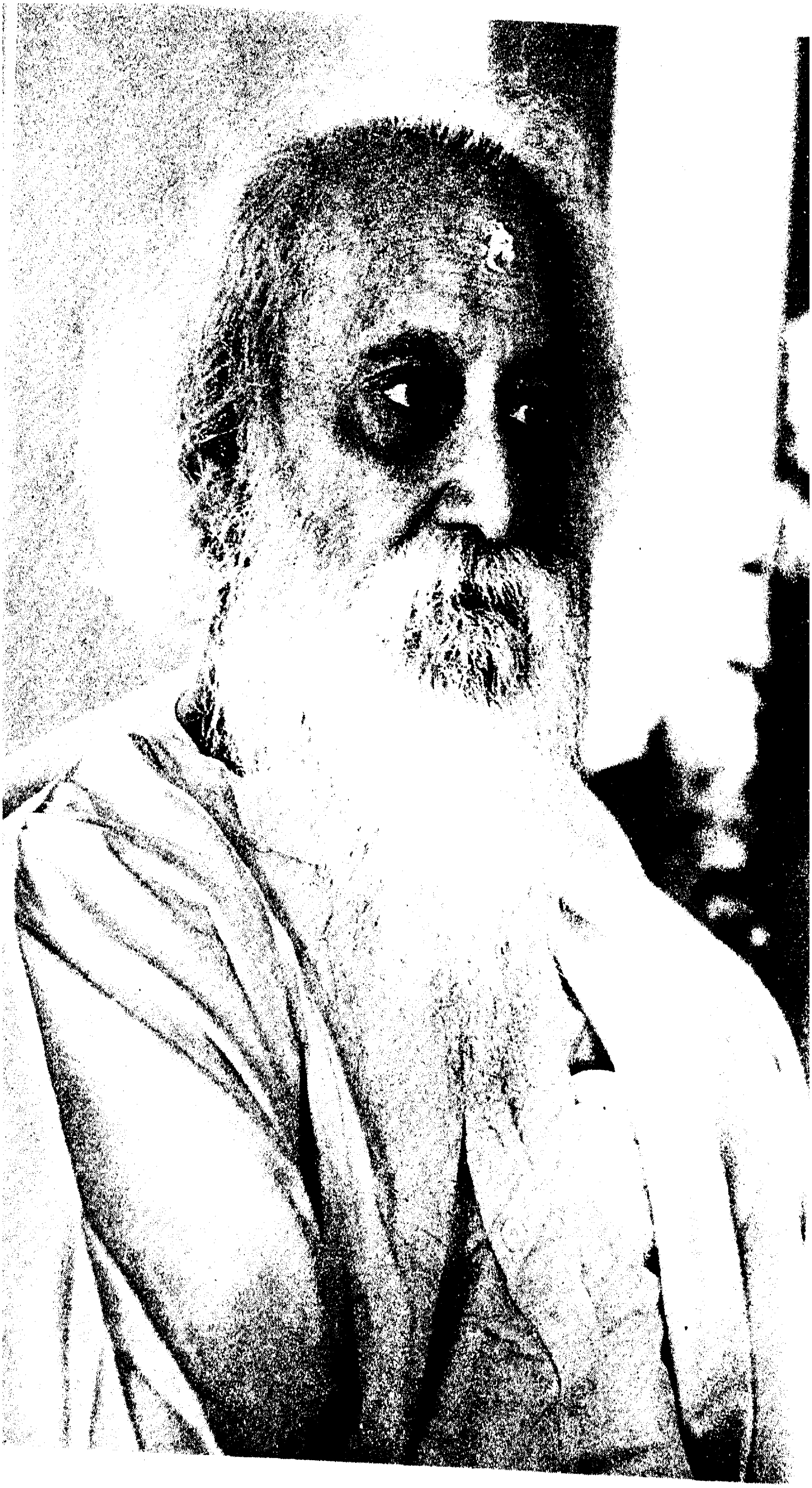

রবীন্দ্র-রচনাবলী

নবম খণ্ড

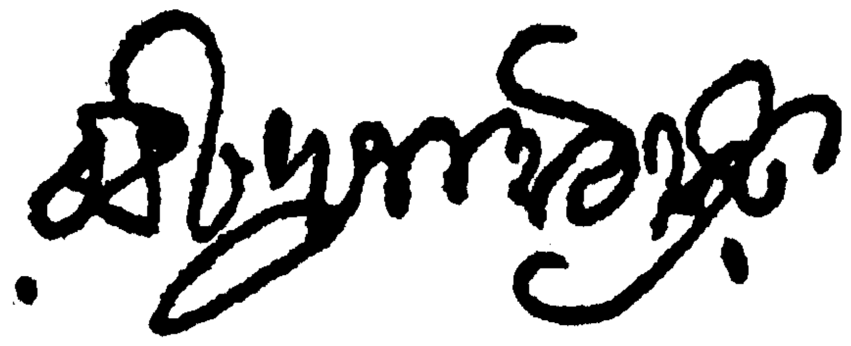

বিশ্বভারতী
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৯৬
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯
পৌষ ১৪১০

© বিশ্বভারতী

ISBN-81-7522-364-2 (V.9)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)

প্রকাশক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক ট্রায়ো প্রসেস
পি ১২৮ সি. আই. টি. রোড। কলকাতা ১৪

সূচী

কবিতা ও গান

বিচিত্রিতা ৩
শেষ সপ্তক ৩৭
সংযোজন ১১৫

নাটক ও প্রহসন

শোধবোধ ১৩৩
গৃহপ্রবেশ ১৭১
শেষ বর্ষণ ২০৩
নটীর পূজা ২১৭
নটরাজ ২৫৩

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ৩০১

প্রবন্ধ

জীবনস্মৃতি ৪০৯
সঞ্চয় ৫১৭
পরিচয় ৫৭৩
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ৬৪৭

গ্রন্থপরিচয় ৬৬৩

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৭৩৩

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		প্রবেশক
বিচিত্রিতার নামপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক অঙ্কিত	৩
রবীন্দ্রনাথ সিংহল ১৯৩৪		৭
আমার শেষবেলাকার ঘরখানি		৩৯
ঘটভরা		১২৪
রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক অঙ্কিত	৪১১
শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও 'আমরা তিনটি বালক'		৪৩০
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক অঙ্কিত	৪৩৬
মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথ	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক অঙ্কিত	৪৪৪
সাহিত্যের সঙ্গী		৪৫৮
সারদা দেবী		৫০৮

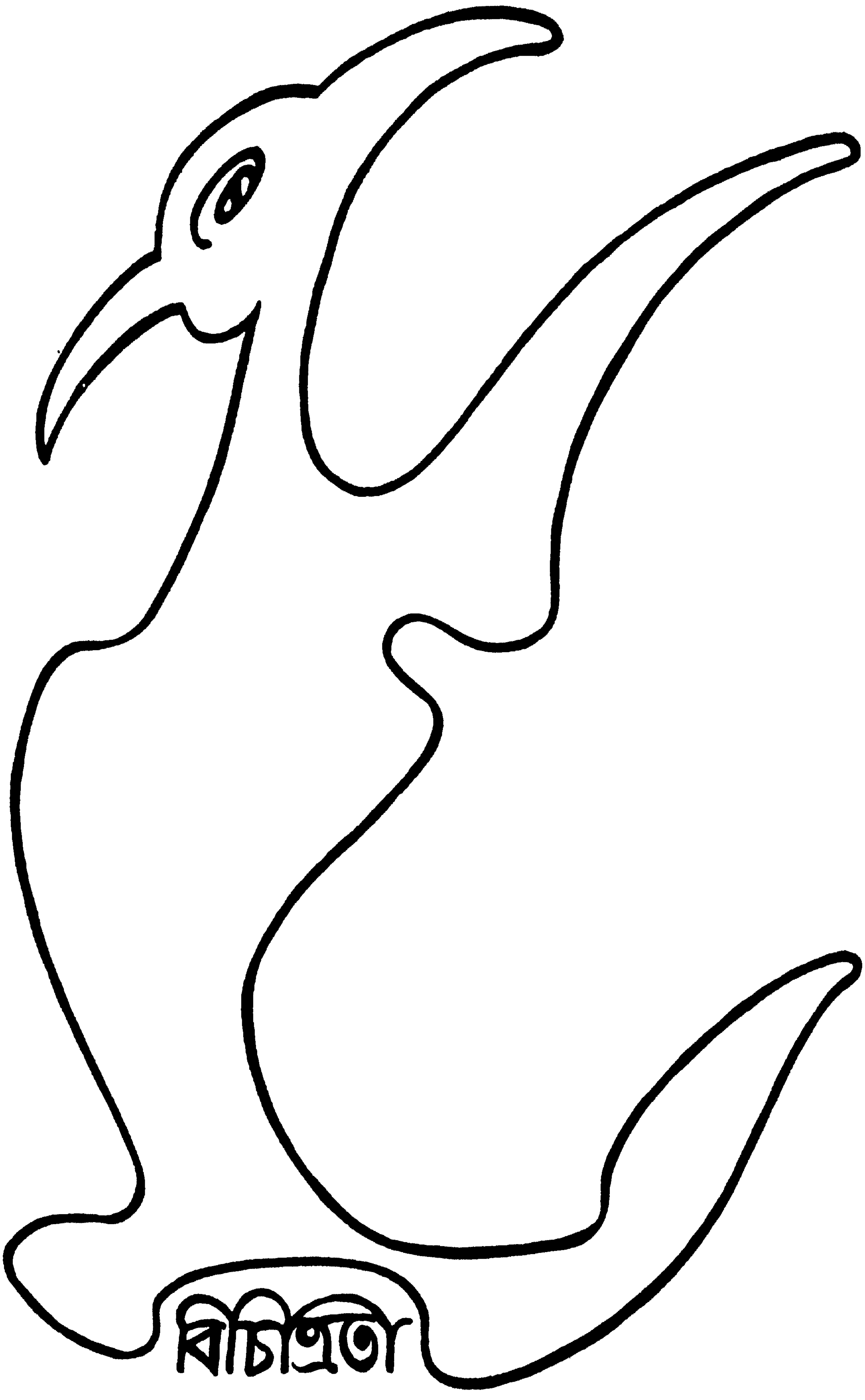
বিচিত্রতা

কবিতা ও গান

আশীর্বাদ

পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি
সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগালো কে যে নয়নপাতে,
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা।

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের-লীলালিখন-ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি,
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি।

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি যে হাসে
রঙ জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে।

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত।

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের 'পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয়।

চিরবালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে,
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম-পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা-'পরে।

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

[শান্তিনিকেতন]
রাসপূর্ণিমা
৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

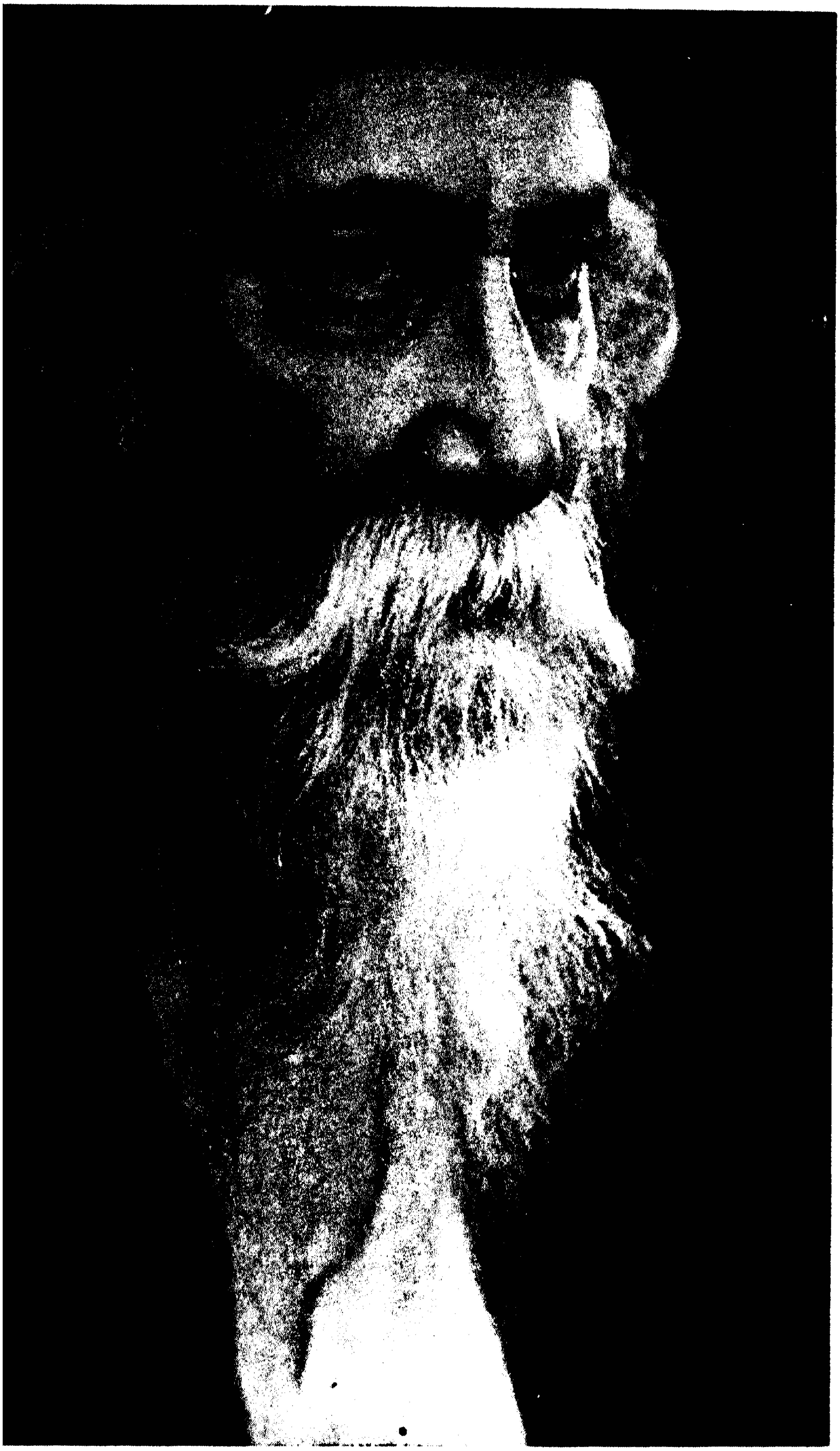

রবীন্দ্রনাথ

সিংহল । ১৯৩৪

বিচিত্রিতা

পুষ্প

পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে, হে নারী, তোমার অপেক্ষায়
পল্লবচ্ছায়ায়।
তোমার নিশ্বাস তারে লেগে
অন্তরে সে উঠিয়াছে জেগে,
মুখে তব কী দেখিতে পায়।

সে কহিছে— 'বহু পূর্বে তুমি আমি কবে একসাথে
আদিম প্রভাতে
প্রথম আলোকে জেগে উঠি
এক ছন্দে বাঁধা রাখী দুটি
দুজনে পরিনু হাতে হাতে।

'আধো আলো-অন্ধকারে উড়ে এনু মোরা পাশে পাশে
প্রাণের বাতাসে।
একদিন কবে কোন্ মোহে
দুই পথে চলে গেনু দোঁহে
আমাদের মাটির আবাসে।

'বারে বারে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে
নব নব দেশে।
যুগে যুগে রূপে রূপান্তরে
ফিরিনু সে কী সন্ধান-তরে
সৃজনের নিগূঢ় উদ্দেশে।

'অবশেষে দেখিলাম কত জন্ম-পরে নাহি জানি
ওই মুখখানি।
বুঝিলাম আমি আজও আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী।

'তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।

তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।

'কী যে বলে সেই সুর, কোন্ দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।
আজ, সখী, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি—
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।'

১১ মাঘ [১৩৩৮]

বধূ

যে-চিরবধূর বাস তরুণীর প্রাণে
সেই ভীরু চেয়ে আছে ভবিষ্যৎ-পানে
অনাগত অনিশ্চিত ভাগ্যবিধাতার
সাজায়ে পূজার ডালি।

কল্পমূর্তি তার
প্রতিষ্ঠা করেছে মনে।

যাহারে দেখে নি
একান্তে স্মরিয়া তারে সুনিপুণ বেণী
কুসুমে খচিত করি তুলে।
সযতনে
পরে নীলাম্বরী শাড়ি।

নিভৃতে দর্পণে
দেখে আপনার মুখ।

শুধায় সভয়ে—
হব কি মনের মতো, পাব কি হৃদয়ে
সৌভাগ্য-আসন।

কোন্ দূরের কল্যাণে
সঁপিছে করুণ ভক্তি দেবতার ধ্যানে।
আগন্তুক অজানার পথ-পানে থেমে
উদ্দেশে নিজেরে সঁপে আগামিক প্রেমে।

১৪ মাঘ [১৩৩৮]

অচেনা

তোমারে আমি কখনো চিনি নাকো,
লুকানো নহ, তবু লুকানো থাকো।
ছবির মতো ভাবনা পরশিয়া
একটু আছ মনেরে হরষিয়া।

অনেক দিন দিয়েছ তুমি দেখা,
বসেছ পাশে, তবুও আমি একা।
আমার কাছে রহিলে বিদেশিনী,
লইলে শুধু নয়ন মম জিনি।

বেদনা কিছু আছে বা তব মনে,
সে ব্যথা ঢাকে তোমারে আবরণে।
শূন্য-পানে চাহিয়া থাক তুমি,
নিশ্বসিয়া উঠে কাননভূমি।

মৌন তব কী কথা বলে বুঝি,
অর্থ তারি বেড়াই মনে খুঁজি।
চলিয়া যাও তখন মনে বাজে—
চিনি না আমি, তোমারে চিনি না যে।

পসারিনী

পসারিনী, ওগো পসারিনী,
কেটেছে সকালবেলা হাটে হাটে লয়ে বিকিকিনি
ঘরে ফিরিবার খনে
কী জানি কী হল মনে,
বসিলি গাছের ছায়াতলে—
লাভের জমানো কড়ি
ডালায় রহিল পড়ি,
ভাবনা কোথায় ধেয়ে চলে।

এই মাঠ, এই রাঙা ধূলি,
অঘ্রানের-রৌদ্র-লাগা চিক্কণ কাঁঠালপাতাগুলি,
শীতবাতাসের শ্বাসে
এই শিহরন ঘাসে—
কী কথা কহিল তোর কানে।
বহুদূর নদীজলে
আলোকের রেখা ঝলে,
ধ্যানে তোর কোন্ মন্ত্র আনে।

সৃষ্টির প্রথম স্মৃতি হতে
সহসা আদিম স্পন্দ সঞ্চরিল তোর রক্তস্রোতে।
তাই এ তরুতে তৃণে
প্রাণ আপনারে চিনে
হেমন্তের মধ্যাহ্নের বেলা—
মৃত্তিকার খেলাঘরে
কত যুগযুগান্তরে
হিরণে হরিতে তোর খেলা।

নিরালা মাঠের মাঝে বসি
সাম্প্রতের আবরণ মন হতে গেল দ্রুত খসি।
আলোকে আকাশে মিলে
যে-নটন এ নিখিলে
দেখ তাই আঁখির সম্মুখে,
বিরাট কালের মাঝে
যে ওঙ্কারধ্বনি বাজে
গুঞ্জরি উঠিল তোর বুকে।

যত ছিল ত্বরিত আহ্বান
পরিচিত সংসারের দিগন্তে হয়েছে অবসান।
বেলা কত হল, তার
বার্তা নাহি চারি ধার,
না কোথাও কর্মের আভাস।
শব্দহীনতার স্বরে
খররৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে,
শূন্যতার উঠে দীর্ঘশ্বাস।

পসারিনী, ওগো পসারিনী,
ক্ষণকাল-তরে আজি ভুলে গেলি যত বিকিকিনি।
কোথা হাট, কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা—
অনন্তের বাণী আনে
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা।

৫ মাঘ ১৩৩৮

গোয়ালিনী

হাটেতে চল পথের বাঁকে বাঁকে,
হে গোয়ালিনী, শিশুরে নিয়ে কাঁখে।
হাটের সাথে ঘরের সাথে
বেঁধেছ ডোর আপন হাতে
পরুষ কলকোলাহলের ফাঁকে।

হাটের পথে জানি না কোন্ ভুলে
কৃষ্ণকলি উঠিছে ভরি ফুলে।
কেনাবেচার বাহনগুলা
যতই কেন উড়াক ধুলা
তোমারি মিল সে ওই তরুমূলে।

শালিখপাখি আহারকণা-আশে
মাঠের 'পরে চরিছে ঘাসে ঘাসে।
আকাশ হতে প্রভাতরবি
দেখিছে সেই প্রাণের ছবি,
তোমারে আর তাহারে দেখে হাসে।

মায়েতে আর শিশুতে দোঁহে মিলে
ভিড়ের মাঝে চলেছ নিরিবিলে।
দুধের ভাঁড়ে মায়ের প্রাণ
মাধুরী তার করিল দান,
লোভের ভালে স্নেহের ছোঁওয়া দিলে।

কুমার

কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেক-তরে এনেছে তীর্থবারি।
সাজাবে অঙ্গ উজ্জ্বল বরবেশে,
জয়মাল্য-যে পরাবে তোমার কেশে,
বরণ করিবে তোমারে সে-উদ্দেশে
দাঁড়ায়েছে সারি সারি।

দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভবে
বারে বারে, বীর, জাগ ভয়ার্ত ভবে।
ভাই ব'লে তাই নারী করে আহ্বান,
তোমারে রমণী পেতে চাহে সন্তান,
প্রিয় ব'লে গলে করিবে মাল্য দান
আনন্দে গৌরবে।

সে ছায়া খেলারই ছলে
নিয়েছিনু হিয়াতলে
হেলাভরে হেসে,
ভেবেছিনু চুপে চুপে
ফিরে দিব ছায়ারূপে
তোমারি উদ্দেশে।

সে ছায়া তো ফিরিল না, সে আমার প্রাণে
হল প্রাণবান।
দেখি, ধরা পড়ে গেল কবে মোর গানে
তোমার সে দান।

যদি-বা দেখিতে তারে
পারিতে না চিনিবারে
অয়ি এলোকেশী—
আমার পরান পেয়ে
সে আজি তোমারো চেয়ে
বহুগুণে বেশি।

কেমনে জানিবে তুমি তারে সুর দিয়ে
দিয়েছি মহিমা।
প্রেমের অমৃতস্নানে সে যে, অয়ি প্রিয়ে,
হারায়েছে সীমা।
তোমার খেয়াল ত্যেজে
পূজার গৌরবে সে যে
পেয়েছে গৌরব।
মর্তের স্বপন ভুলে
অমরাবতীর ফুলে
লভিল সৌরভ।

৯ মাঘ [১৩৩৮]

দান

হে উষা তরুণী,
নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর শুনি
যেমনি উঠিলে জেগে, দেখিলে তোমার শয্যাশেষে
তোমারি উদ্দেশে
রেখেছে ফুলের ডালি
শিশিরে প্রক্ষালি
কোন্ মহা-অন্ধকারে কে প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর।

তোমারে দিয়েছে বর
তোমার অজ্ঞাতে
সুপ্তিঢাকা রাতে,
তব শুভ্র আলোকেরে করিয়া স্মরণ
আগে হতে করেছে বরণ।
নিজেরে আড়াল করি
বর্ণে গন্ধে ভরি
প্রেমের দিয়েছে পরিচয়
ফুলেরে করিয়া বাণীময়।

মৌনী তুমি, মুগ্ধ তুমি, স্তব্ধ তুমি, চক্ষু ছলোছলো—
কথা কও, বলো কিছু বলো,
তোমার পাখির গানে
পাঠাও সে-অলক্ষ্যের পানে
প্রতিভাষণের বাণী,
বলো তারে— হে অজানা, জানি আমি জানি,
তুমি ধন্য, তুমি প্রিয়তম,
নিমেষে নিমেষে তুমি চিরন্তন মম।

হার

শুক্লা একাদশী।
লাজুক রাতের ওড়না পড়ে খসি
বটের ছায়াতলে,
নদীর কালো জলে।
দিনের বেলায় কৃপণ কুসুম কুণ্ঠাভরে
যে-গন্ধ তার লুকিয়ে রাখে নিরুদ্ধ অন্তরে
আজ রাতে তার সকল বাধা ঘোচে,
আপন বাণী নিঃশেষিয়া দেয় সে অসংকোচে।

অনিদ্র কোকিল
দূর শাখাতে মুহুর্মুহু খুঁজতে পাঠায় কুহুগানের মিল।
যেন রে আর সময় তাহার নাই,
এক রাতে আজ এই জীবনের শেষ কথাটি চাই।
ভেবেছিলেম সইবে না আজ লুকিয়ে রাখা
বদ্ধ বাণীর অস্ফুটতায় যে-কথা মোর অর্ধাবরণ-ঢাকা।
ভেবেছিলেম বন্দীরে আজ মুক্ত করা সহজ হবে,
ক্ষুদ্র বাধায় দিনে দিনে রুদ্ধ যাহা ছিল অগৌরবে।

সে যবে আজ এল ঘরে
জ্যোৎস্নারেখা পড়েছে মোর 'পরে
শিরীষ-ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
ভেবেছিলেম বলি তাকে—
'দেখো আমায়, জানো আমায়, সত্য ডাকে আমায় ডেকে লহো,
সবার চেয়ে গভীর যাহা নিবিড় ভাষায় সেই কথাটি কহো।
হয় নি মোদের চরম মন্ত্র পড়া,
হয় নি পূর্ণ অভিষেকের তীর্থজলের ঘড়া,
আজ হয়ে যাক মালাবদল যে-মালাটি অসীম রাত্রিদিন
রইবে অমলিন।'

হঠাৎ বলে উঠল সে-যে, ক্রুদ্ধ নয়ন তার—
গড়ের মাঠে তাদের দলের হার হয়েছে, অন্যায় সেই হার।
বারে বারে ফিরে ফিরে খেলাহারের গ্লানি
জানিয়ে দিল ক্লান্তি নাহি মানি।
বাতায়নের সমুখ থেকে চাঁদের আলো নেমে গেল নীচে,
তখনো সেই নিদ্রাবিহীন কোকিল কুহরিছে।

৩ মাঘ ১৩৩৮

মরীচিকা

ওই-যে তোমার মানস-প্রজাপতি
ঘরছাড়া সব ভাবনা যত, অলস দিনে কোথা ওদের গতি।
দখিন হাওয়ার সাড়া পেয়ে
চঞ্চলতার পতঙ্গদল ভিতর থেকে বাইরে আসে ধেয়ে।
চেলাঞ্চলে উতল হল তারা,
চক্ষে মেলে চপল পাখা আকাশে পথহারা।
বকুলশাখায় পাখির হঠাৎ ডাকে
চমকে-যাওয়া চরণ ঘিরে ঘুরে বেড়ায় শাড়ির ঘূর্ণিপাকে।
কাটায় ব্যর্থ বেলা
অঙ্গে অঙ্গে অস্থিরতার চকিত এই খেলা।
মনে তোমার ফুল-ফোটানো মায়া
অস্ফুট কোন্ পূর্বরাগের রক্তরঙিন ছায়া।
ঘিরল তারা তোমার চারি পাশে
ইঙ্গিতে আভাসে
ক্ষণে ক্ষণে চমকে ঝলকে।
তোমার অলকে
দোলা দিয়ে বিনা ভাষায় আলাপ করে কানে কানে,
নাই কোনো যার মানে।

মরীচিকার ফুলের সাথে
মরীচিকার প্রজাপতির মিলন ঘটে ফাল্গুনপ্রভাতে।
আজি তোমার যৌবনেরে ঘেরি
যুগলছায়ার স্বপনখেলা তোমার মধ্যে হেরি।

৭ মাঘ ১৩৩৮

শ্যামলা

যে-ধরণী ভালোবাসিয়াছি
তোমারে দেখিয়া ভাবি তুমি তারি আছ কাছাকাছি।
হৃদয়ের বিস্তীর্ণ আকাশে
উন্মুক্ত বাতাসে
চিত্ত তব স্নিগ্ধ সুগভীর।
হে শ্যামলা, তুমি ধীর,
সেবা তব সহজ সুন্দর,
কর্মেরে বেষ্টিয়া তব আত্মসমাহিত অবসর।

মাটির অন্তরে
স্তরে স্তরে
রবিরশ্মি নামে পথ করি,
তারি পরিচয় ফুটে দিবসশর্বরী
তরুলতিকায় ঘাসে,
জীবনের বিচিত্র বিকাশে।
তেমনি প্রচ্ছন্ন তেজ চিত্ততলে তব
তোমার বিচিত্র চেষ্টা করে নব নব
প্রাণমূর্তিময়,
দেয় তারে যৌবন অক্ষয়।
প্রতিদিবসের সব কাজে
সৃষ্টির প্রতিভা তব অক্লান্ত বিরাজে।
তাই দেখি তোমার সংসার
চিত্তের সজীব স্পর্শে সর্বত্র তোমার আপনার।

আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে
মাটির যে-গন্ধ উঠে সিক্ত সমীরণে,
ভাদ্রে যে-নদীটি ভরা কূলে কূলে,
মাঘের শেষে যে-শাখা গন্ধঘন আমের মুকুলে,
ধানের হিল্লোলে ভরা নবীন যে-খেত,
অশথের কম্পিত সংকেত,
আশ্বিনে শিউলিতলে পূজাগন্ধ যে স্নিগ্ধ ছায়ার,
জানি না এদের সাথে কী মিল তোমার।

দেখি ব'সে জানালার ধারে—
প্রান্তরের পারে
নীলাভ নিবিড় বনে
শীতসমীরণে
চঞ্চল পল্লবঘন সবুজের 'পরে
ঝিলিমিলি করে
জনহীন মধ্যাহ্নের সূর্যের কিরণ,
তন্দ্রাবিষ্ট আকাশের স্বপ্নের মতন।
দিগন্তে মন্থর মেঘ, শঙ্খচিল উড়ে যায় চলি
ঊর্ধ্বশূন্যে, কতমতো পাখির কাকলি,
পীতবর্ণ ঘাস
শুষ্ক মাঠে, ধরণীর বনগন্ধি আতপ্ত নিশ্বাস
মৃদুমন্দ লাগে গায়ে, তখন সে-ক্ষণে
অস্তিত্বের যে ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ভরি উঠে মনে,
প্রাণের যে প্রশান্ত পূর্ণতা, লভি তাই
যখন তোমার কাছে যাই—
যখন তোমারে হেরি
রহিয়াছ আপনারে ঘেরি
গম্ভীর শান্তিতে,
স্নিগ্ধ সুনিস্তব্ধ চিতে,
চক্ষে তব অন্তর্যামী দেবতার উদার প্রসাদ
সৌম্য আশীর্বাদ।

৮ মাঘ [১৩৩৮]

একাকিনী

একাকিনী বসে থাকে আপনারে সাজায়ে যতনে।
বসনে ভূষণে
যৌবনেরে করে মূল্যবান।
নিজেরে করিবে দান
যার হাতে
সে অজানা তরুণের সাথে
এই যেন দূর হতে তার কথা-বলা।
এই প্রসাধনকলা,
নয়নের এ-কজ্জললেখা,
উজ্জ্বল বসন্তীরঙা অঞ্চলের এ-বঙ্কিমরেখা
মণ্ডিত করেছে দেহ প্রিয়সম্ভাষণে।
দক্ষিণপবনে
অস্পষ্ট উত্তর আসে শিরীষের কম্পিত ছায়ায়।

এইমতো দিন যায়,
ফাগুনের গন্ধে ভরা দিন।
সায়াহ্নিক দিগন্তের সীমন্তে বিলীন
কুঙ্কুম-আভায় আনে
উৎকণ্ঠিত প্রাণে
তুলি' দীর্ঘশ্বাস—
অভাবিত মিলনের আরক্ত আভাস।

২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮

সাজ

এই-যে রাঙা চেলি দিয়ে তোমায় সাজানো,
ওই-যে হোথায় দ্বারের কাছে সানাই বাজানো,
অদৃশ্য এক লিপির লিখায়
নবীন প্রাণের কোন্ ভূমিকায়
মিলছে, না জানো।

শিশুবেলায় ধূলির 'পরে আঁচল এলিয়ে
সাজিয়ে পুতুল কাটল বেলা খেলা খেলিয়ে।
বুঝতে নাহি পারবে আজো
আজ কী খেলায় আপনি সাজো
হৃদয় মেলিয়ে।

অখ্যাত এই প্রাণের কোণে সন্ধ্যাবেলাতে
বিশ্বখেলোয়াড়ের খেয়াল নামল খেলাতে।
দুঃখসুখের তুফান লেগে
পুতুল-ভাসান চলল বেগে
ভাগ্যভেলাতে।

তার পরেতে ভোলার পালা, কথা কবে না—
অসীম কালের পটে ছবির চিহ্ন রবে না।
তার পরেতে জিতবে ধুলো,
ভাঙা খেলার চিহ্নগুলো
সঙ্গে লবে না।

রাঙা রঙের চেলি দিয়ে কন্যে সাজানো,
দ্বারের কাছে বেহাগ রাগে সানাই বাজানো,
এই মানে তার বুঝতে পারি—
খেয়াল যাহার খুশি তাঁরি
জানো না-জানো।

প্রকাশিতা

আজ তুমি ছোটো বটে, যার সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধা
যেন তার আধা।
অধিকারগর্বভরে
সে তোমারে নিয়ে চলে নিজঘরে।
মনে জানে তুমি তার ছায়েবানুগতা—
তমাল সে, তার শাখালগ্ন তুমি মাধবীর লতা।
আজ তুমি রাঙাচেলি দিয়ে মোড়া
আগাগোড়া,
জড়োসড়ো ঘোমটায়-ঢাকা
ছবি যেন পটে আঁকা।

আসিবে-যে আর-একদিন,
নারীর মহিমা নিয়ে হবে তুমি অন্তরে স্বাধীন
বাহিরে যেমনি থাক্।
আজিকে এই-যে বাজে শাঁখ
এরি মধ্যে আছে গূঢ় তব জয়ধ্বনি।
জিনি লবে তোমার সংসার, হে রমণী,
সেবার গৌরবে।
যে-জন আশ্রয় তব তোমারি আশ্রয় সেই লবে।
সংকোচের এই আবরণ দূর ক'রে
সেদিন কহিবে— দেখো মোরে!
সে দেখিবে ঊর্ধ্বে মুখ তুলি
সুপ্ত হয়ে পড়ে গেছে ধূসর সে কুণ্ঠিত গোধূলি—
দিগন্তের 'পরে স্মিতহাসে
পূর্ণচন্দ্র একা জাগে বসন্তের বিস্মিত আকাশে।
বুঝিবে সে দেহে মনে
প্রচ্ছন্ন হয়েছে তরু পুষ্পিত লতার আলিঙ্গনে।

বরবধূ

এ-পারে চলে বর, বধূ সে পরপারে,
সেতুটি বাঁধা তার মাঝে।
তাহারি 'পরে দান আসিছে ভারে ভারে,
তাহারি 'পরে বাঁশি বাজে।
যাত্রা দুজনার
লক্ষ্য একই তার,
তবুও যত কাছে আসে

সতত যেন থাকে
বিরহ ফাঁকে ফাঁকে
তৃপ্তিহারা অবকাশে।

সে-ফাঁক গেলে ঘুচে থেমে যে যাবে গান,
দৃষ্টি হবে বাধাময়,
যেথায় দূর নাহি সেথায় যত দান
কাছেতে ছোটো হয়ে রয়।
বিরহনদীজলে
খেয়ার তরী চলে,
বায় সে মিলনেরই ঘাটে।
হৃদয় বার বার
করিবে পারাপার
মিলিতে উৎসবনাটে।

বেলা যে পড়ে এল, সূর্য নামে ধীরে,
আলোক ম্লান হয়ে আসে।
ভাঙিয়া গেছে হাট, জনতাহীন তীরে
নৌকা বাঁধা পাশে পাশে।
এ-পারে বর চলে
পুরানো বটতলে,
নদীটি বহি চলে মাঝে,
বধূরে দেখা যায়
মাঠের কিনারায়,
সেতুর 'পরে বাঁশি বাজে।

ছায়াসঙ্গিনী

কোন্ ছায়াখানি
সঙ্গে তব ফেরে লয়ে স্বপ্নরুদ্ধ বাণী
তুমি কি আপনি তাহা জানো।
চোখের দৃষ্টিতে তব রয়েছে বিছানো
আপনাবিস্মৃত তারি
স্তম্ভিত স্তিমিত অশ্রুবারি।

একদিন জীবনের প্রথম ফাল্গুনী
এসেছিল, তুমি তারি পদধ্বনি শুনি
কম্পিত কৌতুকী
যেমনি খুলিয়া দ্বার দিলে উঁকি

আম্রমঞ্জরির গন্ধে মধুপগুঞ্জনে
হৃদয়স্পন্দনে
এক ছন্দে মিলে গেল বনের মর্মর।
অশোকের কিশলয়স্তর
উৎসুক যৌবনে তব বিস্তারিল নবীন রক্তিমা।
প্রাণোচ্ছ্বাস নাহি পায় সীমা
তোমার আপনা-মাঝে,
সে-প্রাণেরই ছন্দ বাজে
দূর নীল বনান্তের বিহঙ্গসংগীতে,
দিগন্তে নির্জনলীন রাখালের করুণ বংশীতে।
তব বনচ্ছায়ে
আসিল অতিথি পান্থ, তৃণস্তরে দিল সে বিছায়ে
উত্তরী-অংশুকে তার সুবর্ণ পূর্ণিমা
চম্পকবর্ণিমা।
তারি সঙ্গে মিশে
প্রভাতের মৃদু রৌদ্র দিশে দিশে
তোমার বিধুর হিয়া
দিল উচ্ছ্বাসিয়া।

তার পর সসংকোচে বন্ধ করি দিলে তব দ্বার,
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণে উদ্দাম কুন্তলভার
লইলে সংযত করি—
অশান্ত তরুণ প্রেম বসন্তের পন্থ অনুসরি
স্খলিত কিংশুক-সাথে
জীর্ণ হল ধূসর ধুলাতে।

তুমি ভাবো সেই রাত্রিদিন
চিহ্নহীন
মল্লিকাগন্ধের মতো
নির্বিশেষে গত।
জানো না কি যে-বসন্ত সম্বরিল কায়া
তারি মৃত্যুহীন ছায়া
অহির্নিশি আছে তব সাথে সাথে
তোমার অজ্ঞাতে।
অদৃশ্য মঞ্জরি তার আপনার রেণুর রেখায়
মেশে তব সীমন্তের সিন্দূরলেখায়।
সুদূর সে ফাল্গুনের স্তব্ধ সুর
তোমার কণ্ঠের স্বর করি দিল উদাত্ত মধুর।
যে চাঞ্চল্য হয়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ, শান্ত, সুগম্ভীর।

[মাঘ ? ১৩৩৮]

প্রভেদ

তোমাতে আমাতে আছে তো প্রভেদ
জানি তা বন্ধু, জানি,
বিচ্ছেদ তবু অন্তরে নাহি মানি।
এক জ্যোৎস্নায় জেগেছি দুজনে
সারারাত-জাগা পাখির কূজনে,
একই বসন্তে দোঁহাকার মনে
দিয়েছে আপন বাণী।

তুমি চেয়ে আছ আলোকের পানে,
পশ্চাতে মোর মুখ—
অন্তরে তবু গোপন মিলনসুখ।
প্রবল প্রবাহে যৌবনবান
ভাসায়েছে দুটি দোলায়িত প্রাণ,
নিমেষে দোঁহারে করেছে সমান
একই আবর্তে টানি।

সোনার বর্ণ মহিমা তোমার
বিশ্বের মনোহর,
আমি অবনত পাণ্ডুর কলেবর।
উদাস বাতাসে পরান কাঁপায়ে
অগৌরবের শরম ছাপায়ে
আমারে তোমার বসাইল বাঁয়ে,
একাসনে দিল আনি।
নবারুণরাগে রাঙা হয়ে গেল
কালো ভেদরেখাখানি।

শ্রীপঞ্চমী
১৩৩৮

পুষ্পচয়িনী

হে পুষ্পচয়িনী,
ছেড়ে আসিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী
মালিনীছন্দের বন্ধ টুটে।
বকুল উৎফুল্ল হয়ে উঠে
আজো বুঝি তব মুখমদে।
নূপুররণিত পদে
আজো বুঝি অশোকের ভাঙাইবে ঘুম।
কী সেই কুসুম
যা দিয়ে অতীত জন্মে গনেছিলে বিরহের দিন।

বুঝি সে-ফুলের নাম বিস্মৃতিবিলীন
ভর্তৃপ্রসাদন ব্রতে যা দিয়ে গাঁথিতে মালা
সাজাইতে বরণের ডালা।
মনে হয় যেন তুমি ভুলে-যাওয়া তুমি—
মর্তভূমি
তোমারে যা ব'লে জানে সেই পরিচয়
সম্পূর্ণ তো নয়।
তুমি আজ
করেছ যে-অঙ্গসাজ
নহে সদ্য আজিকার।
কালোয় রাঙায় তার
যে ভঙ্গিটি পেয়েছে প্রকাশ
দেয় বহুদূরের আভাস।
মনে হয় যেন অজানিতে
রয়েছ অতীতে।
মনে হয় যে-প্রিয়ের লাগি
অবন্তীনগরসৌধে ছিলে জাগি,
তাহারি উদ্দেশে
না জেনে সেজেছ বুঝি সে-যুগের বেশে।
মালতীশাখার 'পরে
এই-যে তুলেছ হাত ভঙ্গিভরে
নহে ফুল তুলিবার প্রয়োজনে,
বুঝি আছে মনে
যুগ-অন্তরাল হতে বিস্মৃত বল্লভ
লুকায়ে দেখিছে তব সুকোমল ও-করপল্লব।
অশরীরী মুগ্ধনেত্র যেন গগনে সে
হেরে অনিমেষে
দেহভঙ্গিমার মিল লতিকার সাথে
আজি মাঘীপূর্ণিমার রাতে।
বাতাসেতে অলক্ষিতে যেন কার ব্যাপ্ত ভালোবাসা
তোমার যৌবনে দিল নৃত্যময়ী ভাষা।

১০ মাঘ [১৩৩৮]

ভীরু

কেন এ কম্পিত প্রেম, অয়ি ভীরু, এনেছ সংসারে—
ব্যর্থ করি রাখিবে কি তারে।
আলোকশঙ্কিত তব হিয়া
প্রচ্ছন্ন নিভৃত পথ দিয়া
থেমে যায় প্রাঙ্গণের দ্বারে।

হায়, সে যে পায় নাই আপন নিশ্চিত পরিচয়,
বন্দী তারে রেখেছে সংশয়।
বাহিরে সামান্য বাধা সেও
সে-প্রেমেরে কেন করে হেয়,
অন্তরেও তার পরাজয়।

ওই শোনো কেঁপে ওঠে নিশীথরাত্রির অন্ধকার,
আহ্বান আসিছে বারংবার।
থেকো না ভয়ের অন্ধ ঘেরে,
অবজ্ঞা করিয়ো দুর্গমেরে,
জিনি লহো সত্যেরে তোমার।

নিষ্ঠুরকে মেনে লহো সুদুঃসহ দুঃখের উৎসাহে,
প্রেমের গৌরব জেনো তাহে।
দীপ্তি দেয় রুদ্ধ অশ্রুজল,
নষ্ট আশা হয় না নিষ্ফল,
সমুজ্জ্বল করে চিত্তদাহে।

শীর্ণ ফুল রৌদ্রে পুড়ে কালো হয়, হোক-না সে কালো—
দীন দীপে নিবুক-না আলো।
দুর্বল যে মিথ্যার খাঁচায়
নিত্যকাল কে তারে বাঁচায়,
মরে যাহা মরা তার ভালো।

আঘাত বাঁচাতে গিয়ে বঞ্চিত হবে কি এ-জীবন,
শুধিবে না দুর্মূল্যের পণ।
প্রেম সে কি কৃপণতা জানে,
আত্মরক্ষা করে আত্মদানে—
ত্যাগবীর্যে লভে মুক্তিধন।

০ মাঘ [১৩৩৮]

যুগল

আমি থাকি একা,
এই বাতায়নে বসে এক বৃন্তে যুগলকে দেখা—
সেই মোর সার্থকতা—
বুঝিতে পারি সে কথা
লোকে লোকে কী আগ্রহ অহরহ
করিছে সন্ধান
আপনার বাহিরেতে কোথা হবে আপনার দান।
তা নিয়ে বিপুল দুঃখে বিশ্বচিত্ত জেগে উঠে,
তারি সুখে পূর্ণ হয়ে ফুটে
যা-কিছু মধুর।
যত বাণী, যত সুর,
যত রূপ, তপস্যার যত বহ্নিশিখা,
সৃষ্টিচিত্তশিখা,
আকাশে আকাশে লিখে
দিকে দিকে
অণুপরমাণুদের মিলনের ছবি।
গ্রহ তারা রবি
যে-আগুন জ্বেলেছে তা বাসনারই দাহ,
সেই তাপে জগৎপ্রবাহ
চঞ্চলিয়া চলিয়াছে বিরহমিলনদ্বন্দ্বঘাতে।
দিনরাতে
কালের অতীত পার হতে,
অনাদি আহ্বানধ্বনি ফিরিতেছে ছায়াতে আলোতে।
সেই ডাক শুনে
কত সাজে সাজিয়াছে আজি এ-ফাল্গুনে
বনে বনে অভিসারিকার দল,
পত্রে পুষ্পে হয়েছে চঞ্চল—
সমস্ত বিশ্বের মর্মে যে-চাঞ্চল্য তারায় তারায়
তরঙ্গিছে প্রকাশধারায়,
নিখিল ভুবনে নিত্য যে-সংগীত বাজে
মূর্তি নিল বনচ্ছায়ে যুগলের সাজে।

১৮. ২. ৩২

বেসুর

ভাগ্য তাহার ভুল করেছে— প্রাণের তানপুরার
গানের সাথে মিল হল না, বেসুরো ঝংকার।
এমন ত্রুটি ঘটল কিসে
আপনিও তা বোঝে নি সে,
অভাব কোথাও নেই-যে কিছুই এই কি অভাব তার।

ঘরটাকে তার ছাড়িয়ে গেল ঘরেরই আসবাবে।
মনটাকে তার ঠাঁই দিল না ধনের প্রাদুর্ভাবে।
যা চাই তারো অনেক বেশি
ভিড় করে রয় ঘেঁষাঘেঁষি,
সেই ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে তাই বিদ্রোহ তার নাবে।

সব চেয়ে যা সহজ সেটাই দুর্লভ তার কাছে।
সেই সহজের মূর্তি যে তার বুকের মধ্যে আছে।
সেই সহজের খেলাঘরে
ওই যারা সব মেলা করে
দূর হতে ওর বদ্ধ জীবন সঙ্গ তাদের যাচে।

প্রাণের নিঝর স্বভাব-ধারায় বয় সকলের পানে,
সেটাই কি কেউ ফিরিয়ে দিল উলটো দিকের টানে।
আত্মদানের রুদ্ধ বাণী
বক্ষকপাট বেড়ায় হানি,
সঞ্চিত তার সুধা কি তাই ব্যথা জাগায় প্রাণে।

আপনি যেন আর কেহ সে এই লাগে তার মনে,
চেনা ঘরের অচল ভিতে কাটায় নির্বাসনে।
বসন ভূষণ অঙ্গরাগে
ছদ্মবেশের মতন লাগে,
তার আপনার ভাষা যে হায় কয় না আপন জনে।

আজকে তারে নিজের কাছে পর করেছে কা'রা,
আপন-মাঝে বিদেশে বাস হায় এ কেমন ধারা।
পরের খুশি দিয়ে সে যে
তৈরি হল ঘ'ষে মেজে,
আপনাকে তাই খুঁজে বেড়ায় নিত্য আপন-হারা।

খড়দা
২ মাঘ ১৩৩৮

স্যাকরা

কার লাগি এই গয়না গড়াও
যতন-ভরে।
স্যাকরা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।

শুধাই তারে, প্রিয়া তোমার
কোথায় আছে।
স্যাকরা বলে, মনের ভিতর
বুকের কাছে।

আমি বলি, কিনে তো লয়
মহারাজাই।
স্যাকরা বলে, প্রেয়সীরে
আগে সাজাই।

আমি শুধাই, সোনা তোমার
ছোঁয় কবে সে।
স্যাকরা বলে, অলখ ছোঁওয়ায়
রূপ লভে সে।

শুধাই, একি একলা তারি
চরণতলে।
স্যাকরা বলে, তারে দিলেই
পায় সকলে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

নীহারিকা

বাদল-শেষের আবেশ আছে ছুঁয়ে
তমালছায়াতলে,
সজনে গাছের ডাল পড়েছে নুয়ে
দিঘির প্রান্তজলে।
অস্তরবির-পথ-তাকানো মেঘে
কালোর বুকে আলোর বেদন লেগে—
কেন এমন খনে
কে যেন সে উঠল হঠাৎ জেগে
আমার শূন্য মনে।

"কে গো তুমি, ওগো ছায়ায় লীন"
প্রশ্ন পুছিলাম।
সে কহিল, "ছিল এমন দিন
জেনেছ মোর নাম।
নীরব রাতে নিসুত দ্বিপ্রহরে
প্রদীপ তোমার জ্বেলে দিলেম ঘরে,
চোখে দিলেম চুমো ;
সেদিন আমায় দেখলে আলস-ভরে
আধ-জাগা আধ-ঘুমো।

আমি তোমার খেয়ালস্রোতে তরী,
প্রথম-দেওয়া খেয়া—
মাতিয়েছিলেম শ্রাবণশর্বরী
লুকিয়ে-ফোটা কেয়া।
সেদিন তুমি নাও নি আমায় বুঝে,
জেগে উঠে পাও নি ভাষা খুঁজে,
দাও নি আসন পাতি—
সংশয়িত স্বপন-সাথে যুঝে
কাটল তোমার রাতি।

তার পরে কোন্ সব-ভুলিবার দিনে
নাম হল মোর হারা!
আমি যেন অকালে আশ্বিনে
এক-পশলার ধারা।
তার পরে তো হল আমার জয়—
সেই প্রদোষের ঝাপসা পরিচয়
ভরল তোমার ভাষা,
তার পরে তো তোমার ছন্দোময়
বেঁধেছি মোর বাসা।

চেনো কিংবা নাই বা আমায় চেনো
তবু তোমার আমি।
সেই সেদিনের পায়ের ধ্বনি জেনো
আর যাবে না থামি।
যে-আমারে হারালে সেই কবে
তারই সাধন করে গানের রবে
তোমার বীণাখানি।
তোমার বনে প্রোজ্জ্বল পল্লবে
তাহার কানাকানি।

সেদিন আমি এসেছিলেম একা
তোমার আঙিনাতে।

দুয়ার ছিল পাথর দিয়ে ঠেকা
নিদ্রাঘেরা রাতে।
যাবার বেলা সে-দ্বার গেছি খুলে
গন্ধ-বিভোল পবন-বিলোল ফুলে,
রঙ-ছড়ানো বনে—
চঞ্চলিত কত শিথিল চুলে,
কত চোখের কোণে।

রইল তোমার সকল গানের সাথে
ভোলা নামের ধুয়া।
রেখে গেলেম সকল প্রিয়হাতে
এক নিমেষের ছুঁয়া।
মোর বিরহ সব মিলনের তলে
রইল গোপন স্বপন-অশ্রুজলে
মোর আঁচলের হাওয়া
আজ রাতে ওই কাহার নীলাঞ্চলে
উদাস হয়ে ধাওয়া।"

বরানগর
১ এপ্রিল ১৯৩১

কালো ঘোড়া

কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাস
সে আমার অন্ধ অভিলাষ।
অসাধ্যের সাধনায় ছুটে যাবে ব'লে
দুর্গমেরে দ্রুত পায়ে দ'লে
খুরে খুরে খুঁড়েছে ধরণী,
করেছে অধীর হ্রেষাধ্বনি।
ও যেন রে যুগান্তের কালো অগ্নিশিখা,
কালো কুজ্ঝটিকা।
অকস্মাৎ নৈরাশ্য-আঘাতে
দ্বার মুক্ত পেয়ে রাতে
দুর্দাম এসেছে বাহিরিয়া।
যারে নিয়ে এল সে-যে ব্যথায় মূর্তিত মোর প্রিয়া,
বাহিরে না স্থান পেয়ে
ধ্যানের আসন ছিল ছেয়ে।

এ-অমাবস্যায়
বল্গাহারা কালো অশ্ব ঊর্ধ্বশ্বাসে ধায়।

কালো চিন্তা মম
আত্মঘাতী ঝঞ্ঝাসম
বিস্মৃতির চিরবিলুপ্তিতে
চলে ঝাঁপ দিতে
নিরঙ্কিত পথ বেয়ে।
যাক ধেয়ে।
সৃষ্টিহীন দৃষ্টিহীন রাত্রিপারে
ব্যর্থ দুরাশারে
নিয়ে যাক্—
অন্তিম শূন্যের মাঝে নিশ্চল নির্বাক্।
তার পরে বিরহের অগ্নিস্নানে শুভ্র মন
রৌদ্রস্নাত আশ্বিনের বৃষ্টিশূন্য মেঘের মতন
উন্মুক্ত আলোকে
দীপ্তি পাক সুনির্মল শোকে।

৪ মাঘ ১৩৩৮

অনাগতা

এসেছিল বহু আগে যারা মোর দ্বারে,
যারা চলে গেছে একেবারে,
ফাগুন-মধ্যাহ্নবেলা শিরীষছায়ায় চুপে চুপে
তারা ছায়ারূপে
আসে যায় হিল্লোলিত শ্যাম দূর্বাদলে।
ঘন কালো দিঘিজলে
পিছনে-ফিরিয়া-চাওয়া আঁখি জ্বলো জ্বলো
করে ছলোছলো।
মরণের অমরতালোকে
ধূসর আঁচল মেলি ফিরে তারা গেরুয়া আলোকে।

যে এখনো আসে নাই মোর পথে,
কখনো যে আসিবে না আমার জগতে,
তার ছবি আঁকিয়াছি মনে—
একেলা সে বাতায়নে
বিদেশিনী জন্মকাল হতে।
সে যেন শেঁউলি ভাসে ক্ষীণ মৃদু স্রোতে,
কোথায় তাহার দেশ
নাই সে উদ্দেশ।
চেয়ে আছে দূর-পানে
কার লাগি আপনি সে নাহি জানে।

সেই দূরে ছায়ারূপে রয়েছে সে
বিশ্বের সকল-শেষে
যে আসিতে পারিত তবুও
এল না কভুও।
জীবনের মরীচিকাদেশে
মরুকন্যাটির আঁখি ফিরে ভেসে ভেসে।

ঝাঁকড়াচুল

ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলি নি,
কোন্ দেশে যে চলে গেছে সে-চঞ্চলিনী।
সঙ্গী ছিল কুকুর কালু,
বেশ ছিল তার আলুথালু,
আপনা-'পরে অনাদরে ধুলায় মলিনী।

হুটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি ছিল নিষ্কারণেই,
দিঘির জলে গাছের ডালে গতি ক্ষণে-ক্ষণেই।
পাগলামি তার কানায় কানায়,
খেয়াল দিয়ে খেলা বানায়,
উচ্চহাসে কলভাষে কলকলিনী।

দেখা হলে যখন-তখন বিনা অপরাধে
মুখভঙ্গি করত আমায় অপমানের ছাঁদে।
শাসন করতে যেমন ছুটি
হঠাৎ দেখি ধুলায় লুটি'
কাজল আঁখি চোখের জলে ছলছলিনী।

আমার সঙ্গে পঞ্চাশবার জন্মশোধের আড়ি
কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি।
ডাকলে তারে 'পুঁটলি' ব'লে
সাড়া দিত মর্জি হলে,
ঝগড়াদিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনলিনী।

দ্বিধা

বাহিরে যার বেশভূষার ছিল না প্রয়োজন,
হৃদয়তলে আছিল যার বাস,
পরের দ্বারে পাঠাতে তারে দ্বিধায় ভরে মন
কিছুতে হায় পায় না আশ্বাস।

সবুজ বনে নীল গগনে
মিশায় রূপ সবার সনে,
পাখির গানে পরায় যারে সাজ,
ছিন্ন হয়ে সে-ফুল একা
আকাশ-হারা দিবে কি দেখা
পাথরে-গাঁথা প্রাচীর-মাঝে আজ।

চন্দনের গন্ধজলে মুছালো মুখখানি,
নয়নপাতে কাজল দিল আঁকি।
ওষ্ঠাধরে যতনে দিল রক্তরেখা টানি,
কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।
ভূষণ যত পরালো দেহে
তাহারি সাথে ব্যাকুল স্নেহে
মিলিল দ্বিধা, মিলিল কত ভয়।
প্রাণে যে ছিল সুপরিচিত
তাহারে নিয়ে ব্যাকুল চিত
রচনা করে চোখের পরিচয়।

১৩ মাঘ [১৩৩৮]

যাত্রা

রাজা করে রণযাত্রা,
বাজে ভেরি, বাজে করতাল—
কম্পমান বসুন্ধরা।
মন্ত্রী ফেলি ষড়যন্ত্রজাল
রাজ্যে রাজ্যে বাধায় জটিল গ্রন্থি।
বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার-ভাঁটায়।
পণ্যপোত
ধায় সিন্ধুপারে-পারে।
বীরকীর্তিস্তম্ভ হয় গাঁথা
লক্ষ লক্ষ মানবকঙ্কালস্তূপে,
ঊর্ধ্বে তুলি মাথা
চূড়া তার স্বর্গ-পানে হানে অট্টহাস।
পণ্ডিতেরা—
আক্রমণ করে বারংবার
পুঁথির-প্রাচীর-ঘেরা
দুর্ভেদ্য বিদ্যার দুর্গ।
খ্যাতি তার ধায় দেশে দেশে।

হেথা গ্রামপ্রান্তে নদী বহি চলে প্রান্তরের শেষে
ক্লান্ত স্রোতে।
তরীখানি তুলি লয়ে নববধূটিরে
চলে দূর পল্লি-পানে।
সূর্য অস্ত যায়।
তীরে তীরে
স্তব্ধ মাঠ।
দুরুদুরু বালিকার হিয়া।
অন্ধকারে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয় দিগন্তের ধারে।

১২ মাঘ [১৩৩৮]

দ্বারে

একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে,
অতীতের দ্বার রুদ্ধ তোমার পশ্চাতে।
সেথা হল অবসান
বসন্তের সব দান,
উৎসবের সব বাতি নিবে গেল রাতে।

সেতারের তার হল চুপ,
শুষ্কমালা, ভস্মশেষ দগ্ধ গন্ধধূপ।
কবরীর ফুলগুলি
ধূলিতে হইল ধূলি,
লজ্জিত সকল সজ্জা বিরস বিরূপ।

সম্মুখে উদাস বর্ণহীন
ক্ষীণছন্দ মন্দগতি তব রাত্রিদিন।
সম্মুখে আকাশ খোলা,
নিস্তব্ধ, সকল-ভোলা—
মত্ততার কলরব শান্তিতে বিলীন।

আভরণহারা তব বেশ,
কজ্জলবিহীন আঁখি, রুক্ষ তব কেশ।
শরতের শেষ মেঘে
দীপ্তি জ্বলে রৌদ্র লেগে,
সেইমতো শোকশুভ্র স্মৃতি-অবশেষ।

তবু কেন হয় যেন বোধ
অদৃষ্ট পশ্চাৎ হতে করে পথরোধ।

ছুটি হল যার কাছে
কিছু তার প্রাপ্য আছে,
নিঃশেষে কি হয় নাই সব পরিশোধ।

সূক্ষ্মতম সেই আচ্ছাদন,
ভাষাহারা অশ্রুহারা অজ্ঞাত কাঁদন।
দুর্লঙ্ঘ্য-যে সেই মানা
স্পষ্ট যারে নেই জানা,
সব চেয়ে সুকঠিন অবদ্ধ বাঁধন।

যদি-বা ঘুচিল ঘুমঘোর,
অসাড় পাখায় তবু লাগে নাই জোর।
যদি-বা দূরের ডাকে
মন সাড়া দিতে থাকে,
তবুও বারণে বাঁধে নিকটের ডোর।

মুক্তিবন্ধনের সীমানায়
এমনি সংশয়ে তব দিন চলে যায়।
পিছে রুদ্ধ হল দ্বার,
মায়া রচে ছায়া তার,
কবে সে মিলাবে আছ সেই প্রতীক্ষায়।

১১ মাঘ [১৩৩৮]

কন্যাবিদায়

জননী, কন্যারে আজ বিদায়ের ক্ষণে
আপন অতীতরূপ পড়িয়াছে মনে
যখন বালিকা ছিলে।
মাতৃক্রোড় হতে
তোমারে ভাসালো ভাগ্য দূরতর স্রোতে
সংসারের।
তার পর গেল কত দিন
দুঃখে সুখে,
বিচ্ছেদের ক্ষত হল ক্ষীণ।

এ-জন্মের আরম্ভভূমিকা— সংকীর্ণ সে
প্রথম উষার মতো— ক্ষণিক প্রদোষে
মিলাইল লয়ে তার স্বর্ণ কুহেলিকা।

বাল্যে পরেছিলে শুভ্র মাঙ্গল্যের টিকা,
সিন্দূররেখায় হল লীন।
সে-রেখাটি
জীবনের পূর্বভাগ দিল যেন কাটি।
আজ সেই ছিন্নখণ্ড ফিরে এল শেষে
তোমার কন্যার মাঝে অশ্রুর আবেশে।

বিদায়

তোমার আমার মাঝে হাজার বৎসর
নেমে এল, মুহূর্তেই হল যুগান্তর।
মাথায় ঘোমটা টানি
যখনি ফিরালে মুখখানি
কোনো কথা নাহি বলি,
তখনি অতীতে গেলে চলি—
যে-অতীতে অসীম বিরহে
ছায়াসম রহে
বর্তমানে যারা
হয়েছে প্রেমের পথহারা।
যে-পারে গিয়েছ হোথা
বেশি দূর নহে এখনো তা।
ছোটো নির্ঝরিণী শুধু বহে মাঝখানে,
বিদায়ের পদধ্বনি গাঁথে সে করুণ কলগানে।
চেয়ে দেখি অনিমিখে
তুমি চলিয়াছ কোন্ শিখরের দিকে ;
যেন স্বপ্নে উঠিতেছ ঊর্ধ্ব-পানে,
যেন তুমি বীণাধ্বনি, শান্ত সুরে তানে
চলিয়াছ মেঘলোকে।
আজি মোর চোখে
কাছের মূর্তির চেয়ে দূরের মূর্তিতে তুমি বড়ো
অনেক দিনের মোর সব চিন্তা করিয়াছি জড়ো,
সব স্মৃতি,
অব্যক্ত সকল প্রীতি, ব্যক্ত সব গীতি—
উৎসর্গ করিনু আজি, যাত্রী তুমি, তোমার উদ্দেশে।
স্পর্শ যদি নাই করো যাক তবে ভেসে।

২৮ জুলাই ১৯৩২

শেষ সপ্তক

১৯৩৭ — হিরণকুমার সান্যাল গৃহীত

শেষ সপ্তক

এক

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয় নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য কর নি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে ;
পরদিনে মনে রইল না।
নববসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে,
'তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ;
আরো দেওয়া হল না,
আরো যে আমার নেই।'
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে।

আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।
এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।

শান্তিনিকেতন
অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

দুই

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা ;
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে
একটি অমৃতরেখা ;
আর কোনোদিন তার দেখা মেলে নি।
জোয়ারের তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধখোলা জানলায়
দূর বনান্ত থেকে
পথ-চলতি গানে।
অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়-তারে
বৃষ্টিধারামুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।

তার পরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে ;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে ;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

তিন

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন ;
কৌতূহলী ভোরের আলো
কুয়াশার আবরণ দিলে সরিয়ে।
হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজা বাতাবি গাছে
ধরেছে কচি পাতা ;
সে যেন আপনি বিস্মিত।

একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে
চকিত হয়েছিলেন নিজে,
তেমনি দেখলেম ওকে।
অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ-আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
এই কয়টি কিশলয় ;
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে,
কিন্তু না ব'লে গিয়েছ চলে।

সেদিন বসন্ত ছিল অনতিদূরে ;
তোমার আমার মাঝখানে ছিল
আধ-চেনার যবনিকা ;
কেঁপে উঠল সেটা মাঝে মাঝে ;
মাঝে মাঝে তার একটা কোণ গেল উড়ে ;
দুরন্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ বাতাস,
তবু সরাতে পারে নি অন্তরাল।
উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ ঘটল না ;
ঘণ্টা গেল বেজে,
সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে।

চার

যৌবনের প্রান্তসীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান অবশেষ—
যাক কেটে এর আবেশটুকু ;
সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ,
স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত
দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা
স'রে যাক সন্ধ্যামেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা ক'রে।
ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চার দিকে তার স্বপ্ন-মৌমাছি
গুন গুন করে বেড়ায়
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে।
এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।

অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ওই নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগনি রঙের আঁচলা।
গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।
মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে।
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ।

চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ,
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া-আসা।

চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে ;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।

এর আলো-ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগরসংগমে।

পাঁচ

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে;
ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে।
বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে
যখন পারি তাকে আহ্বান করতে।

কিছুকাল ছিলেম বিদেশে।
সেখানকার শ্রাবণের ভাষা
আমার প্রাণের ভাষার সঙ্গে মেলে নি।
তার অভিষেক হল না
আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে।

সজল মেঘ-শ্যামলের
সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে
কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল।
বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ওই তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে;
তার কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে।

তেমনি ক'রে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।
প্রতিবার রঙের প্রলেপ লাগে
জীবনের পটভূমিকায়
নিবিড়তর ক'রে;
বছরে বছরে শিল্পকারের
অঙ্গুরি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত
অঙ্কিত হয় অন্তরফলকে।

নিরালায় জানলার কাছে বসেছি যখন
নিষ্কর্মাপ্রহরগুলো নিঃশব্দ চরণে
কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে;
জীবনের গুপ্ত ধনের ভাণ্ডারে
পুঞ্জিত হয়েছে বিস্মৃত মুহূর্তের সঞ্চয়।

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে ?

তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে ;
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা,
বলেছে, যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস—
'এসো প্রকাশ, এসো ।'

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে—
বধূ যেমন সত্য ক'রে জানে আপনাকে,
সত্য ক'রে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি ।

ছয়

দিনের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে ।
পথে পথে পাত্র ভরেছি
অনেক কিছু দিয়ে ।
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি ;
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে ।
অনেক করেছি সংগ্রহ মানুষের কথার হাটে,
কিছু করেছি সঞ্চয় প্রেমের সদাব্রতে ।
শেষে ভুলেছি সার্থকতার কথা,
অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোই হয়েছে অন্ধ অভ্যাসে বাঁধা ;
ফুটো ঝুলিটার শূন্য ভরাবার জন্যে
বিশ্রাম ছিল না ।

আজ সামনে যখন দেখি
ফুরিয়ে এল পথ,
পাথেয়ের অর্থ আর রইল না কিছুই ।
যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলনশয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে ক'রে ।

তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।
সামনের আকাশে জ্বলবে একলা সন্ধ্যার তারা।
যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থামবে
রাতের শেষ প্রহরে।

তার পরে
যে জীবনের আলো নিবল,
সুর থামল,
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,
সে-কথা একেবারেই ভুলবে জানি,
ভোলাই ভালো।
তবু তার আগে কোনো-এক দিনের জন্য
কেউ-একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।
আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আমকাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরন,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।

এই সামান্য ছবিটুকু
আর সব-কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো-একটি গোধূলির ধূসর মুহূর্তে।

আর বেশি কিছু নয়।
আমি আলোর প্রেমিক ;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।
পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।
যে পথিক অস্তসূর্যের
ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে
সে তো ধুলোর হাতে উজাড় করে দিলে
সমস্ত আপনার দাবি ;

সেই ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে
রেখে যেয়ো না তোমার নৈবেদ্য ;
ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি,
যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,
যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে,
যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজছে ঘণ্টা
জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের
মিলের মাত্রা রেখে।

সাত

অনেক হাজার বছরের
মরু-যবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হল,
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল—
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে
ছিল তার জীবনক্ষেত্র।
তার মুখরিত শতাব্দী
আপনার সমস্ত কবিগান
বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জন।
আর, যে-সব গান তখনো ছিল অঙ্কুরে, ছিল মুকুলে,
যে বিপুল সম্ভাব্য
সেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন,
অপ্রকাশ থেকে অপ্রকাশেই গেল মগ্ন হয়ে—
যা ছিল অপ্রজ্বল ধোঁওয়ার গোপন আচ্ছাদনে
তাও নিবল।
যা বিকোলো, আর যা বিকোলো না—
দুই-ই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যের ছাপ নিয়ে।
কোথাও রইল না তার ক্ষত,
কোথাও বাজল না তার ক্ষতি।

ওই নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্তন।
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,

ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে ;
অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ ।

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি ।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে ।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে ।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ওই সন্ন্যাসের দীক্ষা ।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয় ।

ঌ ১৩৪১

আট

মনে মনে দেখলুম
সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা,
যা মুখর ইতিহাসকে নিষিদ্ধ রেখেছে
আপন তপস্যার আসন থেকে ।

দেখলেম দুর্গম গিরিব্রজে
কোলাহলী কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে
অসূর্যম্পশ্য নিভৃতে
ছবি আঁকছে গুণী
গুহাভিত্তির 'পরে,
যেমন অন্ধকার পটে
সৃষ্টিকার আঁকছেন বিশ্বছবি ।
সেই ছবিতে ওরা আপন আনন্দকেই করেছে সত্য,
আপন পরিচয়কে করেছে উপেক্ষা,
দাম চায় নি বাইরের দিকে হাত পেতে,
নামকে দিয়েছে মুছে ।

হে অনামা, হে রূপের তাপস,
প্রণাম করি তোমাদের ।

নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি
তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্তিতে।

নামক্ষালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি।
তোমাদের নিঃশব্দ বাণী
রয়েছে এই গুহায়,
বলছে— নামের পূজার অর্ঘ্য,
ভাবীকালের খ্যাতি,
সে তো প্রেতের অন্ন ;
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা।
তার পিছনে ছুটে
সদ্য-বর্তমানের অন্নপূর্ণার
পরিবেশন এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ।

আজ আমার দ্বারের কাছে
শজনে গাছের পাতা গেল ঝ'রে,
ডালে ডালে দেখা দিয়েছে
কচি পাতার রোমাঞ্চ ;
এখন প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া
চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়ায়
গাছে গাছে দোলাদুলি ;
উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে
ধূসরের আভাস,
নানা পাখির কলকাকলিতে
বাতাসে আঁকছে শব্দের অস্ফুট আলপনা।

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।
যখন কোনোদিন গান করেছি রচনা,
সেও তো আপন অন্তরে
এইরকম পাতার হিল্লোল,
হাওয়ার চাঞ্চল্য,
রৌদ্রের ঝলক,
প্রকাশের হর্ষবেদনা।

সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি,
গর-ঠিকানার পথিক।
তার যেটুকু সত্য
তা সেই মুহূর্তেই পূর্ণ হয়েছে,
তার বেশি আর বাড়বে না একটুও,
নামের পিঠে চড়ে।
বর্তমানের দিগন্ত-পারে
যে-কাল আমার লক্ষের অতীত
সেখানে অজানা অনাত্মীয় অসংখ্যের মাঝখানে
যখন ঠেলাঠেলি চলবে
লক্ষ লক্ষ নামে নামে,
তখন তারি সঙ্গে দৈবক্রমে চলতে থাকবে
বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার
আমারো নামটা—
ধিক থাক্ সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।
জীবনের অল্প কয়দিনে
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি।

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

শান্তিনিকেতন
১।৪।৩৫

নয়

ভালোবেসে মন বললে—
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি ;
দিতে পারবে কেন ?
সবটার নাগাল পাব কেমন ক'রে ?
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়।
তার মাথা উঠেছে মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়,
তার পা নেমেছে আঁধারে-ঢাকা গহ্বরে।

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
যাকে বলতে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয় নি,
তার নকশা শেষ হবে কবে ?
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার ?
নামটা রয়েছে যে-পরিচয়টুকু নিয়ে
টুকরো-জোড়া-দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ-করা।

চার দিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে ;
হাওয়ায় লাগে শীত-বসন্তের ছোঁওয়া ;
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হল ?
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে ?
জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,
আর-এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি।

এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে।
তার আলোকহীন প্রদেশে
বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি,
মূল্য পায় নি এমন মহিমা,
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।
সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস ;
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ ;
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ?
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি,
সবাই রইল দূরে—
যারা বললে "জানি", তারা জানল না।

শান্তিনিকেতন
২৭।৩।৩৫

দশ

মনে হয়েছিল আজ সব-কটা দুর্গ্রহ
চক্র ক'রে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।
অদৃষ্ট জাল ফেলে অন্তরের শেষ তলা থেকে
টেনে টেনে তুলছে নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে।
মনে হয়েছিল, অন্তহীন এই দুঃখ ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়
শেষ পর্যন্ত এমনি ক'রে
অন্ধকার হাতড়িয়ে বেড়ানো।
ভিতসুদ্ধ বাসা গেছে ডুবে,
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে।

এমন সময়ে সদ্যবর্তমানের
প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল
দূর অতীতের দিগন্তলীন
বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।

যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়
ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন্ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।

দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা
সেই দারুণ কাহিনী।
কোন্ দুর্দাম সর্বনাশের
বজ্রঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুংকার,
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝংকৃত করছে বীণাপাণি
আপন বীণার তীব্রতম তার।

দেখতে পেলেম
কতকালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি,
কত যুগের জ্বলংধারা মর্মনিঃস্রাব
সংহত হয়েছে,
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্তি
অতীতের সৃষ্টিশালায়।

আর, তার বাইরে পড়ে আছে
নির্বাপিত বেদনার পর্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি,
জ্যোতির্হীন বাক্যহীন অর্থশূন্য।

এগারো

ভোরের আলো-আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতশবাজি।
ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে
একটু একটু সোনার লিখন নিয়ে।

হাটের দিন,
মাঠের মাঝখানকার পথে
চলেছে গোরুর গাড়ি।
কলসীতে নতুন আঁখের গুড়, চালের বস্তা,
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচুশাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা।

ছটা বাজল ইস্কুলের ঘড়িতে।
ওই ঘণ্টার শব্দ আর সকাল বেলাকার কাঁচা রোদ্দুরের রঙ
মিলে গেছে আমার মনে।

আমার ছোটো বাগানের পাঁচিলের গায়ে
বসেছি চৌকি টেনে
করবীগাছের তলায়।
পুব দিক থেকে রোদ্দুরের ছটা
বাঁকা ছায়া হানছে ঘাসের 'পরে!
বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে
পাশাপাশি দুটি নারকেলের শাখায়।
মনে হচ্ছে যমজ শিশুর কলরবের মতো।
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে
চিকন সবুজের আড়ালে।

চৈত্রমাস ঠেকল এসে শেষ হপ্তায়।
আকাশে-ভাসা বসন্তের নৌকায়
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে।
দূর্বাঘাস উপবাসে শীর্ণ;
কাঁকর-ঢালা পথের ধারে
বিলিতি মৌসুমি চারায়
ফুলগুলি রঙ হারিয়ে সংকুচিত।
হাওয়া দিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে—
বিদেশী হাওয়া চৈত্রমাসের আঙিনাতে।
গায়ে দিতে হল আবরণ অনিচ্ছায়।
বাঁধানো জলকুণ্ডে জল উঠছে শিরশিরিয়ে,
টলমল করছে নালগাছের পাতা,
লাল মাছ কটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

নেবুঘাস ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে
খেলা-পাহাড়ের গায়ে।
তার মধ্যে থেকে দেখা যায়
গেরুয়া পাথরের চতুর্মুখ মূর্তি।
সে আছে প্রবহমান কালের দূর তীরে
উদাসীন;
ঋতুর স্পর্শ লাগে না তার গায়ে।
শিল্পের ভাষা তার,
গাছপালার বাণীর সঙ্গে কোনো মিল নেই।
ধরণীর অন্তঃপুর থেকে যে শুশ্রূষা
দিনে রাতে সঞ্চারিত হচ্ছে
সমস্ত গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়,
ওই মূর্তি সেই বৃহৎ আত্মীয়তার বাইরে।
মানুষ আপন গূঢ় বাক্য অনেক কাল আগে
যক্ষের মৃত ধনের মতো
ওর মধ্যে রেখেছে নিরুদ্ধ ক'রে,
প্রকৃতির বাণীর সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধ।

সাতটা বাজল ঘড়িতে।
ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে।
সূর্য উঠল প্রাচীরের উপরে,
ছোটো হয়ে গেল গাছের যত ছায়া।
খিড়কির দরজা দিয়ে
মেয়েটি ঢুকল বাগানে।
পিঠে দুলছে ঝালরওআলা বেণী,
হাতে কঞ্চির ছড়ি ;
চরাতে এনেছে
একজোড়া রাজহাঁস,
আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে।
হাঁস দুটো দাম্পত্য দায়িত্বের মর্যাদায় গম্ভীর,
সকলের চেয়ে গুরুতর ওই মেয়েটির দায়িত্ব।
জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান
ছোট্ট ওই মাতৃমনের স্নেহরসে।

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।
ও এসেছে অনায়াসে,
অনায়াসেই যাবে চলে।
যিনি দিলেন পাঠিয়ে
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ ক'রে
আপন আনন্দভাণ্ডার থেকে।

বারো

কেউ চেনা নয়,
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপনার রহস্যে
আপনি একাকী।
সেখানে তার দোসর নেই।
সংসারের ছাপমারা কাঠামোয়
মানুষের সীমা দিই বানিয়ে।
সংজ্ঞার বেড়া-দেওয়া বসতির মধ্যে
বাঁধা মাইনের কাজ করে সে।
থাকে সাধারণের চিহ্ন নিয়ে ললাটে।

এমন সময় কোথা থেকে
ভালোবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে,
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।

সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপূর্ব, অসাধারণ,
তার জুড়ি কেউ নেই।
তার সঙ্গে যোগ দেবার বেলায়
বাঁধতে হয় গানের সেতু,
ফুলের ভাষায় করি তার অভ্যর্থনা।

চোখ বলে,
যা দেখলুম, তুমি আছ তাকে পেরিয়ে।
মন বলে,
চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্য
তুমি এসেছ সেই অগমের দূত,
রাত্রি যেমন আসে
পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অবারিত ক'রে।
তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যেকার অচেনাকে,
তখন আপন অনুভবের
তল খুঁজে পাই নে,
সেই অনুভব
'তিলে তিলে নূতন হোয়।'

তেরো

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়।'
দেখে অবুঝ মন বলে—
অধরাকে ধরেছি।

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,
ও গেল চলে;
জানলে না এই গানে তোমারই কথা।

তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
একতারার তারে তারে।

সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে ক'রে ;
ওতে রঙ লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে,
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য।
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।

অচিন পাখি তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাক—
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
স্থকিত ওড়ার মধ্যে।
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।

চোদ্দো

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থমথমে,
গাছের পাতা নড়ে না,
স্বচ্ছরাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লি-ঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে ;
বললে, 'তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।'
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সংকোচ গিয়েছিল কেটে।
সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।

সেই মুহূর্তের আনন্দবেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্মজন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।
তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে
তার সবচেয়ে অত্যন্ত ক'রে আছি আমি,
অত্যন্ত বেঁচে।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ,
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।
প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া
যার তলায় দুবেলা জল দাও আপন হাতে,
সেও প্রধান হয়ে উঠে
তার ডালপালার বাইরে
সরিয়ে রাখবে আমাকে
বিশ্বের বিরাট অগোচরে।
তা হোক,
এও গৌণ।

পনেরো

শ্রীমতী রানী দেবী কল্যাণীয়াসু

১

আমি বদল করেছি আমার বাসা।
দুটিমাত্র ছোটো ঘরে আমার আশ্রয়।
ছোটো ঘরই আমার মনের মতো।
তার কারণ বলি তোমাকে।

বড়ো ঘর বড়োর ভান করে মাত্র,
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজ্ঞায় ।
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভান করে না ।
অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তার নেই
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো ।
আকাশের শখ ঘরে মেটাতে চাই নে ;
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে ।

বেশ লাগছে ।
দূর আমার কাছেই এসেছে ।
জানলার পাশেই বসে বসে ভাবি—
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর ।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর ।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে ।
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা,
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের ।

মনে পড়ে একদিন মাঠ বেয়ে চলেছিলেম
পালকিতে অপরাহ্ণে ;
কাহার ছিল আটজন ।
তার মধ্যে একজনকে দেখলেম
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্তি ;
আপন কর্মের অপমানকে প্রতিপদে সে চলছিল পেরিয়ে
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে পাখি যেমন যায় উড়ে ।
দেবতা তার সৌন্দর্যে তাকে দিয়েছেন সুদূরতার সম্মান ।

এই দূর আকাশ সকল মানুষেরই অন্তরতম ;
জানলা বন্ধ, দেখতে পাই নে ।
বিষয়ীর সংসার আসক্তি তার প্রাচীর,
যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে ।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে ।

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি ।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা ;
দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায় ।

কিছু কাজ করি তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,
তাতে আমি নেই ।

যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতি মুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।
এইসঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ সুদূর,
জীবনের চার দিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র ;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।

২

অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।
এতদিন খবর দিই নি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেইসঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়াতাড়া ;
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে ;
এতদিন এই-সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।

মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে,
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারি খোঁজে।
আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, দেখবে ব'লে।
সে তাকায়, আর বলে, 'দেখলেম।'
সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।
কোন্ চির-জাগরূকের সামনে দিয়ে চলেছে,
তিনিও নীরবে বলছেন, 'দেখলেম।'
আদি যুগে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,
'খোলো আবরণ।'
বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে,
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে ;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।

শান্তিনিকেতন
৮।৪।৩৫

৩

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে,
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য ;
নির্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে ।
অমিতার আনন্দসম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা—
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয় ;
শুধু রূপ, আলো দিয়ে গড়া ।

আজ আদিসৃষ্টির প্রথম মুহূর্তের ধ্বনি
পৌঁছল আমার চিত্তে—
যে ধ্বনি অনাদি রাত্রির যবনিকা সরিয়ে দিয়ে
বলেছিল, 'দেখো ।'
এতকাল নিভৃতে
আপনি যা বলেছি আপনি তাই শুনেছি,
সেখান থেকে এলেম আর-এক নিভৃতে,
এখানে আপনি যা আঁকছি, দেখছি তাই আপনি ।
সমস্ত বিশ্ব জুড়ে দেবতার দেখবার আসন,
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
রচনা করছি দেখা ।

ষোলো

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু

১

পড়েছি আজ রেখার মায়ায় ।
কথা ধনীঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর ।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক ।
গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো,
সে কাজে আছে দায়িত্ব ;
গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানো
সে আর-এক কাণ্ড ।

সেইখানেই শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে,
প্রজাপতি উড়তে থাকে,
জোনাকি ঝিকমিক করে রাতের বেলা।
বনের আসরে এরা সব রেখা-বাহন
হালকা চালের দল,
কারো কাছে জবাবদিহি নেই।
কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন ;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,
তর্জনী তোলে না।

কাজকর্ম পড়ে থাকে, চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি,
ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রূপ-ফলানোর অন্দরমহলে।
এমনি করে, মনের মধ্যে
অনেকদিনের যে-লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে
তার সাহস গেছে বেড়ে।
সে আঁকছে, ভাবছে না সংসারের ভালোমন্দ,
গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দাপ্রশংসা।

২

মনটা আছে আরামে।
আমার ছবি-আঁকা কলমের মুখে
খ্যাতির লাগাম পড়ে নি।
নামটা আমার খুশির উপরে
সর্দারি করতে আসে নি এখনো,
ছবি-আঁকার বুক জুড়ে
আগেভাগে নিজের আসনটা বিছিয়ে বসে নি ;
ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলছে না
'নাম রক্ষা কোরো'।
অথচ ওই নামটা নিজের মোটা শরীর নিয়ে
স্বয়ং কোনো কাজই করে না।
সব কীর্তির মুখ্য ভাগটা আদায় করবার জন্যে
দেউড়িতে বসিয়ে রাখে পেয়াদা ;
হাজার মনিবের পিণ্ড-পাকানো
ফরমাশটাকে বেদী বানিয়ে স্তূপাকার ক'রে রাখে
কাজের ঠিক সামনে।
এখনো সেই নামটা অবজ্ঞা করেই রয়েছে অনুপস্থিত
আমার তূলি আছে মুক্ত
যেমন মুক্ত আজ ঋতুরাজের লেখনী।

৭ এপ্রিল ১৯৩৪

সতেরো

শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে শুনতে চেয়েছ
গানের কথা ;
বলতে ভয় লাগে,
তবু কিছু বলব।

মানুষের জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে
আপন সার্থক ভাষা।
মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা,
যেমন বোবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
সেই বিরাট বোবা
আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে,
ব্যাখ্যা করে না।
বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গি, আছে ছন্দ,
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।

অণুপরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,
নাচছে সেই সীমায় সীমায় ;
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ ;
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা,
ঘাসের ফুল থেকে শুরু ক'রে
আকাশের তারা পর্যন্ত।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা ক'রে।
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গি দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।

সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।
সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে
সৃষ্টির অন্দরমহলে,
সেখানে যত রূপের নটী আছে
ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে
নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের
দোলযাত্রায়।

'আমি যে জানি'
এ-কথা যে-মানুষ জানায়
বাক্যে হোক, সুরে হোক, রেখায় হোক,
সে পণ্ডিত।
'আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি'
এ-কথা যার প্রাণ বলে
গান তারি জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়ীতে বাজে সুর।

যদি সুযোগ পাও
কথাটা নারদমুনিকে শুধিয়ো—
ঝগড়া বাধাবার জন্যে নয়,
তত্ত্বের পার পাবার জন্যে সংজ্ঞার অতীতে।

আঠারো

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সুহৃদ্‌বরেষু

আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান?
আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও।
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও
বহন করে না স্থায়ী সত্যকে—
সান্ত্বনা নেই এমন কথায়;
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহংকারে।

জীবনটা আপন সকল সঞ্চয়
ছড়িয়ে রাখে কালের চলাচলের পথে;
তার অবিরাম-ধাবিত চাকার তলায়
গুরুতর বেদনার চিহ্নও যায়
জীর্ণ হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে।

আমাদের প্রিয়তমের মৃত্যু
একটিমাত্র দাবি করে আমাদের কাছে
সে বলে— 'মনে রেখো।'

কিন্তু সংখ্যা নেই প্রাণের দাবির,
তার আহ্বান আসে চারি দিক থেকেই
মনের কাছে ;
সেই উপস্থিত কালের ভিড়ের মধ্যে
অতীতকালের একটিমাত্র আবেদন
কখন হয় অগোচর।

যদি বা তার কথাটা থাকে
তার ব্যথাটা যায় চলে।
তবু শোকের অভিমান
জীবনকে চায় বঞ্চিত করতে।
স্পর্ধা ক'রে প্রাণের দূতগুলিকে বলে—
'খুলব না দ্বার।'
প্রাণের ফসলখেত বিচিত্র শস্যে উর্বর,
অভিমানী শোক তারি মাঝখানে
ঘিরে রাখতে চায় শোকের দেবত্র জমি—
সাধের মরুভূমি বানায় সেখানটাতে,
তার খাজনা দেয় না জীবনকে।
মৃত্যুর সঞ্চয়গুলি নিয়ে
কালের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ।
সেই অভিযোগে তার হার হতে থাকে দিনে দিনে।
কিন্তু চায় না সে হার মানতে ;
মনকে সমাধি দিতে চায়
তার নিজ-কৃত কবরে।

সকল অহংকারই বন্ধন,
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।
ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ,
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে।

উনিশ

তখন বয়স ছিল কাঁচা ;
কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার,
জিন নেই, লাগাম নেই,
ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে
ভরসন্ধেবেলায় ;

ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো
ধরণী যেন পিছু ডাকছে আঁচল দুলিয়ে।
আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা
দূরে মাঠের সীমানায় দেখা যায়
একটিমাত্র ব্যগ্র বিরহী আলো একটি কোন্ ঘরে
নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।

যে ছিল ভাবীকালে
আগে হতে মনের মধ্যে
ফিরছিল তারি আবছায়া,
যেমন ভাবী আলোর আভাস আসে
ভোরের প্রথম কোকিল-ডাকা অন্ধকারে।

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা,
আধোজানা।
তাই অপরূপের রাঙা রঙটা
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে ;
আসন্ন ভালোবাসা
এনেছিল অঘটন-ঘটনার স্বপ্ন।
তখন ভালোবাসার যে কল্পরূপ ছিল মনে
তার সঙ্গে মহাকাব্যযুগের
দুঃসাহসের আনন্দ ছিল মিলিত।
এখন অনেক খবর পেয়েছি জগতের,
মনে ঠাওরেছি
সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের
মালখানা।
মনের রসনা থেকে
অজানার স্বাদ গেছে মরে,
অনুভবে পাই নে
ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।

বিশ

সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা
আকাশের নীচে
রাঙামাটির পথের ধারে।
ঘাসের 'পরে বসেছে সবাই।
দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি,
দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন—
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
শুক্লনবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে।
দূরে কোকিলের ক্লান্ত কাকলিতে বনস্পতি উদাসীন।
ও যেন শিবের তপোবন-দ্বারের নন্দী,
দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত।
সভার লোকেরা বললে,
'একটা কিছু শোনাও কবি,
রাত গভীর হয়ে এল।'
খুললেম পুঁথিখানা,
যত পড়ে দেখি
সংকোচ লাগে মনে।
এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর,
এত যত্নের ধন।
এদের কণ্ঠস্বর এত মৃদু,
এত কুণ্ঠিত।

এরা সব অন্তঃপুরিকা,
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের 'পরে,
তার উপরে ফুলকাটা পাড়,
সোনার সুতোয়।
রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চলতে বাধা।
প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু,
বলেছে, বরবর্ণিনী।
বন্দিনী ওরা বহু সম্মানে।
ওদের নূপুর ঝংকৃত হয় প্রাচীর-ঘেরা ঘরে,
অনেক দামের আস্তরণে;
বাধা পায় তারা নৈপুণ্যের বন্ধনে।
এই পথের ধারের সভায়,
আসতে পারে তারাই
সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে,
খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন
মুছে ফেলেছে সিঁদুর;

যারা ফিরবে না ঘরের মায়ায়,
যারা তীর্থযাত্রী ;
যাদের অসংকোচ অক্লান্ত গতি,
ধূলিধূসর গায়ের বসন ;
যারা পথ খুঁজে পায় আকাশের তারা দেখে ;
কোনো দায় নেই যাদের
কারো মন জুগিয়ে চলবার ;
কত রৌদ্রতপ্ত দিনে
কত অন্ধকার অর্ধরাত্রে
যাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে
অজানা শৈলগুহায়,
জনহীন মাঠে,
পথহীন অরণ্যে ।
কোথা থেকে আনব তাদের
নিন্দা-প্রশংসার ফাঁদে টেনে ।

উঠে দাঁড়ালেম আসন ছেড়ে ।
ওরা বললে, 'কোথা যাও কবি ?'
আমি বললেম,
'যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান ।'

একুশ

নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে ।
সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে ।
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,
গণনায় শেষ করা যায় না ।
তারা কোন্ প্রথম প্রত্যুষের আলোকে
কোন্ গুহা থেকে উড়ে বেরোল অসংখ্য,
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে ।

অব্যক্তে তারা ছিল প্রচ্ছন্ন,
ব্যক্তের মধ্যে ধেয়ে এল
মরণের ওড়া উড়তে ;

তারা জানে না কিসের জন্যে
এই মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগ।

কোন্ কেন্দ্রে জ্বলছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে।
একদিন আসবে কল্পসন্ধ্যা,
আলো আসবে ম্লান হয়ে,
ওড়ার বেগ হবে ক্লান্ত
পাখা যাবে খসে,
লুপ্ত হবে ওরা
চিরদিনের অদৃশ্য আলোকে।

ধরার ভূমিকায় মানব-যুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোটো মাপে
আলোক-আঁধারের পর্যায়ে
নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির
অগোচরে।
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে
এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয়।
বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে
ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল
আঁকা হচ্ছে মোছা হচ্ছে।
বুদ্‌বুদের মতো উঠল মহেঞ্জদারো,
মরুবালুর সমুদ্রে নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।
সুমেরিয়া, আসীরিয়া ব্যাবিলন, মিসর,
দেখা দিল বিপুল বলে
কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া
ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে,
কাঁচা কালির লিখনের মতো
লুপ্ত হয়ে গেল
অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে।

তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো ছুটেছিল পতঙ্গের মতো
অসীম দুর্লক্ষ্যের দিকে।
বীরেরা বলেছিল
অমর করবে সেই আকাঙ্ক্ষার
কীর্তিপ্রতিমা;
তুলেছিল জয়স্তম্ভ।

কবিরা বলেছিল, অমর করবে
সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে,
রচেছিল মহাকবিতা।

সেই মুহূর্তে মহাকাশের অগণ্য-যোজন পত্রপটে
লেখা হচ্ছিল
ধাবমান আলোকের জ্বলদক্ষরে
সুদূর নক্ষত্রের
হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী।
সেই বাণীর একটি একটি ধ্বনির
উচ্চারণ-কালের মধ্যে
ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,
নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে-স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস।

আজ রাত্রে আমি সেই নক্ষত্রলোকের
নিমেষহীন আলোর নীচে
আমার লতাবিতানে বসে
নমস্কার করি মহাকালকে।
অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় প'ড়ে বাতাসে যাক উড়ে।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে ?
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না ;
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

বাইশ

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,
ওই একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—
পৃথক হব আমরা।
ও এসেছে কতলক্ষ পূর্বপুরুষের
রক্তের প্রবাহ বেয়ে ;
কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা ;
সে-সব বেদনা বহু দিনরাত্রিকে মথিত করেছে
সুদীর্ঘ ধারাবাহী অতীত কালে ;
তাই নিয়ে ও অধিকার করে বসল
নবজাত প্রাণের এই বাহনকে,
ওই প্রাচীন, ওই কাঙাল।

আকাশবাণী আসে ঊর্ধ্বলোক হতে,
ওর কোলাহলে সে যায় আবিল হয়ে।
নৈবেদ্য সাজাই পূজার থালায়,
ও হাত বাড়িয়ে নেয় নিজে।

জীর্ণ করে ওকে দিনে দিনে পলে পলে,
বাসনার দহনে,
ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে
যে-আমি জরাহীন।
মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে-আমি মৃত্যুহীন।

আমি আজ পৃথক্‌ হব।
ও থাক্‌ ওইখানে দ্বারের বাইরে,
ওই বৃদ্ধ, ওই বুভুক্ষু।
ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক,
তালি দিক্‌ বসে বসে
ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে ;
জন্মমরণের মাঝখানটাতে
যে আল-বাঁধা খেতটুকু আছে
সেইখানে করুক উঞ্ছবৃত্তি।

আমি দেখব ওকে জানলায় ব'সে,
ওই দূরপথের পথিককে,
দীর্ঘকাল ধরে যে এসেছে
বহু দেহমনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে
মৃত্যুর নানা খেয়া পার হয়ে।
উপরের তলায় বসে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আশা-নৈরাশ্যের ওঠা-পড়ায় সুখদুঃখের আলো-আঁধারে।
দেখব যেমন করে পুতুলনাচ দেখে ;
হাসব মনে মনে।
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

তেইশ

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।
কল্পনা করছি—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান-স্বপ্নের স্রোতে
পৌঁছলেম এই মুহূর্তেই
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলই তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে—
অন্যযুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।
তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতূহল।
যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

আমার নম্রচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর।
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খ'সে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায় নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন—
ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন!

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

চব্বিশ

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
বাঁধব না আজ তোড়ায়,
রঙ-বেরঙের সুতোগুলো থাক্,
থাক্ পড়ে ওই জরির ঝালর।

শুনে ঘরের লোকে বলে,
'যদি না বাঁধ জড়িয়ে জড়িয়ে
ওদের ধরব কী করে,
ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে?'
আমি বলি,
'আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
বকুলবনে অপরাহ্ণে,
চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।

আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি,
তাই নিয়ে খুশি থাকো।'
বন্ধু বললে,
'এলেম তোমার ঘরে
ভরা পেয়ালার তৃষ্ণা নিয়ে।
তুমি খ্যাপার মতো বললে,
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা।
আতিথ্যের ত্রুটি ঘটাও কেন ?'

আমি বলি, 'চলো-না ঝরনাতলায়,
ধারা সেখানে ছুটছে আপন খেয়ালে,
কোথাও মোটা, কোথাও সরু।
কোথাও পড়ছে শিখর থেকে শিখরে,
কোথাও লুকোল গুহার মধ্যে।
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথর
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্বরের মতো,
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো—
কাকে ধরতে চায় ওই জলের ঝিকিমিকির মধ্যে ?'

সভার লোকে বললে,
'এ যে তোমার আঁবাধা বেণীর বাণী,
বন্দিনী সে গেল কোথায় ?'
আমি বলি, 'তাকে তুমি পারবে না আজ চিনতে,
তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,
চমক দিচ্ছে না চুনি-বসানো কঙ্কণে।'
ওরা বললে, 'তবে মিছে কেন ?
কী পাবে ওর কাছ থেকে ?'

আমি বলি, 'যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে।
পাতার ভিতর থেকে
তার রঙ দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপটায়।
চার দিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।
মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।'

পঁচিশ

পাঁচিলের এ ধারে
ফুলকাটা চিনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।
ফুলের কেয়ারিতে
কাঁচিছাঁটা বেগ্‌নি গাছের পাড়।
পাঁচিলের গায়ে গায়ে
বন্দী-করা লতা।
এরা সব হাসে মধুর করে,
উচ্চহাস্য নেই এখানে ;
হাওয়ায় করে দোলাদুলি
কিন্তু জায়গা নেই দুরন্ত নাচের—
এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা।
বাগানটাকে দেখে মনে হয়
মোগল বাদশার জেনেনা,
রাজ-আদরে অলংকৃত,
কিন্তু পাহারা চার দিকে,
চরের দৃষ্টি আছে ব্যবহারের প্রতি।

পাঁচিলের ও পারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপটাস
খাড়া উঠেছে উর্ধ্বে।
পাশেই দুটি-তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ।
নীল আকাশ অবারিত বিস্তীর্ণ
ওদের মাথার উপরে।

অনেক দিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা—
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।
ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে।
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি।
ওদের আছে শাখার দোলন
দীর্ঘ লয়ে ;
পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের ;
মর্মরধ্বনি হাওয়ায় ছড়ানো।

আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত ;
বললেম, 'টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে ।'

ছাব্বিশ

আকাশে চেয়ে দেখি
অবকাশের অন্ত নেই কোথাও ।
দেশকালের সেই সুবিপুল আনুকূল্যে
তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,
তাদের দ্রুতবিচ্ছুরিত আলোক-সংকেতে
তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান ।

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত ;
চার দিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল ;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড করে
ভিড় করেছে তারা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে ।

সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,
সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে ।
প্রতিদিনের অভ্যস্ত কথার
মূল্য হল দীন ;
অর্থ গেল মুছে ।
আমার ভাষা যেন
কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত
হেমন্তের বেলা,
তার সুর পড়েছে চাপা ।
সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো
মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না—
'ভালোবাসি ।'
সংকোচ লাগে কণ্ঠের কৃপণতায় ।

তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী ।
দেখি চেয়ে, তোমার পল্লবস্তবক
অনায়াসে পার হয়েছে

শাখাব্যূহের জটিলতা,
জয় করে নিয়েছে চার দিকে নিস্তব্ধ অবকাশ।
তোমার নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস সেই উদার পথে
উত্তীর্ণ হয়ে যায়
সূর্যোদয়-মহিমার মাঝে।
সেই পথ দিয়ে দক্ষিণ বাতাসের স্রোতে
অনাদি প্রাণের মন্ত্র
তোমার নবকিসলয়ের মর্মে এসে মেলে—
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র—
'ভালোবাসি।'

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায় সুদূরে;
বর্তমান মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
উর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বতবাণী—
'ভালোবাসি।'

যেদিন যুগান্তের রাত্রি হল অবসান
আলোকের রশ্মিদূত
বিকীর্ণ করেছিল এই আদিমবাণী
আকাশে আকাশে।

সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্রবচন।
এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ-গগনে
অস্তসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে।

আজ এ দিনান্তের অন্ধকারে
এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষবাণীতে হোক উদ্ভাসিত—
'ভালোবাসি।'

সাতাশ

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি
ঝরনাধারার নীচে।
বসে থাকি
কোমরে আঁচল বেঁধে,
সারা সকালবেলা,
শেওলা-ঢাকা পিছল পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।

এক নিমেষেই ঘট যায় ভরে
তার পরে কেবলই তার কানা ছাপিয়ে ওঠে,
জল পড়তে থাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে
বিনা কাজে বিনা ত্বরায়—
ওই যে সূর্যের আলোয়
উপচে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা,
আমার খেলা ওই সঙ্গেই ছলকে ওঠে
মনের ভিতর থেকে।
সবুজ বনের মিনে-করা
উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা,
তারই পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে
পড়ছে ঝরঝরানির শব্দ।
ভোরের ঘুমে তার ডাক শুনতে পায়
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের ধ্বনি
বেগনি রঙের বনের সীমানা যায় পেরিয়ে,
নেমে যায় যেখানে ওই বুনোপাড়ার মানুষ
হাট করতে আসে,
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
বাঁকে বাঁকে উঠতে থাকে চড়াই পথ বেয়ে,
তার বলদের গলায়
ঝুনুঝুনু ঘণ্টা বাজে,
তার বলদের পিঠে
শুকনো কাঠের আঁটি বোঝাই-করা।

এমনি করে
প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলাকার
নতুন রৌদ্রের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে চলেছে পাহাড় পেরিয়ে
জলার দিকে,

শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
উর্ধ্বমুখ পর্বতের উধাও চিন্তে
নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো।
বেলা হল,
ডাক ডাক পড়ল ঘরে,
ওরা রাগ করে বললে,
'দেরি করলি কেন ?'
চুপ করে থাকি নিরুত্তরে।
ঘট ভরতে দেরি হয় না
সে তো সবাই জানে ;
বিনাকাজে উপচে-পড়া-সময় খোওয়ানো,
তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে ?

আটাশ

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।
সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে
রক্ত-অবগুণ্ঠনের নীচে
শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার জ্বাল
শাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।

সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে
মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।
যখন নিভৃতপুলকে রোমাঞ্চ লেগেছে মনে
গোপনে রেখেছ তার 'পরে
সুরলোকের সম্মতি,
ইন্দ্রাণীর মালার একটি পাপড়ি,
তোমাকে এমনি করেই জেনেছি
আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী।

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত ;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে ।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্‌ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটিবৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত ।
আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে
কবিচিত্তে যখন জাগিয়ে তুলেছ
নিঃশব্দ শান্তিবাণী
সেই মুহূর্তেই
আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য ।
তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে
আমাদের নিমন্ত্রণ নেই,
আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ ।

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মানবই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে ।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি—
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানব-পথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে ।

উনত্রিশ

অনেক কালের একটিমাত্র দিন
কেমন করে বাঁধা পড়েছিল
একটা কোনো ছন্দে, কোনো গানে,
কোনো ছবিতে।
কালের দূত তাকে সরিয়ে রেখেছিল
চলাচলের পথের বাইরে।
যুগের ভাসান-খেলায়
অনেক কিছু চলে গেল ঘাট পেরিয়ে,
সে কখন ঠেকে গিয়েছিল বাঁকের মুখে
কেউ জানতে পারে নি।

মাঘের বনে
আমের কত বোল ধরল,
কত পড়ল ঝরে ;
ফাল্গুনে ফুটল পলাশ,
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে ;
চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্ষের খেতে
কবির লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।
আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে
কোনো ঋতুর কোনো তুলির
চিহ্ন লাগে নি।

একদা ছিলেম ওই দিনের মাঝখানেই।
দিনটা ছিল গা ছড়িয়ে
নানা-কিছুর মধ্যে ;
তারা সমস্তই ঘেঁষে ছিল আশেপাশে সামনে।
তাদের দেখে গেছি সবটাই
কিন্তু চোখে পড়ে নি সমস্তটা।
ভালোবেসেছি,
ভালো করে জানি নি
কতখানি বেসেছি।
অনেক গেছে ফেলাছড়া ;
আনমনার রসের পেয়ালায়
বাকি ছিল কত।

সেদিনের যে পরিচয় ছিল আমার মনে
আজ দেখি তার চেহারা অন্য ছাঁদের।
কত এলোমেলো, কত যেমন-তেমন
সব গেছে মিলিয়ে।

তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে
তাকে আজ দূরের পটে দেখছি যেন
সেদিনকার সে নববধূ।
তনু তার দেহলতা,
ধূপছায়া রঙের আঁচলটি
মাথায় উঠেছে খোঁপাটুকু ছাড়িয়ে।
ঠিকমতো সময়টি পাই নি
তাকে সব কথা বলবার,
অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন,
সে-সব বৃথা কথা।
হতে হতে বেলা গেছে চলে।

আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি—
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হল না ;
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,
ফেরার পথ নেই।

ত্রিশ

যখন দেখা হল
তার সঙ্গে চোখে চোখে
তখন আমার প্রথম বয়েস ;
সে আমাকে শুধাল,
'তুমি খুঁজে বেড়াও কাকে ?'
আমি বললেম,
'বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে,
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ,
বাঁশির থেকে ধ্বনি।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে ;
তার মৌমাছির পাখায় বাজে
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জরণ।'

শুনে সে রইল চুপ করে
অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

আমার মনে লাগল ব্যথা,
বললেম, 'কী ভাবছ তুমি ?'
ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে,
'কেমন করে জানবে তাকে পেলে কি না,
তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে
একটিমাত্রকে ?'

আমি বললেম,
'আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সব চেয়ে গোপন কথা ;
ও কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারই ভিতর ।'

কোনো কথা সে বলল না ।
কচি শ্যামল তার রঙটি ;
গলায় সরু সোনার হারগাছি
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা ।
চোখে ছিল
একটা দিশাহারা ভয়ের চমক
পাছে কেউ পালায় তাকে না ব'লে ।
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,
ঠাহর পায় নি
কোন্‌খানে সীমা
তার আঙিনাতে ।

দেখা হল ।
সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ওইটুকু নিয়ে ।
তার পরে সে চলে গেছে ।

একত্রিশ

পাড়ায় আছে ক্লাব,
আমার একতলার ঘরখানা
দিয়েছি ওদের ছেড়ে ।
কাগজে পেয়েছি প্রশংসাবাদ,
ওরা মীটিং করে আমাকে পরিয়েছে মালা ।
আজ আট বছর থেকে
শূন্য আমার ঘর ।
আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি
সেই ঘরের একটা ভাগে
টেবিলে পা তুলে
কেউ পড়ছে খবরের কাগজ,
কেউ খেলছে তাস,
কেউ করছে তুমুল তর্ক ।
তামাকের ধোঁয়ায়
ঘনিয়ে ওঠে বদ্ধ হাওয়া,
ছাইদানিতে জমতে থাকে,
ছাই, দেশলাইকাঠি,
পোড়া সিগারেটের টুকরো ।

এই প্রচুর পরিমাণ ঘোলা আলাপের
গোলমাল দিয়ে
দিনের পর দিন
আমার সন্ধ্যার শূন্যতা দিই ভরে ।
আবার রাত্তির দশটার পরে
খালি হয়ে যায়
উপুড়-করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ ।
বাইরে থেকে আসে ট্র্যামের শব্দ,
কোনোদিন আপন মনে শুনি
গ্রামোফোনের গান,
যে কয়টা রেকর্ড আছে
ঘুরে ফিরে তারই আবৃত্তি ।

আজ ওরা কেউ আসে নি ;
গেছে হাবড়া স্টেশনে
অভ্যর্থনায় ;
কে সদ্য এনেছে
সমুদ্রপারের হাততালি
আপন নামটার সঙ্গে বেঁধে ।

নিবিয়ে দিয়েছি বাতি ।

যাকে বলে 'আজকাল'
অনেকদিন পরে
সেই আজকালটা, সেই প্রতিদিনের নকিব
আজ নেই সন্ধ্যায় আমার ঘরে।
আট বছর আগে
এখানে ছিল হাওয়ায়-ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারই একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব-কিছুতেই।
যেন কী শুনব বলে
রইল কান পাতা ;
সেই ফুলকাটা ঢাকাওয়ালা
পুরোনো খালি চৌকিটা
যেন পেয়েছে কার খবর।

পিতামহের আমলের
পুরোনো মুচুকুন্দ গাছ
দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে।
রাস্তার ওপারের বাড়ি
আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু আকাশ আছে
সেখানে দেখা যায়
জ্বলজ্বল করছে একটি তারা।
তাকিয়ে রইলেম তার দিকে চেয়ে
টনটন করে বুকের ভিতরটা।
যুগল জীবনের জোয়ার-জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ওই তারার ছায়া।

অনেক কথার মধ্যে
মনে পড়ছে ছোট্টো একটি কথা।
সেদিন সকালে
কাগজ পড়া হয় নি কাজের ভিড়ে ;
সন্ধেবেলায় সেটা নিয়ে
বসেছি এই ঘরেতেই,
এই জানলার পাশে
এই কেদারায়।
চুপি চুপি সে এল পিছনে,
কাগজখানা দ্রুত কেড়ে নিল হাত থেকে।
চলল কাড়াকাড়ি
উচ্চ হাসির কলরোলে।

উদ্ধার করলুম লুঠের জিনিস,
স্পর্ধা করে আবার বসলুম পড়তে।
হঠাৎ সে নিবিয়ে দিল আলো।
আমার সেদিনকার
সেই হার-মানা অন্ধকার
আজ আমাকে সর্বাঙ্গে ধরেছে ঘিরে,
যেমন করে সে আমাকে ঘিরেছিল
দুয়ো-দেওয়া নীরব হাসিতে ভরা
বিজয়ী তার দুই বাহু দিয়ে
সেদিনকার সেই আলো-নেবা নির্জনে।

হঠাৎ ঝর্‌ঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে,
জানলাটা উঠল শব্দ করে,
দরজার কাছের পর্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থির হয়ে।

আমি বলে উঠলেম,
'ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণলোক থেকে
তোমার বাদামি রঙের শাড়িখানি পরে?'
একটা নিশ্বাস লাগল আমার গায়ে,
শুনলেম অশ্রুতবাণী,
'কার কাছে আসব?'
আমি বললেম,
'দেখতে কি পেলে না আমাকে?'

শুনলেম,
'পৃথিবীতে এসে
যাকে জেনেছিলেম একান্তই,
সেই আমার চিরকিশোর বঁধু
তাকে তো আর পাই নে দেখতে
এই ঘরে।'
শুধালেম, 'সে কি নেই কোথাও?'
মৃদু শান্তসুরে বললে,
'সে আছে সেইখানেই
যেখানে আছি আমি।
আর কোথাও না।'

দরজার কাছে শুনলেম উত্তেজিত কলরব—
হাবড়া স্টেশন থেকে
ওরা ফিরেছে।

বত্রিশ

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে।
হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা
পঙ্খের-কাজ-করা মেজে;
তার উপরে খান-দুয়েক মাদুর পাতা।
ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে
মিটমিটে আলোয়।
বুড়ো মোহন সর্দার —
কলপ-লাগানো চুল বাবরি-করা,
মিশকালো রঙ,
চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস,
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু-মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগবার মতো তার পূর্ব-ইতিহাস।
বসেছে আমাদের মাঝখানে,
বলছে রোঘো ডাকাতের কথা।
আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি।
দক্ষিণের হাওয়া-লাগা ঝাউডালের মতো
দুলছে মনের ভিতরটা।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।
পথের বাঁ ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী।
পাশের বাড়ি থেকে
কুকুর ডেকে উঠল অকারণে।
নটার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে।

অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিতকথা।

তত্ত্বরত্নের ছেলের পৈতে,
রোঘো ব'লে পাঠাল চরের মুখে,
'নমো নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর,
ভেবো না খরচের কথা।'
মোড়লের কাছে পত্র দেয়
পাঁচ হাজার টাকা দাবি ক'রে ব্রাহ্মণের জন্যে।

রাজার খাজনা-বাকির দায়ে
বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে,
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
দেনা শোধ ক'রে দেয় রঘু।
বলে— 'অনেক গরিবকে দিয়েছ ফাঁকি,
কিছু হালকা হোক তার বোঝা।'

একদিন তখন মাঝরাত্তির,
ফিরছে রোঘো লুঠের মাল নিয়ে,
নদীতে তার ছিপের নৌকো
অন্ধকারে বটের ছায়ায়।
পথের মধ্যে শোনে—
পাড়ায় বিয়েবাড়িতে কান্নার ধ্বনি,
বর ফিরে চলেছে বচনা করে ;
কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।
এমন সময় পথের ধারে
ঘন বাঁশবনের ভিতর থেকে
হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে!

আকাশের তারাগুলো
যেন উঠল থরথরিয়ে।
সবাই জানে রোঘো ডাকাতের
পাঁজর-ফাটানো ডাক।
বরসুদ্ধ পালকি পড়ল পথের মধ্যে ;
বেহারা পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।
ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা
অন্ধকারের মধ্যে উঠল তার কান্না—
'দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।'
রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—
পালকি থেকে টেনে বের করলে বরকে,
বরকর্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,
পড়ল সে মাথা ঘুরে।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁক উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি ;
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়াল সভায়,
শিবের বিয়ের রাতে ভূতপ্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেলমাখা সর্বাঙ্গ,
মুখে ভুসোর কালি।
বিয়ে হল সারা।

তিন পহর রাতে
যাবার সময় কনেকে বললে ডাকাত,
'তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো স্মরণ কোরো রঘুকে।'

তার পরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

তেত্রিশ

বাদশাহের হুকুম—
সৈন্যদল নিয়ে এল আফ্রাসায়েব খাঁ, মুজফ্‌ফর খাঁ,
মহম্মদ আমিন খাঁ,
সঙ্গে এল রাজা গোপাল সিং ভদৌরিয়া,
উদইৎ সিং বুন্দেলা।

গুরুদাসপুর ঘেরাই করল মোগল সেনা।
শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে,
বন্দা সিং তাদের সর্দার।
ভিতরে আসে না রসদ,
বাইরে যাবার পথ সব বন্ধ।

থেকে থেকে কামানের গোলা পড়ছে
প্রাকার ডিঙিয়ে,
চার দিকের দিক্‌সীমা পর্যন্ত
রাত্রির আকাশ মশালের আলোয় রক্তবর্ণ।

ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি;
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।
কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউ বা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস ে
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

নরক-যন্ত্রণায় কাটল আট মাস,
মোগলের হাতে পড়ল
গুরুদাসপুর গড় ।
মৃত্যুর আসর রক্তে হল আকণ্ঠ পঙ্কিল,
বন্দীরা চীৎকার করে
'ওয়াহি গুরু, ওয়াহি গুরু',
আর শিখের মাথা স্খলিত হয়ে পড়ে
দিনের পর দিন ।

নেহাল সিং বালক ;
স্বচ্ছ তরুণ সৌম্যমুখে
অন্তরের দীপ্তি পড়েছে ফুটে ।
চোখে যেন স্তব্ধ আছে
সকালবেলার তীর্থযাত্রীর গান ।
সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বের করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে ।
বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে,
শালগাছের চারা,
উঠেছে ঋজু হয়ে,
তবু এখনো
হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায় ।
প্রাণের অজস্রতা
দেহে মনে রয়েছে
কানায় কানায় ভরা ।

বেঁধে আনলে তাকে ।
সভার সমস্ত চোখ
ওর মুখে তাকাল বিস্ময়ে করুণায় ।
ক্ষণেকের জন্যে
ঘাতকের খড়্গ যেন চায় বিমুখ হতে ।
এমন সময় রাজধানী থেকে এল দূত,
হাতে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁয়ের
স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র ।

যখন খুলে দিলে তার হাতের বন্ধন,
বালক শুধাল, আমার প্রতি কেন এই বিচার ?
শুনল, বিধবা মা জানিয়েছে—
শিখধর্ম নয় তার ছেলের,
বলেছে, শিখেরা তাকে জোর করে রেখেছিল
বন্দী করে ।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হল
বালকের মুখ।
বলে উঠল, 'চাই নে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়,
সত্যে আমার শেষ মুক্তি,
আমি শিখ।'

চৌত্রিশ

পথিক আমি।
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে;
বিরাট অহংকার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত,
সেই ধুলার 'পরে সন্ধ্যাবেলায়
ভিক্ষুক তার জীর্ণ-কাঁথা মেলে বসে,
পথিকের শ্রান্ত পদ
সেই ধুলায় ফেলে চিহ্ন,
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে।

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

পঁয়ত্রিশ

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত ?

খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী
সে তো কেবল খাঁচারই নয়,
তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্য-মর্মর,
আছে করুণ বিস্মৃতি।

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি—
এ তো কেবলই দেখার জাল-বোনা নয়।
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষে
দেশ-পারানো কোন্ দেশের দিকে,
দিগ্‌বলয়ের ইঙ্গিতলীন
কোন্ কল্পলোকের অদৃশ্য সংকেতে।

দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ,
রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখসুখের বন্ধুর পথে।
শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য ?
ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান,
তার সত্য মিলবে কোন্‌খানে ?

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ ?
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ ;
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই ?

ছত্রিশ

শীতের রোদ্দুর।
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে।
বেগ্‌নি-ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা
ঝুরি-নামা বৃদ্ধ বট
ডাল মেলেছে রাস্তার ও পার পর্যন্ত।

ফলসাগাছের ঝরা পাতা
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে
ধুলোর সাঙাত হয়ে।

কাজ-ভোলা এই দিন
উধাও বলাকার মতো
লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায়।
ঝাউগাছের মর্মরধ্বনিতে মিশে
মনের মধ্যে এই কথাটি উঠছে বেজে
'আমি আছি'।

কুয়োতলার কাছে
সামান্য ওই আমের গাছ ;
সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্মৃত,
বনের সাধারণ সবুজের আবরণে
ও থাকে ঢাকা।
এমন সময় মাঘের শেষে
হঠাৎ মাটির নীচে
শিকড়ে শিকড়ে তার শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় মুকুলিত হয়ে ওঠে বাণী—
'আমি আছি'।
চন্দ্রসূর্যের আলো আপন ভাষায়
স্বীকার করে তার সেই ভাষা।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে,
তখন যে-আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির
মধ্যে মিলিয়ে ছিল,
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।
সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানি নে ;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
'আমি আছি'।

সাঁইত্রিশ

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে।
তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ,
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ।

দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে
দুঃখেরই দহনে,
শুষ্ককে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলে
পূজার পুণ্যধূপে।
কালোকে আলো করলে,
তেজ দিলে নিস্তেজকে,
ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হল
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জনে,
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে।

আটত্রিশ

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্মকুঁড়ির মতো।
সেদিন সংকীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে,
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,
শ্রাবণের মেঘমালা
যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারই আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে।

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।
রেণুর ভারে মন্থর বাতাস
তাকে জানিয়ে দিল
নীপ-নিকুঞ্জের আকুলি।

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি ;
নিজের অন্তর-আঙিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।
আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা।

উনচল্লিশ

ওরা এসে আমাকে বলে,
কবি, মৃত্যুর কথা শুনতে চাই তোমার মুখে।
আমি বলি,
মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।

বলছে সে, 'চলো চলো ;
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে ।
বলছে, চুপ করে বোস যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধরে
তবে দেখবে, তোমার জগতে
ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুকনো নদীতে,
ম্লান হল তোমার তারার আলো ।'
বলছে, 'থেমো না, থেমো না,
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না,
পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে ক্লান্তকে অচলকে ।

'আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে ।

'যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিই নি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে ।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই ।

'বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে ।
সে চাপাতে চায়
তার সব বোঝা তোমার মাথায়,
বর্তমান গিলে ফেলতে চায়
তোমার সব-কিছু আপন জঠরে ।
তার পরে অবিচল থাকতে চায়
আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো
জাগরণহীন নিদ্রায় ।
তাকেই বলে প্রলয় ।

'এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি,
অন্তহীন নব নব অনাগতে ।'

চল্লিশ

পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
—অথর্ববেদ

ঋষি কবি বলেছেন—
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।
কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে?
তাকেই বলি নবীন,
সে নিত্যকালের।
কত জরা কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তাকে চার দিকে,
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল,
প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
ধ্বনিত হল তার বাণী—
"এই আমি, প্রথমজাত অমৃত।"
দিন এগোতে থাকে,
তপ্ত হয়ে ওঠে বাতাস,
আকাশ আবিল হয়ে ওঠে ধুলোয়,
বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল
আবর্তিত হতে থাকে
দূর হতে দূরে।

কখন দিন আসে আপন শেষপ্রান্তে,
থেমে যায় তাপ,
নেমে যায় ধুলো,
শান্ত হয় কর্কশ কণ্ঠের পরিণামহীন বচসা,
আলোর যবনিকা সরে যায়
দিক্‌সীমার অন্তরালে।

অন্তহীন নক্ষত্রলোকে,
ম্লানিহীন অন্ধকারে
জেগে ওঠে বাণী—
"এই আমি, প্রথমজাত অমৃত।"
শতাব্দীর পর শতাব্দী
আপনাকে ঘোষণা করে
মানুষের তপস্যায়;

সে-তপস্যা
ক্লান্ত হয়,
হোমাগ্নি যায় নিবে,
মন্ত্র হয় অর্থহীন,
জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন
ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে।

অবশেষে কখন
শেষ সূর্যাস্তের তোরণদ্বারে
নিঃশব্দচরণে আসে
যুগান্তের রাত্রি,
অন্ধকারে জপ করে শান্তিমন্ত্র
শবাসনে সাধকের মতো।
বহুবর্ষব্যাপী প্রহর যায় চলে,
নবযুগের প্রভাত
শুভ্র শঙ্খ হাতে
দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,
দেখা যায়,
তিমিরধারায় ক্ষালন করেছে কে
ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জনা ;
ব্যাপ্ত হয়েছে অপরিসীম ক্ষমা
অন্তর্হিত অপরাধের
কলঙ্কচিহ্নের 'পরে।
পেতেছে শান্ত জ্যোতির আসন
প্রথমজাত অমৃত।
বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে
ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়।

দিন এগোল।
চলল জীবনযাত্রার পথ
এ-পথে ও-পথে।
ক্ষুব্ধ অন্তরের তাপতপ্ত নিশ্বাস
শুকনো পাতা ওড়াল দিগন্তে।
চাকার বেগে
বাতাস ধুলায় হল নিবিড়।
আকাশচর কল্পনা
উড়ে গেল মেঘের পথে,
ক্ষুধাতুর কামনা
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে

ঘুরে বেড়াল ধরাতলে
ফলের বাগানে ফসলের খেতে
আহূত অনাহূত ।
আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে ।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে ।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪২

একচল্লিশ

হালকা আমার স্বভাব,
মেঘের মতো না হোক
গিরিনদীর মতো ।
আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থামল না ।
বেদীর থেকে নেমে আসি,
রঙ্গমঞ্চে বসে বাঁধি নাচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে ।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হয়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝংকার দিতে
আজও সে সংকোচ করে না ।
আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের
রহস্যসখা ।
তিনি অর্বাচীন নবীনদের কাছে
প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে
ভুলেই গেছেন ।
তরুণের উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে
উতরোল তাঁর কৌতুক,
তাদের উদ্দাম নৃত্যে
বাজান তিনি দ্রুততালের মৃদঙ্গ ।
তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য মেঘমেদুর অম্বরে ;
অজস্র তাঁর পরিহাস
বিকশিত কাশবনে,
শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে ।
তাঁর কোনো লোভ নেই
প্রধানদের কাছে মর্যাদা পাবার ;

তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না
চাপল্যের ঝরনার মুখে।
তাঁর বেলাভূমিতে
ভঙ্গুর সৈকতের ছেলেমানুষি
প্রতিবাদ করে না সমুদ্রের।
আমাকে চান টেনে রাখতে তাঁর বয়স্যদলে,
তাই আমার বার্ধক্যের শিরোপা
হঠাৎ নেন কেড়ে
ফেলে দেন ধুলোয়—
তার উপর দিয়ে নেচে নেচে
চলে যায় বৈরাগী
পাঁচ রঙের তালি-দেওয়া আলখাল্লা প'রে।
যারা আমার মূল্য বাড়াতে চায়,
পরায় আমাকে দামি সাজ,
তাদের দিকে চেয়ে
তিনি ওঠেন হেসে,
ও সাজ আর টিকতে পায় না
আনমনার অনবধানে।

আমাকে তিনি চেয়েছেন
নিজের অবারিত মজলিসে,
তাই ভেবেছি যাবার বেলায় যাব
মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে,
কৌতুকে রসোল্লাসে।
এসো আমার অমানী বন্ধুরা
মন্দিরা বাজিয়ে—
তোমাদের ধুলোমাখা পায়ে
যদি ঘুঙুর বাঁধা থাকে
লজ্জা পাব না।

বিয়াল্লিশ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত প্রিয়বরেষু

তুমি গল্প জমাতে পার।
বোস তোমার কেদারায়,
ধীরে ধীরে টান দাও গুড়গুড়িতে,
উছলে ওঠে আলাপ
তোমার ভিতর থেকে
হালকা ভাষায়,

যেন নিরাসক্ত ঔৎসুক্যে,
তোমার কৌতুকে-ফেনিল মনের
কৌতূহলের উৎস থেকে।

ঘুরেছ নানা জায়গায়, নানা কাজে,
আপন দেশে, অন্য দেশে।
মনটা মেলে রেখেছিলে চার দিকে,
চোখটা ছিলে খুলে।
মানুষের যে-পরিচয়
তার আপন সহজ ভাবে,
যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায়
দিনে দিনে যা গাঁথা হয়ে ওঠে,
সামান্য হলেও যাতে আছে
সত্যের ছাপ,
অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব,
সেটা এড়ায় নি তোমার দৃষ্টি।
সেইটে দেখাই সহজ নয়,
পণ্ডিতের দেখা সহজ।

শুনেছি তোমার পাঠ ছিল সায়ান্সে,
শুনেছি শাস্ত্রও পড়েছ সংস্কৃত ভাষায়;
পার্সি জবানিও জানা আছে।
গিয়েছ সমুদ্রপারে,
ভারতে রাজসরকারের
ইম্পীরিয়ল রথযাত্রার লম্বা দড়িতে
'হেঁইয়ো' ব'লে দিতে হয়েছে টান।
অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি
মগজে বোঝাই হয়েছে কম নয়,
পুঁথির থেকেও কিছু,
মানুষের প্রাণযাত্রা থেকেও বিস্তর।

তবু সব-কিছু নিয়ে
তোমার যে পরিচয় মুখ্য
সে তোমার আলাপ-পরিচয়ে।
তুমি গল্প জমাতে পার।
তাই যখন-তখন দেখি,
তোমার ঘরে মানুষ লেগেই আছে,
কেউ তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো
কেউ বয়সে বেশি।
গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না,
এই তোমার বাহাদুরি।
তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানাও,
জীবলীলার মানুষকে।

একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,
সব-কিছুর কাছে-থাকা।
তুমি জমা করেছ তোমার মনে
নানা লোকের সঙ্গ,
সেইটে দিতে পার সবাইকে
অনায়াসে—
সেইটেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের তকমা পরিয়ে
পণ্ডিত-পেয়াদা সাজাও না
থমকিয়ে দিতে ভালোমানুষকে।

তোমার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারটা
পূর্ণ আছে যথাস্থানেই।
সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা করে রাখে নি।
যেখানে আসন পাত
গল্পের ভোজে
সেখানে ক্ষুধিতের পাতের থেকে ঠেকিয়ে রাখ
লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরিকে।

একটিমাত্র কারণ—
মানুষের 'পরে আছে তোমার দরদ,
যে-মানুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে
সুখদুঃখের দুর্গম পথে,
বাঁধা পড়ে নানা বন্ধনে
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়—
যে-মানুষ বাঁচে,
যে-মানুষ মরে
অদৃষ্টের গোলকধাঁধার পাকে।
সে-মানুষ রাজাই হোক, ভিখিরিই হোক
তার কথা শুনতে মানুষের অসীম আগ্রহ।

তার কথা যে-লোক পারে বলতে সহজেই
সে-ই পারে,
অন্যে পারে না।
বিশেষ এই হাল-আমলে।
আজ মানুষের জানাশোনা
তার দেখাশোনাকে
দিয়েছে আপাদমস্তক ঢেকে।
একটু ধাক্কা পেলে
তার মুখে নানা কথা অনর্গল ছিটকে পড়ে—
নানা সমস্যা, নানা তর্ক ;
একান্ত মানুষের আসল কথাটা
যায় খাটো হয়ে।

আজ বিপুল হল সমস্যা,
বিচিত্র হল তর্ক,
দুর্ভেদ্য হল সংশয় ;
আজকের দিনে
সেইজন্যেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে।
এ দুর্দিনে
মাস্টারমশায়কেও অত্যন্ত দরকার।
তাঁর জন্যে ক্লাস আছে
পাড়ায় পাড়ায়—
প্রায়মারি, সেকেন্ডারি।
গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ।

সমুদ্রের ও পারে
একদিন ওরা গল্পের আসর খুলেছিল,
তখন ছিল অবকাশ ;
ওরা ছেলেদের কাছে শুনিয়েছিল,
রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো,
সকল বয়সের মানুষের কাছে
ডন্‌ কুইক্‌সোট্‌।

দুরূহ ভাবনার আঁধি লাগল
দিকে দিকে ;
লেক্‌চারের বান ডেকে এল,
জলে স্থলে কাদায় পাঁকে
গেল ঘুলিয়ে।
অগত্যা
অধ্যাপকেরা জানিয়ে দিলে
একেই বলে গল্প।
বন্ধু,
দুঃখ জানাতে এলুম
তোমার বৈঠকে।
আজকালের ছাত্রেরা দেয়
আজকালের দোহাই।
আজকালের মুখরতায়
তাদের অটুট বিশ্বাস।
হায় রে, আজকাল
কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে
মোটাদামের মার্কা-মারা
পসরা নিয়ে।

যা চিরকালের
তা আজ যদি-বা ঢাকা পড়ে
কাল উঠবে জেগে।
তখন মানুষ আবার বলবে খুশি হয়ে,
গল্প বলো।

তেতাল্লিশ

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।
রথে চলে চলেছে কাল,
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয়;
পান সারা হলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।

একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে।
কেউ নেই তারা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে,
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে;
তার সেদিনকার কান্নাহাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।

তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও
দেখি নে ধুলোর 'পরে।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ-মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড়,
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এদিক থেকে ওদিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই
প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল একগোত্রের।

সে-কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ,
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কাল-সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।

পঁচিশে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে.
ফাল্গুনের প্রত্যুষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।
তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়াল
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

সেই শুনে কোনো-কোনোদিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে
কাজ-ভোলানো সকাল-বিকালে।

তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝি নি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস ;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা ;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।

তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে
নতুন ফোটা বেলফুলের মালা ;
ভোরের স্বপ্ন
তারি গন্ধে ছিল বিহ্বল।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে।
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের
রঙকরা প্রাচীরগুলো
পড়ল ভেঙে।
যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।

সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে-একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল
তার পর নতুন তার।

সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।
বেলা-অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝদরিয়ায় ;
কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে
কেউ বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্নে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্তপ্রতিমা ;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র ;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে ;
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে ;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে,
বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।
তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজও আছে
আমার গানে আমার বাণীতে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরী।

খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে ।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা ।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে—
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে ।
বিদ্বেষে অনুরাগে
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে ।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে ।
জেনেছ কি—
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত,
অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্ন,
অনেক উপেক্ষিত ?
অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ,
স্পষ্ট অস্পষ্ট,
খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত—
আজ যার সমানে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষবেলাকার পরিচয় বলে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল বলে
করব না অহংকার ।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

চুয়াল্লিশ

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু করে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃতদিনের প্রেতের বাসা।

সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে ;
যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।

সেই মাটির ছাদের নীচে বসব আমি
রোজ সকালে শৈশবে যা ভরেছিল
আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোনা
এক-একমুঠো চাঁপা আর বেল ফুলে।
মাঘের শেষে যার আমের বোল
দক্ষিণের হাওয়ায়
অলক্ষ্য দূরের দিকে ছড়িয়েছিল
ব্যথিত যৌবনের আমন্ত্রণ।

আমি ভালোবেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে ;
যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকণ আভা ।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ওই মাটির দিগন্তে
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে ।

প্রতিদিন আমার ঘরের সুপ্ত মাটি
সহজে উঠবে জেগে
ভোরবেলাকার সোনার কাঠির
প্রথম ছোঁওয়ায় ;
তার চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমায়
স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
চৈত্ররাতের চাঁদের
নিদ্রাহারা মিতালিতে ।

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,
গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায় ;
সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে ।
আমার দু-চোখ ভ'রে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়,
রাঙা পথের ওপারে,
যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায় দুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে,
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে ;
যেখানে সাথিবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা ।

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষবেলায় ।

এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে,
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

পঁয়তাল্লিশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু

তখন আমার আয়ুর তরণী
যৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে।
যে-সব কাজ প্রবীণকে প্রাজ্ঞকে মানায়
তাই নিয়ে পাকা করছিলেম
পাকা চুলের মর্যাদা।

এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজপত্রের আসরে।
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক,
খবর দিলে,
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলে নি।
দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম
পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে।
পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি
দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।
ভরা যৌবনের দিনেও
যৌবনের সংবাদ
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগে নি আমার লেখনীতে।
আমার মন বুঝল
যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
পুবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছুডাক,
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে।
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা।

যাকে ছেড়ে এলেম
তাকেই নিচ্ছি চিনে।
সরে এসে দেখছি
আমার এতকালের সুখদুঃখের ওই সংসার,
আর তার সঙ্গে
সংসারকে পেরিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট।
ঋষিকবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন—
'ভুবন সৃষ্টি করেছ
তোমার এক অর্ধেককে দিয়ে,
বাকি আধখানা কোথায়
তা কে জানে।'
সেই একটি-আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে
আপন প্রান্তরেখায়;
দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা—
তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষকথা ব'লে যাব
'দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।'

ছেচল্লিশ

তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন-ফোটা কাঁটালিচাঁপার মতো।

বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে,
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল-শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।

তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,

সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,
হাসত আমার মুখে চেয়ে।
আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে।

তার পরে বয়স হল
কাজের দায় চাপল মাথার 'পরে।
দিনের পরে দিন তখন হল ঠাসাঠাসি।
তারা হারাল আপনার স্বতন্ত্র মর্যাদা।
একদিনের চিন্তা আর-এক দিনে হল প্রসারিত,
একদিনের কাজ আর-এক দিনে পাতল আসন।
সেই একাকার-করা সময় বিস্তৃত হতে থাকে
নতুন হতে থাকে না।
একটানা বয়েস কেবলই বেড়ে ওঠে,
ক্ষণে ক্ষণে সমে এসে
চিরদিনের ধুয়োটির কাছে
ফিরে ফিরে পায় না আপনাকে।

আজ আমার প্রাচীনকে নতুন ক'রে নেবার দিন এসেছে।
ওঝাকে ডেকেছি, ভূতকে দেবে নামিয়ে।
গুণীর চিঠিখানির জন্যে
প্রতিদিন বসব এই বাগানটিতে—
তাঁর নতুন চিঠি
ঘুম-ভাঙার জানলাটার কাছে।
প্রভাত আসবে
আমার নতুন পরিচয় নিতে,
আকাশে অনিমেষ চক্ষু মেলে
আমাকে শুধাবে
'তুমি কে'।
আজকের দিনের নাম
খাটবে না কালকের দিনে।

সৈন্যদলকে দেখে সেনাপতি,
দেখে না সৈনিককে—
দেখে আপন প্রয়োজন,
দেখে না সত্য,
দেখে না স্বতন্ত্র মানুষের
বিধাতাকৃত আশ্চর্যরূপ।
এতকাল তেমনি করে দেখেছি সৃষ্টিকে,
বন্দিদলের মতো
প্রয়োজনের এক শিকলে বাঁধা।
তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছি
সেই বন্ধনে নিজে।

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই,
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

সংযোজন

স্মৃতিপাথেয়

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাসে
অন্যমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা
মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃত-রেখা,
কভু যার পাই নাই দেখা,
দুর্লভ সে প্রিয়
অনির্বচনীয়।

যে মহা-অপরিচিত
এক পলকের লাগি হয় সচকিত
গভীর অন্তরতর প্রাণে
কোন্ দূর বনান্তের পথিকের গানে,
সে অপূর্ব আসে ঘরে
পথহারা মুহূর্তের তরে
বৃষ্টিধারামুখরিত নির্জন প্রবাসে
সন্ধ্যাবেলা যূথিকার সকরুণ স্নিগ্ধ গন্ধশ্বাসে,
চিত্তে রেখে দিয়ে গেল চিরস্পর্শ স্বীয়
তাহারি স্খলিত উত্তরীয়।

সে বিস্মিত ক্ষণিকেরে পড়ে মনে
কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে
শীতের মধ্যাহ্নকালে গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠে
চেয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে।
সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে সে স্মৃতির ছবি
সূর্যাস্তের পার হতে বাজায় পূরবী।
পেয়েছি যে-সব ধন যার মূল্য আছে
ফেলে যাই পাছে।
সেই যার মূল্য নাই, জানিবে না কেও
সঙ্গে থাকে অখ্যাত পাথেয়।

শেষ সপ্তকের দুই-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

বাতাবির চারা

একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধারা
বাতাবির চারা
আসন্নবর্ষণ কোন্ শ্রাবণপ্রভাতে
রোপণ করিলে নিজহাতে
আমার বাগানে।
বহুকাল গেল চলি ; প্রখর পৌষের অবসানে
কুহেলি ঘুচাল যবে কৌতূহলী ভোরের আলোক,
সহসা পড়িল চোখ—
হেরিনু শিশিরে ভেজা সেই গাছে
কচিপাতা ধরিয়াছে,
যেন কী আগ্রহে
কথা কহে,
যে কথা আপনি শুনে পুলকেতে দুলে ;
যেমন একদা করে তমসার কূলে
সহসা বাল্মীকি মুনি
আপনার কণ্ঠ হতে আপন প্রথম ছন্দ শুনি'
আনন্দসঘন
গভীর বিস্ময়ে নিমগন।

কোথায় আছ না-জানি এ সকালে
কী নিষ্ঠুর অন্তরালে—
সেথা হতে কোনো সম্ভাষণ
পরশে না এ প্রান্তের নিভৃত আসন।
হেনকালে অকস্মাৎ নিঃশব্দের অবহেলা হতে
প্রকাশিল অরুণ আলোতে
এ কয়টি কিশলয়।
এরা যেন সেই কথা কয়
বলিতে পারিতে যাহা তবু না বলিয়া
চলে গেছ প্রিয়া।

সেদিন বসন্ত ছিল দূরে
আকাশ জাগে নি সুরে,
অচেনার যবনিকা কেঁপেছিল ক্ষণে ক্ষণে,
তখনো যায় নি সরে দুরন্ত দক্ষিণসমীরণে।
প্রকাশের উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ না ঘটিতে,
পরিচয় না রটিতে,
ঘণ্টা গেল বেজে
অব্যক্তের অনালোকে সায়াহ্নে গিয়েছ সভা ত্যেজে।

তিন-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

শেষ পর্ব

যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা
সেথা হতে শেষ অরুণিমা
শীর্ণপ্রায়
আজি দেখা যায়।

সেথা হতে ভেসে আসে
চৈত্রদিবসের দীর্ঘশ্বাসে
অস্ফুট মর্মর,
কোকিলের ক্লান্ত স্বর,
ক্ষীণস্রোত তটিনীর অলস কল্লোল—
রক্তে লাগে মৃদুমন্দ দোল।

এ আবেশ মুক্ত হোক ;
ঘোরভাঙা-চোখ
শুভ্র সুস্পষ্টের মাঝে জাগিয়া উঠুক।
রঙ-করা দুঃখ সুখ
সন্ধ্যার মেঘের মতো যাক সরে
আপনারে পরিহাস করে।
মুছে যাক সেই ছবি— চেয়ে থাকা পথপানে,
কথা কানে কানে,
মৌনমুখে হাতে হাত ধরা,
রজনীগন্ধায় সাজি ভরা,
চোখে চোখে চাওয়া,
দুরু দুরু বক্ষ নিয়ে আসা আর যাওয়া।

যে খেলা আপনা সাথে সকালে বিকালে
ছায়া-অন্তরালে,
সে খেলার ঘর হতে
হল আসিবার বেলা বাহির-আলোতে।
ভাঙিব মনের বেড়া কুসুমিত-কাঁটালতা-ঘেরা,
যেথা স্বপনেরা
মধুগন্ধে মরে ঘুরে ঘুরে
গুন গুন সুরে।
নেব আমি বিপুল বৃহৎ
আদিম প্রাণের দেশ— তেপান্তর মাঠের সে পথ
সাত সমুদ্রের তটে তটে
যেখানে ঘটনা ঘটে,
নাই তার দায়,
যেতে যেতে দেখা যায়, শোনা যায়,
দিনরাত্রি যায় চলে
নানা ছন্দে নানা কলরোলে।

থাক্ মোর তরে
আপক্ক ধানের খেত অঘ্রানের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে ;
সোনার তরঙ্গদোলে
মুগ্ধ দৃষ্টি যার 'পরে ভেসে যায় চলে
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে,
যেথায় অদৃশ্য সাথি লীলাভরে
সারাদিন ভাসায় প্রহর যত
খেলার নৌকার মতো।
দূরে চেয়ে রব আমি স্থির
ধরণীর
বিস্তীর্ণ বক্ষের কাছে
যেথা শাল গাছে
সহস্র বর্ষের প্রাণ সমাহিত রয়েছে নীরবে
নিস্তব্ধ গৌরবে।
কেটে যাক আপনা-ভোলানো মোহ,
কেটে যাক আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,
প্রতি বৎসরের আয়ু কর্তব্যের আবর্জনাভার
না করুক স্তূপাকার—
নির্ভাবনা তর্কহীন শাস্ত্রহীন পথ বেয়ে বেয়ে
যাই চলে অর্থহীন গান গেয়ে গেয়ে।

প্রাণে আর চেতনায় এক হয়ে ক্রমে
অনায়াসে মিলে যাব মৃত্যুমহাসাগরসংগমে,
আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব হয়ে ক্ষীণ
গোধূলি নিঃশব্দ রাত্রে যেমন অতলে হয় লীন।

জোড়াসাঁকো
৫ এপ্রিল ১৯৩৪

চার-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়

দুঃখ যেন জাল পেতেছে

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চার দিকে ;
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুর্গ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়।
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই,
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই।
যেন এ দুখ অন্তহীন,
ঘরছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন।

এমন সময় অকস্মাৎ
মনের মধ্যে হানল চমক তড়িদ্‌ঘাত,
এক নিমেষেই ভাঙল আমার বন্ধ দ্বার,
ঘুচল হঠাৎ অন্ধকার।
সুদূরকালের দিগন্তলীন বাগ্‌বাদিনীর পেলেম সাড়া,
শিরায় শিরায় লাগল নাড়া।
যুগান্তরের ভগ্নশেষে
ভিত্তিছায়ায় ছায়ামূর্তি মুক্তকেশে
বাজায় বীণা ; পূর্বকালের কী আখ্যানে
উদার সুরের তানের তন্তু গাঁথছে গানে ;
দুঃসহ কোন্‌ দারুণ দুখের স্মরণ-গাঁথা
করুণ গাথা ;
দুর্দাম কোন্‌ সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের
মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের
গর্জরবে
রক্তরঙিন যে-উৎসবে
রুদ্রদেবের ঘূর্ণিনৃত্যে উঠল মাতি
প্রলয়রাতি,
তাহারি ঘোর শঙ্কাকাঁপন বারে বারে
ঝংকারিয়া কাঁপছে বীণার তারে তারে।

জানিয়ে দিলে আমায়, অয়ি
অতীতকালের হৃদয়পদ্মে নিত্য-আসীন ছায়াময়ী,
আজকে দিনের সকল লজ্জা সকল গ্লানি
পাবে যখন তোমার বাণী,
বর্ষশতের ভাসান-খেলার নৌকা যবে
অদৃশ্যেতে মগ্ন হবে,
মর্মদহন দুঃখশিখা
হবে তখন জ্বলনবিহীন আখ্যায়িকা,
বাজবে তারা অসীম কালের নীরব গীতে
শান্ত গভীর মাধুরীতে ;
ব্যথার ক্ষত মিলিয়ে যাবে নবীন ঘাসে,
মিলিয়ে যাবে সুদূর যুগের শিশুর উচ্চহাসে।

২৮ আষাঢ় ১৩৪১

দশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

মর্মবাণী

শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্তিমতী
গানে যাহা ঝরে ঝরনায়,
সে বাণী হারায় কেন জ্যোতি,
কেন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়
মুখের কথায়
সংসারের মাঝে
নিরন্তর প্রয়োজনে জনতার কাজে ?
কেন আজ পরিপূর্ণ ভাষা দিয়ে
পৃথিবীর কানে কানে বলিতে পারি নে 'প্রিয়ে
ভালোবাসি' ?
কেন আজ সুরহারা হাসি
যেন সে কুয়াশা-মেলা
হেমন্তের বেলা ?

অনন্ত অম্বর
অপ্রয়োজনের সেথা অখণ্ড প্রকাণ্ড অবসর,
তারি মাঝে এক তারা অন্য তারকারে
জানাইতে পারে
আপনার কানে কানে কথা।
তপস্বিনী নীরবতা
আসন বিস্তীর্ণ যার অসংখ্য যোজন দূর ব্যেপে
অন্তরে অন্তরে উঠে কেঁপে
আলোকের নিগূঢ় সংগীতে।
খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিতে
নাই সেই অসীমের অবসর ;
তাই অবরুদ্ধ তার স্বর,
ক্ষীণসত্য ভাষা তার।
প্রত্যহের অভ্যস্ত কথার
মূল্য যায় ঘুচে,
অর্থ যায় মুছে।
তাই কানে কানে
বলিতে সে নাহি জানে
সহজে প্রকাশি
'ভালোবাসি'।

আপন হারানো বাণী, খুঁজিবারে,
বনস্পতি, আসি তব দ্বারে।
তোমার পল্লবপুঞ্জ শাখাব্যূহভার
অনায়াসে হয়ে পার
আপনার চতুর্দিকে মেলেছে নিস্তব্ধ অবকাশ।

সেথা তব নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস
সূর্যোদয়মহিমার পানে
আপনারে মিলাইতে জানে।

অজানা সাগর পার হতে
দক্ষিণের বায়ুস্রোতে
অনাদি প্রাণের যে বারতা
তব নব কিশলয়ে রেখে যায় কানে কানে কথা,
তোমার অন্তরতম—
সে কথা জাগুক প্রাণে মম,
আমার ভাবনা ভরি উঠুক বিকাশি—
'ভালোবাসি'।
তোমার ছায়ায় বসে বিপুল বিরহ মোরে ঘেরে ;
বর্তমান মুহূর্তেরে
অবলুপ্ত করি দেয় কালহীনতায়।
জন্মান্তর হতে যেন লোকান্তরগত আঁখি চায়
মোর মুখে।
নিষ্কারণ দুখে
পাঠাইয়া দেয় মোর চেতনারে
সকল সীমার পারে।
দীর্ঘ অভিসারপথে সংগীতের সুর
তাহারে বহিয়া চলে দূর হতে দূর।
কোথায় পাথেয় পাবে তার
ক্ষুধা পিপাসার,
এ সত্য বাণীর তরে তাই সে উদাসী
'ভালোবাসি'।
ভোর হয়েছিল যবে যুগান্তের রাতি
আলোকের রশ্মিগুলি খুঁজি সাথি
এ আদিম বাণী
করেছিল কানাকানি
গগনে গগনে।

নবসৃষ্টি-যুগের লগনে
মহাপ্রাণ-সমুদ্রের কূল হতে কূলে
তরঙ্গ দিয়েছে তুলে
এ মন্ত্রবচন।
এই বাণী করেছে রচন
সুবর্ণকিরণ বর্ণে স্বপন-প্রতিমা
আমার বিরহাকাশে যেথা অস্তশিখরের সীমা।
অবসাদ-গোধূলির ধূলিজাল তারে
ঢাকিতে কি পারে ?

নিবিড় সংহত করি এ-জন্মের সকল ভাবনা
সকল বেদনা
দিনান্তের অন্ধকারে মম
সন্ধ্যাতারা সম
শেষবাণী উঠুক উদ্ভাসি—
'ভালোবাসি'।

ছাব্বিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

ঘট ভরা

আমার এই ছোটো কলসখানি
সারা সকাল পেতে রাখি
ঝরনাধারার নীচে।
বসে থাকি একটি ধারে
শেওলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।
ঘট ভরে যায় বারে বারে—
ফেনিয়ে ওঠে, ছাপিয়ে পড়ে কেবলই।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা
শৈলশ্রেণীর নীল আকাশে
ঝরঝরানির শব্দ ওঠে দিনে রাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের শব্দ যায় পেরিয়ে
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা,
পাহাড়তলির রাস্তা ছেড়ে
যেখানে ওই হাটের মানুষ
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াইপথে,
বলদ দুটোর পিঠে বোঝাই
শুক্‌নো কাঠের আঁটি ;
রুনুঝুনু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

ঝরঝরানি আকাশ ছাপিয়ে
ভাবনা আমার ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে
পথহারানো দূর বিদেশে।
রাঙা ছিল সকালবেলার প্রথম রোদের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে।
বেলা হল ডাক পড়েছে ঘরে।

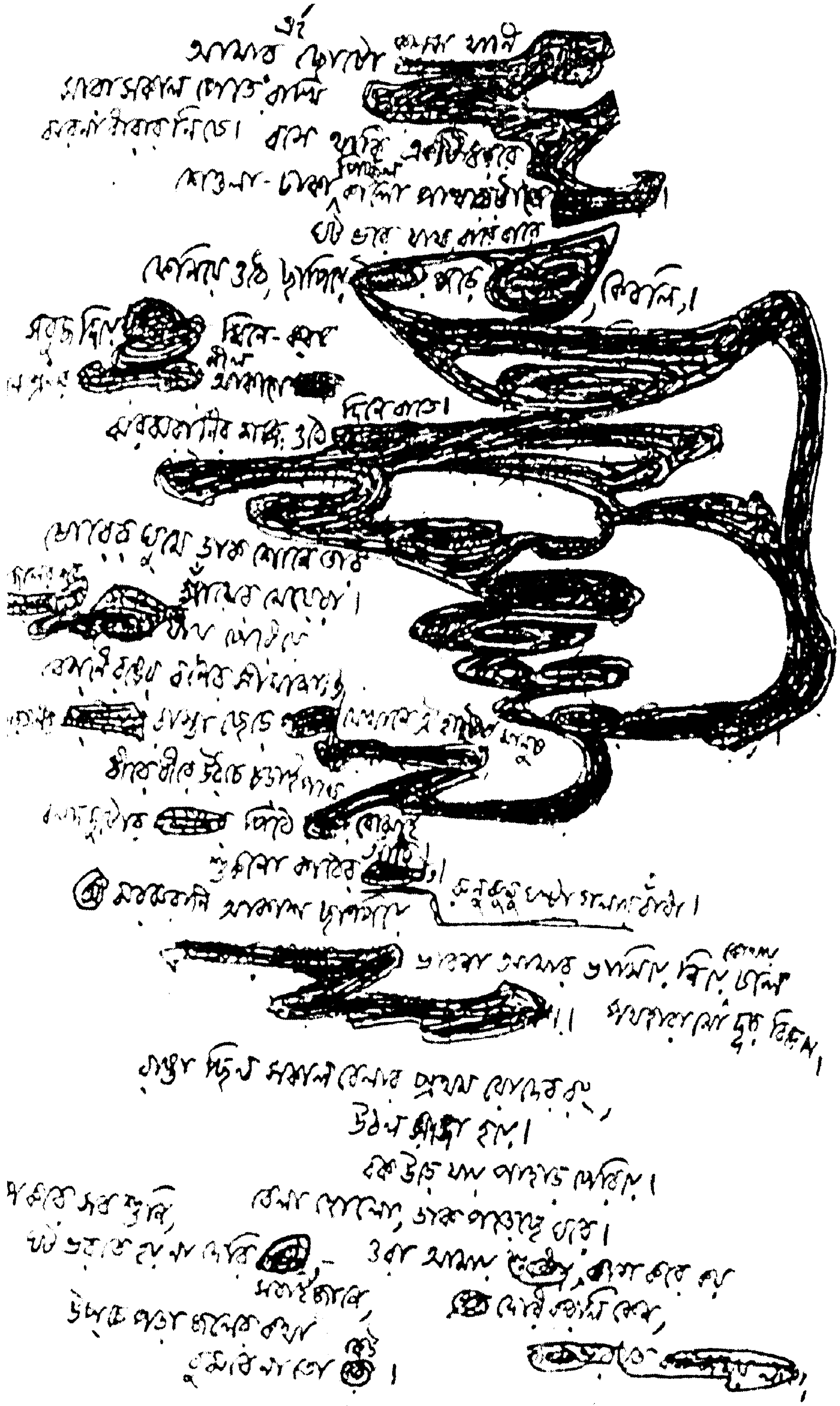

'ঘট ভরা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

ওরা আমায় রাগ ক'রে কয়
'দেরি করলি কেন ?'
চুপ করে সব শুনি ;
ঘট ভরতে হয় না দেরি সবাই জানে,
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো কেউ।

সাতাশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

প্রশ্ন

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা
দেহের দেহলীতে জাগায় দেহের অতীত কথা।
খাঁচার পাখি যে বাণী কয়
সে তো কেবল খাঁচারই নয়,
তারি মধ্যে করুণ ভাষায় সুদূর অগোচর
বিস্মরণের ছায়ায় আনে অরণ্যমর্মর।

চোখের দেখা নয় তো কেবল দেখারই জালবোনা,
কোন্ অলক্ষ্যে ছাড়িয়ে সে যায় সকল দেখাশোনা।
শীতের রৌদ্রে মাঠের শেষে
দেশ-হারানো কোন্ সে দেশে
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকে নিমেষ-হারা চোখে
দিগ্‌বলয়ের ইঙ্গিত-লীন উধাও কল্পলোকে।

ভালোমন্দ বিকীর্ণ এই দীর্ঘ পথের বুকে
রাত্র-দিনের যাত্রা চলে কত দুঃখে সুখে।
পথের লক্ষ্য পথ-চলাতেই
শেষ হবে কি ? আর কিছু নেই ?
দিগন্তে যার স্বর্ণ লিখন, সংগীতের আহ্বান,
নিরর্থকের গহ্বরে তার হঠাৎ অবসান ?

নানা ঋতুর ডাক পড়ে যেই মাটির গহন তলে
চৈত্রতাপে, মাঘের হিমে, শ্রাবণ-বৃষ্টিজলে,
স্বপ্ন দেখে বীজ সেখানে
অভাবিতের গভীর টানে,
অন্ধকারে এই যে ধেয়ান স্বপ্নে কি তার শেষ ?
উষার আলোয় ফুলের প্রকাশ, নাই কি সে উদ্দেশ ?

১৫ নভেম্বর ১৯৩৪

পঁয়ত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

আমি

এই যে সবার সামান্য পথ, পায়ে হাঁটার গলি
সে পথ দিয়ে আমি চলি
সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে,
রাতের আঁধার দিনের জ্যোতিতে।
প্রতি তুচ্ছ মুহূর্তেরই আবর্জনা করি আমি জড়ো,
কারো চেয়ে নইকো আমি বড়ো।
চলতে পথে কখনো বা বিঁধছে কাঁটা পায়ে,
লাগছে ধুলো গায়ে ;
দুর্বাসনার এলোমেলো হাওয়া,
তারি মধ্যে কতই চাওয়া পাওয়া,
কতই বা হারানো,
খেয়া ধরে ঘাটে আঘাটায়
নদী-পারানো।

এমনি করে দিন কেটেছে, হবে সে-দিন সারা
বেয়ে সর্বসাধারণের ধারা।
শুধাও যদি সবশেষে তার রইল কী ধন বাকি,
স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি তা কি।
জানি, এমন নাই কিছু যা পড়বে কারো চোখে,
স্মরণ-বিস্মরণের দোলায় দুলবে বিশ্বলোকে।
নয় সে মানিক, নয় সে সোনা—
যায় না তারে যাচাই করা, যায় না তারে গোনা।

এই দেখো-না শীতের রোদে দিনের স্বপ্নে বোনা
সেগুন-বনে সবুজ-মেশা সোনা,
শজনে গাছে লাগল ফুলের রেশ,
হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ।
বেগ্‌নি ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা স্তব্ধ বটের শাখা
ঘোর রহস্যে ঢাকা।
ফলসা গাছের ঝরা পাতা গাছের তলা জুড়ে
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে।
গোরুর গাড়ি মেঠো পথের তলে
উড়তি ধুলোয় দিকের আঁচল ধূসর ক'রে চলে।
নীরবতার বুকের মধ্যখানে
দূর অজানার বিধুর বাঁশি ভৈরবী সুর আনে।
কাজভোলা এই দিন
নীল আকাশে পাখির মতো নিঃসীমে হয় লীন।
এরই মধ্যে আছি আমি,
সব হতে এই দামি।

কেননা আজ বুকের কাছে যায় না জানা,
আরেকটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডানা
জগতে জগতে
অন্তবিহীন ইতিহাসের পথে।

ওই যে আমার কুয়োতলার কাছে
সামান্য ওই আমের গাছে
কখনো বা রৌদ্র খেলায়, কভু শ্রাবণধারা,
সারা বরষ থাকে আপনহারা
সাধারণ এই অরণ্যানীর সবুজ আবরণে,
মাঘের শেষে অকারণে
ক্ষণকালের গোপন মন্ত্রবলে
গভীর মাটির তলে
শিকড়ে তার শিহর লাগে—
শাখায় শাখায় হঠাৎ বাণী জাগে
'আছি, আছি, এই যে আমি আছি'।
পুষ্পোচ্ছ্বাসে ধায় সে বাণী স্বর্গলোকের কাছাকাছি
দিকে দিগন্তরে।
চন্দ্র সূর্য তারার আলো তারে বরণ করে।

এমনি করেই মাঝে মাঝে সোনার কাঠি আনে
—কভু প্রিয়ার মুগ্ধ চোখে, কভু কবির গানে—
অলস মনের শিয়রেতে কে সে অন্তর্যামী ;
নিবিড় সত্যে জেগে ওঠে সামান্য এই আমি।

যে আমিরে ধূসর ছায়ার প্রতিদিনের ভিড়ের মধ্যে দেখা
সেই আমিরে এক নিমেষের আলোয় দেখি একের মধ্যে একা।
সে-সব নিমেষ রয় কি না রয় কোনোখানে,
কেউ তাহাদের জানে বা না-ই জানে,
তবু তারা জীবনে মোর দেয় তো আনি
ক্ষণে ক্ষণে পরম বাণী
অনন্তকাল যাহা বাজে
বিশ্বচরাচরের মর্মমাঝে
'আছি আমি আছি'—
যে বাণীতে উঠে নাচি
মহাগগন-সভাঙ্গনে আলোক-অপ্সরী
তারার মাল্য পরি।

ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

আষাঢ়

নব বরষার দিন
বিশ্বলক্ষ্মী তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন।
রিক্ত তপ্ত দিবসের নীরস প্রহরে
ধরণীর দৈন্য-'পরে
ছিলে তপস্যায় রত
রুদ্রের চরণতলে নত—
উপবাসশীর্ণ তনু, পিঙ্গল জটিল কেশপাশ,
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরি দহনে
অহনে অহনে ;
শুষ্কেরে জ্বালায়ে তীব্র অগ্নিশিখারূপে
ভস্ম করি দিলে তারে তোমার পূজার পুণ্যধূপে।
কালোরে করিলে আলো ;
নিস্তেজেরে করিলে তেজালো ;
নির্মম ত্যাগের হোমানলে
সম্ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হয়ে গেল পলে পলে।
অবশেষে দেখা দিল রুদ্রের উদার প্রসন্নতা
বিপুল দাক্ষিণ্যে অবনতা
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর পানে।
নির্মল নবীন প্রাণে
অরণ্যানী
লভিল আপন বাণী।
দেবতার বর
মুহূর্তে আকাশ ঘিরি রচিল সজল মেঘস্তর।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
পেতে দিল আজি
শ্যাম আস্তরণ,
নেমে এল তার 'পরে সুন্দরের করুণ চরণ।
সফল তপস্যা তব
জীর্ণতারে সমর্পিল রূপ অভিনব ;
মলিন দৈন্যের লজ্জা ঘুচাইয়া
নব ধারাজলে তারে স্নাত করি দিলে মুছাইয়া
কলঙ্কের গ্লানি ;
দীপ্ততেজে নৈরাশ্যেরে হানি
উদ্‌বেল উৎসাহে
রিক্ত যত নদীপথ ভরি দিলে অমৃতপ্রবাহে।
জয় তব জয়
গুরুগুরু মেঘগর্জে ভরিয়া উঠিল বিশ্বময়।

সাঁইত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

যক্ষ

হে যক্ষ তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সংকীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেষ্টনে তুমি যবে
রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দু-জনের নির্জন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায়, শ্রাবণের মেঘজাল
কৃপণের মতো যথা শশাঙ্কের রচে অন্তরাল
আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারায়ে ফেলে তারে,
সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে
অন্ধ মোহাবেশে। বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে,
সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হল, বিরহের দুঃখতাপে
প্রেম হল পূর্ণ বিকশিত ; জানিল সে আপনারে
বিশ্বধরিত্রীর মাঝে। নির্বাধে তাহার চারি ধারে
সান্ধ্য অর্ঘ করে দান বৃষ্টিজলে সিক্ত বনযূথী
গন্ধের অঞ্জলি ; নীপনিকুঞ্জের জানাল আকূতি
রেণুভারে মন্থর পবন। উঠে গেল যবনিকা
আত্মবিস্মৃতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা
উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামন্ত্র বিশ্বপথিকের
মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্বধূ-প্রাঙ্গণ হতে নির্ভীকের
শূন্যপথে অভিসার। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের ; নিত্যরসে
আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব মূরতি
অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী। এক দিন ছিল সেই সতী
গৃহের সঙ্গিনী, তারে বসাইলে ছন্দশঙ্খ রবে
অলোক-আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে
অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে। প্রেম তব ছিল বাক্যহীন,
আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন
সংগীততরঙ্গে আন্দোলিত। তুমি আজ হলে কবি,
মুক্ত তব দৃষ্টিপথে উদ্‌বারিত নিখিলের ছবি
শ্যামমেঘে স্নিগ্ধচ্ছায়া। বক্ষ ছাড়ি মর্মে অধ্যাসীনা
প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা।
অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে।

দার্জিলিং
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

নাটক ও প্রহসন

শোধবোধ

শোধবোধ

প্রথম দৃশ্য

মিস্টার লাহিড়ির ড্রয়িংরুম

তাঁর কন্যা নলিনী ও নলিনীর বন্ধু চারুবালা

চারু। ভাই নেলি, তোর হয়েছে কী বল্ তো।

নলিনী। মরণদশা।

চারু। না, ঠাট্টা নয়। তোকে কেমন এক রকম দেখছি।

নলিনী। কী রকম বল্ তো।

চারু। তা বলতে পারব না। রাগ না অনুরাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই ; কেবল এইটুকু বুঝি, তোর ঈশেন কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

নলিনী। শিলাবৃষ্টি না জলবৃষ্টি, না ফাঁকা ঝড়, কী আন্দাজ করছিস বল্ তো।

চারু। তোমার আলিপুরের ওয়েদার রিপোর্ট, ভাই, আমার হাতে নেই। আজ পর্যন্ত তোমাকে বুঝতেই পারলুম না।

নলিনী। তবে বুঝিয়ে দিই কেন যে মন চঞ্চল হয়েছে। ধৈর্য আর রাখতে পারছি নে। ওরে পত্তুলাল, ডেকে দে তো লালবাজার থেকে কে চিঠি নিয়ে এসেছে।

চারু। মিস্টার নন্দীর চিঠি ? কী লিখেছে।

নলিনী।

গান

সে আমার গোপন কথা, শুনে যা ও সখী
ভেবে না পাই বলব কী।

চারু। হাঁ ভাই, বল্ ভাই বল্, কিন্তু সাদা কথায়।

নলিনী। অবস্থাগতিকে সাদা কথা যে রাঙা হয়ে ওঠে।

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হয়ে যায় মনে মনে যাহাই বকি।

চারু। তুই ভাই এই-সব সখীকে-ডাক-পাড়া সেকেলে ধরনের গান কোথা থেকে জোগাড় করিস্ বল্ তো।

নলিনী। খুব একেলে ধরনের কবির কাছ থেকেই।

চারু। মিস্টার লাহিড়ি রাগ করেন না ?

নলিনী। বাংলা সাহিত্যে কোন্‌টা একেলে কোন্‌টা সেকেলে, সে তাঁর খেয়ালই নেই। একটি গান সব চেয়ে তাঁর পছন্দ, সেইটে তাঁকে শুনিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বোঝেন যে, ইহকাল পরকাল কোনো কালই যদি আমার না থাকে, অন্তত মডার্ন্ কালটা আছে—

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

চারু। তোর মতো অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখি নি— সবই উলটো-পালটা। তুই যদি ভাটপাড়ার পণ্ডিতের ঘরে জন্মাতিস, তা হলে চটেমটে মেমসাহেব হয়ে উঠতিস। মিস্টার লাহিড়ির ঘরে জন্মেছিস বলেই বুড়ি ঠাকুরমার চাল প্র্যাকটিস চলছে। কোন্‌দিন এসে দেখব জ্যাকেট ছেড়ে নামাবলি ধরেছিস।

নলিনী। তাতে আগাগোড়া ছুবিয়ে রাখব— মিস্টার নন্দী বার-অ্যাট-ল—

চাপরাশির প্রবেশ

তোমারা সাব্‌কো বোলো, জবাব পিছে ভেজ দেউঙ্গী।—

[সেলাম করিয়া চাপরাশির প্রস্থান

দেখলি, একবার চাপরাশের ঘটা দেখলি ?— গিলটি তক্‌মার ঝল্‌মলানিতে চোখ ঝলসে গেল।

চারু। ভয় করিস্‌ নে নেলি। গিলটি সোনার চাপরাশ জোটে চাপরাশির ভাগ্যে, কিন্তু—

নলিনী। হাঁ গো, আর খাঁটি সোনার চাপরাশ পরবেন মিসেস নন্দী। তাঁর কী সৌভাগ্য !

চারু। দেখ নেলি, ন্যাকামি করিস্‌ নে। মিস্টার নন্দীর মতো পাত্র যেন অমনি—

মিসেস লাহিড়ির প্রবেশ

মিসেস লাহিড়ি। নেলি, ছি ছি, তুই এই কাপড় প'রে মিস্টার নন্দীর বেয়ারার—

নলিনী। কেন এ তো মন্দ কাপড় নয়।

মিসেস লাহিড়ি। কী মনে করবে বল্‌ তো। ওদের বাড়িতে সব—

নলিনী। বেহারা হয়ে জন্মেছে বলেই কি এত শাস্তি দিতে হবে। বেচারা মনিববাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছু দেখে বেঁচে গেল। এত খুশি হল যে বকশিশ চাইতে ভুলে গেল।

মিসেস লাহিড়ি। চিঠি দিতে এসে আবার বকশিশ চাইবে কী। তোর সব অদ্ভুত কথা।

নলিনী। এমন আশ্চর্য চিঠি, মা, তাতে এত—

মিসেস লাহিড়ি। এত কী।

নলিনী। সোনালি ক্রেস্ট আঁকা— আর তাতে লেখা আছে তিনি স্বয়ং এখানে আসবেন— আমাকে—

মিসেস লাহিড়ি। কী করতে।

নলিনী। বেশি আশা করে বোসো না, মা। প্রোপোজ করতে না, আমার জন্মদিনের জন্যে কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে। সেই বা কজনের ভাগ্যে—

মিসেস লাহিড়ি। যা, আর বকিস্‌ নে— শীঘ্র যা, ড্রেস করে নে— এখনি লোক আসতে আরম্ভ হবে। মিস্টার নন্দী তোর সেই ধূপছায়া রঙের শাড়িটা খুব অ্যাড্‌মায়ার করেন, সেটা—

নলিনী। সে হবে, মা, আমি এখনি যাচ্ছি।

মিসেস লাহিড়ি। যাই, হোটেল থেকে খানসামাগুলো এল কি না দেখিগে।

[প্রস্থান

নলিনী। দেখবি ? এই দেখ চিঠি। সশরীরে আসবেন তার অ্যানাউন্স্‌মেন্ট। সেকালে বিশু ডাকাত এইরকম খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত।

চারু। ডাকাতি ?

নলিনী। নয় তো কী। একজন সরলা অবলার হৃদয়ভাণ্ডার লুঠ ! তার সিঁধকাঠিটা দেখবি ? এই দেখ্‌।

চারু। ইস্‌। এ যে হীরে-দেওয়া ব্রেস্‌লেট ! যা বলিস, তোর কপাল ভালো। এ বুঝি তোর জন্মদিনের—

নলিনী। হাঁ হাঁ, জন্মদিনের উপহার— আমার জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনকেই ঘিরে ফেলবার সুদর্শন চক্র।

চারু। সুদর্শন চক্র বটে। যা বলিস, মিস্টার নন্দীর টেস্ট্‌ আছে।

নলিনী। ব্রেসলেটও তার প্রমাণ, আর ব্রেসলেট পরাবার জন্য যে মৃণালবাহু বেছে নিয়েছেন তাতেও প্রমাণ।

চারু। আজ যে বড়ো ঠাট্টার সুর ধরেছিস।

নলিনী। তা হলে গম্ভীর সুর ধরি।

গান

সে যেন আসবে আমার মন বলেছে।
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।
দেখ্ লো তাই দেয় ইশারা
তারায় তারা;
চাঁদ হেসে ওই হল সারা তাহাই লখি।
শুনে যা ও সখী।

চারু। আমি যদি পুরুষ হতুম নেলি, তা হলে তোর ঐ পায়ের কাছে প'ড়ে—

নলিনী। জুতোর লেস লাগাতিস বুঝি? আর ব্রেসলেট পরাত কে।

মিস্টার লাহিড়ির প্রবেশ

মিস্টার লাহিড়ি। আজ বরুণ নন্দীর আসবার কথা আছে না?

নলিনী। হাঁ, তাঁর চিঠি পেয়েছি।

মিস্টার লাহিড়ি। তা হলে এখনো যে ড্রেস কর নি?

নলিনী। কী ড্রেস পরব, তাই তো এতক্ষণ চারুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম।

মিস্টার লাহিড়ি। দেখো, ভুলো না, সার হার্‌কোর্ট তোমাকে কী চিঠি লিখেছেন, সেইটে বরুণ নন্দী দেখতে চেয়েছিল— সেটা—

নলিনী। হাঁ, সেটা আমি বের করে রাখব, আর জেনেরাল্ পর্কিন্সের ভাইঝি তার অটোগ্রাফওয়ালা যে ফোটো আমাকে দিয়েছিল, সেটাও—

মিস্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ সেটা, আর সেই যে—

নলিনী। বুঝেছি, গবর্মেন্ট্ হাউসে নেমন্তন্নে গিয়েছিলুম, তার নাচের প্রোগ্রামটা।

মিস্টার লাহিড়ি। আজ কোন্ গানটা গাবে বলো তো।

নলিনী। সেই যে ঐটে—

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

মিস্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ, ফর্স্ট্ ক্লাস। ওটা তোমার গলায় খুব মানায়, আর সেইটে— মনে আছে তো? In the gloaming, O my darling.

নলিনী। আছে।

মিস্টার লাহিড়ি। আর সব-শেষে গেয়ো Goodbye, sweetheart।

নলিনী। কিন্তু ওগুলো যে পুরুষের গান।

মিস্টার লাহিড়ি। (হাসিয়া) তাতে ক্ষতি কী, নেলি— আজকাল মেয়েরা তো—

নলিনী। ভুলতে আরম্ভ করেছে যে তারা মেয়ে। কিন্তু মুশকিল এই যে, তাতে পুরুষদের একটুও ভুল হচ্ছে না।

মিস্টার লাহিড়ি। Bravo, well said। যাও এবার ড্রেস করতে যাও। অমনি সেই তোমার অটোগ্রাফ বইটা, সেই যেটাতে—

নলিনী। বুঝিছি, যেটাতে লর্ড বেরেস্‌ফোর্ডের কার্ড্‌ আঁটা আছে। আচ্ছা, বাবা, সে হবে এখন। তুমি তৈরি হওগে, আমি এখনি যাচ্ছি।

[লাহিড়ির প্রস্থান

লাহিড়ি। (ফিরিয়া আসিয়া) দেখো, একটা জিনিস নোটিস করছি নেলি, সেটা তোমাকে বলা ভালো। তুমি অনেক সময়ে বরুণের সঙ্গে এমন টোনে কথা কও যে সে মনে করে, তুমি তাকে একটুও সীরিয়াস্‌লি নিচ্ছ না, তাই সে ভেবে পায় না যে তুমি—

নলিনী। বুঝেছি বাবা। সুবিধে পেলেই বুঝিয়ে দেব আমি খুব সীরিয়াস।

লাহিড়ি। আর-একটা কথা। আমি ঠিক বুঝতে পারি নে তুমি সতীশকে কেমন যেন একটুখানি ইন্‌ডাল্‌জেন্স্‌ দাও।

চারু। না মিস্টার লাহিড়ি, নেলি তো তাকে কথায় কথায় নাকের জলে চোখের জলে করে। পৃথিবীতে ওর কুকুর টম্‌কে ছাড়া নেলি আর যে কাউকে একটুও ইন্‌ডাল্‌জেন্স্‌ দেয়, এ তো আমি দেখি নি।

লাহিড়ি। কিন্তু সে আসতেও ছাড়ে না। সেদিন চা-পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে এসেছিল যে তার মচ্‌ মচ্‌ শব্দে দেয়ালের ইঁটগুলোকে পর্যন্ত চমকিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক-এক সময় ভারি অক্‌ওআর্ড্‌ হয়। তা ছাড়া ওর ট্রাউজারগুলো— থাক্‌গে, লোরেটোতে ছোটোবেলায় তোমার সঙ্গে ও একসঙ্গে পড়েছিল, ওকে আমি কিছু বলতে চাই নে, কিন্তু যেদিন বরুণরা আসবে, সেদিন বরঞ্চ ওকে—

নলিনী। ভয় কী বাবা, সেদিন বরঞ্চ সতীশকে ট্রাউজার না পরে ধুতি পরে আসতে বলব, আর দিল্লির জুতো— সে মচ্‌ মচ্‌ করবে না।

লাহিড়ি। ধুতি ? পার্টিতে ? আবার দিল্লির নাগরা ?

নলিনী। পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া ভালো।

চারু। ওর সঙ্গে কথায় পারবেন না। এ দিকে লোক আসবার সময় হয়ে আসছে। নেলি, তুই যা ভাই কাপড় পরে আয়, যদি কেউ লোক আসে, আমি তাদের সামলাব।

[নলিনীর প্রস্থান

লাহিড়ি। এই বুঝি ওর সব জন্মদিনের প্রেজেন্ট্‌ ? বরুণের ব্রেস্‌লেটটা কি এমনি টেবিলের উপরেই থাকবে ?

চারু। থাক্‌-না, আমি ওর উপর চোখ রাখব।

লাহিড়ি। এটা কার ? একটা মক্‌মলের মলাটের অ্যাল্‌বম। এ দেখছি সতীশের ! দাম লেখা আছে, মুছে ফেলতেও হুঁশ ছিল না। এক টাকা বারো আনা। ইন্‌সল্‌ভেন্সির মামলা আনতে হবে না। সেকেন্ড্‌হ্যান্ড সেলে কেনা। এটাও কি এখানে থাকবে নাকি।

চারু। সরাতে গেলে নেলি রক্ষা রাখবে না।

লাহিড়ি। থাক্‌ তবে, তুমি এখানে একটু বোসো, আমি ড্রেস করে আসি।

[প্রস্থান

সতীশের প্রবেশ

চারু। এত সকাল-সকাল যে ?

সতীশ। (লজ্জিত হইয়া) দেখছি আমার ঘড়িটা ঠিক চলছিল না। যাই, বরঞ্চ আমি একটু ঘুরে আসিগে।

চারু। না, আপনি বসুন, সময় হয়ে এসেছে। নেলির প্রেজেন্ট্‌গুলো দেখুন-না। এই দেখেছেন ?

সতীশ। এ যে হীরের ব্রেস্‌লেট ! এ কে দিয়েছে।

চারু। মিস্টার নন্দী। চমৎকার না ?

সতীশ। তাই তো। বেশ।

চারু। এই মুক্তো-দেওয়া হেয়ার্‌পিনটা আমার ভাই অমূল্যর দেওয়া। আর এই রুপোর দোয়াতদান— ও কী সতীশবাবু, যাচ্ছেন নাকি ?

সতীশ। ভাবছি এইবেলা আমার কাজ সেরে আসি।

চারু। আপনার অ্যাল্‌বমটি নেলির কাজে লাগবে। এই দেখুন-না মিস্টার নন্দী ওকে তাঁর সই-করা ফোটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সতীশ। হাঁ, তাই তো দেখছি। আমার কিন্তু বিশেষ কাজ আছে, আমি যাই। আর দেখুন, এখনকার মতো এই অ্যাল্‌বমটা আমি নিয়ে যাচ্ছি— তার পরে—

চারু। কী করবেন।

সতীশ। না, ওটা— একবার— একটুখানি ঐ— আপনি দয়া করে নেলিকে বলবেন যে, বিশেষ একটু কারণে এখনকার মতো— তার পরে আবার— এখন যাই— কাজ আছে।

[প্রস্থান

চারু। যাক, বিদায় করে দেওয়া গেল। মা গো, কী টাই প'রেই এসেছে। অ্যাল্‌বমটাও গেল। এই-যে মিস্টার লাহিড়ি, শুনে যান, সুখবর আছে, বকশিশ চাই।

নেপথ্যে। একটু পরেই যাচ্ছি, আমার বাট্‌ন্‌হুক্‌টা খুঁজে পাচ্ছি নে।

সতীশকে লইয়া নলিনীর প্রবেশ

চারু। ও কী, নেলি, তোর ভালো করে তো সাজা হল না।

নলিনী। হঠাৎ কোতোয়ালি করতে হল। ড্রেসিংরুমের জানলা দিয়ে দেখি, চোর পালাচ্ছে একটা মাল বগলে নিয়ে, তখনই নেমে গিয়ে বমালসুদ্ধ গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছি।

চারু। বাস্‌ রে, কী কড়া পাহারা। মালটা কি খুবই দামি, আর চোরটাও কি খুবই দাগি।

নলিনী। (সতীশকে) তুমি এসেই তখনই পালাচ্ছিলে যে— আর আমার একখানা অ্যাল্‌বম নিয়ে?

সতীশ নিরুত্তর

চারু। ওঃ বুঝেছি, প্রাইভেট কামরায় বিচার হবে। নেলি, আমি তা হলে তৈরি হয়ে আসিগে। তোর নাবার ঘরে টয়লেট ভিনিগার আছে তো?

নলিনী। আছে।— [চারুর প্রস্থান

তোমার এ কী রকম দুর্‌বুদ্ধি। আমার অ্যাল্‌বম নিয়ে—

সতীশ। লক্ষ্মীছাড়ার দান লক্ষ্মীকে পৌঁছয় না। যেটা যার যোগ্য নয়, সে জিনিসটা তার নয়, আমি এই বুঝি।

নলিনী। আর বগলে করে যে নিয়ে যায় সেটা যে তারই, এই-বা কোন্‌ শাস্ত্রে লেখে?

সতীশ। তবে সত্যি কথাটা বলি। আমি যে ভীরু, বেশ জোরের সঙ্গে কিছুই দিতে পারি নে। সেইজন্যে দিয়ে লজ্জা পাই।

নলিনী। তোমার এই অ্যাল্‌বমের মধ্যে কম জোরের লক্ষণটা কী দেখলে। এ তো টক্‌টকে লাল।

সতীশ। লজ্জায় লাল। কতবার মনে হয়েছিল, এই অ্যাল্‌বমের মধ্যে নিজের একখানা ছবি পুরে দিই, 'আমাকে মনে রেখো' এই করুণ দাবিটুকু বোঝাবার জন্যে। কিন্তু ভয় হল তুমি মনে করবে ওটা আমার স্পর্ধা; খালি রেখে দিলুম, তুমি নিজে ইচ্ছে করে যার ছবি রাখবে ওর মধ্যে তারই স্থান থাক্‌।

নলিনী। খুব ভালো বলছ, সতীশ, ইচ্ছে করছে বইয়ে লিখে রাখি।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না।

নলিনী। আমার আর-একজনের কথা মনে পড়ছে। সে দিয়েছিল একখানা খাতা— তোমার অ্যাল্‌বমের মধ্যে যে-কথাটা না-লেখা অক্ষরে আছে, সেইটে সে গানে লিখে দিয়েছিল— শুধু তাই নয়, পাছে চোখে না পড়ে, তাই নিজে এসে গেয়ে শুনিয়েছিল—

পাতাখানি শূন্য রাখিলাম,
নিজের হাতে লিখে রেখো শুধু আমার নাম।

সতীশ। কে, লোকটা কে।

নলিনী। তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাবে নাকি। আমাদের কবি গো— কিন্তু কবিত্বে তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গেছ— তোমার এ যে আন্‌হার্ড মেলডি। আমি শুনতে পাচ্ছি—

এই অ্যাল্‌বম শূন্য রইল সবি,
নিজের হাতে ভরে রেখো শুধু আমার ছবি।—

কিন্তু তোমার সব কথা বলা হয় নি।

সতীশ। না, হয় নি। বলি তা হলে। এসে দেখলুম— সবাই আমার মতো ভীরু নয়। যার জোর আছে, সে নিজের ছবিতে নিজের নাম লিখে পাঠাতে সংকোচ করে না। মনে বুঝলুম, আমি দিয়েছি শূন্য পাতা, আর তারাই দিলে পূর্ণ করবার জিনিস।

নলিনী। তোমাকে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি ভুল করেছে সে। ছবি দিতে সবাই পারে, ছবি রাখবার জায়গা দিতে কজন পারে। ভীরু, তোমার অদৃশ্য ছবিরই জিত থাক্। (নন্দীর ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিল) ও কী, অমন করে লাফিয়ে উঠলে কেন। মৃগীরোগে ধরল নাকি।

সতীশ। কোন্ রোগে ধরেছে তা অন্তর্যামী জানেন। নেলি, একবার তুমি আমাকে স্পষ্ট করে—

নলিনী। এই বুঝি নাটক শুরু হল ? চোখের সামনে দেখলে তো যে-ছবি চেঁচিয়ে কথা কয়, তার কী দশা। যে মানুষ চুপ করে থাকতে জানে না, তারও—

সতীশ। আর কাজ নেই, নেলি, থাক্। তোমাকে কত ভয় করি, তুমি জানো না।

নলিনী। ভয় যদি কর তা হলে অ্যাল্‌বম চুরি কোরো না। আমি কাপড় ছেড়ে আসিগে।

সতীশ। একটি অনুরোধ। আন্‌হার্ড মেলডি আমার মুখে খুবই মিষ্টি, কিন্তু তোমার মুখে নয়। তোমার জন্মদিনে তোমার মুখে একটি গান শুনে যাব।

নলিনী। আচ্ছা।

গান

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা,
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র, তারে বুকে ক'রে
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে—
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে,
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস,
নবীন উষার পুষ্পসুবাস—
এরই 'পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

চারুর প্রবেশ

চারু। এ কী করেছিস, নেলি। মিস্টার নন্দীর ফোটো—

নলিনী। যে-মাটির গর্ভে হীরে থাকে, যে-মাটির বুকে ভুঁইচাঁপা ফুল ফোটে, সেই মাটির হাতে ওকে সমর্পণ করে দিয়েছি। এর চেয়ে আর কত সম্মান হবে?

চারু। ছি ছি, নেলি, মিস্টার নন্দী জানতে পারলে কী মনে করবেন। এ যে একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছিস।

নলিনী। ইচ্ছে করিস তো তোর ঘরের আটা দিয়ে তুই জোড়া দিয়ে নিতে পারিস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধুমুখী ও সতীশ

সতীশ। মা, কোনোমতে টাকাটা পেয়েছি, নেক্‌লেসও নেলির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেকালের আমলের সোনার গুড়গুড়িটা সিঁদুরেপটির মতি পালদের ওখানে যে বাঁধা রেখে এলুম, নিশ্চিন্তি হতে পারছি নে।

বিধুমুখী। তোর কোনো ভয় নেই, সতীশ। তিনি এ-সব জিনিসের 'পরে কোনো মমতাই রাখেন না। কেবল ওঁর ঠাকুরদাদার জিনিস বলেই আজ পর্যন্ত লোহার সিন্দুকে ছিল। একদিনের জন্যে খবরও রাখেন নি। সেটা আছে কি গেছে, সে তাঁর মনেও নেই।

সতীশ। সে আমি জানি। কিন্তু ভারি ভয় হচ্ছে, যারা বন্ধক রেখেছে তারা হয়তো বাবাকে চিঠি লিখে খোঁজ করবে। তুমি কোনোমতে তোমার গহনাপত্র দিয়ে সেটা খালাস করে দাও।

বিধুমুখী। হায় রে কপাল, গহনাপত্র কিছু কি বাকি আছে। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে। যাই হোক, আমি ভয় করি নে— প্রজাপতির আশীর্বাদে নলিনীর সঙ্গে আগে তোর কোনোমতে বিয়ে হয়ে যাক, তার পরে তোর বাবা যা বলেন, যা করেন, সব সহ্য হবে। কথাবার্তা কিছু এগিয়েছে?

সতীশ। সর্বদা যে-রকম লোক ঘিরে থাকে, কথা কব কখন্। জান তো সেই নন্দী— সে যেন বিলিতি কাঁটাগাছের বেড়া। তার বুলিগুলো সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। সেই দৈত্যটার হাত থেকে রাজকন্যার উদ্ধার করি কী উপায়ে।

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, মেয়ের মন বুঝতে পারি— মনে মনে সে তোকে ভালোবাসে।

সতীশ। সে আমি জানি নে। কিন্তু বরুণ নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাবা একটু দয়া করলেই কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু—

বিধুমুখী। তোর কী চাই বল্‌-না।

সতীশ। ভালো বিলিতি সুট। চাঁদনির কাপড় পরলেই ভরসা কমে যায়; নন্দীর মতো করে সজোরে নলিনীর সঙ্গে কথাই কইতে পারি নে। বাড়িসুদ্ধ সব্বাই আমার দিকে এমন করে তাকায় যেন আমার গায়ে কাপড়ই নেই, আছে নর্দমার পাঁক।

বিধুমুখী। আমি তোর কাপড়ের দুর্দশা তোর মাসিকে আভাসে জানিয়ে রেখেছি। আজ এখনই তাঁর আসবার কথা। আজই হয়তো একটা কিনারা হয়ে যাবে।

সতীশ। ঐ যে মেসোমশায়কে নিয়েই তিনি আসছেন মা, যেমন করে পার আজই যেন— কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি— বাবা যদি জানতে পারেন, মেরে ফেলবেন।

বিধুমুখী। আমি বলি কী— কোনো ছুতোয় সেই নেক্‌লেসটা যদি নলিনীর কাছ থেকে—

সতীশ। সে কথাও ভেবেছি। তা হলেই আমার লজ্জা পুরো হয়। এক-একবার মনে করি, সংসারে যত মুশকিল সব আমারই? বরুণ নন্দীর বাপ কি কোনোকালে ছিল না। যে-রকম দেখছি, একটা কোনো গল্প বলে নেক্‌লেসটা ফিরিয়ে আনতে হবে, তার পরে আমার নিজের গলায় পরবার জন্যে গয়না মিলবে।

বিধুমুখী। সে আবার কী।

সতীশ। একগাছা দড়ি।

বিধুমুখী। দেখ্‌, আমাকে আর রোজ রোজ কাঁদাস্‌ নে। আমার রক্ত শুকিয়ে গেল, চোখের জলও বাকি নেই। এক দিকে তোর বাবা, আর-এক দিকে তুই— উপরে সরার চাপ আর নীচে আগুন, আমি যে গুমে গুমে—

সতীশের মাসি সুকুমারী ও মেসোমশায় শশধরবাবুর প্রবেশ

এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্‌ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল। দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কী কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাক ডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম ধুতি পরে কলেজে যাস নাকি। বিধু, ওকে যে লাউঞ্জ সুটটা কিনে দিয়েছিলেম, সে কী হল।

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে।

সুকুমারী। তা তো ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতদিন টেকে। তা, তাই বলে কি আর নূতন সুট তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাসৃষ্টি।

বিধুমুখী। জানই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুনসি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন— মা গো, এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারও দেখি নি।

সুকুমারী। মিছে না। এক বৈ ছেলে নয়, একটু সাজাতে-গোজাতেও ইচ্ছা করে না? এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, আমি তোর জন্য একসুট কাপড় র‍্যাম্‌জের ওখানে অর্ডার দিয়ে রেখেছি। আহা ছেলেমানুষের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক সুটে আমার কী হবে, মাসিমা। লাহিড়ি-সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে— সে আমাকে তাদের বাড়িতে টেনিস খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে, আমি নানা ছুতো করে কাটিয়ে দিই। আমার যে কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত, তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা চোখ বুজে কল্পনা করাই ভালো।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কর্তাবাবু লোহার সিন্দুকের চাবি চেয়েছেন।

সতীশ। (কানে কানে) সর্বনাশ মা, সর্বনাশ। নিশ্চয় গুড়গুড়ির খোঁজ পড়েছে।

বিধুমুখী। একটু চুপ কর্ তুই। কেন রে, চাবি কেন।
ভৃত্য। কাল কোথায় যাবেন, চেক-বইটা চান।
বিধুমুখী। আচ্ছা, একটু সবুর করতে বল্, চাবি নিয়ে এখনই যাচ্ছি।

[ভৃত্যের প্রস্থান

সতীশ। মা, লোহার সিন্দুক খুললেই তো—
বিধুমুখী। একটু থাম্। আমাকে একটু ভাবতে দে।
সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালাল কেন, বিধু।
বিধুমুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।
সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্।

সতীশের প্রবেশ

—তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্‌ক্রিম খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা। ওগো যাও-না— ছেলেমানুষকে একটু—
সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।
বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।
সতীশ। চাপকান তো পেলেটির খানসামাদেরও আছে। বেমালুম দলে মিশে যাব।
সুকুমারী। আর যাই হোক বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি, তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিংবা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।
শশধর। এ কথাগুলো—
সুকুমারী। চুপি চুপি বলতে হবে ? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মথ নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না ?
শশধর। সর্বনাশ ! কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত আলোচনা—
সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও।
সতীশ। (জনান্তিকে) মা, লোহার সিন্দুকের চাবি বাবাকে কিছুতেই দিয়ো না— বরঞ্চ আমার সেই ঘড়ির কথাটা তুলে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ভুলিয়ে রেখো।
সুকুমারী। এই-যে মন্মথ আসছেন। এখনই সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে অস্থির করে তুলবেন। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়— আমরা পালাই।

[প্রস্থান

মন্মথের প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কদিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিয়েছেন। আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।
মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব।— শোনো, লোহার সিন্দুকের চাবিটা—
বিধুমুখী। তুমি একলা বসে বসে রাগ করো। আমি চললুম, আমি আর সইতে পারছি নে।

[প্রস্থান

মন্মথ। শশধর, সে-ঘড়িটা তোমায় ফিরে নিয়ে যেতে হবে।
শশধর। তুমি যে লোহার সিন্দুক খুলতে যাচ্ছিলে, যাও-না।
মন্মথ। সে পরে হবে, কিন্তু ঘড়িটা এখনই তুমি নিয়ে যাও।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। ঘড়ি তো নিয়ে গেলুম ; তার পর থেকে আমার সময়টা কাটবে কী রকম ? ঘরের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে গিয়ে আমাকে যে ঘরছাড়া হতে হবে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়। সংসারের এই নিয়ম।

মন্মথ। নিজের সম্বন্ধে হলে নিঃশব্দে সহ্য করতেম। ছেলেকে মাটি করতে পারি না।

শশধর। সে তো ভালো কথা। কিন্তু স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে খাড়া উলটোমুখে চলতে গেলে বিপদে পড়বে। তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘুরে গেলে ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উলটো বয়, জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীরু!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যাঁর ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করতে হয়, তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাট্য বলে কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সৎপরামর্শ— গোঁয়ার্তমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে। আমি চললেম, যা ভালো বোঝ করো।

[শশধরের প্রস্থান

বিধুমুখীর প্রবেশ

মন্মথ। তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।

বিধুমুখী। পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।

মন্মথ। (হাসিয়া) সকলের মতেই যদি চলবে, তবে সকলকে ছেড়ে একটিমাত্র আমাকেই বিয়ে করলে কেন।

বিধুমুখী। তুমি যদি একমাত্র নিজের মতেই চলবে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিয়ে করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধুমুখী। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে— কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আবার সংসারমরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধুমুখী। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

মন্মথ। লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাই, তোমরা এখানে ভালো হয়ে বসেই কথা কও-না। দাঁড়িয়ে কেন। আমি পাশের ঘরে আছি বলে বুঝি আলাপ জমছে না ? ভয় নেই ভাই, আমি নীচের ঘরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

সতীশের প্রবেশ ও বাপকে দেখিয়াই পলায়ন

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলেটিকে কী মাখিয়েছ।

বিধুমুখী। মূর্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স্ মাত্র। তাও বিলাতি নয়— তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বার বার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধুমুখী। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল থেকে মাথায় কেরোসিন মাখাব, আর গায়ে কাস্টর-অয়েল।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। কেরোসিন কাস্টর-অয়েল গায়-মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধুমুখী। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ-বয়সে হয়তো সহ্য হবে না। যাই হোক, এ কথা আমি তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে, তাতে তার শখের খরচ চলবে না।

বিধুমুখী। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কপনি পরানো অভ্যাস করাতেম।

মন্মথ। আমিও তা জানি। তোমার ভগিনীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে-পড়ে দিয়ে যাবে। সেইজন্যই যখন-তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও! আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি; কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।

বিধুমুখী। ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি, সে তো পূর্বে বুঝতে পারি নি।

বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাবলুম এতক্ষণে কথা ফুরিয়ে গেছে, এইবার ঘরে এসে পানগুলো সেজে রাখি। কিন্তু এখনো ফুরোল না। মেজোবউ, তোদের ধন্য। আজ সে তোর ন-বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে, তবু তোদের কথা যে আর ফুরোল না! রাত্রে কুলোয় না, শেষকালে দিনেও দুই জনে মিলে ফিস্ ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিনরাত্রি জোগান কোথা থেকে, আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না।

বিধুমুখী। না দিদি, আমাদের মধুরালাপ লোকালয় থেকে অনেক দূরে গিয়েই করতে হবে, নইলে সবাই দৃষ্টি দেবে। ওগো, এসো— ছাতে এসো, গোটাকতক কথা বলে রাখি। তুমি আবার নাকি হঠাৎ কাল লঙ্কাদ্বীপে যাচ্ছ— এখানকার হাওয়া তোমার সহ্য হচ্ছে না? [উভয়ের প্রস্থান

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কী বাপ!

সতীশ। বাবা কাল ভোরে জাহাজে করে কলম্বো যাবেন, তাই কালই লাহিড়িসাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াতে ডেকেছেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কী, সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ-কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয় আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার ঐ সামনের ঘরটাতেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব। এ-বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক— চা খাবার ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্দুক-ফিন্দুক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমার ও-ঘরেও তো জিনিসপত্র—

সতীশ। ওগুলো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার ঐ বঁটি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন লাহিড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। বঁটি-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে ভাইবোনে মিলে গল্প করতে তো শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে, জেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি-গায়ে ফস করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম. কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি-গায়ে—

সতীশ। তিনি তো কাল কলম্বোয় যাবেন।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

[জেঠাইমার প্রস্থান

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। পারলুম না।— জানো তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মর্নিং সুট তো মাসি অর্ডার দিয়েছেন, আর একটা লাউঞ্জ সুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধুমুখী। বলো কী, সতীশ। এ তো আড়াইশো টাকার ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তো খরচ করতে হবে। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে বনের বাঁদররা ড্রেস কোট পরে না।— কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি! একটা প্ল্যান ভেবেছি, তুমি বাবাকে বলো যে কাল রাত্রে তোমার লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

বিধুমুখী। দেখ্ সতীশ, এদিকে তোর বাবার বিষয়বুদ্ধি একটুও নেই— কিন্তু ওঁকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ধরা পড়ে যাবি।

সতীশ। ধরা তো এক সময়ে পড়বই। আপাতত কোনোরকম ক'রে— তা ছাড়া কাল তো উনি কলম্বোয় যাচ্ছেন, ইতিমধ্যে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। যথেষ্ট সময় পেলে নেক্‌লেসটা চাই কি ফিরিয়েও নিতে পারি। অনেক ভেবে দেখলুম শেষকালে— ঐ যে বাবা আসছেন। মা, এখনই, আর দেরি কোরো না।

[সতীশের প্রস্থান

শশধর ও মন্মথের প্রবেশ

বিধুমুখী। ওগো শুনছ, সর্বনাশ হয়েছে। কাল রাত্রে লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

শশধর। সে কী কথা, বউ। কোথায় চাবি রেখেছিলে, কে করলে এমন কাজ।

বিধুমুখী। তাই তো ভাবছি, হয়তো নতুন বেহারাটা—

শশধর। মন্মথ, তুমি যে একেবারে অবিচলিত? একবার খোঁজ করে দেখো।

মন্মথ। কোনো লাভ নেই।

শশধর। কী গেল না-গেল, সেটা তো একবার দেখাও চাই।

মন্মথ। কিছু নিশ্চয় গেছে, শুধু চাবি নিয়ে ঝম্‌ঝমিয়ে বেড়াবে, চোরের এমন শখ প্রায় থাকে না।

শশধর। কিন্তু কে চোর, সেটাও তো বের করা চাই।

মন্মথ। সাধুর চেয়ে যার দরকার অনেক বেশি, সেই হয় চোর।

শশধর। আমি কি তোমার কাছে চোরের ডেফিনিশন চাচ্ছি। বলছি— সন্ধান করা চাই তো ?

মন্মথ। (উত্তেজনার সহিত) না, চাই নে, চাই নে। ভিতরে যে আছে তাকে বাইরে সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শশধর। কী বলছ, মন্মথ। চলো-না একবার দেখেই আসা যাক।

মন্মথ। নিষ্ফল, নিষ্ফল, আমার দেখাশোনা হয়ে গেছে।

শশধর। অন্তত কালকে কলম্বো যাওয়াটা স্থগিত রাখো, একটা পুলিস-তদন্ত করাও।

মন্মথ। কলম্বোর চেয়ে আরো অনেক দূরে যাওয়া দরকার— সাউথ পোলে যেখানে থাকে পেঙ্গুয়িন পাখি, যেখানে থাকে সিন্ধুঘোটক— সেখানে চাবিও চুরি যায় না আর পুলিস-তদন্তর ঠাট বসাতে হয় না।

শশধর। বউ, তুমি যে একেবারে চুপ, মুখ হয়ে গেছে সাদা। চলো, বরঞ্চ তোমাতে আমাতে একবার—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেববাড়ি থেকে এই কাপড় এসেছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড় নিয়ে যা, এখনই নিয়ে যা।

[ভৃত্যের প্রস্থান

শশধর। আহা, আহা, করছ কী মন্মথ। কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে তুমি আমাকেই—

মন্মথ। ঐ কাপড়গুলোতেই আছে চাবি-চুরির ব্যাকটিরিয়া— টাকা-চুরির বীজ— এই আমি তোমাকে বলে গেলুম।

[মন্মথের প্রস্থান। বিধুমুখীর মেজের উপর উপুড় হইয়া কান্না

শশধর। বউ, ছি ছি, এমন করে কাঁদতে নেই। ওঠো ওঠো।

বিধুমুখী। রায়মশায়, আমার বেঁচে সুখ নেই।

শশধর। কিছুই বুঝতে পারছি নে। মন্মথ কাকে সন্দেহ করছে ? সতীশকে নাকি ?

বিধুমুখী। নিজের ছেলেকে যদি সন্দেহ না করবে, তবে বাপ কিসের। যদি মা হত, ছেলেকে গর্ভে ধারণ করত, তা হলে বুঝত ছেলে বলতে কী বুঝায়। গেছে তো গেছে, না হয় সোনার গুড়গুড়িটাই গেছে, আমার সতীশ কি ওঁর সোনার গুড়গুড়ির চেয়ে কম দামের।

শশধর। সোনার গুড়গুড়ির কথা কী বলছ। সিন্দুক থেকে কী গেছে, দেখেছ নাকি।

বিধুমুখী। হাঁ, তা— না দেখি নি। আমি বলছি ওঁর সিন্দুকে সেই গুড়গুড়ি ছাড়া আর তো দামি জিনিস নেই— তা সেটা যদি চুরি হয়েই থাকে, তাই বলেই কি ছেলেকে সন্দেহ।

শশধর। তোমার সন্দেহটা কাকে, বউ।

বিধুমুখী। কেন। ওঁর তো সেই বড়ো ভালোবাসার উড়ে বেয়ারা আছে— বনমালী। তার হাতেই তো ওঁর সব। সে হল ভারি সাধু, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। একটু ইশারাতেও বলো দেখি পুলিস দিয়ে তার বাক্স তল্লাস করতে, হাঁ-হাঁ করে মারতে আসবেন— সে তো ওঁর ছেলে নয়, ওঁর বেয়ারা, তাই তার 'পরে এত ভালোবাসা।

শশধর। কিছু মনে কোরো না বউ, আমি যাচ্ছি, ওকে বুঝিয়ে বলছি।

[প্রস্থান

সতীশের দ্রুত প্রবেশ

সতীশ। মা, ভয়ানক বিপদ্‌।

বিধুমুখী। আবার কী হল। বুকের ধড়্‌ধড়ানি এক মুহূর্ত থামতে দিল না।

সতীশ। সেই যে মতি পাল, যার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে বাবার কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছে দেখলুম— এতক্ষণে বোধ হয়—

বিধুমুখী। সর্বনাশ! যা, তুই রায়মশায়কে শিগগির আমার কাছে পাঠিয়ে দে, এখনো তিনি যান নি।

[সতীশের প্রস্থান

মন্মথের প্রবেশ

মন্মথ। এই দেখো চিঠি। পড়ে দেখো।

বিধুমুখী। না, আমি পড়তে চাই নে।

মন্মথ। পড়তেই হবে।

বিধুমুখী। (চিঠি পড়িয়া) তা কী হয়েছে।

মন্মথ। বেশি কিছু না, চুরি হয়েছে, আমার গুড়গুড়ি চুরি।

বিধুমুখী। নিজের ছেলে নিয়েছে, তাকে বল চুরি? বলতে তোমার জিব টাক্‌রায় আটকে গেল না?

মন্মথ। যে কথা বলতে জিব আটকে যাওয়া উচিত ছিল, সে কথা তুমিই বলেছ।

বিধুমুখী। কী বলেছি।

মন্মথ। সেই চাবি-চুরির মিথ্যে গল্প।

বিধুমুখী। বেশ করেছি। নিজের ছেলের জন্যে বলেছি— তার বাপের হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বলেছি।

মন্মথ। প্রাণ বাঁচালেই কি বাঁচানো হল।

বিধুমুখী। অনেক হয়েছে; আর ধর্ম-উপদেশ শুনতে চাই নে। এখন ছেলের উপর কোন্‌ জল্লাদি করতে চাও, খোলসা করে বলো।

মন্মথ। পুলিসে খবর দেব।

বিধুমুখী। দাও-না। চাবি আমার হাতে ছিল, আমিই তো চুরি করে ওকে দিয়েছি। যাক আমাকে নিয়ে জেলে, সেখানে আমি সুখে থাকব। অনেক সুখে, এর চেয়ে অনেক সুখে; মনে হবে স্বর্গে গেছি।

মন্মথ। দরকার নেই; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেকদিন আগেই যার যাওয়া উচিত ছিল, সে-ই একলা যাবে।

[প্রস্থান

শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ-বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। ওর আবার বুকের ব্যামো, ভয় হয় পাছে আমাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওর বিপদ ঘটে। যা হোক, আজ এ ব্যাপারটা কী হল। তুমি বললে চাবি-চুরি, যে-রকমটা দেখা যাচ্ছে তাতে কথাটা—

বিধুমুখী। সবই তো শুনেছ। বলতে গেলে সতীশেরই জিনিস, ওরই আপন প্রপিতামহের। আজ বাদে কাল ওরই হাতে আসত, সেইটে নিয়েছে বলেই—

শশধর। তা যা বল বউ, কাজটা ভালো হয় নি, ওটা চুরিই বটে।

বিধুমুখী। তাই যদি হয়, তবে প্রপিতামহের দান সতীশকে নিতে না দিয়ে উনি সেটা তালাবন্ধ করে রেখেছেন, সেও কি চুরি নয়। এ-গুড়গুড়ি কি ওঁর আপন উপার্জনের টাকায়।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না, এখন কী মুশকিলে পড়েছ দেখো দেখি।

সতীশ। মুশকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি? ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত।

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস্ নে।

শশধর। ছি ছি. সতীশ। এমন কথা যদি-বা কখনো মনেও আসে, তবু কি মা'র সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, তোমাকেও বলে রাখি, আমি যেমন করে পারি সেই নেক্‌লেসটা ফিরিয়ে এনে বাবার গুড়গুড়ি উদ্ধার করে তাঁর হাতে দিয়ে তবে এ বাড়ি থেকে ছুটি নেব। বাবার সম্পত্তি যে আমার নয়, এ কথাটা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি। আর যাই হোক, আমার প্রাণটা তো আমার, এটা তো বাবার লোহার সিন্দুকে বাঁধা পড়ে নি, এটা তো রাখতেও পারি ফেলতেও পারি।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধুমুখী। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্ দিন কী করে বসে। আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে, শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। কী সর্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল্, এমন-সব কথা মনেও আনবি নে। চুপ করে রইলি যে? লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কত বড়ো পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশাই, সে-ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে এক্‌জামিনে ফেল করেছি, তার উপর দেনা; এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায়, তবে বাবা আমার সে-অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধুমুখী। সত্যি দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমিই না হয় ওকে মানুষ করি? কী বলো গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই, এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কী বলেন; বাচ্ছাই বা কী বলে।

সুকুমারী। যা বলে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

বিধুমুখী। দিদি!

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে কাঁদতে হবে না। চল্‌ তোর চুল বেঁধে দিইগে। এমন ছিরি করে তোর ভগ্নীপতির সামনে বার হতে লজ্জা করে না?

[শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মন্মথের প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মথ। তা জানি নে, কিন্তু যার যেটা প্রাপ্য, সে তাকে পেতেই হবে।

শশধর। প্রাপ্যের চেয়েও বড়ো জিনিস আছে, তার 'পরেও মানুষের দাবি থাকা অন্যায় নয়।

মন্মথ। মিথ্যে আমাকে বলছ। হয়তো সব দোষ আমারই, একলা আমারই! তার শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েছি। এখন তোমরাই যদি সংশোধনের ভার নাও তো নাও, আমি নিষ্কৃতি নিলুম।

[উভয়ের প্রস্থান

সতীশের বেগে প্রবেশ

সতীশ। (উচ্চস্বরে) মা, মা!

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। কী সতীশ, কী হয়েছে।

সতীশ। ঠিক করেছি, যেমন করে হোক নেক্‌লেসটা নেলির কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবই।

বিধুমুখী। কী ছুতো করবি।

সতীশ। কোনো ছুতোই না। সত্যি কথা বলব। নেলির কাছে আমি কিছু লুকোব না।

বিধুমুখী। না না, সে কি হয়।

সতীশ। বলব গুড়গুড়ির কথা— বলব আমার অবস্থা কত খারাপ। আমি নেলিকে ফাঁকি দিতে পারব না।

বিধুমুখী। সতীশ, আমার কথা শোন্‌, বিয়েটা আগে হোক, তার পরে সত্যি মিথ্যে যা ইচ্ছে তোর তাই বলিস।

সতীশ। সে আমি কিছুতে পারব না। আমি জানি, নেলি একটুও মিথ্যে সইতে পারে না। আমি কিচ্ছু লুকোব না। আগাগোড়া সব বলব।

বিধুমুখী। তার পরে?

সতীশ। (ললাট আঘাত করিয়া) তার পরে কপাল!

তৃতীয় দৃশ্য

মিস্টার লাহিড়ির বাড়িতে টেনিস্‌ক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়।

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস্‌পার্টি জানতেম না, আমি টেনিস্‌সুট পরে আসি নি।

নলিনী। জনবুলের যত বাছুর আছে সকলেরই তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল

বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্ছি।— মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন-না— আমি আপনারই সেবার্থে।

নলিনী। যদি একেবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন— ইনি আজ টেনিস্‌সুট প'রে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন, জাল, ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি। টেনিস্‌সুট না প'রে এলেই যদি আপনার এত দয়া হয়, তবে আমার এই টেনিস্‌সুটটা মিস্টার সতীশকে দান ক'রে তাঁর এই— এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী সুট, সতীশ। খিচুড়ি-সুটই বলা যাক— তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি-সুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তবু লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার নিতান্তই আপত্তি থাকে, তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস লাহিড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।

নলিনী। শোনো, শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পারো। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক-ডাচেস ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন্ নি! মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শুনছ সতীশ, রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চলতে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিস্‌সুট সম্বন্ধে তোমার যে-রকম সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান, তাতে আশা হয়।

অন্যত্র গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলেম না।

চারুবালা নন্দীর কাছে আসিয়া

চারু। মিস্টার নন্দী, সুশীলের সঙ্গে আমার একটা কথা নিয়ে ঘোর তর্ক হয়ে গেছে, আপনাকে তার নিষ্পত্তি করে দিতে হবে— আমি বাজি রেখেছি—

নন্দী। যদি আমার উপরেই নিষ্পত্তির ভার থাকে তা হলে বাজিতে আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন।

চারু। না না, আগে কথাটা শুনুন— তার পরে বিচার ক'রে—

নন্দী। যাদের ফেথ্ নেই সেই নাস্তিকরাই সব কথা আগাগোড়া শোনে, বিচার করে— কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি জিনিস আছে, শাস্ত্রে যাদের বলে অন্ধ। আমি দেবী-ওয়ারশিপার, অন্ধভক্ত।

চারু। আপনার কথা শুনলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি, আপনি অক্সফোর্ডে পড়েছেন। এখন আমাদের বাজির কথাটা শুনুন। সুশীল বলতে চায়, আমার এই শাড়ির রঙের সঙ্গে আমার এই জুতোর রঙ মানায় না।

নন্দী। সুশীল নিশ্চয় রঙকানা। আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর চমৎকার ম্যাচ হয়েছে। যদি মাপ করেন তো বলি, আপনার এই রুমালটার রঙ—

চারু। এ বুঝি আমার রুমাল? এ-যে নেলির— সে জোর করে আমাকে দিলে— বহরমপুর না কোথা থেকে এই ফুলকাটা মুসলমানি ফেশানের রুমাল কিনেছে। আমাকে কললে, সাজের মধ্যে অন্তত একটা দিশি জিনিস থাক্।

নন্দী। আই সী— মিস বোস, আপনি টেনিসের নেক্স্‌ট্ সেটে পার্টনার ঠিক করেছেন?

চারু। না।

নন্দী। আমাকে যদি সিলেক্ট্ করেন, তা হলে দেখতে পাবেন, আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর যে-রকম ম্যাচ হয়েছে, টেনিসে আপনার সঙ্গে আমার তার চেয়ে খারাপ ম্যাচ হবে না।

চারু। আপনাকে পার্টনার পেলে তো জিতবই। আমি ভেবেছিলেম, নেক্স্‌ট্ সেটে আপনি বুঝি নেলির সঙ্গে এনগেজ্‌ড্।

নন্দী। না, she wanted to be excused।

চারু। ওঃ, বোধ হয় সতীশের সঙ্গে কথা আছে। আমি তো বুঝতে পারি নে সতীশের মধ্যে নলিনী কী-যে দেখেছে!

নন্দী। দেখেছে ওর মনুমেন্টাল অ্যাবসার্ডিটি, আর তার চেয়ে অ্যাবসার্ড ওর— থাক্‌, সে-কথা থাক্‌।

চারু। কিন্তু ওর মতো অতবড়ো অযোগ্য লোককে—

নন্দী। অযোগ্যতা হচ্ছে শূন্যপেয়ালা, কৃপা দিয়ে ভরা সহজ।

চারু। শুধু কেবল কৃপা! ছিঃ! শ্রদ্ধা কি তার চেয়েও বড়ো নয়। চলুন খেলতে। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি ভারি বিশ্রী খেলি।

নন্দী। খেলায় আপনি হারতে পারেন, কিন্তু বিশ্রী খেলতে কিছুতেই পারেন না।

চারু। থ্যাঙ্ক্‌স্‌। [উভয়ের প্রস্থান

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস্‌কোর্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায় হায়, কোর্তাহারা অভাগা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে— দরজির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার ঠিকানা যদি জানতে, তা হলে খুব বেশি দূরে তাকে খুঁজে বেড়াতে হত না।

নলিনী। (করতালি দিয়া) ব্রাভো! মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি শুরু হয়েছে। উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে। এসো একটু কেক খেয়ে যাবে; মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো— টেনিস্‌কোর্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

সতীশ। নেলি, আজ তোমাকে একটা খুব বিশেষ কথা বলতে এসেছি—

নলিনী। না না, বিশেষ কথার চেয়ে সাধারণ কথা আমি ভালোবাসি।

সতীশ। যেমন করে হোক বলতেই হবে, নইলে বাঁচব না, তার পরে যদি বিদায় করে দাও তবে মাথা হেঁট করে জন্মের মতোই—

নলিনী। সর্বনাশ! সহজে বলবার কথা পৃথিবীতে এত আছে যে, চমক-লাগানো কথা না বললেও সময় কেটে যায়। আমারও বলবার কথা একটা আছে, তার পরে যদি সময় থাকে তুমি বোলো।

সতীশ। আচ্ছা, তাই আগে বলে নাও, কিন্তু আমার কথা শুনতেই হবে।

নলিনী। বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি, বলে নিই; রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেছ বলে রাগ করব, আমি এত বড়ো স্যাভেজ?

নলিনী। সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে। সেই তোমার নেক্‌লেস?

সতীশ। নেক্‌লেস? সেটা কি তবে—

নলিনী। ভুল বুঝো না— জিনিসটা খুব ভালো। কিন্তু তুমি যে ঐটে কেনবার জন্যে—

সতীশ। নেলি, চুপ চুপ, তোমার মুখে আমি সে-কথা শুনতে পারব না। কে তোমাকে কী বলেছে, সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—

নলিনী। হঠাৎ অমন খেপে উঠলে কেন। কী মিথ্যে কথা? নেক্‌লেসটা তুমিই আমাকে দিয়েছ, সেও কি মিথ্যে কথা।

সতীশ। না, না। হাঁ, তা হতেও পারে, এক রকম করে দেখলে হয়তো—

নলিনী। নেক্‌লেস এক রকম করে ছাড়া আর ক'রকম করে দেখা যায়? কথা উঠতে না উঠতেই আগে থাকতেই তুমি যেন—

সতীশ। আচ্ছা, তা বলো, কী বলছিলে বলো।

নলিনী। কিচ্ছু না, খুব সাদা কথা, অমন দামি জিনিস আমাকে কেন দিলে।

সতীশ। আচ্ছা বেশ, তা হলে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

নলিনী। ঐ দেখো, আবার অভিমান।

সতীশ। আমার মতো অবস্থার লোকের অভিমান কিসের। দাও তবে ফিরিয়েই দাও।

নলিনী। অমন সুর কর যদি তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা কওয়াই শক্ত হয়। একটু শান্ত হয়ে শোনো আমার কথা। মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেস্‌লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেক্‌লেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। সেটা বোঝবার শক্তি থাকলেই তো মানুষের কোনো মুশকিল ঘটে না। যে-অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে-অবস্থাটা তোমার একেবারে জানা নেই বলে তুমি রাগ কর, নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু ও-নেক্‌লেস তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে ?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্য যে-দান, আমার কাছে সে-দানের মূল্য নেই।

সতীশ। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে! এমন কথা তুমি বললে ? অন্যায় বলছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে— তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছু বলি নি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস।

সতীশ। আচ্ছা, তবে নিলুম।

হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া ধুলায় ফেলিয়া দিল

নলিনী। ও কী হল।

সতীশ। ভেবেছিলুম ওর দাম আছে, ওর কোনো দাম নেই।

নলিনী। (তুলিয়া লইয়া) তুমি রাগই কর আর যাই কর, আমার যা বলবার তোমাকে বলবই। আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। (চমকিয়া উঠিয়া) কে বললে ধার হয়েছে। কে বললে তোমাকে। একজন কেউ আছে, সে লাগালাগি করছে। তার নাম বলো ; আমি তাকে—

নলিনী। আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো।

সতীশ। বলতেই হবে তোমাকে কে বলেছে আমার ধারের কথা। আমি তাকে দেখে নিতে চাই।

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে ; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার ভদ্র উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না— অন্তত ধার করার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে-সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা মৃত্যুর চেয়েও দুঃসাধ্য, আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, একে যদি তুমি নন্দীসাহেবের নকল বল, তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা করবার তা তো করেছ— তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম— এখন এ-জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। তবে দাও, তাই দাও। যদি আমার অন্তরের কথাটা বুঝে থাক, তা হলে—

নলিনী। থাক্‌ থাক্‌, অন্তরের কথা অন্দরমহলেই থাক্‌। নেক্‌লেসটা এই নিয়ে যাও।

সতীশ। (হাতে লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সেই ভালো, তবে যাই। (কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) দয়া

করো নেলি, দয়া করো— যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে ওটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ থেকে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন, আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে। সতীশ, তোমার এই নেক্‌লেসটা হাতে করে নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি করে নিয়েছি, এই কথাটা তোমাকে বুঝে দেখতে হবে। নইলে কখনোই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতুম না। দিলে অপমান করা হত। বুঝতে পারছ ?

সতীশ। সম্পূর্ণ না।

নলিনী। তোমার দান-করাকেই আমি বেশি মান দিয়েছি বলেই তোমার দানের জিনিসকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি। মনে করো না, এটা হারিয়ে গেছে; সেই হারানোতে তোমার দান তো একটুও হারায় না।

সতীশ। ঠিক বলছ, নেলি ?

নলিনী। ঠিক বলছি। আমি যেমন সহজে এটি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি, তেমনি সহজে তুমি এটি আমার হাত থেকে ফিরে নাও। তা হলে আমি ভারি খুশি হব।

সতীশ। খুশি হবে ? তবে দাও। (নেক্‌লেস লইয়া) কিন্তু যে-হাত দিয়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, সেই হাতেই তুমি আর-একজনের ব্রেস্‌লেট পরেছ, সে যেন আমাকে—

নলিনী। ওতে কন্যার হাত নেই সতীশ, আছে কন্যাকর্তার হাত। বাবা বিশেষ করে বলেছিলেন, আজ—

সতীশ। আচ্ছা, ঐ ব্রেস্‌লেট চিরদিনই তোমার হাতে থাক্‌— এই নেক্‌লেস কেবল কিছুক্ষণের জন্যে গলায় পরো, তার পরে আমি নিয়ে যাব।

নলিনী। পরলে বাবা রাগ করবেন।

সতীশ। কেন।

নলিনী। তা হলে এই ব্রেসলেট পরার দাম কমে যাবে— ফের মুখ গম্ভীর করছ ?

সতীশ। কথাটা কি খুব প্রফুল্ল হবার মতো।

নলিনী। নয় তো কী। তোমার কাছে যে আমি এত খুলে কথা বলি, তার কোনো দাম নেই ? অকৃতজ্ঞ ! মিস্টার নন্দীর সঙ্গে আমি এমন করে কইতে পারতুম ? এবার কিন্তু টেনিস্‌কোর্ট থেকে যাও।

সতীশ। কেন যেতে বলছ, নেলি। এখানে আমাকে মানায় না ?

নলিনী। না, মানায় না।

সতীশ। চাঁদনির কাপড় পরি বলে ?

নলিনী। সে একটা কারণ বৈকি।

সতীশ। তুমি আমাকে এমন কথা বললে ?

নলিনী। আমি যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি, খুশি হোয়ো, অন্যে বললে রাগ করতে পার।

সতীশ। তুমি আমাকে অযোগ্য বলে জান, এতে আমি খুশি হব ?

নলিনী। এই টেনিস্‌কোর্টের অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে লজ্জা পাও ? এতেই আমি সব চেয়ে লজ্জা বোধ করি। তুমি তো তুমি, এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দুই হাত জোড় করে পায়ের ধুলো নিয়েই তাঁকে বলতুম, ভগবান, লাহিড়িদের বাড়ির এই টেনিস্‌কোর্টে আপনাকে মানায় না, মিস্টার নন্দীকে তার চেয়ে বেশি মানায়। শুনে কি তখনই তিনি হার্মানের বাড়ি ছুটতেন টেনিস্‌সুট অর্ডার দিতে।

সতীশ। বুদ্ধদেবের সঙ্গে—

নলিনী। তোমার তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি বলতে চাই, টেনিস্‌কোর্টের বাইরেও একটা মস্ত জগৎ আছে— সেখানে চাঁদনির কাপড় পরেও মনুষ্যত্ব ঢাকা পড়ে না। এই কাপড় প'রে যদি এখনই ইন্দ্রলোকে যাও তো উর্বশী হয়তো একটা পারিজাতের কুঁড়ি ওর বাট্‌ন্‌হোলে পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না— অবিশ্যি তোমাকে যদি তার পছন্দ হয়।

সতীশ। বাট্‌ন্‌হোল তো এই রয়েছে, গোলাপের কুঁড়িও তোমার খোঁপায়— এবারে পছন্দর পরিচয়টা কি ভিক্ষে করে নিতে পারি।

নলিনী। আবার ভুলে যাচ্ছ, এটা স্বর্গ নয়, এটা টেনিস্‌কোর্ট্‌।

সতীশ। এটা যে স্বর্গ নয়, সেইটে ভুলতে পারি নে বলেই তো—

নলিনী। এইবার তো নন্দীর সুর লাগছে গলায়—

সতীশ। তার একটিমাত্র কারণ— আমি টেনিস্‌কোর্টেরই যোগ্য হতে চাই। উর্বশীর হাতের পারিজাতের কুঁড়ির 'পরে আমার একটুও লোভ নেই।

নলিনী। বড়ো দুঃসাধ্য তোমার তপস্যা, সতীশ— স্বর্গে তোমার কম্পিটিশন কার্তিককে নিয়ে, চাঁদকে নিয়ে— এখানে আছেন স্বয়ং মিস্টার নন্দী। পেরে উঠবে না, কন্যাকর্তাদের সব দামি দামি অর্কিড ওঁরই বাট্‌ন্‌হোলে গিয়ে পৌঁচচ্ছে। ছেড়ে দাও আশা।

সতীশ। অর্কিডের আশা ছেড়েছি, কিন্তু ঐ গোলাপের কুঁড়ি—

নলিনী। ওটা বাবা যখন দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কামনা করেছিলেন, ওর সদ্গতি হয় যেন—

সতীশ। অর্থাৎ—

নলিনী। ঐ অর্থাতের মধ্যে অনেকখানি অর্থ আছে।

সতীশ। আর আমি যে তোমার স্তব করে মরি, তার মধ্যে যতটা শব্দ আছে ততটা অর্থ নেই?

নলিনী। যদি কিছু থাকে, সে কন্যাকর্তাদের অমরলোকের উপযুক্ত নয়।

সতীশ। অতএব আমাকে সদ্য স্বর্গপ্রাপ্তির চেষ্টা করতে হবে। চললেম তবে সেই তপস্যায়।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। হ্যালো সতীশবাবু! ও কী ও! সেই নেক্‌লেসটা নিয়ে চলেছ যে! সেদিন তো অ্যাল্‌বম নিয়ে সরে পড়েছিলে, আজ নেক্‌লেস? Bravo! You know how to eat your pudding and yet to keep it.

সতীশ। বুঝতে পারছি নে আপনার কথা।

নন্দী। আমরা যা দিই তা ফিরে নিই নে, তার বদলেও কিছু ফিরে পাই নে। দেবার হাত, নেবার হাত, দুই হাতই খালি থাকে। You are lucky, বিনা মূলধনে ব্যাবসা ক'রে এত এনর্মাস প্রফিট।

নলিনী। ও কী সতীশ, হাতের আস্তিন গুটোচ্ছ যে, মারামারি করবে নাকি। তা হলে মাঝের থেকে আমার নেক্‌লেসটা ভাঙবে দেখছি। দাও ওটা গলায় পরে নিই।—

নেক্‌লেস লইয়া গলায় পরা

অমনি নেব না, সতীশ, এর দাম দেব।—

গোলাপের কুঁড়ি সতীশের বাট্‌ন্‌হোলে পরাইয়া

মিস্টার নন্দী, আপনার ব্রেস্‌লেট আপনি নিয়ে যান।

নন্দী। কেন।

নলিনী। এর দাম আমার কাছে নেই।

নন্দী। বিনা দামেই তো আমি—

নলিনী। আপনার খুব দয়া। কিন্তু আমার তো আত্মসম্মান আছে। এসো সতীশ, তোমাদের দুজনের লড়াই দেখবার সময় আমার নেই। তার চেয়ে এসো বেড়াতে বেড়াতে গল্প করি, সময়টা কাটবে ভালো।

[উভয়ের প্রস্থান

চারুবালার প্রবেশ

চারু। মিস্টার নন্দী, আপনার নৈবেদ্য দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সামনে দেবতা নেই যে।

নন্দী। কে বললে নেই।

চারু। সাকার দেবতার কথা বলছি, নিরাকারের খবর জানি নে।

নন্দী। পূজা যদি নেন, তা হলে করকমলে—

চারু। আপনি মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখেন নাকি। আমি তো—

নন্দী। হাঁ, ভুল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছই—

চারু। তার পরে রিডাইরেক্টেড্‌ হয়ে—

নন্দী। ঘুরে আসতে হয়।

চারু। আজ আপনার কপালে তারই ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

নন্দী। ছাপের সংখ্যা আর বাড়াবেন না, তা হলে কলঙ্কের চিহ্নটাই জাগবে ; ঠিকানাটাই পড়বে চাপা।

চারু। আপনার মতো আলাপ করতে আমি কাউকে শুনি নি— চমৎকার কথা কইতে পারেন।

নন্দী। শুধু যে কেবল কানে শোনার কথাই আমার সম্বল, তা নয়, হাতে সোনাও জোগাতে পারি, এইটে প্রমাণ করতে দিন।

চারু। আপনি বাংলাতেও pun করতে পারেন— ক্ষমতা আছে। কিন্তু মিস্টার নন্দী, ও ব্রেস্‌লেট তো নেলির—

নন্দী। সেইটেই তো হয়েছিল মস্ত ভুল। শোধরাবার অপরচুনিটি যদি না দেন, তা হলে উদ্ধার হবে কী করে।

চারু। ঐ নেলি আসছে, চলুন আমরা ঐদিকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

নলিনী ও সতীশের প্রবেশ

নলিনী। যথেষ্ট হয়েছে সতীশ, আজ যদি মিষ্টি কথা বলবার চেষ্টা কর তা হলে কিন্তু রসভঙ্গ হবে।

সতীশ। আচ্ছা, আমাকে যদি একেবারে চুপ করিয়ে রাখতে চাও, তা হলে ঐ গানটা আমাকে শোনাও।

নলিনী। কোন্‌টা।

সতীশ। সেই যে— উজাড় করে দাও হে আমার সকল সম্বল।

নলিনীর গান

উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল।
শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।
চৈত্ররাতের বেলায়
নাহয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরমদিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে,
তবে ভাঙা খেলার ঘরে
নাহয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

লাহিড়িসাহেবের প্রবেশ

লাহিড়ি। নেলি, এই দিকে এসো। শুনে যাও। (জনান্তিকে) সতীশের বাপ মারা গেছেন।

নলিনী। সে কী কথা।

লাহিড়ি। মাদ্রাজে। সেও আজ তিন দিন হল। হার্টের উইক্‌নেস থেকে।

নলিনী। সতীশ জানে না?

লাহিড়ি। না— মন্মথ বাড়ির লোককে কাছে ডাকতে মানা করেছিলেন। সেখানে ওঁর বাড়ির ঠিকানাও কেউ জানত না। দৈবাৎ পুজোর ছুটিতে একজন বাঙালি উকিল সেখানে ছিল, মৃত্যুশয্যায় সেই তাঁর উইল তৈরি করেছে। সে আজ এসে পৌঁচেছে। আমাকে সে জানে— আমার কাছেই প্রথম এসেছিল, আমি মন্মথর বাড়িতে তাকে এইমাত্র রওনা করে দিলুম। তুমি সতীশকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দাও।

[প্রস্থান

নলিনী। সতীশ, চা পড়ে রয়েছে, খেয়ে নাও।

সতীশ। আমার ইচ্ছে করছে না।

নলিনী। আমার কথা শোনো, শুধু চা নয়, কিছু খাও। এই নাও রুটি।

সতীশ। মনে রেখো নেলি, গরিব বলেই আমার দানের দাম অনেক বেশি।

নলিনী। দেখো, ও-কথা আজ থাক্। কাল হবে। এখন তুমি খেয়ে নাও।

সতীশ। তাড়া দিচ্ছ কেন— আমার তো আপিস নেই।

নলিনী। চুপ চুপ, কথা কোয়ো না, খাও। আর-একটু খাও। এই নাও।

সতীশ। আর পরছি নে— আমার হয়েছে। আমার খাবার রুচি চলে গেছে।

নলিনী। আচ্ছা, তা হলে এসো— শোনো। তোমাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই।

সতীশ। আমার এমন সৌভাগ্য তো আর কখনো—

নলিনী। চুপ চুপ। চলে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

লাহিড়ি ও লাহিড়ি-জায়ার প্রবেশ

লাহিড়ি-জায়া। সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে?

লাহিড়ি। হাঁ।

জায়া। কে যে বললে সমস্ত সম্পত্তি অনাথ-আশ্রমে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মা'র জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ। এখন কী করা যায়!

লাহিড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি। তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে, সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু খেয়ে দেখতে পাও না। তোমার নেলি এ দিকে লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে নন্দীকে দেশছাড়া করে দিয়েছে। নন্দী তো ভয়ে ওর কাছেই ঘেঁষতে চায় না। জানো বোধ হয় চারুর সঙ্গে সে এন্‌গেজ্‌ড্।

লাহিড়ি। সেদিন টেনিস্‌কোর্টেই সেটা বোঝা গিয়েছিল।

জায়া। এখন উপায় কী করবে।

লাহিড়ি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর কোনোদিন নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির উপর নির্ভর করে বসেছিলে। অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

লাহিড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে; তাতে ক্ষুধাশান্তি হয় না।

লাহিড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল— অগাধ টাকা। ছেলেপুলে কিছুই নেই— বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চটপট নিক্‌-না। তুমি একটু তাড়া দাও-না।

লাহিড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে— এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না— তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে— তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও-না।

লাহিড়ি। ব্যস্ত হোয়ো না— পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার আমাদের নেলি যে-রকম জেদালো মেয়ে, সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখো, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

লাহিড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে, সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। এক সময় আমি ভাবতুম, নন্দীর ওপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব— সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো-না বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই করে। কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না ? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

শশধরের ঘর ঃ সম্মুখেই বাগান

সতীশ। বাবার শাপ এখনো ছাড়ে নি মা, এখনো ছাড়ে নি। তিনি আমার ভাগ্যের উপরে এখনো চেপে বসে আছেন।

বিধুমুখী। আমাদের যা করবার তা তো করেছি, গয়াতে তাঁর সপিণ্ডিকরণ হয়ে গেল— তোর মাসির কল্যাণে ব্রাহ্মণবিদায়েরও ভালো আয়োজন হয়েছিল।

সতীশ। সেই পুণ্যফল মাসির কপালেই ফলল। নইলে—

বিধুমুখী। তাই তো। নইলে এত বয়সে তাঁর ছেলে হবে, এমন সর্বনেশে কথা স্বপ্নেও ভাবি নি।

সতীশ। অন্যায় অন্যায় ! বাবার সম্পত্তি পেতে পারতুম, তার থেকে বঞ্চিত হলুম ; তার পরে আবার— কী অন্যায়।

বিধুমুখী। অন্যায় নয় তো কী। নিজের বোনপোকে এমন করেও ঠকালে ? শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খাটল ; আমরা কালীঘাটে এত মানত করলুম, তার কিছুই হল না। একেই বলে কলিকাল। একমনে ভগবানকে ডাক্‌— তিনি যদি এখনো—

সতীশ। মা, এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল— কিন্তু যে-রকম অন্যায় হল, তাতে— ঈশ্বরের কাছে— তিনি দয়া করে যেন—

বিধুমুখী। আহা, তাই হোক— নইলে তোর উপায় কী হবে, সতীশ। হে ভগবান, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় ঈশ্বরকে আমি আর মানব না ; কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব। কে বলে তিনি মঙ্গলময়।

বিধুমুখী। আরে চুপ চুপ, এখন অমন কথা মুখে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কী না ঘটতে পারে।— সতীশ, আজ বুঝি ওদের ওখানে যাচ্ছিস ?

সতীশ। হাঁ।

বিধুমুখী। তোর সেই সাহেবের দোকানের কাপড় পরিস্ নি যে বড়ো ?

সতীশ। সে-সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিধুমুখী। সে আবার কবে হল।

সতীশ। অনেক দিন। টেনিস্‌পার্টিতে নলিনীকে কথা দিয়ে এসেছিলেম।

বিধুমুখী। সে যে অনেক দামের !

সতীশ। নইলে পোড়াবার মজুরি পোষাবে কেন। স্বর্ণলঙ্কারও তো অনেক দাম ছিল।

বিধুমুখী। তোমাদের বোঝা আমার কর্ম নয়। যাই, দিদির খোকাকে নাওয়াতে হবে।

[প্রস্থান

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। সতীশ !

সতীশ। কী মাসিমা।

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বুঝি !

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা। কাল লাহিড়িসাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই—

সুকুমারী। লাহিড়িসাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেব মানুষ ; তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে। আমি তো শুনলাম, তোমাকে তারা পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিঙ পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে ! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই। এ দিকে একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে ক'রে ভুল করে। কিন্তু সরকারও তো ভালো—সে খেটে উপার্জন ক'রে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো অনেক আগেই তা পারতেম, কিন্তু তুমিই তো—

সুকুমারী। তাই বটে ! জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন বুঝছি, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। আমি আরো ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই যত দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা ! আচ্ছা, আমারই নাহয় যত দোষ, তবু যে-কদিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্ছ, দরকারমতো দুটো কাজই নাহয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কী করতে হবে বলো, আমি এখনই করছি।

সুকুমারী। আজ তোমার আপিসের ছুটি আছে, তোমাকে দোকানে যেতে হবে। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্‌বো সিল্ক চাই— আর একটা সেলার সুট।

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো শোনো, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো। জুতো চাই।

[সতীশ প্রস্থানোন্মুখ

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন— সবগুলো ভালো করে শুনেই যাও। আজও বুঝি লাহিড়িসাহেবের রুটি-বিস্কুট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে ? খোকার জন্য স্ট্র-হ্যাট এনো— আর তার রুমালও এক ডজন চাই।

[সতীশের প্রস্থান। পুনরায় ডাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শুনলাম তোমার মেসোর কাছ থেকে তুমি নূতন সুট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত-খুশি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সা লাহিড়িসাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। স-টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

সুকুমারী। এখনো দোকান খুলতে দেরি আছে। কিন্তু টাকা বাকি যা থাকে, ফেরত দিয়ো যেন। একটা হিসাব রাখতে ভুলো না।

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো সতীশ, এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে। দু'পা হেঁটে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায়-মাথায় ভাবনা পড়ে— পুরুষমানুষ এত বাবু হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুনবাজার থেকে মাছ কিনে আনতেন— মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে— আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটেভাড়া, বেহারার মাইনে, যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে—

[সুকুমারীর প্রস্থান

সেই চিঠিটা এইবেলা শেষ করি, নইলে সময় পাব না। [চিঠি লিখিতে প্রবৃত্ত

হরেনের প্রবেশ

হরেন। দাদা, ও কী লিখছ, কাকে লিখছ, বলো-না।

সতীশ। যা যা, তোর সে-খবরে কাজ কী, তুই খেলা করুগে যা।

হরেন। দেখি-না কী লিখছ— আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি— যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা— ভালোবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ, বলো-না। কাঁচা পেয়ারা?

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যা কথা বলছ! ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার— ভালোবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী, দাদা। এ-যে ফুলের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস্‌ নে— হাত দিস্‌ নে, ছিঁড়ে ফেলবি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্‌।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা। আমি তোমাকে লজঞ্জুস আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ— তাই বৈকি, আরেকজনের জিনিস বৈকি!

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, একটুখানি চুপ কর্‌, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্জুস কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি। (স্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে) ভয়ে আকার ভা—

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস্‌ নে।— আঃ; থাম্‌ থাম্‌।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, খবরদার ছিঁড়িস্‌ নে।— ও কী করলি। যা বারণ করলেম তাই, ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি। এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি। (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা এখান থেকে— যা বলছি! যা!

[হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন ও সতীশের সবেগে প্রস্থান

বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস্‌ নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধুমুখী। আচ্ছা, চুপ কর্‌, চুপ কর্‌, আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধুমুখী। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি।— [হরেনের ক্রন্দন] এমন ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন যেটি চায় তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একেবারে নবাবপুত্র! ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়। (সতর্জনে) খোকা, চুপ কর্‌ বলছি, ঐ হাম্‌দোবুড়ো আসছে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কী ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না।— আর, তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ। কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ করলেম আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেছ।

বিধুমুখী। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধুমুখী। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না, তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ, দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল— তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে-পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ বুঝি। ওকে তোমদের সহ্য হচ্ছে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার কব্‌রাজের বোতল-বোতল ওষুধ গিলছে, তবু দিন-দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

[সকলের প্রস্থান

সতীশ ও নলিনীর প্রবেশ

সতীশ। এ কী, তুমি যে এ-বাড়িতে?

নলিনী। শশধরবাবু বাবাকে কী একটা আইনের কাজে ডেকেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।

সতীশ। আমি তোমার কছে শেষ বিদায় নিতে চাই, নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে।

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। যে-লোক সন্ধান জানে সে-তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফেশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পা'ও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সত্যই বলছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দগ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হৃৎকম্প!

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার লাহিড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। এতবড়ো অভিমানী লোকের কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিই।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না।

নলিনী। খুব করি, যদি সে-দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যে-রকম ব্যারামের কথা পড়া যায় সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বয়ং নন্দীসাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের এক চুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফেশানের টাই নই— কলার নই— দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান।

নলিনী। ঐ-যে, বাবা ডাকছেন। তাঁর কাজ হয়ে গেছে। যাই।

[উভয়ের প্রস্থান

সুকুমারী ও শশধরের প্রবেশ

সুকুমারী। দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, আমার হরেনকে মারবার জন্যেই ওরা মায়ে-পোয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে।

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি।

সুকুমারী। আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে? সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোলো। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না— ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে-কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শুনি।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-না, আমরা হরেনকে যে-ভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়— সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কী রকম, সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ, তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

সুকুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো— পুরুষমানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়। আর, যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

সুকুমারী। না— দোষ কি ওর হতে পারে! সব দোষ আমারই। তুমি তো আর কারও কোনো দোষ দেখতে পাও না— কেবল আমার বেলাতেই—

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন— আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি— অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো। কিন্তু আমি বলছি, সতীশ যতক্ষণ এ-বাড়িতে থাকবে খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। এ তো আমারই আপন বোনের ছেলে। কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করি নে— এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না, মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে-অনিষ্ট করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে।

কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো, শুনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ও মা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল— সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না— তা থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে তুমি যে-দুধকলা আমাকে খাইয়েছ, তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্যকথাই বলছ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই— এখন আমি দংশন করতে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস্ নে? আমি তোর মা, সতীশ?

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমাকে জেল থেকে ফিরিয়ে আনলে। সে কি মাসির ঘরের চেয়ে ভয়ানক।

শশধর। আঃ সতীশ। চলো চলো— কী বকছ, থামো।

সুকুমারী। নাও, তোমরা বোঝাপড়া করো— আমার কাজ আছে।

[প্রস্থান

শশধর। সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মুখে কী বলছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত শোধ করে দিতে না পারি তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ— একটু স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো; তোমার সম্বন্ধে আমরা যে-অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব, সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি— পরশু শুক্রবারে রেজেস্ট্রি করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধুলা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব— তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক্ থাক্! ও-সব স্নেহ-ফ্নেহ আমি কিছু বুঝি নে, রস-কস আমার কিছুই নেই। যা কর্তব্য তা কোনোরকমে পালন করতেই হবে, এই বুঝি। সাড়ে-আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও।— সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি মিস্টার লাহিড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন— তোমার প্রতি যে টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন। আরো-একটা সুখবর আছে সতীশ, তোমাকে যে-আপিসে কাজ করিয়ে দিয়েছি সেখানকার বড়োসাহেব তোমার খুব সুখ্যাতি করছিলেন।

সতীশ। সে আমার গুণে নয়। তোমাকে ভক্তি করেন বলেই আমাকে এত বিশ্বাস করেন।

[প্রস্থান

শশধর। ওরে রামচরণ, তোর মাঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কী স্থির করলে।

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি।

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করেছ তো।

শশধর। তাই যদি না করব, তবে আর প্ল্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি, সতীশকে আমাদের তরফ মানিকপুর লিখে-পড়ে দেব— তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা, কী সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না। আমি বলে দিলাম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না?

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই করো-না কেন তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝি নে— তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব— এই আমি বলে গেলেম।

[প্রস্থান

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশায়, আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার লাহিড়ির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তালুক নেব না।

শশধর। কেন সতীশ।

সতীশ। নিজের কোনো মূল্য থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব। তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না, সে তিনি— অর্থাৎ, বুঝেছ— সে এক রকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু— যদিই বা—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বৈকি। বিলক্ষণ! তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে— ধৈর্য ধরে থাকলেই—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা, মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি যে অন্ন খাইয়েছেন তা উদ্গার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদসুদ্ধ শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই, সতীশ। তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। মাসিমাকে বোলো, আজই এখনই তাঁর কাছে হিসাব চুকিয়ে তবে জলগ্রহণ করব।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বাগান

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাবু আজকাল পুরোনো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। ভালোই তো, যা মাইনে পাবে তাতেই বেশ চলে যাবে। তার উপরে যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে ব'স, তবে একদিন সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দেবে। আমার পরামর্শ নিয়ে যদি চলতে তবে সতীশ এতদিনে মানুষের মতো হত।

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নি, কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন ; আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন— আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে-টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত, তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

সুকুমারী। রইল। সে তো বরাবরই ঐরকম লম্বাচৌড়া কথা বলে থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ?

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ঐ-যে তোমার সতীশবাবু আসছেন। আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না, এই দেখো, আমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই— কেবল খানকয়েক নোট আছে।

শশধর। ইস্, এ যে একতাড়া নোট। যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে, তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গুনে নাও। তোমার হরেনের পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কী কাণ্ড, সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গুনচট আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি— ইতিমধ্যে দর চড়েছে ; তাই মুনাফা পেয়েছি।

শশধর। সতীশ, এ-যে জুয়োখেলা।

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ, আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ-টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি, মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ, তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুনে খাতাঞ্জির হাতে দাও-না, ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

নোটগুলি তুলিয়া গুনিয়া দেখা

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো ?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। অ্যাঁ, সে কী কথা। বেলা-যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয়, মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অন্নঋণ আর নূতন করে ফাঁদতে পারব না। [প্রস্থান

সুকুমারী। বাপের হাত থেকে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দুপয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ ? কৃতজ্ঞতা এমনই বটে ! ঘোর কলি কিনা !

[উভয়ের প্রস্থান

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। এই পিস্তলে দুটি গুলি পুরেছি— এই যথেষ্ট। আমার অন্তিমের প্রেয়সী। ও কে ও ? হরেন ! কী করছিস ? এই সন্ধ্যার সময় বাগানে অন্ধকার যে, চারি দিকে কেউ নেই— পালা, পালা, পালা। (কপালে আঘাত করিয়া) সতীশ, কী ভাবছিস তুই— ওরে সর্বনেশে, চুপ চুপ— না না না, এ কী বকছি। আমি কি পাগল হয়ে গেলুম— কে আছিস ওখানে। বেহারা, বেহারা ! কেউ না, কেউ কোথাও নেই। মাসিমা ! শুনতে পাচ্ছ ? ইঃ, একেবারে লুটোপুটি করতে থাকবে। আঃ। হাতকে আর সামলাতে পারছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

[ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সবেগে আঘাত করিল, কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না, শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।]

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী ! দাদা নাকি ! তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কাঁচা পেয়ারা পাড়ছিলুম, বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়, মেসোমশায়, এই বেলা রক্ষা করো, আর দেরি কোরো না— তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, সতীশ। কী হয়েছে।

হরেন। কিছুই হয় নি, মা— কিছুই না— দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

সুকুমারী। এ কী রকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাসৃষ্টি। দেখো দেখি ! আমার বুক এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে। সতীশ, মদ ধরেছে বুঝি !

সতীশ। পালাও— তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও ! নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত থেকে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো, এই দেখো, মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্ দেখি ! আপিসের সাহেব পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতাল্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয়, এই বেলা পালা। হায় ভগবান, আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই— পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়, যা সন্দেহ করছ, তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, তুমি শুনে খুশি হবে, আমি চোর, আমি খুনী! তোমার কীর্তি পুরো হল। এখন আর কাঁদতে হবে না— যাও তুমি, যাও তুমি, যাও যাও, আমার সম্মুখ থেকে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বলো কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি।

শশধর। ঐ পিস্তলটা।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়ো-সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন থেকে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জানো না—

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে ক্ষমা করো।

বিধুমুখী। বাবা, আমার কপালে ক্ষমা না থাকে, নাই থাক্, ভগবান তোকে যেন ক্ষমা করেন। দিদির কাছে যাই। তাঁর পায়ে ধরি গে।

[প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উলটো হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি— কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলেম না— তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে—

সতীশ। যেজন্য আমি এই সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী— আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর শ্রদ্ধা আছে।

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐজন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা— ছি ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে-কাজ করেছ আমিও তাই করেছি— তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগুলি সব এনেছি— এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয়— এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদের না ব'লে চুরি করেই এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না।

শশধর। উদ্ধার হবে; এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে-ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই যে শশধরবাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বুড়োদেরই হয় না— তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না।— সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসি। ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে অতিথিসৎকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

—

গৃহপ্রবেশ

গৃহপ্রবেশ

প্রথম অঙ্ক

যতীনের পাশের ঘরে

প্রতিবেশিনী ও যতীনের বোন হিমি

প্রতিবেশিনী। যতীন আজ কেমন আছে, হিমি।

হিমি। ভালো না, কায়েতপিসি।

প্রতিবেশিনী। বলি, খিধেটা তো আছে এখনো?

হিমি। না, একচামচ বার্লিও সইছে না।

প্রতিবেশিনী। আমি যা বলি, একবার দেখোই-না, বাছা। আমার ঠাকুরজামাইয়ের ঠিক ঐরকম হয়েছিল। ঠাকুরের কৃপায় খেতে পারত, খিধে ছিল বেশ, তাই রক্ষে। কিন্তু একটু পাশ ফিরতে গেলেই— যতীনেরও তো ঐরকম পাঁজরের ব্যথা—

হিমি। না, ওঁর তো কোনো ব্যথা নেই।

প্রতিবেশিনী। তা নাই রইল। কিন্তু ঠাকুরজামাইও ঠিক এইরকম কত মাস ধরে শয্যাগত ছিল। তাই বলি বাছা, ফরিদপুর থেকে আনিয়ে নে-না সেই কপিলেশ্বর ঠাকুরের— যদি বলিস তো নাহয় আমার ছেলে অতুলকে—

হিমি। তুমি একবার মাসিকে ব'লে দেখো তিনি যদি—

প্রতিবেশিনী। তোর মাসি? সে তো কানেই আনে না। সে কি কিছু মানে। যদি মানত তবে তার এমন দশা হয়?— বলি হিমি, তোদের বউ তো যতীনের ঘরের দিক দিয়েও যায় না।

হিমি। না, না, মাঝে মাঝে তো—

প্রতিবেশিনী। আমার কাছে ঢেকে কী হবে, বাছা। তোমরা যে বড়ো সাধ করে এমন রূপসী মেয়ে ঘরে আনলে— এখন দুঃখের দিনে তোমাদের পরী-বউয়ের রূপ নিয়ে কী হবে'বলো তো। এর চেয়ে যে কালো কুচ্ছিৎ—

হিমি। অমন করে বোলো না, কায়েতপিসি। আমাদের বউ ছেলেমানুষ—

প্রতিবেশিনী। ওমা, ছেলেমানুষ বলিস কাকে। বয়েস ভাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিল ব'লেই কি আমাদের চোখ নেই। অমন ছেলে যতীন, তার কপালে এমন— ঐ যে আসছে মণি—

মণির প্রবেশ

এসো বাছা, এসো। ছাতে ছিলে বুঝি?

মণি। হাঁ।

প্রতিবেশিনী। শীলেদের বাড়ির বর বেরিয়েছে, তাই বুঝি দেখতে গিয়েছিলে? আহা, ছেলেমানুষ দিনরাত রুগীর ঘরে কি—

মণি। আমার টবের গাছে জল দিতে গিয়েছিলুম।

প্রতিবেশিনী। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে। তোমার গোলাপের কলম আমাকে গোটাদুয়েক দিতে হবে। অতুলের ভারি গাছের শখ, ঠিক তোমার মতো।

মণি। তা দেব।

প্রতিবেশিনী। আর, শোনো বাছা— তোমার গ্রামোফোন তো আজকাল আর ছোঁও না— যদি বল তো ওটা নাহয় নিজের খরচায় মেরামত করিয়ে—

মণি। তা নিয়ে যাও-না।

প্রতিবেশিনী। তোমাদের বউয়ের হাত খুব দরাজ। হবে না কেন। কত বড়ো ঘরের মেয়ে। বড়ো লক্ষ্মী। ঐ আসছেন তোমাদের মাসি— আমি যাই। যতীনের দরজা আগলে বসেই আছেন। ব্যামোকে তো ঠেকাতে পারেন না, আমাদেরই ঠেকিয়ে রাখেন।

[প্রস্থান

হিমি। কী খুঁজছ, বউদিদি।

মণি। আমার কুকুরছানাকে দুধ খাওয়াবার সেই পিরিচটা।

মাসির প্রবেশ

মাসি। বউমা, তোমার পায়ের শব্দের জন্যে যতীন কান পেতে আছে তা জানো। এই সন্ধের মুখে রুগীর ঘরে ঢুকে নিজের হাতে আলোটি জ্বেলে দাও, তার মন খুশি হোক। কী হল। বলি, কথার একটা জবাব দাও।

মণি। এখনি আমাদের—

মাসি। যেই আসুক-না কেন, তোমাকে তো বেশিক্ষণ থাকতে বলছি নে। এই তার মকরধ্বজ খাবার সময় হল। তোমার জন্যেই রেখে দিয়েছি। তুমি খলটা নিয়ে ওর পাশতলায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মধু দিয়ে মেড়ে দাও। তার পরে ওসুধটা খাওয়া হলেই চলে এসো।

মণি। আমি তো দুপুরবেলায় ওঁর ঘরে গিয়েছিলুম।

মাসি। তখন তো ও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মণি। সন্ধের সময় ঐ ঘরে ঢুকলে কেমন আমার ভয় করতে থাকে।

মাসি। কেন, তোর ভয় কিসের।

মণি। ঐ ঘরেই আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছিল— সে আমার খুব মনে পড়ে।

মাসি। কেউ মরে নি, সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও এমন একটু জায়গা আছে?

মণি। বোলো না, মাসি, বোলো না, সত্যি বলছি, মরাকে আমি ভারি ভয় করি।

মাসি। আচ্ছা বাপু, দিনের বেলাতেই নাহয় তুই আরেকটু ঘন ঘন—

মণি। আমি চেষ্টা করেছি যেতে। কিন্তু আমার কেমন গা ছম্ ছম্ করে। উনি আমার মুখের দিকে এমন একরকম করে চান— চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে।

মাসি। তাতে ভয়ের কথাটা কী।

মণি। মনে হয় যেন উনি অনেক দূর থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এ পৃথিবীতে না।

মাসি। আচ্ছা বাপু, বাইরে থেকেই নাহয় এই পথ্যিটথ্যিগুলো তৈরি করে দে। তুই মনে করে নিজের হাতে কিছু করেছিস শুনলে, সেও তবু কতকটা—

মণি। মাসি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি দিনরাত এই-সব রোগের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব না।

মাসি। একবার জিজ্ঞাসা করি, তুই নিজে যদি কখনো শক্ত ব্যামোয় পড়িস, তা হলে—

মণি। কখনো তো ব্যামো হয়েছে মনে পড়ে না। কোন্নগরের বাগানে থাকতে একবার জ্বর হয়েছিল। মা আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। আমি লুকিয়ে পালিয়ে একটা পচাপুকুরে চান করে এলুম। সবাই ভাবলে ন্যুমোনিয়া হবে। কিচ্ছু হল না। সেই দিনই জ্বর ছেড়ে গেল।

মাসি। তোদের বাড়িতে কারও কি কখনো বিপদ-আপদ কিছু ঘটে নি।

মণি। আমি তো কখনো দেখি নি। এই বাড়িতে এসে প্রথম মৃত্যু দেখলুম। কেবলই ইচ্ছে করছে, ছাড়া পাই, কোথাও চলে যাই। মালিশের গন্ধ পেলে মনে হয়, বাতাসকে যেন হাঁসপাতালের ভূতে পেয়েছে।

মাসি। তোর যদি এমনিই মেজাজ হয় তা হলে তোকে নিয়ে সংসারে—

মণি। জানি নে। আমাকে তোমাদের বাগানের মালী করে দাও-না— সে আমি ঠিক পারব।

[দ্রুত প্রস্থান

হিমি। দেখো মাসি, বউদিদির এমন স্বভাব যে চেষ্টা করেও রাগ করতে পারি নে। মনে হয় যেন বিধাতা ওর উপরে কোনো দায় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান নি। ওর কাছে দুঃখকষ্টের কোনো মানেই নেই।

মাসি। ভগবান ওর বাইরের দিকটা বহু যত্নে গড়তে গিয়ে ভিতরের দিকটা শেষ করবার এখনো সময় পান নি। তোর দাদার এই বাড়ির মতো আর-কি। খুব ঘটা করে আরম্ভ করেছিল— বাইরের মহল শেষ হতে হতেই দেউলে— ভিতরের মহলের ভারা আর নামল না। আজ ওকে কেবলই ভোলাতে হচ্ছে। বাড়িটাকে নিয়েও, মণিকে নিয়েও।

হিমি। বুঝতে পারি নে, এটা কি আমাদের ভালো হচ্ছে।

মাসি। কী জানিস, হিমি ? মৃত্যু যখন সামনে, তখন ঘর তৈরি সারা হোক না-হোক, কী এল গেল। তাই ওকে বলি, একান্তমনে সংকল্প করেছ যা সেইটেই সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমি, সেইটেই তো সত্য।

হিমি। বাড়িটা যেন তাই হল। কিন্তু বউদিদি ?

মাসি। হিমি, তোর বউদিদিকে যিনি সুন্দর করেছেন, তাঁর সংকল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ। চিরদিনের যে-মণি, ভগবানের আপন বুকের ধন যে-মণি সেই তো কৌস্তুভরত্ন— তার মধ্যে কোথাও কোনো খুঁত নেই। মৃত্যুকালে যতীন বিধাতার সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক।

হিমি। মাসি, তোমার কথা শুনলে আমার মন আলোয় ভরে ওঠে।

মাসি। হিমি, আমি কেবল কথাই বলি, কিন্তু বউয়ের উপরে রাগ করতেও ছাড়ি নে। সব বুঝি, তবু ক্ষমাও করতে পারি নে। কিন্তু হিমি, তুই যে ঐ বললি, তোর বউদিদির উপর রাগ করতে পারিস নে, তাতেই বুঝলুম, তুই যতীনেরই বোন বটে। যাই যতীনের কাছে।

[প্রস্থান

রোগীর ঘরে

যতীন। মাসি, তেতলার ঘরের সব পাথর বসানো হয়ে গেছে ?

মসি। হাঁ, কাল হয়ে গেছে সব।

যতীন। যাক, এতদিন পরে শেষ হয়ে গেল। আমার কতকালের ঘরবাঁধা সারা হল, আমার কতদিনের স্বপ্ন।

মাসি। কত লোক দেখতে আসছে তোর এই বাড়িটা, যতীন।

যতীন। তারা বাইরে থেকে দেখছে, আমি ভিতরে থেকে যা দেখতে পাচ্ছি তা এখনো শেষ হয় নি। কোনোকালে শেষ হবে না। কল্পলোকের শেষ পাথরটি বসিয়ে আজ পর্যন্ত কোন্‌ শিল্পী বলেছে, এইবার আমার সাঙ্গ হল ? বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাও বলতে পারেন নি, তাঁরও কাজ চলছে।

মাসি। যতীন, কিন্তু আর না বাবা, এইবার তুই একটু ঘুমো।

যতীন। না মাসি, আজ তুমি আমাকে সকাল সকাল ঘুমোতে বোলো না—

মাসি। কিন্তু ডাক্তার—

যতীন। থাক্‌ ডাক্তার। আজ আমার জগৎ তৈরি হয়ে গেল। আজ আমি ঘুমোব না— আজ বাড়ির সব আলোগুলো জ্বেলে দাও, মাসি। মণি কোথায়। তাকে একবার—

মাসি। তাকে সেই তেতালার নতুন ঘরটায় ফুল দিয়ে সাজিয়ে বসিয়ে দিয়েছি।

যতীন। এ তোমার মাথায় কী করে এল। ভারি চমৎকার। দরজার দুধারে মঙ্গলঘট দিয়েছ ?

মাসি। হাঁ, দিয়েছি বৈকি।

যতীন। আর, মেঝেতে পদ্মফুলের আলপনা?

মাসি। সে আর বলতে?

যতীন। একবার কোনোরকম করে ধরাধরি করে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার না? একবার কেবল দেখে আসি, আমার মণি আপন-তৈরি ঘরের মাঝখানটিতে ব'সে।

মাসি। না যতীন, সে কিছুতেই হতে পারে না, ডাক্তার ভারি রাগ করবে।

যতীন। আমি মনে মনে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। কোন্ শাড়িটা পরেছে।

মাসি। সেই বিয়ের লাল শাড়িটা।

যতীন। আমার এই বাড়ির নাম কী হবে জান, মাসি?

মাসি। কী বল্ তো।

যতীন। মণিসৌধ।

মাসি। বেশ নামটি।

যতীন। তুমি এর সবটার মানে বুঝতে পারছ না, মাসি।

মাসি। না, সবটা হয়তো পারছি নে।

যতীন। সৌধ বলতে কেবল বাড়ি বুঝলে চলবে না। ওর মধ্যে সুধা আছে—

মাসি। তা আছে, যতীন— এ তো কেবল টাকা দিয়ে তৈরি হয় নি— তোর মনের সুধা এতে ঢেলেছিস।

যতীন। তোমরা হয়তো শুনলে হাসবে—

মাসি। না, হাসব কেন, যতীন।— বল্, কী বলছিলি।

যতীন। আমি আজ বুঝতে পারছি, তাজমহল তৈরি করে শাজাহান কী সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। সে সান্ত্বনা তাঁর মৃত্যুকেও অতিক্রম ক'রে আজ পর্যন্ত—

মাসি। আর কথা কোস্ নে, যতীন— ঘুমোতে না চাস ঘুমোস নে, চুপ করে একটু ভাব নাহয়।

যতীন। মণি তার বিয়ের সেই লাল বেনারসি পরেছে! আজ তাকে একবার—

মাসি। ডাক্তার যে বারণ করে, যতীন—

যতীন। ডাক্তার ভাবে, পাছে আমার—

মাসি। তোমার জন্যে নয়, মণির জন্যেই— ওকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ওর ভিতরটাতে—

যতীন। দুর্বলতা আছে, ডাক্তার বললে বুঝি—

মাসি। সে আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি—

যতীন। আহা, বেচারা, তা হলে সাবধান হোয়ো— কাজ নেই, রুগীর ঘর থেকে দূরে দূরে থাকাই ভালো।

মাসি। ও তো আসতে পেলে বাঁচে, কিন্তু আমরা—

যতীন। না, না, কাজ নেই, কাজ নেই। মাসি, ঐ শেলফের উপর আল্‌বামটা আছে, দিতে পার?—

[আল্‌বাম আনিয়া দিল

তোমাকে তাজমহলের কথা বলছিলুম। এখন মনে হচ্ছে, আমার যেন সেই শাজাহানের মতোই হল— আমি ক্ষীণ জীবনের এপারে— সে পূর্ণ জীবনের ওপারে— অনেক দূরে, আর তার নাগাল পাওয়া যায় না। যেমন সেই সম্রাটের মম্‌তাজ! তাকেই নিবেদন করে দিলুম আমার এই বাড়িটি— আমার এই তাজমহল। এরই মধ্যে সে আছে, চিরকাল থাকবে, অথচ আমার চোখের কাছে সে নেই।

মাসি। ও যতীন, আর কেন কথা বলছিস। একবার একটু থাম্— ঘুমের ওষুধটা এনে দিই।

যতীন। না মাসি, না। আজ ঘুম নয়। আমি জেগে থেকে কিছু কিছু পাই, ঘুমের মধ্যে আরো সব হারিয়ে যায়।— মাসি, তোমার কাছে কেবলই আমি মণির কথা বলি, কিছু মনে কর না তো?

মাসি। কিছু না, যতীন। কত ভালো লাগে বলতে পারি নে। জানিস, কার কথা মনে পড়ে?

যতীন। কার কথা।

মাসি। তোর মায়ের। এমনি ক'রে যে একদিন তারও মনের কথা আমাকে শুনতে হত। তোর বাবা তখন আমাদের বাড়িতে থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন। তোর মায়ের সেদিনকার মনের কথা আমি ছাড়া বাড়িতে কেউ জানত না। বাবা যখন বিয়ের জন্যে অন্য পাত্র জুটিয়ে আনলেন, তখন আমিই তো তাঁকে—

যতীন। সে তোমারই কাছে শুনেছি। মাকে বুঝি দাদামশাই কিছুতেই পারলেন না, শেষকালে বাবার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হল। সেদিনের কথা কল্পনা করতে এত আনন্দ হয়।

মাসি। তোর মায়ের ভালোবাসা, সে যে তপস্যা ছিল। পাঁচ বৎসর ধরে তার হোমের আগুন জ্বলল, তার পরে সে বর পেলে। যতীন, তোর মধ্যে সেই আগুনই আমি দেখি, আর অবাক হয়ে ভাবি।

যতীন। মা তাঁর হোমের আগুন আমার রক্তের মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছেন— আমার তপস্যাতেও বর পাব। কী জানি মনে হচ্ছে মাসি, সেই বর পাবার সময় আমার খুব কাছে এসেছে।— কোথায় ঐ বাঁশি বাজছে?

মাসি। বিয়ের সানাই। আজ যে বিয়ের লগ্ন।

যতীন। কী আশ্চর্য। আজই তো মণি লাল বেনারসি পরেছে। জীবনে বিয়ের লগ্ন বারে বারে আসে। আজ আলোগুলো সব জ্বালাতে বলে দাও-না, মাসি। দেউড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে—

মাসি। চোখে বেশি আলো লাগলে ঘুমোতে পারবি নে যে, যতীন—

যতীন। কোনো ক্ষতি হবে না। জেগে থেকে ঘুমের চেয়ে বেশি শান্তি পাব। জান, মাসি? মন্দির হল সারা— এখন হবে দেবীমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যে এতটা হতে পারবে, মনেও করি নি।

মাসি। আমি ঘরে থাকলে তোর কথা থামবে না। আমি যাই। ঘুমোতে না চাস, অন্তত চুপ করে থাক্।

যতীন। আচ্ছা, বাড়ির যে প্ল্যান করেছিলুম সেইটে আমাকে দিয়ে যাও— আর আমার সেই খেলাঘরের বাক্সটা। খেলাঘর বলতে গিয়ে সেই গানটা মনে পড়ে গেল— হিমি, হিমি—

মাসি। ব্যস্ত হোস নে যতীন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

হিমির প্রবেশ

হিমি। কী দাদা।

যতীন। ঐ গানটা গা বোন— সেই যে খেলাঘর—

হিমির গান

খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি
    মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি
    বলব কী তোরে।
পথে যে পথিক ডেকে যায়,
অবসর পাই নে আমি হায়,
বাহিরের খেলায় ডাকে যে—
    যাব কী ক'রে।
যাহাতে সবার অবহেলা,
    যায় যা ছড়াছড়ি,
পুরানো ভাঙা দিনের ঢেলা
    তাই দিয়ে ঘর গড়ি।

যে আমার নিত্যখেলার ধন,
তারি এই খেলার সিংহাসন,
ভাঙারে জোড়া দেবে সে
কিসের মন্তরে।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। গান হচ্ছে, বেশ বেশ, খুব ভালো— ওষুধের চেয়ে ভালো। যতীন, মনটা খুশি রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। পঁচানব্বইয়ের চেয়ে কম বাঁচা একটা মস্ত অপরাধ। ফাঁসির যোগ্য।

যতীন। মন আমার খুব খুশি আছে। জানেন ডাক্তারবাবু, এতদিন পরে আমার বাড়ি-তৈরি শেষ হয়ে গেল। সব আমার নিজেরই প্ল্যান।

ডাক্তার। এই তো চাই। নিজের তৈরি বাড়িতে নিজে বাস করলে তবে সেটা মাপসই হয়। আসলে পৈতৃক বাড়িও ভাড়াটে বাড়ি, নিজের নয়। তোমার বাবা আমার ক্লাসফ্রেন্ড্‌ ছিল ; প্রাণটা ছাড়া পূর্বপুরুষের ব'লে কোনো বালাই কেদারের ছিল না। নিজের যা-কিছু নিজে দেখতে দেখতে গড়ে তুললে। সে কি কম আনন্দ। তার শ্বশুর তার বিবাহে নারাজ ছিলেন ব'লে শ্বশুরের সম্পত্তি রাগ করে নিলেই না। তুমিও নিজের বাসা নিজে বেঁধে তুললে, সেও খুশির কথা বৈকি।

যতীন। ভারি খুশিতে আছি।

ডাক্তার। বেশ, বেশ। এবার গৃহপ্রবেশ হোক। আমাদের খাওয়াও, অমন শুয়ে পড়ে থাকলে তো হবে না।

যতীন। আমার আজ মনে হচ্ছে, গৃহপ্রবেশ হবে। একবার পাঁজিটা দেখে নেব। যেদিন প্রথম শুভদিন হবে সেইদিনই—

ডাক্তার। বেশ, বেশ। পাঁজি নয় বাবা, সব মনের উপর নির্ভর করে। মন যখনই শুভদিন ঠিক করে দেয়, তখনই শুভদিন আসে।

যতীন। মন আমার বলছে, শুভদিন এল। তাই তো হিমিকে ডেকে গান শুনছি। গৃহপ্রবেশের সানাই যেন আজ শরতের আকাশে বাজতে আরম্ভ করেছে।

ডাক্তার। বাজুক। ততক্ষণ নাড়ীটা দেখি, বুকটা পরীক্ষা করে নিই। সন্দেশ-মেঠাই ফরমাশ দেবার আগে এই-সব বাজে উৎপাতগুলো চুকিয়ে নেওয়া যাক। কী বল, বাবা।

যতীন। নাড়ী যাই হোক-না কেন, তাতে কী আসে যায়।

ডাক্তার। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। মন ভোলাবার জন্যে ওগুলো করতে হয়। আমরা তো ধন্বন্তরির মুখোশটা প'রে রুগীর বুকে পিঠে পেটে পকেটে কষে হাত বুলোই, যম বসে বসে হাসে। স্বয়ং ডাক্তার ছাড়া যমের গাম্ভীর্য কেউ টলাতে পারে না। হিমি, মা, তুমি পাশের ঘরে যাও, গিয়ে গান করো, পাখির মতো গান করো। আমি একটা বই লিখতে বসেছি, তাতে বুঝিয়ে দেব, গানের ঢেউ এলে বাতাস থেকে ব্যামো কী রকম ভেসে যায়। ব্যামোগুলো সব বেসুর কিনা— ওরা সব বেতালা বেতালের দল ; শরীরের তাল কাটিয়ে দেয়। যা মা, বেশ-একটু গলা তুলে গান করিস।

হিমি। কোন্‌টা গাব, দাদা।

যতীন। সেই নূতন বিয়ের গানটা।

ডাক্তার। হাঁ হাঁ, সে ঠিক হবে। আজ একটা লগ্ন আছে বটে। পথে তিনটে বিয়ের দল পার হয়ে আসতে হল ; তাই তো দেরি হয়ে গেল।

পাশের ঘরে আসিয়া হিমির গান

বাজো রে বাঁশরি বাজো।
সুন্দরী, চন্দনমাল্যে
মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো।

আজি মধুফাল্গুন-মাসে,
চঞ্চল পান্থ কি আসে।
মধুকরপদভর-কম্পিত চম্পক
অঙ্গনে ফোটে নি কি আজো।
রক্তিম অংশুক মাথে,
কিংশুককঙ্কণ হাতে—
মঞ্জীরঝংকৃত পায়ে,
সৌরভসিঞ্চিত বায়ে,
বন্দনসংগীত-গুঞ্জন-মুখরিত
নন্দনকুঞ্জে বিরাজো।

—

পাশের ঘরে ডাক্তার ও মাসি

ডাক্তার। যেটা সত্যি সেটা জানা ভালোই। যে-দুঃখ পেতেই হবে সেটা স্বীকার করাই চাই, ভুলিয়ে দুঃখ বাঁচাতে গেলে দুঃখ বাড়িয়েই তোলা হয়।

মাসি। ডাক্তার, এত কথা কেন বলছ।

ডাক্তার। আমি বলছি আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে।

মাসি। ডাক্তার, তুমি কি আমাকে কেবল ঐ দুটো মুখের কথা বলেই প্রস্তুত করবে ভাবছ। আমার যখন আঠারো বছর বয়স, তখন থেকে ভগবান স্বয়ং আমাকে প্রস্তুত করছেন— যেমন করে পাঁজা পুড়িয়ে ইঁট প্রস্তুত করে। আমার সর্বনাশের গোড়া বাঁধা হয়েছে অনেকদিন, এখন কেবল সবশেষের টুকুই বাকি আছে। বিধাতা আমাকে যা-কিছু বলবার খুবই পষ্ট করে বলেছেন, তুমি আমাকে ঘুরিয়ে বলছ কেন।

ডাক্তার। যতীনের আর আশা নেই, আর অল্প কয়দিন মাত্র।

মাসি। জেনে রাখলুম। সেই শেষ কদিনের সংসারের কাজ চুকিয়ে দিই— তার পরে ঠাকুর যদি দয়া করেন ছুটির দিনে তাঁর নিজের কাজে ভর্তি করে নেবেন।

ডাক্তার। ওষুধ কিছু বদল করে দেওয়া গেল। এখন সর্বদা ওর মনটাকে প্রফুল্ল রাখা চাই। মনের চেয়ে ডাক্তার নেই।

মাসি। মন! হায় রে। তা আমি যা পারি তা করব।

ডাক্তার। আপনার বউমাকে প্রায় মাঝে মাঝে রোগীর কাছে যেতে দেবেন। আমার মনে হয় যেন আপনারা ওঁকে একটু বেশি ঠেকিয়ে রাখেন।

মাসি। হাজার হোক, ছেলেমানুষ, রুগীর সেবার চাপ কি সইতে পারে।

ডাক্তার। তা বললে চলবে না। আপনিও ওঁর 'পরে একটু অন্যায় করেন। দেখেছি বউমার খুব মনের জোর আছে। এতবড়ো ভাবনা মাথার উপরে ঝুলছে কিন্তু ভেঙে পড়েন নি তো।

মাসি। তবু ভিতরে ভিতরে তো একটা—

ডাক্তার। আমরা ডাক্তার, রোগীর দুঃখটাই জানি, নীরোগীর দুঃখ ভাববার জিনিস নয়। বউমাকে বরঞ্চ আমার কাছে ডেকে দিন, আমি নিজে তাঁকে বলে দিয়ে যাচ্ছি।

মাসি। না না, তার দরকার নেই— সে আমি তাকে—

ডাক্তার। দেখুন, আমাদের ব্যবসায়ে মানুষের চরিত্র অনেকটা বুঝে নেবার অনেক সুবিধা আছে। এটা জেনেছি যে, বউয়ের উপরে শাশুড়ির যে-একটা স্বাভাবিক রীষ থাকে, ঘোর বিপদের দিনেও সে যেন মরতে চায় না। বউ ছেলের সেবা করে তার মন পাবে, এ আর কিছুতেই—

মাসি। কথাটা মিথ্যে নয়, তা রীষ থাকতেও পারে। মনের মধ্যে কত পাপ লুকিয়ে থাকে, অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানে।

ডাক্তার। শুধু বোনপো কেন। বউয়ের প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে। নিজের মন দিয়েই ভেবে দেখুন-না, তার মনটা কী রকম হচ্ছে। বেচারা নিশ্চয়ই ঘরে আসবার জন্যে ছটফট করে সারা হল।

মাসি। বিবেচনাশক্তি কম, অতটা ভেবে দেখি নি তো।

ডাক্তার। দেখুন, আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, উচিত কথা বলতে আমার মুখে বাধে না। কিছু মনে করবেন না।

মাসি। মনে করব কেন, ডাক্তার। অন্যায় কোথাও থাকে যদি, নিন্দে না হলে তার শোধন হবে কী করে। তা তোমার কথা মনে রইল, কোনো ত্রুটি হবে না।— [ডাক্তারের প্রস্থান

হিমি, কী করছিস।

হিমি। দাদার জন্যে দুধ গরম করছি।

মাসি। আচ্ছা, দুধ আমি গরম করব। তুই যা, যতীনকে একটু গান শোনাগে যা। তোর গান শুনতে শুনতে ওর চোখে তবু একটু ঘুম আসে।

প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী। দিদি, যতীন কেমন আছে আজ।

মাসি। ভালো নেই, সুরো।

প্রতিবেশিনী। আমার কথা শোনো, দিদি। একবার আমাদের জগু ডাক্তারকে দেখাও দেখি। আমার নাতনি নাক ফুলে ব্যথা হয়ে যায় আর-কি। শেষকালে জগু ডাক্তার এসে তার ডান নাকের ভিতর থেকে এতবড়ো একটা কাঁচের পুঁতি বের করে দিলে। ওর ভারি হাতযশ। আমার ছেলে তার ঠিকানা জানে।

মাসি। আচ্ছা, বোলো ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিতে।

প্রতিবেশিনী। সেদিন তোমাদের বউকে আলিপুরে জু-তে দেখলুম যে।

মাসি। ও জন্তু-জানোয়ার ভারি ভালোবাসে, প্রায় সেখানে যায়।

প্রতিবেশিনী। জন্তু ভালোবাসে ব'লে কি স্বামীকে ভালোবাসতে নেই।

মাসি। কে বললে, ভালোবাসে না! ছেলেমানুষ, দিনরাত রুগীর কাছে থাকলে বাঁচবে কেন। আমরাই তো ওকে জোর ক'রে—

প্রতিবেশিনী। তা যাই বল, পাড়াসুদ্ধ মেয়েরা সবাই কিন্তু ওর কথা—

মাসি। পাড়ার মেয়েরা তো ওকে বিয়ে করে নি, সুরো। আমার যতীন ওকে বোঝে, সে তো কোনোদিন—

প্রতিবেশিনী। তা দিদি, সে কিছু বলে না ব'লেই কি—

মাসি। শুধু বলে না? ও-যে কখনো জাদুঘরে কখনো-বা বাঘভাল্লুক দেখতে যায়, এতেই তার আনন্দ।

প্রতিবেশিনী। বল কী দিদি। সেবাটা কি তার চেয়ে—

মাসি। ও তো বলে মণির পক্ষে এইটেই সেবা। যতীন নিজে বিছানায় বদ্ধ থাকে, মণি ঘুরে বেড়িয়ে এলে সেইটেতেই যতীন যেন ছুটি পায়। রুগীর পক্ষে সে কি কম।

প্রতিবেশিনী। কী জানি ভাই, আমরা সেকেলে মানুষ, ও-সব বুঝতে পারি নে। তা যা হোক, আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব, দিদি। সে জগু ডাক্তারের ঠিকানা জানে। একবার তাকে ডেকে দেখাতে দোষ কী। [প্রস্থান

—

রোগীর ঘরে

যতীন। এই যে, হিমি এসেছিস। আঃ বাঁচলুম। সেই ফোটোটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে, তুই একবার দেখ-না, বোন।

হিমি। কোন্ ফোটো, দাদা।

যতীন। সেই-যে বোটানিকেল গার্ডনে মণির সঙ্গে গাছতলায় আমার যে-ছবি তোলা হয়েছিল।

হিমি। সেটা তো তোমার আলবামে ছিল।

যতীন। এই-যে খানিক আগে আলবাম থেকে খুলে নিয়েছি। বিছানার মধ্যেই কোথাও আছে— কিংবা নীচে পড়ে গেছে।

হিমি। এই-যে দাদা, বালিশের নীচে।

যতীন। মনে হয় যেন আর-জন্মের কথা। সেই নিমগাছের তলা। মণি পরেছিল কুসমি রঙের শাড়ি। খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে নিচু করে বাঁধা। মনে আছে হিমি, কোথা থেকে একটা বউ-কথা-কউ ডেকে ডেকে অস্থির হচ্ছিল। নদীতে জোয়ার এসেছে— সে কী হাওয়া, আর ঝাউগাছের ডালে ডালে কী ঝর্‌ঝরানি শব্দ। মণি ঝাউয়ের ফলগুলো কুড়িয়ে তার ছাল ছাড়িয়ে শুঁকছিল— বলে, আমার এই গন্ধ খুব ভালো লাগে। তার যে কী ভালো লাগে না, তা জানি নে। তারই ভালো লাগার ভিতর দিয়ে এই পৃথিবীটা আমি অনেক ভোগ করেছি। সেদিন যেটা গেয়েছিলি, সেই গানটি গা তো হিমি। লক্ষ্মী মেয়ে। মনে আছে তো ?

হিমি। হাঁ মনে আছে।

গান

যৌবনসরসী নীরে
মিলনশতদল,
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল।
শরম-রক্তরাগে
তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধকেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়নজল।
ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ,
সবেদন পরশন।
শঙ্কিত চিত্ত মোর
পাছে ভাঙে বৃন্তডোর,
তাই অকারণ করুণায়
মোর আঁখি করে ছলছল।

যতীন। সেদিন গাছের তলা কথা কয়ে উঠেছিল। আজ এই দেয়ালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী একেবারে চুপ। ঐ দেয়ালগুলো তার ফ্যাকাসে ঠোঁটের মতো। হিমি, আলোটা আর-একটু কম করে দে। এপারে গাছে গাছে কতরকমের সবুজের উচ্ছ্বাস আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, আর ওপারে কলের চিমনি থেকে ধোঁয়াগুলো পাক দিয়ে আকাশে উঠছে, তারও কী সুন্দর রঙ, আর কী সুন্দর ডৌল। সবই ভালো লাগছিল। আর তোদের সেই কুকুরটা— জলে মণি বার বার গোলা ফেলে দিচ্ছিল, আর সে সাঁতার দিয়ে—

হিমি। দাদা, তুমি কিন্তু আর কথা কোয়ো না।

যতীন। আচ্ছা কব না ; আমি চোখ বুজে শুনব, সেই ঝাউগাছের ঝর ঝর শব্দ। কিন্তু হিমি, তুই আজ গাইলি, ও যেন ঠিক তেমন— কে জানে। আর-একটু অন্ধকার হয়ে আসুক, আপনা-আপনি শুনতে পাব— ধীরে বও, ধীরে বও, সমীরণ। আচ্ছা, তুই যা। ছবিটা কোথায় রাখলুম ?

হিমি। এই-যে ! [প্রস্থান

পাশের ঘরে মাসি ও অখিল

অখিল। কেন ডেকে পাঠিয়েছ কাকি।

মাসি। বাবা, তুই তো উকিল, তোকে একটা-কিছু করে দিতেই হচ্ছে।

অখিল। তারা তো আর সবুর করতে পারছে না— ডিক্রি করেছে, এখন জারি করবার জন্যে—

মাসি। বেশিদিন সবুর করতে হবে না। তারা তো তোরই মক্কেল। একটু বুঝিয়ে বলিস, ডাক্তার বলেছে—

অখিল। ডাক্তার আরো একবার বলেছিল কিনা, এবার তারা বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না। বাড়ি বন্ধক রেখে বাড়ি তৈরি করা, যতীনের এ কী রকম বুদ্ধি হল।

মাসি। ওর দোষ নেই, দোষ নেই, ওর বুদ্ধির জায়গায় মণি বসেছে শনি হয়ে। ভেবেছিল ওর মণিকে, ওর ঐ আলেয়ার আলোকে, ইঁটের বেড়া দিয়ে ধরে রাখবে।

অখিল। ওর তো নগদ টাকা কিছু ছিল।

মাসি। সমস্তই পাটের ব্যাবসায় ফেলেছে।

অখিল। যতীনের পাটের ব্যাবসা! কলম দিয়ে লাঙল-চাষ। হাসব না কাঁদব?

মাসি। অসাধ্যরকম খরচ করতে বসেছিল, ভেবেছিল পাট বেচাকেনা করে তাড়াতাড়ি মুনফা হবে। আকাশ থেকে মাছি কেমন করে ঘায়ের খবর পায়, সর্বনাশের একটু গন্ধ পেলেই কোথা থেকে সব কুমন্ত্রী এসে জোটে।

অখিল। সর্বনাশ! এখন বাজার এমন যে খেতের পাট চাষীদের কাটবার খরচ পোষাচ্ছে না।

মাসি। থাক্ থাক্ আর বলিস নে। ভাববারও আর দরকার নেই— দিন ফুরিয়ে এল।

অখিল। কাকি, পাওনাদার বোধ হয় ওর পাটের ব্যাবসার খবর পেয়েছে— বুঝেছে অনেক শকুনি জমবে, তাই তাড়াতাড়ি নিজের পাওনা আদায় করবার জোগাড় করছে।

মাসি। ওরে অখিল, এ ক'টা দিন সবুর করতে বল— যমদূতের সঙ্গে আদালতের পেয়াদা যেন পাল্লা দিতে না আসে। নাহয় নিয়ে চল আমাকে তোর মক্কেলের কাছে। আমি বামুনের মেয়ে তার পায়ে মাথা খুঁড়ে আসিগে।

অখিল। আচ্ছা, তাদের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখি, যদি দরকার হয় তোমাকে হয়তো যেতে হবে। একবার যতীনের সঙ্গে দেখা করে যাই।

মাসি। না, তোকে দেখলেই ওর ব্যাবসার কথা মনে পড়ে যাবে।

অখিল। আচ্ছা, ও-যে মণির নামে অনেক টাকা লাইফ ইনস্যোর করেছিল, তার কী হল।

মাসি। সে আমি যেমন করে হোক টিকিয়ে রেখেছি। আমার যা-কিছু ছিল তাতেই তো গেল, আর এই ডাক্তার-খরচে। যতীনকে তো বাঁচাতে পারব না, যতীনের এই দানটিকে বাঁচাতে পারলুম, আমার মনে এই সুখ থাকবে। মনে তো আছে, মাঝে মাঝে ইনস্যোরের মাশুল যখন তাকে জোগাতে হত তখন সে কী হাঙ্গাম। দোহাই অখিল, তোর মক্কেলকে ব'লে—

অখিল। দেখো কাকি, আমি সত্যি কথা বলি, ওর 'পরে আমার একটুও দয়া হয় না। এতবড়ো বাদশাই বোকামি—

মাসি। কিন্তু ওর 'পরে ভগবানের দয়া কত একবার দেখ। সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও এই বাড়িটি তৈরি করতে বসেছিল, শেষ হল না বটে, কিন্তু ওর খেলার সাথি ভাঙা খেলনা কুড়িয়ে নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছেন। আর কোন্ খেলায় নিমন্ত্রণ পড়েছে কে জানে।

অখিল। কাকি, আমাদের আইনের বইয়ে ভাগ্যে তোমাদের এই খেলার কথাটা কোথাও লেখে নি। তাই অন্ন ক'রে দুটো খেতে পাচ্ছি নইলে ঐরকমই খেয়ালের হাওয়ায় একেবারে দেউলের ঘাটে গিয়ে মরতুম।

[প্রস্থান

মণির প্রবেশ

মাসি। বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে নাকি? তোমার জ্যাঠতত ভাই অনাথকে দেখলুম।

মণি। হাঁ, মা বলে পাঠিয়েছেন আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—

মাসি। বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন।

মণি। ভাবছি, আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।

মাসি। ওমা, সে কী কথা। যতীনকে একলা ফেলে যাবে?

মণি। ফিরতে আমার খুব বেশি দেরি হবে না।

মাসি। খুব বেশি দেরি হবে কি না তা কে বলতে পারে, মা। সময় কি আমাদের হাতে। চোখের এক পলকে দেরি হয়ে যায়।

মণি। তিন ভাইয়ের পরে বড়ো আদরের মেয়ে, ধুম করে অন্নপ্রাশন হবে। আমি না গেলে মা ভারি—

মাসি। তোমার মায়ের ভাব, বাছা, বুঝতে পারি নে— কান্নার সাত সমুদ্রে ঘেরা যাদের প্রাণ, তোমার মাও তো সেই মায়েরই জাত, তবু তিনি মানুষের এতবড়ো ব্যথা বোঝেন না, ঘন ঘন কেবলই তোমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে যান—

মণি। দেখো মাসি, তুমি আমার মাকে খোঁটা দিয়ে কথা কোয়ো না বলছি। তবু যদি আপন শাশুড়ি হতে, তা হলেও নয় সহ্য করতুম, কিন্তু—

মাসি। আচ্ছা মণি, অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করো। আমি শাশুড়ি হয়ে তোমাকে কিছু বলছি নে, আমি একজন সামান্য মেয়েমানুষের মতোই মিনতি করছি— যতীনের এই সময়ে তুমি যেয়ো না। যদি যাও তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি নিশ্চয় জানি।

মণি। তা জানি, তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে মাসি। এই কথা বোলো যে, আমি গেলে বিশেষ কোনো—

মাসি। তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই, সে কি আমি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতে হয়, আমার মনে যা আছে খুলেই লিখব।

মণি। আচ্ছা বেশ, তোমাকে লিখতে হবে না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—

মাসি। দেখো বউ, অনেক সয়েছি, কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও কিছুতেই সইব না।

মণি। আচ্ছা, থাক্ তোমাদের চিঠি। বাপের বাড়ি যাব তার এত হাঙ্গামা কিসের। উনি যখন জর্মনিতে পড়তে যেতে চেয়েছিলেন তখনই তো পাসপোর্টের দরকার হয়েছিল। আমার বাপের বাড়ি জর্মনি নাকি?

মাসি। আচ্ছা, আচ্ছা, অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না। ঐ বুঝি আমাকে ডাকছে। যাই, যতীন। কী জানি, শুনতে পেয়েছে কি না।

[প্রস্থান

—

যতীনের ঘরে

মাসি। আমাকে ডাকছিলে, যতীন?

যতীন। হাঁ, মাসি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, উপায় নেই, আমি তো বন্দী; অসুখের জাল দিয়ে জড়ানো, দেয়াল দিয়ে ঘেরা— সঙ্গে সঙ্গে মণিকে কেন এমন বেঁধে রাখি।

মাসি। কী যে বলিস যতীন, তার ঠিক নেই। তোর সঙ্গে যে ওর জীবন বাঁধা, তুই খালাস দিতে চাইলেই কি ওর বাঁধন খসবে।

যতীন। একদিন ছিল যখন স্ত্রী সহমরণে যেত, সে অন্যায় তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মণির আজ এ যে পলে পলে সহমরণ, বেঁচে থেকে সহমরণ। মনে ক'রে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে— এর থেকে ওকে দাও মুক্তি মাসি, দাও মুক্তি।

মাসি। আজ এমন কথা হঠাৎ কেন বলছিস, যতীন। স্বপ্নের ঘোরে এক কথা আর হয়ে তোর কানে পৌঁচেছিল নাকি।

যতীন। না না, অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলুম, ঝাউগাছের ঝরঝর শব্দ, নদীতে জোয়ার, দূরে বউ-কথা-কও পাখির ডাক। মনে পড়ছিল, মণির সেই কুসমি রঙের শাড়ি, আর কুকুরের সঙ্গে দেখাল, আর বিনা-কারণে হাসি। ওর দুরন্ত প্রাণ, এই মরা দেওয়ালগুলোর মধ্যে কেন। দাও ছুটি ওকে। কতদিন এ বাড়িতে ওর

হাসিই শুনতে পাই নি। ওর স্রোতে নবীন জোয়ার, সে কি ঐ-সব ওষুধের শিশি, আর রুগীর পথ্যের বাঁধ বেঁধে আটকে দেবে। আমার মনে হচ্ছে, অন্যায়— ভারি অন্যায়।

মাসি। কিচ্ছু অন্যায় না, একটুও অন্যায় না। যার প্রাণ আছে সেই তো প্রাণ দিতে পারে! বর্ষণ তো ভরা মেঘের। উঠে বসিস্ নে যতীন, শো— অমন ছটফট করতে নেই। কোথায় মণিকে পাঠাতে চাস, বল্, আমি বুঝতে পারছি নে।

যতীন। নাহয় মণিকে ওর বাপের বাড়ি— ভুলে যাচ্ছি ওর বাবা এখন কোথায়—

মাসি। সীতারামপুরে।

যতীন। হাঁ, সীতারামপুরে। সে খোলা জায়গা, সেখানে ওকে পাঠিয়ে দাও।

মাসি। শোনো একবার। এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন।

যতীন। ডাক্তার কী বলেছে, সে কথা কি সে—

মাসি। তা সে নাই জানলে। চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমনি একটু ইশারায় বলা, অমনি বউ কেঁদে অস্থির।

যতীন। সত্যি মাসি, বউ কাঁদলে? সত্যি? তুমি দেখেছ?

মাসি। যতীন, উঠিস্ নে উঠিস্ নে, শো। ঐ যাঃ, ভাঁড়ার ঘর বন্ধ করতে ভুলে গেছি— এখনই ঘরে কুকুর ঢুকবে। আমি যাই, তুমি একটু ঘুমোও যতীন।

যতীন। আমি এইবার ঠিক ঘুমোব, তুমি ভেবো না। কেবল একটা কথা— গৃহপ্রবেশের শুভদিন ঠিক করে দাও।

মাসি। কী বলছিস যতীন, তোর এ অবস্থায়—

যতীন। তোমরা বিশ্বাস করতে পার না— আমার মন বলছে, গৃহপ্রবেশের দিন এল ব'লে। আমি যেতে পারব, নিশ্চয় যেতে পারব। এইবেলা থেকে সব প্রস্তুত করোগে। তখন যেন আবার দেরি না হয়।

মাসি। তা হবে, হবে, কিছু ভাবিস্ নে।

যতীন। মণিকেও এইবেলা বলে রাখো। তারও তো কাজ আছে?

মাসি। আছে বৈকি যতীন, আছে।

যতীন। তুমি আমাদের দুজনকে বরণ করে নেবে।— আচ্ছা মাসি, আমার একটা প্রশ্ন মনে আসে, ভয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নে। তুমি বলতে পার? পাটের বাজার কি এর মধ্যে চড়েছে।

মাসি। ঠিক তো জানি নে। অখিল কী যেন বলছিল।

যতীন। কী, কী, কী বলছিল। তোমাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, যদি বাজার না চড়ে থাকে তা হলে—

মাসি। কী আর হবে।

যতীন। তা হলে আমার এ বাড়ি— এক মুহূর্তে হয়ে যাবে মরীচিকা। ঐ-যে, ঐ-যে, আমাদের আড়তের গোমস্তা। নরহরি, নরহরি—

মাসি। যতীন, চেঁচিয়ো না, মাথা খাও, স্থির হয়ে শোও। আমি যাচ্ছি, ওর সঙ্গে কথা কয়ে আসছি।

যতীন। আমার ভয় হচ্ছে, যেন— মাসি, যদি বাজার খারাপই হয়, তুমি অখিলকে ব'লে কোনোরকম করে—

মাসি। আচ্ছা, অখিলের সঙ্গে কথা কব। তুই এখন—

যতীন। জান, মাসি? আমি যে টাকা ধার নিয়েছিলুম সে অখিলেরই টাকা অন্যের নাম করে—

মাসি। আমিও তাই আন্দাজ করেছি।

যতীন। কিন্তু দেখো, নরহরিকে তুমি আমার কাছে আসতে দিয়ো না— আমার ভয় হচ্ছে পাছে কী ব'লে বসে। আমি সইতে পারব না, তুমি ওকে অখিলের কাছে নিয়ে যাও।

মাসি। তাই যাচ্ছি—

যতীন। তোমার কাছে পাঁজিটা যদি থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো তো।

মাসি। এখন পাঁজি থাক্, তুই ঘুমো।

যতীন। মণি বাপের বাড়ি যাবার কথায় কাঁদলে? আমার ভারি আশ্চর্য ঠেকছে।

মাসি। এতই বা আশ্চর্য কিসের।

যতীন। ও যে সেই অমরাবতীর উর্বশী যেখানে মৃত্যুর ছায়া নেই— ওকে তোমরা করে তুলতে চাও প্রাইভেট হাঁসপাতালের নার্স?

মাসি। যতীন, ওকে কি তুই কেবল ছবির মতোই দেখবি। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবার?

যতীন। তাতে দোষ কী? ছবি পৃথিবীতে বড়ো দুর্লভ। দেখার জিনিসকে দেখতে পাবার সৌভাগ্য কি কম। তা হোক, তুমি বলেছিলে মণি কেঁদেছিল? লক্ষ্মীর আসন পদ্ম, সেও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুগন্ধে বাতাসকে কাঁদিয়ে দেয়?

মাসি। মেয়েমানুষ যদি সেবা করতে না পারলে তা হলে—

যতীন। শাজাহানের ঘরে ঘরকরনা করবার লোক ঢের ছিল— তাদের সকলের মধ্যে কেবল একজনকে তিনি দেখেছিলেন যার কিছুই করবার দরকার ছিল না। নইলে তাজমহল তাঁর মনে আসত না। তাজমহলেরও কোনো দরকার নেই। মাসি, আমি সেরে উঠলেই আবার এই বাড়িটি নিয়ে পড়ব। যতদিন বেঁচে থাকি, এই বাড়িটিকে সম্পূর্ণ করে তোলাই আমার একমাত্র কাজ হবে, আমার এই মণিসৌধ। বিধাতার স্বপ্নকে যে আমি চোখে দেখলুম, আমার স্বপ্নকে সাজিয়ে তুলে কেবল সেই খবরটি রেখে যেতে চাই। মাসি, তুমি হয়তো আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না।

মাসি। তা সত্যি বলছি বাবা, তোদের এ পুরুষমানুষের কথা আমি ঠিক বুঝি নে।

যতীন। এ জানালাটা আরেকটু খুলে দাও।— [মাসি জানালা খুলিয়া দিলেন] ঐ দেখো, ঐ দেখো, অনাদি অন্ধকারের সমস্ত চোখের জলের ফোঁটা তারা হয়ে রইল।— হিমি কোথায়, মাসি। সে কি ঘুমোতে গেছে।

মাসি। না, এখনো বেশি রাত হয় নি। ও হিমি, শুনে যা।

হিমির প্রবেশ

যতীন। আমাকে গাইতে বারণ করেছে বলেই বারে বারে তোকে ডাকতে হয়— কিছু মনে করিস নে, বোন।

হিমি। না দাদা, তুমি তো জানো, আমার গাইতে কত ভালো লাগে। কোন্ গানটা শুনতে চাও, বলো।

যতীন। সেই যে— আমার মন চেয়ে রয়।

হিমির গান

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরি,
রূপের কোলে ওই-যে দোলে অরূপ মাধুরী।
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে,
মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই-যে ঠেলে,
আপন-মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী।

যতীন। মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ, মণির মন চঞ্চল— আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি— কিন্তু দেখো—

মাসি। না বাবা, ভুল বুঝেছিলুম, সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়।

যতীন। তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি, তাই তার উপরে রাগ করতে। কিন্তু সুখ জিনিসটি ঐ তারাগুলির মতো অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, কিছু বলবার নেই। কিন্তু মাসি, ওর তো অল্প বয়েস, ও কী নিয়ে থাকবে।

মাসি। অল্প বয়েস কিসের। আমরাও তো বাছা, ঐ বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে অন্তরের দিকে টেনে নিয়েছি। তাতে ক্ষতি হয়েছে কী। তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের।

যতীন। যখন থেকে শুনেছি মণি কেঁদেছে, তখন থেকেই বুঝেছি, ওর মন জেগেছে। ওকে একবার ডেকে দাও, মাসি। দুপুরবেলা একবার এসেছিল। তখন দিনের প্রথম আলো, দেখে হঠাৎ মনে হল, ওর মধ্যে ছায়া একটুও কোথাও নেই। একবার এই সন্ধের অন্ধকারে দেখতে দাও, হয়তো ওর ভিতরের সেই চোখের জলটুকু দেখতে পাব।

মাসি। তোমার কাছে ওর ভালোবাসা ঘোমটা খুলতে এখনো লজ্জা পায়, তাই ওর যত কান্না সবই আড়ালে।

যতীন। আচ্ছা, থাক্, থাক্, নাহয় আড়ালেই থাক্। কিন্তু সেই আড়ালের খবরটি মাসি, তুমি আমাকে দিয়ে যেয়ো। কেননা, যখন তার আড়ালটি সরে যাবে, তখন হয়তো— আজ কিন্তু সন্ধেবেলায় আমি তার সঙ্গে বিশেষ করে একটু কথা বলতে চাই।

মাসি। কী তোর এমন বিশেষ কথা আছে বল্ তো।

যতীন। আমার মণিসৌধ তৈরি শেষ হয়ে গেল, সেই খবরটা আপন মুখে তাকে দিতে চাই। গৃহপ্রবেশ আমার নয়, গৃহপ্রবেশ তাকেই করতে হবে— তার জন্যেই আমার এই সৃষ্টি, আমার এই ইঁটকাঠের বীণায় গান।

মাসি। সে বুঝি জানে না?

যতীন। তবু নিবেদন করে দিতে হবে। হিমিকে বলব, দরজার বাইরে থেকে ঐ গানটা গাইবে—

মোর জীবনের দান,
করো গ্রহণ করার পরম মূল্যে চরম মহীয়ান।—

যাও মাসি, তুমি ডেকে দাও। মাসি, ঐ দেখো, নরহরি বুঝি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে— আমার পাটের আড়তের গোমস্তা— ওকে আজ এখানে আসতে দিয়ো না। না, না, না, আমি কিছুই শুনতে চাই নে। ওর খবর যাই থাক্-না, সে আমি পরে বুঝব।

[মাসির প্রস্থান

যতীন। হিমি, শোন্ শোন্।—

হিমির প্রবেশ

তোকে একটা গান শুনিয়ে দিই। এটা তোকে শিখতে হবে।

হিমি। না দাদা, তুমি গেয়ো না, ডাক্তার বারণ করে।

যতীন। আমি গুন্‌গুন্ করে গাব। অনেক দিন পরে আমাদের কিনু বাউলের সেই গানটা আমার মনে পড়েছে।

গান

ওরে মন যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।

তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।
তার ফিরে যাওয়ার হাওয়াখানা
বুকের মাঝে দিল হানা,
ওরে সেই হাওয়া তোর প্রাণের ভিতর
তুলবে তুফান হাহাকারে।—

তোর মাসির কাছে শুনে বুঝেছি হিমি, মণির মন জেগেছে। তুই হয়তো আমার কথা বুঝতে পারছিস নে। আচ্ছা থাক্ সে। এ বাড়ির সবটা তুই দেখেছিস ?

হিমি। চমৎকার হয়েছে।

যতীন। উপরের যে ঘরটাতে পাথর বসাতে দিয়েছিলুম— কই, প্ল্যানটা কোথায়। এই যে, এই ঘরে— এর কড়িকাঠ ঢেকে একটা কাঠের চাঁদোয়া হয়েছে তো ?

হিমি। হাঁ, হয়েছে বৈকি।

যতীন। তাতে কী রকম কাজ বল্ তো।

হিমি। চার দিকে মোটা করে নীল পাড়, মাঝখানে লাল পদ্ম আর সাদা হাঁসের জমি— ঠিক যেমন তুমি বলে দিয়েছিলে।

যতীন। আর দেয়ালে ?

হিমি। দেয়ালে বকের সার, ঝিনুক বসিয়ে আঁকা।

যতীন। আর মেঝেতে ?

হিমি। মেঝেতে শঙ্খের পাড়। তার মাঝখানে মস্ত একটা পদ্মাসন।

যতীন। দরজার বাইরে দুধারে শ্বেতপাথরের দুটো কলস বসিয়েছে কি।

হিমি। হাঁ বসিয়েছে। তার মধ্যে দুটো ইলেকট্রিক আলোর শিশি বসানো— কী সুন্দর।

যতীন। জানিস, সে ঘরটার কী নাম ?

হিমি। জানি, মণিমন্দির।

যতীন। সেদিন অখিল তোর মাসির কাছে এসেছিল। কী বলছিল, কিছু শুনেছিস কি। এই বাড়িটার কথা ?

হিমি। তিনি বলছিলেন, কলকাতায় এমন সুন্দর বাড়ি আর নেই।

যতীন। না না, সে কথা না। অখিল কি এ বাড়ির— থাক্, কাজ নেই। মাসি বলছিলেন, আজ দুপুরবেলা মৌরলামাছের যে-ঝোল হয়েছিল সেটা নাকি মণির তৈরি— ভারি সুন্দর স্বাদ। তুই কি—

হিমি। সে আমি বলতে পারি নে।

যতীন। ছি ছি বোন, তোর বউদিদির সঙ্গে আজ পর্যন্ত তোর ভালো বনল না, এটা আমার—

হিমি। ননদ যে আমি— তাই হয়তো—

যতীন। তুই বুঝি শাস্ত্র মিলিয়ে ভাব করিস, রাগ করিস ?

হিমি। হাঁ দাদা, সেই-যে হিন্দি গানে আছে— ননদিয়া রহি জাগি—

যতীন। তুই বুঝি সেটাকে একটু বদলে নিয়ে করেছিস— ননদিয়া রহি রাগি।

হিমি। হাঁ দাদা, সুরে খারাপ শুনতে হয় না। (গাহিয়া) ননদিয়া রহি রাগি—

যতীন। কিন্তু বেসুর করিস নে, বোন।

হিমি। সে কি হয়। তোমার কাছেই তো সুর শেখা।

যতীন। ঐরে, আজই যতসব কাজের লোকের ভিড় দেখছি। নরেনখাঁ'র লোক দেউড়ির কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিমি এক কাজ কর্ তো— কোনোরকম ক'রে আভাসে খবর নিতে পারিস ? এখনকার বাজারে— না না, থাক্গে। ঐ দরজাটা বন্ধ করে দে।

—

পাশের ঘরে

মাসি। এ কী, বউ। কোথাও যাচ্ছ নাকি।

মণি। সীতারামপুরে যাব।

মাসি। সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।

মণি। অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।

মাসি। লক্ষ্মী, মা আমার, যেয়ো তুমি যেয়ো— তোমাকে বারণ করব না। কিন্তু আজ না।

মণি। টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ হয়ে গেছে। মা খরচ পাঠিয়েছেন।

মাসি। তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে। নাহয় তুমি কাল ভোরের গাড়িতেই যেয়ো। আজ রাত্তিরটা—

মণি। মাসি, আমি তোমাদের তিথি-বার মানি নে। আজ গেলে দোষ কী।

মাসি। যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু বিশেষ কথা আছে।

মণি। বেশ তো, এখনো দশ মিনিট সময় আছে, আমি তাঁকে বলে আসছি।

মাসি। না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।

মণি। তা বলব না, কিন্তু দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন, আজ না গেলে চলবেই না।

মাসি। জোড়হাত করছি বউ, আমার কথা একদিনের মতো রাখো। মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে বোসো। তাড়াতাড়ি কোরো না।

মণি। তা কী করব বলো। গাড়ি তো বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে। এখনই সে এসে আমায় নিয়ে যাবে। এইবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসিগে।

মাসি। না, তবে থাক্, তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, যতদিন বেঁচে থাকবি এদিনের কথা তোকে চিরকাল মনে রাখতে হবে।

মণি। মাসি, আমাকে অমন করে শাপ দিয়ো না বলছি।

মাসি। ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ। দুঃখের যে শেষ নেই, আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না। [মণির প্রস্থান

শৈলের প্রবেশ

শৈল। মাসি, তোমাদের বউয়ের ব্যাভারখানা কী রকম বলো তো। কী কাণ্ড। স্বামীর এ অবস্থায় কোন্ বিবেচনায় বাপের বাড়ি চলল।

মাসি। ঐটুকু তো মেয়ে, মনে হয় যেন ননী দিয়ে তৈরি, কিন্তু কী পাথরে গড়া ওর প্রাণ।

শৈল। ওকে তো অনেকদিন থেকে দেখছি, কিন্তু এতটা যে পারে তা জানতুম না। এদিকে দেখো, কুকুর বেড়াল বাঁদর ময়ূর জন্তু-জানোয়ার কত পুষেছে তার ঠিক নেই— তাদের কিছু হলেই অনর্থপাত করে দেয়, অথচ স্বামীর উপরে— ওকে বুঝতে পারলুম না।

মাসি। যতীন ওকে মর্মে মর্মেই বুঝেছিল। একদিন দেখেছি যতীন মাথা ধ'রে বিছানায় প'ড়ে, মণি দল বেঁধে থিয়েটরে চলেছে। থাকতে না পেরে আমি যতীনকে পাখার বাতাস করতে গেলুম। ও আমার হাত থেকে পাখা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে। ওরে বাস্ রে কী ব্যথা। সে-সব দিনের কথা মনে করলে আমার বুক ফেটে যায়।

শৈল। তাও বলি মাসি, অমনি পাথরের মতো মেয়ে না হলেও পুরুষদের উড়ো মন চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। যতই নরম হবে, ততই ওরা ফসকে যাবে।

মাসি। কী জানি শৈল, ঐটেই হয়তো মানুষের ধর্ম। বাঁধনের মধ্যে কিছু একটু শক্ত জিনিস না থাকলে সেটা বাঁধনই হয় না, তা কী পুরুষের কী মেয়ের। ভালোবাসার মালায় ফুল থাকে পারিজাতের, কিন্তু তার সুতোটি থাকে বজ্রের।

শৈল। এখনো যদি গাড়িতে না উঠে থাকে তা হলে ওকে একটু বুঝিয়ে দেখিগে। [প্রস্থান

প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী। ঠান্‌দি ? ওমা এ কী কাণ্ড। তোমার বউ নাকি বাপের বাড়ি চলল।

মাসি। তা কী হয়েছে। তা নিয়ে তোমাদের অত ভাবনা কেন।

প্রতিবেশিনী। তা তো বটেই, আমাদের কী বলো। যতীনবাবুকে পাড়ার লোক সবাই ভালোবাসে সেইজন্যেই—

মাসি। হাঁ, সেইজন্যেই যতীন যাকে ভালোবাসে তোমরা সকলে মিলে তার—

প্রতিবেশিনী। তা বেশ ঠানদিদি, মণি খুবই ভালো কাজ করেছে। অত ভালো খুব কম মেয়েতেই করতে পারে।

মাসি। স্বামীর ইচ্ছা মেনে যে-স্ত্রী চলে তাকেই তো তোমরা ভালো বল! মণি আমাদের সেই স্ত্রী।

প্রতিবেশিনী। হাঁ, সে তো দেখতে পাচ্ছি।

মাসি। মণি ছেলেমানুষ, রুগীর কাছে বদ্ধ হয়ে আছে, তাই দেখে যতীন কিছুতে সুস্থির হতে পারছিল না। শেষকালে ডাক্তারবাবুর মত নিয়ে তবে তো ও— তা থাক্‌গে। তোমরা যত পার পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে করে বেড়াওগে। যতীনের কানের কাছে আর চেঁচামেচি কোরো না।

প্রতিবেশিনী। বাস্‌ রে। মণি যে কোন্‌ দুঃখে ঘন ঘন বাপের বাড়ি যায় সে বোঝা যাচ্ছে। [প্রস্থান

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। ব্যাপারখানা কী। দরজার কাছে এসে দেখি, বাক্স তোরঙ্গ গাড়ির মাথায় চাপিয়ে বউমা তার ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় চলল। আমাকে দেখে একটুও সবুর করলে না। রোগীর অবস্থার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করা, তাও না। ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন বুঝি ?—

মাসি নিরুত্তর

দেখুন, রোগীর এই অবস্থায় অন্তত এই কিছুদিনের জন্যে বউয়ের সঙ্গে আপনার শাশুড়িগিরি নাহয় বন্ধই রাখতেন।

মাসি। পারি কই, ডাক্তার। স্বভাব ম'লেও যায় না। একসঙ্গে ঘরে থাকতে গেলেই দুটো বকাবকি হয় বৈকি।

ডাক্তার। তা বউ-যে গাড়ি ডাকিয়ে এনে চলে গেল, আপনি একটু নিবারণ করলেই তো হত।

মাসি নিরুত্তর

কী জানি, বোধ করি গেল বলেই আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্টই বলছি, এমনি করে বউকে নির্বাসনে দিয়ে আপনি প্রতি মুহূর্তে যে যতীনের আশাভঙ্গ করছেন, তাতে তার কেবলই প্রাণহানি হচ্ছে। রুগীর প্রতি আমাদের কর্তব্য সব আগে, সেইজন্যেই আমাকে এমন পষ্ট কথা বলতে হল, নইলে আপনাদের শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়ার মধ্যে কথা কবার অধিকার আমার নেই।

মাসি। যদি দোষ করে থাকি, তা নিয়ে তর্ক করে তো কোনো ফল নেই। আমি-যে নিজেকে খাটো করে বউকে ফিরে আসতে চিঠি লিখব, সে প্রাণ ধরে পারব না, তা তুমি আমাকে গালই দাও আর যাই কর। এখন তুমি এক কাজ করতে পার ডাক্তার ?

ডাক্তার। কী, বলুন।

মাসি। সীতারামপুরে বউয়ের বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দাও। তাতে লিখো যতীনের কী অবস্থা। বউমার বাবাকে আমি যতদূর জানি তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, তিনি সে চিঠি পেলেই বউমাকে নিয়ে এখানে আসবেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, লিখে দিচ্ছি। কিন্তু বউমা-যে বাপের বাড়ি চলে গেছেন, এ খবর যেন কোনোমতেই যতীন জানতে না পায়। আমি আপনাকে বলেই রাখছি। এ খবরের উপরে আমার কোনো ওষুধই খাটবে

না। হিমি, মা, তুমি যে ঐখানে বসে আছ, এক কাজ করো ; ও যে-গানটা ভালোবাসে সেইটে ওর দরজার কাছে বসে গাও। ও যেন বউমার খবর জিজ্ঞাসা করবার সময় একটুও না পায়। শুনছ, মা ? এখন কান্নার সময় নয়। কান্না পরে হবে। এখন গান। তোমাকে বলেছি কি ? একটা বই লিখছি, তাতে দেখিয়ে দেব, গানের ভাইব্রেশন আর রোগের বীজের চাল একেবারে উলটো। নোবেল প্রাইজের জোগাড় করছি আর-কি, বুঝেছ ? [প্রস্থান

হিমির গান

ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে।
    কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
    ঘুরেছিল চারি দিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে ;
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে।
    আজ কী দেখি কালোচুলের আঁধার ঢালা,
    স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মানিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে।
    বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধূপে ;
    আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে।

হিমি। (নেপথ্যে চাহিয়া) যাচ্ছি দাদা, ভিতরেই যাচ্ছি। [প্রস্থান

অখিলের প্রবেশ

অখিল। কেন ডেকেছ, কাকি।

মাসি। তোকে ডেকে পাঠাবার জন্যে কাল থেকে যতীন আমাকে বার বার অনুরোধ করছে। আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

অখিল। ওর সেই বাড়িবন্ধকের ব্যাপার নিয়ে ?

মাসি। সে কথাটা ওর মনের মধ্যে খুবই আছে, কিন্তু সেটা ও জিজ্ঞাসা করতে চায় না। যতবারই ও-ভাবনাটা ধাক্কা দিচ্ছে ততবারই তাকে সরিয়ে সরিয়ে রাখছে। সে কথা তুমি ওর কাছে কোনোমতেই পেড়ো না— ও-ও পাড়বে না।

অখিল। তবে আমাকে কিসের দরকার পড়ল।

মাসি। উইল করবার জন্যে।

অখিল। উইল ? অবাক করলে।

মাসি। জানি, কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু মাথার দিব্যি দিচ্ছি, এই কথাটি তোমাকে রাখতেই হবে। ও যাকে যা-কিছু দিতে বলে, সম্ভব হোক অসম্ভব হোক, সমস্তই তোমার ঠিক ঠিক লিখে নেওয়া চাই। হেসো না, প্রতিবাদ কোরো না। তার পরে সে উইলের যা দশা হবে তা জানি।

অখিল। জানি বৈকি। জর্জ দি ফিফ্‌থের সমস্ত সাম্রাজ্যই আমি যতীনকে দিয়ে উইল করিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারি। আমার বিশ্বাস সম্রাটবাহাদুর আন্‌ডিউ ইনফ্লুয়েন্সের অভিযোগ তুলে আদালতে নালিশ রুজু করবেন না। কিন্তু দেখো কাকি, এইবার তোমার সঙ্গে এই বাড়ির কথাটা বলে নিই। আমার মক্কেল—

মাসি। অখিল, এখন দুটো সত্যি কথা কওয়াই যাক। ঘরে-বাইরে কেবলই মিথ্যে বলে বলে দম বন্ধ হয়ে এল। এখন শোনো, তোমার মক্কেল তুমি নিজেই— এ কথা গোড়া থেকেই জানি।

অখিল। সে কী কথা, কাকি!

মাসি। থাক্, ভোলাবার কোনো দরকার নেই। ভালোই করেছ। জানি, আমার সম্পত্তিতে তোমাদেরই অধিকার ব'লে তোমরা বরাবরই তার 'পরে দৃষ্টিপাত করেছ—

অখিল। ছি ছি, এমন কথা—

মাসি। তাতে দোষ কী ছিল বলো। তোমরা আমার ছেলেরই মতো তো বটে। তোমাদেরই সব দিতুম। কিন্তু আমরা দুই বোন ছিলুম। বাবা দিদির উপরে রাগ করে একলা আমাকেই তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গেলেন। সে রাগ পড়ে যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হল। স্বর্গে আছেন তিনি, আজ তাঁর সেই রাগ নেই। সেইজন্যেই বাবার সম্পত্তি তাঁরই দৌহিত্রের ভোগে ঢেলে দিয়েছি। লক্ষ্মীর কৃপায় তোমাদের তো কোনো অভাব নেই।

অখিল। তা নিয়ে তোমাকে কি কোনো কথা বলেছি কোনোদিন।

মাসি। বুদ্ধি থাকলে কথা বলবার তো দরকার হয় না। বাড়ি তৈরির নেশায় যতীনকে ধরলে। সে নেশার ভিতরে যে কত অসহ্য দুঃখ তা তোরা পাকাবুদ্ধি আইনওয়ালারা বুঝবি নে। আমি মেয়েমানুষ, ওর মাসি, আমার বুক ফাটতে লাগল। ধার পাব কোথায়। তোরই কাছে যেতে হল। তুই এক ফাঁকা মক্কেল খাড়া ক'রে—

হিমির প্রবেশ

হিমি। মাসি, বামুনঠাকরুন এসেছেন।

মাসি। লক্ষ্মী মেয়ে, তুই তাঁকে একটু বসতে বল্, আমি এখনই আসছি।

[হিমির প্রস্থান

অখিল। কাকি, তোমার এই বোনঝির কত বয়স হবে।

মাসি। সতেরো সবে পেরিয়েছে। এই বছরেই আই· এ· দেবে।

অখিল। গলাটি ভারি মিষ্টি, বাইরে থেকে ওঁর গান শুনেছি।

মাসি। ওরা দুই ভাইবোনে একই জাতের। দাদা বাড়ি করছেন, ইনি গান করছেন, দুটোতেই একই সুরের খেলা।

অখিল। বিয়ের সম্বন্ধ—

মাসি। না, ওর দাদার অসুখ হয়ে অবধি সে কথা কাউকে মুখে আনতে দেয় না— পড়াশুনো সব ছেড়ে এইখানেই পড়ে আছে।

অখিল। কিন্তু ভালো পাত্র খুঁজে দিতে পারি কাকি, যদি কখনো—

মাসি। যেমন তুই মক্কেল খুঁজে দিয়েছিলি সেইরকমই, না?

অখিল। না কাকি, ঠাট্টা না— আমি ভাবছি, ওঁকে যদি একটা হার্মোনিয়ম পাঠিয়ে দিই, তাতে কি তোমাদের—

মাসি। কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ও তো হার্মোনিয়ম ভালোবাসে না।

অখিল। গানের সঙ্গে?

মাসি। গানের সঙ্গে এসরাজ বাজায়।

অখিল। আচ্ছা, তা হলে এসরাজই নাহয়—

মাসি। ওর তো আছে এসরাজ।

অখিল। নাহয় আরো একটা হল। সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলাকেই তো বলে শ্রীবৃদ্ধি।

মাসি। আচ্ছা, দিস এসরাজ। এখন আমার কথাটা শোন্। এতকাল তোর সেই মক্কেলকে সুদ দিয়ে এসেছি আমারই পৈতৃক গয়না বেচে। মাঝে মাঝে মক্কেল যখনই তিন দিনের মধ্যে শোধ নেবার কড়া দাবি করে চিঠি দিয়েছে, তখনই সুদ চড়িয়ে চড়িয়ে আজ আমার আর কিছু নেই। কাজেই কাকির সম্পত্তি দেওরপো'র সিন্ধুকেই গেছে। প্রেতলোকে আমার শ্বশুরের তৃপ্তি হয়েছে— কিন্তু আমার বাবা, যতীনের মা— পরলোকে তাঁদের যদি চোখের জল পড়ে—

হিমির প্রবেশ

হিমি। দাদা তোমাকে বার বার ডাকছেন, মাসি। ছটফট করছেন আর কেবলই বউদিদির কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তার জবাব কিছুতে আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আমার গলা আটকে যায়।

[দুই হাতে মুখ চাপিয়া কান্না

মাসি। কাঁদিস নে মা, কাঁদিস নে। আমি যতীনের কাছে যাচ্ছি।

অখিল। কাকি, আমি যদি কিছু করতে পারি, বলো, আমি নাহয় যতীনের কাছে গিয়ে—

মাসি। হাঁ, যতীনের কাছে যেতে হবে। তার সেই উইলটা।

[প্রস্থান

—

রোগীর ঘরে

যতীন। মণি এল না? এত দেরি করলে যে?

মাসি। সে এক কাণ্ড। গিয়ে দেখি তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে বলে কান্না। বড়োমানুষের ঘরের মেয়ে— দুধ খেতেই জানে, জ্বাল দিতে শেখে নি। তোমার কাজ করতে প্রাণ চায় বলেই করা। অনেক করে ঠাণ্ডা করে তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। একটু ঘুমোক।

যতীন। মাসি!

মাসি। কী বাবা।

যতীন। বুঝতে পারছি, দিন শেষ হয়ে এল। কিন্তু কোনো খেদ নেই। আমার জন্যে শোক কোরো না।

মাসি। না বাবা, শোক করবার পালা আমার ফুরিয়েছে। ভগবান আমাকে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বেঁচে থাকাই যে ভালো আর মরাই যে মন্দ, তা নয়।

যতীন। মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে। আজ আমি ওপারের ঘাটের থেকে সানাই শুনতে পাচ্ছি। হিমি, হিমি কোথায়।

মাসি। ঐ-যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

হিমি। কেন দাদা, কী চাই।

যতীন। লক্ষ্মী বোন আমার, তুই অমন আড়ালে আড়ালে কাঁদিস নে— তোর চোখের জলের শব্দ আমি যেন বুকের মধ্যে শুনতে পাই। দেখি তোর হাতটা। আমি খুব ভালো আছি। ঐ গানটা গা তো ভাই— যদি হল যাবার ক্ষণ—

হিমির গান

যদি হল যাবার ক্ষণ
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন।
বারে বারে যেথায় আপন গানে
স্বপন ভাসাই দূরের পানে,
মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন—
সে মোর শূন্য বাতায়ন।
মনের প্রান্তে ওই মালতীর লতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা।
ওরি ডালে আর-শ্রাবণের পাখি
স্মরণখানি আনবে না কি—
আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন—
আমাদের বিরহ মিলন।

মাসি। হিমি, বোতলে গরম জল ভরে আন্। পায়ে দিতে হবে।

[হিমির প্রস্থান

যতীন। কষ্ট হচ্ছে মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমেই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকোর মতো জীবন-জাহাজের সঙ্গে সে ছিল বাঁধা— আজ বাঁধন কাটা পড়েছে, তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার সঙ্গে সে আর লেগে নেই।— এ তিন দিন মণিকে দিনে রাতে একবারও দেখি নি।

মাসি। বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসছে।

যতীন। আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে— সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি। ঠিক মনে পড়ছে না।

মাসি। আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।

যতীন। মা যখন মারা যান, আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতেই আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—

মাসি। সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।

যতীন। কিন্তু এই বাড়িটা—

মাসি। কিসের বাড়ি আমার। কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার যেটুকু সে তো আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।

যতীন। মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—

মাসি। সে কি জানি নে, যতীন তুই এখন ঘুমো।

যতীন। আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই রইল। ও তো কখনো তোমাকে অমান্য করবে না।

মাসি। সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।

যতীন। তোমার আশীর্বাদই আমার সব। তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—

মাসি। ও কী কথা, যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ ব'লে আমি মনে করব— এমনি পোড়া মন ?

যতীন। কিন্তু তোমাকেও আমি—

মাসি। দেখ্ যতীন, এইবার রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর টাকা দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখে যাবি ?

যতীন। মাসি, টাকার চেয়ে যদি আরো বড়ো কিছু তোমাকে—

মাসি। দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভরে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্যি। এতদিন তো বুক ভরে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও— লিখে দাও বাড়িঘর, জিনিসপত্র— ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক— যা আছে মণির নামে সব লিখে দাও— এ-সব বোঝা আমার সইবে না।

যতীন। তোমার ভোগে রুচি নেই, কিন্তু মণির বয়স অল্প, তাই—

মাসি। ও কথা বলিস নে— ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—

যতীন। কেন ভোগ করবে না, মাসি।

মাসি। না গো না, পারবে না, পারবে না, আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না ; গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে— কিছুতে কোনো রস পাবে না।

যতীন। (চুপ করিয়া থাকিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া) দেবার মতো জিনিস তো কিছুই—

মাসি। কম কী দিয়ে যাচ্ছ। ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল ক'রে যা দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনোদিনই বুঝবে না ?

যতীন। মণি কাল কি এসেছিল। আমার পড়ে পড়ছে না।

মাসি। এসেছিল। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। শিয়রের কাছে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে—

যতীন। আশ্চর্য! আমি ঠিক সেই সময়ে স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে— দরজা অল্প একটু ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠেলি করছে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ। ওকে দেখতে দাও যে সন্ধেবেলাকার আলোর মতো কেমন অতি সহজে আমার ধীরে ধীরে—

মাসি। বাবা, তোমার পায়ের উপর এই পশমের শালটা টেনে দিই— পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

যতীন। না মাসি, গায়ে কিছু দিতে ভালো লাগছে না।

মাসি। জানিস যতীন, এ শালটা মণির তৈরি— এতদিন রাত জেগে জেগে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।

[যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মাসি তার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন।]

যতীন। আমার মনে হচ্ছে যেন ওটা হিমি সেলাই করছিল। মণি তো সেলাই ভালোবাসে না— ও কি পারে।

মাসি। ভালোবাসার জোরে মেয়েমানুষ শেখে। হিমি ওকে দেখিয়ে দিয়েছে বৈকি। ওর মধ্যে ভুল সেলাই অনেক আছে—

যতীন। হিমি, তুই পাখা রাখ্, ভাই। আয় আমার কাছে বোস্। আজই পাঁজি দেখে তোকে বলে দেব কবে গৃহপ্রবেশের লগ্ন আসবে।

হিমি। থাক্ দাদা, ও-সব কথা—

যতীন। আমি উপস্থিত থাকতে পারব না— সেই মনে করে বুঝি— আমি থাকব বোন, সেদিন এ বাড়ির হাওয়ায় হাওয়ায় আমি থাকব— তোরা বুঝতে পারবি। যে গানটা গাবি সে আমি ঠিক করে রেখেছি— সেই, অগ্নিশিখা— একবার শুনিয়ে দে—

হিমির গান

অগ্নিশিখা, এসো, এসো,
আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে শূন্য ঘরে
পুণ্যদীপ জ্বালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা,
আনো নিত্য ভালো।
এসো শুভ লগ্ন বেয়ে
এসো হে কল্যাণী।
আনো শুভ সুপ্তি, আনো
জাগরণখানি।
দুঃখরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নির্নিমেষে,
উৎসব-আকাশে তব
শুভ্র হাসি ঢালো।

যতীন। গানে কোন্ উৎসবের কথাটা আছে জানিস, হিমি?

হিমি। জানি নে।

যতীন। আহা, আন্দাজ কর্‌-না।

হিমি। আমি আন্দাজ করতে পারি নে।

যতীন। আমি পারি। যেদিন তোর বিয়ে হবে সেদিন উৎসবের ভোরবেলা থেকে—

হিমি। থাক্‌ দাদা, থাক্‌।

যতীন। আমি যেন তার বাঁশি শুনতে পাচ্ছি, ভৈরবীতে বাজছে। আমি লিখে দিয়েছি তোর বিয়ের খরচের জন্যে—

হিমি। দাদা, তবে আমি যাই।

যতীন। না, না, বোস্‌। কিন্তু গৃহপ্রবেশের দিন আমার হয়েই তোকে সব সাজাতে হবে— মনে রাখিস, সাদা পদ্ম যত পাওয়া যায়— ঘরে যে-আসন তৈরি হবে তার উপরে আমার বিয়ের সেই লাল বেনারসি চাদরটা—

শম্ভুর প্রবেশ

শম্ভু। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁকে কি আজ রাত্রে থাকতে হবে।

মাসি। হাঁ, থাকতে হবে। [শম্ভুর প্রস্থান

যতীন। কিন্তু আজ ঘুমের ওষুধ না। তাতে আমার ঘুমও যায় ঘুলিয়ে, জাগাও যায় ঘুলিয়ে। বৈশাখদ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, মাসি। কাল সেই তিথি। মণিকে সেই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই : দু'মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ করে রইলে যে। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে বলেই এই দু'রাত আমার ঘুম হয় নি। আর দেরি নয়, এর পরে আর সময় পাব না। না মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো বেশ শান্ত ছিলে। আজ কেন—

মাসি। ওরে যতীন, ভেবেছিলুম আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে— আজ আর পারছি নে।

যতীন। হিমি তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন।

মাসি। বিশ্রাম করতে গেল। একটু পরেই আবার আসবে।

যতীন। মণিকে ডেকে দাও।

মাসি। যাচ্ছি বাবা, শম্ভু দরজার কাছে রইল। যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো। [প্রস্থান

—

পাশের ঘরে অখিলের প্রবেশ

[তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হিমি উঠিয়া দাঁড়াইল]

হিমি। মাসিকে ডেকে দিই।

অখিল। দরকার নেই। তেমন জরুরি কিছু নয়।

হিমি। দাদার ঘরে কি যাবেন।

অখিল। না, এইখান থেকেই খবর নিয়ে যাব। যতীন কেমন আছে।

হিমি। ডাক্তার বলেন, আজ অবস্থা ভালো নয়।

অখিল। কদিন থেকে তোমরা দিনরাত্রিই খাটছ। আমি এলুম তোমাদের একটু জিরোতে দেবার জন্যে। বোধ হয় রোগীর সেবা আমিও কিছু কিছু—

হিমি। না, সে হতেই পারে না। আমি কিছু শ্রান্ত হই নি।

অখিল। আচ্ছা, নাহয় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করি।

হিমি। এ-সব কাজ—

অখিল। জানি, ওকালতির চেয়ে অনেক বেশি শক্ত।

হিমি। না, আমি তা বলছি নে।

অখিল। না, সত্যি কথা। আমাকে যদি বার্লি তৈরি করতে হয়, আমি হয়তো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

হিমি। কী বলছেন আপনি।

অখিল। একটুও বাড়িয়ে বলছি নে। ঘরে আগুন লাগানো আমাদের অভ্যেস। বুঝতে পারছ না ?— দেখো-না কেন, তুমি তো যতীনের জন্যে বার্লি তৈরি করছ, আমি হয়তো এমন কিছু তৈরি করে বসে আছি যেটা রোগীর পথ্য নয়, অরোগীর পক্ষেও গুরুপাক। তুমি বোসো, দুটো কথা তোমার সঙ্গে কয়ে নিই।

হিমি। এখন কিন্তু গল্প করবার মতো—

অখিল। রামো ! গল্প করতে পারলে আমাদের ব্যাবসা ছেড়ে দিতুম, দ্বিতীয় বঙ্কিম চাটুজ্জে হয়ে উঠতম। হাসছ কী। আমাদের অনেক কথাই বানাতে হয়, একটুও ভালো লাগে না— গল্প বানাতে পারলে এ ব্যাবসা ছেড়ে দিতুম। তুমি বোধ হয় গল্প লেখা শুরু করেছ ?

হিমি। না।

অখিল। নাটক তৈরি—

হিমি। না, আমার ও-সব আসে না।

অখিল। কী করে জানলে।

হিমি। ভাষায় কুলোয় না।

অখিল। নাটক তৈরি করতে ভাষার দরকার হয় না। খাতাপত্র কিছুই চাই নে। হয়তো এখনই তোমার নাটক শুরু হয়েছে-বা, কে বলতে পারে।

হিমি। আমি যাই, মাসিকে ডেকে দিই।

অখিল। না, দরকার হবে না। আমি বাজে কথা বন্ধ করলুম, কাজের কথাই পাড়ব। ভেবেছিলুম যতীনকেই বলব। কিন্তু তার শরীর যে-রকম এখন—

হিমি। তাঁর ব্যাবসার কোনো গুজব আমার কানে উঠেছে কি না এ কথা প্রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি হয়তো—

অখিল। আমি জানি, ব্যাবসা গেছে তলিয়ে—

হিমি। পায়ে পড়ি, তাঁকে এ খবর দেবেন না। আর যাই হোক, তাঁর এই বাড়িটা তো—

অখিল। যতীন বাড়ির কথা বলে নাকি।

হিমি। কেবল ঐ কথাই বলছেন। একদিন ধুম ক'রে গৃহপ্রবেশ হবে, তারই প্ল্যান—

অখিল। গৃহপ্রবেশের আয়োজন তো হয়েছে—

হিমি। আপনি কী করে জানলেন।

অখিল। আমার আপিস থেকেই হয়েছে— পেয়াদারা বেশভূষা ক'রে প্রায় তৈরি—

হিমি। দেখুন অখিলবাবু, এ হাসির কথা নয়—

অখিল। সে কি আর আমি জানি নে। তোমার কাছে লুকিয়ে কী হবে। এ বাড়িটা দেনায়—

হিমি। না না না— সে হতেই পারবে না— অখিলবাবু, দয়া করবেন—

অখিল। কিন্তু এত ভাবছ কেন। তুমি তো সব জানই। তোমাদের দাদা তো আর বেশিদিন—

হিমি। জানি জানি, দাদা আর থাকবেন না, সেও সহ্য হবে, কিন্তু তাঁর এই বাড়িটিও যদি যায় তা হলে বুক ফেটে মরে যাব। এ যে তাঁর প্রাণের চেয়ে—

অখিল। দেখো, তুমি সাহিত্যে গণিতে লজিকে ক্লাসে পুরো মার্কা পেয়ে থাক, কিন্তু সংসারজ্ঞানে থার্ড ক্লাসেও পাস করতে পারবে না। বিষয়কর্মে হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থ নেই, ওর নিয়ম—

হিমি। আমি জানি নে। আপনার পায়ে পড়ি, এ বাড়ি আপনাকে বাঁচাতে হবে। আপনার আপিসের—

অখিল। পেয়াদাগুলোকে সাজাতে হবে বাজনদার করে, হাতে দিতে হবে বাঁশি। ল কলেজে লয়তত্ত্বের সব অধ্যায় শিখেছি, কেবল তানলয়ের পালাটা প্র্যাক্‌টিস হয় নি। এটা হয়তো বা তোমার কাছ থেকেই—

মাসির প্রবেশ

মাসি। অখিল, কী হচ্ছে। হিমি কাঁদছে কেন।

অখিল। গৃহপ্রবেশের প্ল্যানে একটু খটকা বেধেছে তাই নিয়ে—

মাসি। তা ওর সঙ্গে এ-সব কথা কেন।

অখিল। ওর দাদা যে ওরই উপরে গৃহপ্রবেশের ভার দিয়েছে, শুনছি কাজটাতে কোনো বাধা না হয়, এইজন্যে এত লোককে ছেড়ে আমাকেই ধরেছে। তা তোমরা যদি সকলেই মনে কর, তা হলে চাই-কি গৃহপ্রবেশের কাজে আমিও কোমর বেঁধে লাগতে পারি। কথাটা বুঝেছ, কাকি ?

মাসি। বুঝেছি। শুধু কোমর বাঁধা নয়, বাঁধন আরো পাকা করতে চাও। এখন সে পরামর্শ করবার সময় নয়। আপাতত যতীনকে তুমি আশ্বাস দিয়ো যে তার বাড়িতে কারও হাত পড়বে না।

অখিল। বেশ তো, বললেই হবে পাটের বাজার চড়েছে। এখন এঁকে চোখের জলটা মুছতে বলবেন—

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। উকিল যে! তবেই হয়েছে।

অখিল। দেখুন, শনি বড়ো না কলি বড়ো, তা নিয়ে তর্ক করে লাভ কী। বাংলাদেশে আপনাদের হাত পার হয়েও যে-কটি লোক টিকে থাকে, তাদেরই সামান্য শাঁসটুকু নিয়েই আমাদের কারবার—

ডাক্তার। এ ঘরে সে কারবার চালাবার আর বড়ো সময় নেই, দেখে এসেছি।

অখিল। ভয় দেখাবেন না মশায়, মৃত্যুতেই আপনাদের ব্যাবসা খতম, আমাদেরটা ভালো ক'রে জমে তার পর থেকে। না না, থাক্ থাক্, ও-সব কথা থাক্— কাকি, এই বলে যাচ্ছি, গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের সমস্ত ভার নিতে রাজি আছি— তার সঙ্গে সঙ্গে উপরি আরো-কিছু ভারও। বাইরের ঘরে থাকব, যখন দরকার হয় ডেকে পাঠিয়ো।

[প্রস্থান

ডাক্তার। এখনো বউমা এল না। আপনিও তো অনেকক্ষণ ওর ঘরে যান নি।

মাসি। মণির কথা জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি নে। আর তো আমি কথা বানিয়ে উঠতে পারি নে— নিজের উপর ধিক্কার জন্মে গেল। ও একটু ঘুমিয়ে পড়লে তার পরে ঘরে যাব।

ডাক্তার। আমি বাইরে অপেক্ষা করব। রুগী কেমন থাকে ঘণ্টাখানেক পরে খবর দেবেন। ইতিমধ্যে উকিলকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, ওদের মুখ দেখলে সহজ অবস্থাতেই নাড়ী ছাড়ব ছাড়ব করে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

রোগীর ঘরে দ্বারের কাছে শম্ভু

প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী। এই যে, শম্ভু।

শম্ভু। হ্যাঁ, দিদি।

প্রতিবেশিনী। একবার যতীনকে দেখে যেতে চাই। মাসি নেই, এইবেলা—

শম্ভু। কী হবে গিয়ে, দিদি।

প্রতিবেশিনী। নাটোরের মহারাজার ওখানে একটা কাজ খালি হয়েছে। আমার ছেলের জন্যে যতীনের কাছ থেকে একখানা চিঠি লিখিয়ে—

শম্ভু। দিদি, সে কোনোমতেই হবে না। মাসি জানতে পারলে রক্ষে থাকবে না।

প্রতিবেশিনী। জানবে কী ক'রে। আমি ফস্ করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে—

শম্ভু। মাপ করো দিদি, সে কোনোমতেই হবে না।

প্রতিবেশিনী। হবে না! তোমার মাসি মনে করেন, আমাদের ছোঁয়াচ লাগলে তাঁর বোনপো বাঁচবে না। এদিকে নিজের কথাটা ভেবে দেখেন না। স্বামীটিকে খেয়েছেন, একটিমাত্র মেয়ে সেও গেছে, বাপমা কাউকেই রাখলে না। এইবার বাকি আছে ঐ যতীন। ওকে শেষ করে তবে উনি নড়বেন। নইলে ওঁর আর মরণ নেই। আমি বলে রাখলুম শম্ভু, দেখে নিস্— মাসিতে যখন ওকে পেয়েছে, যতীনের আশা নেই।

শম্ভু। ঐ আমাকে ডাকছেন। তুমি এখন যাও।

প্রতিবেশিনী। ভয় নেই, আমি চললুম। [প্রস্থান

ঘরে শম্ভুর প্রবেশ

যতীন। (পায়ের শব্দে চমকাইয়া) মণি!

শম্ভু। কর্তাবাবু, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকছিলেন?

যতীন। একবার তোর বউঠাকরুনকে ডেকে দে।

শম্ভু। কাকে।

যতীন। বউঠাকরুনকে।

শম্ভু। তিনি তো এখনো ফেরেন নি।

যতীন। কোথায় গেছেন।

শম্ভু। সীতারামপুরে।

যতীন। আজ গেছেন?

শম্ভু। না, আজ তিন দিন হল।

যতীন। তুই কে? আমি কি চোখে ঠিক দেখছি।

শম্ভু। আমি শম্ভু।

যতীন। ঠিক করে বল্ তো, আমার তো কিছু ভুল হচ্ছে না?

শম্ভু। না, বাবু।

যতীন। কোন্ ঘরে আছি আমি? এই কি সীতারামপুর।

শম্ভু। না, কলকাতায় এ তো আপনার শোবার ঘর।

যতীন। মিথ্যে নয়? এ সমস্তই মিথ্যে নয়?

শম্ভু। আমি মাসিমাকে ডেকে দিই। [প্রস্থান

মাসির প্রবেশ

যতীন। আমি যে মরে যাই নি, তা কী করে জানব, মাসি। হয়তো সবই উলটে গেছে।

মাসি। ও কী বলছিস, যতীন।

যতীন। তুমি তো আমার মাসি?

মাসি। না তো কী, যতীন।

যতীন। হিমিকে ডেকে দাও-না, সে আমার পাশে বসুক। সে যেন থাকে আমার কাছে। এখনই যেন কোথাও না যায়।

মাসি। আয় তো হিমি, এখানে বোস্ তো!

যতীন। ঐ বাঁশিটা থামিয়ে দাও-না। ওটা কি গৃহপ্রবেশের জন্যে আনিয়েছ। ওর আর দরকার নেই।

মাসি। পাশের বাড়িতে বিয়ে, ও বাঁশি সেইখানে বাজছে।

যতীন। বিয়ের বাঁশি ? ওর মধ্যে অত কান্না কেন। বেহাগ বুঝি ? তোমাকে কি আমার স্বপ্নের কথা বলেছি, মাসি।

মাসি। কোন্ স্বপ্ন।

যতীন। মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্যে দরজা ঠেলছিল। কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কিছুতেই ঢুকতে পারলে না। অনেক করে ডাকলুম, তার আর গৃহপ্রবেশ হল না। হল না, হল না, হল না।—

[মাসি নিরুত্তর

বুঝেছি মাসি, বুঝেছি, আমি দেউলে। একেবারে দেউলে। সব দিকে। এ বাড়িটাও নেই— সব বিক্রি হয়ে গেছে, কেবল নিজেকে ভোলাচ্ছিলুম।

মাসি। না যতীন, না, শপথ করে বলছি তোর বাড়ি ঠিক আছে— অখিল এসেছে, যদি বলিস তাকে ডেকে দিই।

যতীন। বাড়িটা তবে আছে ? সে তো অপেক্ষা করতে পারবে, আমার মতো সে তো ছায়া নয়। বৎসরের পর বৎসর সে দরজা খুলে থাক্-না দাঁড়িয়ে। কী বল, মাসি।

মাসি। থাকবে বৈকি যতীন, তোর ভালোবাসায় ভরা হয়ে থাকবে।

যতীন। ভাই হিমি, তুই থাকবি আমার ঘরটিতে। একদিন হয়তো সময় হবে, ঘরে প্রবেশ করবে। সেদিন যে-লোকেই থাকি, আমি জানতে পারব। হিমি, হিমি !

হিমি। কী, দাদা।

যতীন। তোর উপর ভার রইল, বোন। মনে আছে, কোন্ গানটা গাবি ?

হিমি। আছে— অগ্নিশিখা, এসো এসো।

যতীন। লক্ষ্মী বোন আমার, কারও উপর রাগ করিস নে। সবাইকে ক্ষমা করিস। আর আমাকে যখন মনে করবি তখন মনে করিস, 'আমাকে দাদা চিরদিন ভালোবাসত, আজও ভালোবাসে।' জান মাসি, আমার এই বাড়িতেই হিমির বিয়ে হবে ? আমাদের সেই পুরোনো দালানে, যেখানে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল। সে দালানে আমি একটুও হাত দিই নি।

মাসি। তাই হবে, বাবা।

যতীন। মাসি, আর-জন্মে তুমি আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।

মাসি। বলিস কী, যতীন। আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব ? নাহয় তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে। সেই কামনাই কর্-না।

যতীন। না, ছেলে না— ছিঃ ! ছোটোবেলায় যেমন ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়ে তুমি আমার ঘরে আসবে। আমি তোমাকে সাজাব।

মাসি। আর বকিস নে, একটু ঘুমো।

যতীন। তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী—

মাসি। ও তো একেলে না হল না।

যতীন। না, একেলে না। তুমি চিরদিন আমার সাবেককেলে। সেই তোমার সুধায়-ভরা সাবেককাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।

মাসি। তোর ঘরে কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করি নে।

যতীন। তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর, মাসি ? দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও ?

মাসি। বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্বল। তাই তোকে বড়ো ভয়ে ভয়ে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।

যতীন। মাসি, একটা কথা গর্ব করে বলতে পারি। যা পাই নি তা নিয়ে কোনোদিন কাড়াকাড়ি করি নি। সমস্ত জীবন হাতজোড় করে অপেক্ষাই করলুম। মিথ্যাকে চাই নি বলেই এত সবুর করতে হল। সত্য হয়তো এবার দয়া করবেন।— ও কে ও, মাসি ও কে।

মাসি। কই, কেউ তো না, যতীন।
যতীন। তুমি একবার ও-ঘরটা দেখে এসোগে, আমি যেন—
মাসি। না বাছা, কাউকে দেখছি নে।
যতীন। আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—
মাসি। কিচ্ছু না, যতীন।

ডাক্তারের প্রবেশ

যতীন। ও কে ও। কোথা থেকে আসছ ? কিছু খবর আছে ?
মাসি। উনি ডাক্তার।
ডাক্তার। আপনি ওঁর কাছে থাকবেন না— আপনার সঙ্গে বড়ো বেশি কথা কন—
যতীন। না, মাসি, যেতে পাবে না।
মাসি। আচ্ছা, বাছা, আমি ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।
যতীন। না, না, আমার পাশে বোসো, আমার হাত ধ'রে। ভগবান তোমার হাত থেকেই আমাকে নিজের হাতে নেবেন।
ডাক্তার। আচ্ছা বেশ। কিন্তু কথা কবেন না। আর, সেই ওষুধটা খাবার সময় হল।
যতীন। সময় হল ? আবার ভোলাতে এসেছ ? সময় পার হয়ে গেছে। মিথ্যে সান্ত্বনায় আমার দরকার নেই। বিদায় করে দাও, সব বিদায় করে দাও। মাসি, এখন আমার তুমি আছ— কোনো মিথ্যাকেই চাই নে। আয় ভাই হিমি, আমার পাশে বোস।
ডাক্তার। এতটা উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।
যতীন। তবে আমাকে আর উত্তেজিত কোরো না।—

[ডাক্তারের প্রস্থান

ডাক্তার গেছে, এইবার আমার বিছানায় উঠে বোসো, তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।
মাসি। শোও বাবা, একটু ঘুমোও।
যতীন। ঘুমোতে বোলো না, এখনো আমার আর-একটু জেগে থাকবার দরকার আছে। শুনতে পাচ্ছ না ? আসছে। এখনই আসবে। চোখের উপর কী রকম সব ঘোর হয়ে আসছে। গোধূলিলগ্ন, গোধূলিলগ্ন আমার। বাসরঘরের দরজা খুলবে। হিমি ততক্ষণ ঐ গানটা— জীবনমরণের সীমানা পারায়ে।

হিমির গান

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু'বাহু বাড়ায়ে।
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া।
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে—
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে।

মণির প্রবেশ

মাসি। বাবা, যতীন, একটু চেয়ে দেখ্। ঐ যে এসেছে।
যতীন। কে। স্বপ্ন ?
মাসি। স্বপ্ন নয়। বাবা, মণি। ঐ যে তোমার শ্বশুর।
যতীন। (মণির দিকে চাহিয়া) তুমি কে।
মাসি। চিনতে পারছ না ? ঐ তো তোমার মণি।
যতীন। দরজাটা কি সব খুলে গেছে।
মাসি। সব খুলেছে।
যতীন। কিন্তু পায়ের উপর ও শালটা নয়, ও শালটা নয়। সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও।
মাসি। শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে। ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর্।

শেষ বর্ষণ

শেষ বর্ষণ

রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকা

গান আরম্ভ

রাজা। ওহে থামো তোমরা, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও-না।

নটরাজ। (পুঁথি দিয়া) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভালো বুঝতে পারি নে। কী লিখছে? 'শেষ বর্ষণ'।

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা বেশ ভালো। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ। কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে খেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তার পরে জগতে তার মতো অদরকারি আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না; তাই সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালাল কেন?

নটরাজ। পাছে মহারাজ বলে বসেন, ভাব অর্থ সুর তান লয়, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না সেই ভয়ে। লোকটা বড়ো ভিতু।

রাজকবি। এ তো বড়ো কৌতুক। পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপসা।

রাজা। তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ। ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালান নি। অস্তসূর্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘে রঙ ছড়িয়ে আছে।

রাজকবি। তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড়ো সাদা।

নটরাজ। ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রঙ খুলতে থাকবে।

রাজা। কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে?

নটরাজ। সে ভার আমার উপর। ইশারায় বুঝিয়ে দেব।

রাজা। আমার কাছে ইশারা চলবে না। বিদ্যুতের ইশারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে?

নটরাজ। বর্ষাকে আহ্বান ক'রে।

রাজা। বর্ষাকে আহ্বান! এই আশ্বিন মাসে!

রাজকবি। ঋতু-উৎসবের শবসাধনা? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুলবেন। অদ্ভুত রসের কীর্তন।

নটরাজ। কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তার পরে আলো।

রাজা। (পারিষদের প্রতি) মানে কী হে?

পারিষদ। মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের হেঁয়ালি বরঞ্চ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজকবি। যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, টানলে আরো বাড়তে থাকে।

নটরাজ। বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তা হলেই সহজে বুঝবেন। জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা। রোসো রোসো। বর্ষাকে ডাকা কী রকম? বর্ষা তো নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ। সে তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা। গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরই বাঁধা?

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। এই আর এক বিপদ।

রাজকবি। নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্বদলকে খবর দিন-না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক তা হলে কবির পক্ষে 'শেষ বর্ষণ' নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ। রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উলটে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খত দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এরকম নয়।

রাজা। ওহে নটরাজ, রস জিনিসটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিসটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি-বা না পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তা হলে তো আমার মতো লোকের মুশকিল।

নটরাজ। মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্মা।

পারিষদ। অলমতিবিস্তরেণ। তোমাদের ধর্মে যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মতো সহ্য করব।

নটরাজ। (গায়কগায়িকাদের প্রতি) ঘনমেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘন বরিষনে জল-কলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি প্রাণের আকাশের পুব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝরো ঝরো'।

ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি।

নটরাজ। শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারায় একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ঐ শুনুন মহারাজ মেঘমল্লার।—

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে।

রাজা। পুব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আসে?
নটরাজ। শ্রাবণের পূর্ণিমা।
রাজকবি। শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইশারায়।
রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।
নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার জিত, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালাবদল। ওগো কলস্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আনলে।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল।
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপনলোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

রাজা। বেশ, বেশ, এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

রাজা। ঐ দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই বুঝি?

নটরাজ। মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরই জ্বালা।
তোমার মন্ত্রবলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।
মরো মরো পাতায় পাতায়
ঝরো ঝরো বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে।
সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ-ঢালা।

রাজা। সব রকমের খ্যাপামিই তো হল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী?

নটরাজ। বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ", সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আনমনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য, ধরো হে—

পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী।
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরান আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।

নটরাজ। বিরহীর বেদনা রূপ ধ'রে দাঁড়াল, ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল কিন্তু ওর বাণীটি আছে তোমার কণ্ঠে, মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।

চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

রাজা। আর নয় নটরাজ, বিরহের পালাটাই বড়ো বেশি হয়ে উঠল, ওজন ঠিক থাকছে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারি দিকে ছলছল করছে, মিলনপদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।

রাজকবি। তাই না হয় হল কিন্তু অশ্রুবাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেললে তো চলবে না।

নটরাজ। মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য একবার শুনিয়ে দাও তো।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা-মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।

রাজা। আঃ, এতক্ষণ একটু উৎসাহ লাগল। থামলে চলবে না। দেখো-না, তোমাদের মাদলওআলার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। বলি ও ওস্তাদ, ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল, ওরা যে খ্যাপার মতো চলেছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো-না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক-না সুরে কথায় মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে ;
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

রাজকবি। ঐ রে, আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরি নেই, আবার কান্না নামল বলে।

নটরাজ। ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্ছে চোখের জলেরই জিত। বর্ষার রাতে সাথিহারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো; আজ বুঝি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা ভৈরবীতে করুণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথিহারা রাতে।
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে।
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে।

রাজা। কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য, তবে ঐটে শুরু করো।

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে,
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িত-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী।
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,

কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া,
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে ;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে।
এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

রাজা। বাঃ, বেশ জমেছে। আমি বলি আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ দেখছেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব। শেষ কেয়াফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভরে উঠল। ঐ যে 'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।

একলা বসে বাদলশেষে শুনি কত কী।
'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে
ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল
নইলে যেত কি।
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি।

রাজা। নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।

নটরাজ। তা হলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।

রাজা। তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মান, রাজার কথা মান না ? আমি যদি বলি যেতে দেব না ?

নটরাজ। তা হলে আমিও তাই বলব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো করুণিকা, বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায় ?

নাট্যাচার্য। নটরাজ, ও বলছে ওর সময় গেল।

নটরাজ। গেলই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনই তো শুরু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগলমিলন।

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
পুব হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে',
শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল বলে,
বিনা কাজে আকাশমাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে।'
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথিহীন।
পুব হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো',
শরৎ বলে, 'মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।'

নটরাজ। শরতের প্রথম প্রত্যুষে ঐ যে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দয়া করবেন কথা কবেন না।

রাজা। নটরাজ, তুমিও তো কথা কইতে কসুর কর না।

নটরাজ। আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা। আর আমার হল তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার নাহয় হল নুড়ি, দুইয়ে মিলেই তো ঝরনা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁর সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ। এবার বুঝেছি আপনি ছদ্মরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইল না। গীতাচার্য গান ধরো।

দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো, সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ওই শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়
আয় আয় আয়।

নটরাজ। ঐ দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌঁচেছে। আকাশের আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাবান্তরে লিখে দিল ঐ শেফালি। সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্তে, তার ব্যথা কজন বোঝে? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওলো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রুপালি।
বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
কাননবীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি।

রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে?

নটরাজ। আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়ারূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপিণীর নূপুর বাজল, কঙ্কণ চমক দিল কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন।
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়।
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন।
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসাযাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ।

নটরাজ। শুভ্র শান্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাবে— আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন। রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে, তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো না।
আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জলে ছায়াছবি সৃজনে,
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে,
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না।
ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা,
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
ওই বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে
আজি তোমাদের সাজায়ে দিল কে ?
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি,
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।

নটরাজ। প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদ্গদ, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতীবিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী বোলো।

গোপন অশ্রুজলে মিলুক শরম-হাসি—
মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহমিলনে গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো। [অবগুণ্ঠন মোচন

নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে?

তোমার নাম জানি নে সুর জানি।
তুমি শরৎপ্রাতের আলোর বাণী।
সারাবেলা শিউলিবনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি!
আমি যা বলিতে চাই হল বলা,
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি।

রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে? বলো তো এবার কে আসবে?

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

সুন্দরের প্রবেশ

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা।
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে।
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন?

নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝড়ে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়াআসায় স্বর্গমর্তের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।

কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহ নি ফিরে,
কার বিষাদের শিশিরনীরে
এলে নাহিয়া।
ওগো অকরুণ, কী মায়া জান,
মিলনছলে বিরহ আন।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধারপানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া।

নটরাজ। এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু থাকি সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে।
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হল গত
নিশিশেষের তারার মতো
তারে শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ সাথে।

রাজা। ও কী। একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি ? কেবল দুদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হল, গান সারা হল এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা— তার পরে ?

নটরাজ। 'তার পরে' প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা, এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই চরম। তার পরে ? কেউ চুপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রোখে, কেউ ভোলে কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায় ?

গান আমার যায় ভেসে যায়,
চাস নে ফিরে দে তারে বিদায়।
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশিরফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়।
কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চলে কতই তরী
উজানবায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।

রাজা। উত্তম হয়েছে।

রাজকবি। আরো অনেক উত্তম হতে পারত।

নটীর পূজা

নাট্যোল্লিখিত পাত্রীগণ

লোকেশ্বরী	রাজমহিষী, মহারাজ বিম্বিসারের পত্নী
মল্লিকা	মহারানী লোকেশ্বরীর সহচরী
বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা ভদ্রা	রাজকুমারীগণ
উৎপলপর্ণা	বৌদ্ধ ভিক্ষুণী
শ্রীমতী	বৌদ্ধধর্মরতা নটী
মালতী	বৌদ্ধধর্মানুরাগিণী পল্লীবালা, শ্রীমতীর সহচরী
রাজকিংকরী ও রক্ষিণীগণ	

সূচনা

ভিক্ষু উপালির প্রবেশ

গান

পূর্বগগনভাগে
    দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
        তরুণারুণরাগে।
শুভ্র শুভ মুহূর্ত আজি
        সার্থক কর'রে,
        অমৃতে তর'রে,
অমিতপুণ্যভাগী কে
        জাগে, কে জাগে।

কে আছ? ভিক্ষা চাই, ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা আমার।

নটীর প্রবেশ ও প্রণাম

শুভমস্তু কল্যাণম্। বৎসে, তুমি কে?

নটী। আমি এই রাজবাড়ির নটী।

উপালি। এই পুরীতে আজ একা কেবল তুমিই জেগে?

নটী। রাজকন্যারা সকলেই ঘুমিয়ে আছেন।

উপালি। ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই।

নটী। প্রভু, অনুমতি করুন, রাজকন্যাদের ডেকে আনি।

উপালি। আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি।

নটী। আমি যে অভাগী। প্রভুর ভিক্ষাপাত্রে আমার দান কুণ্ঠিত হবে। কী দেব অনুমতি করুন।

উপালি। তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান।

নটী। আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী সে তো আমি জানি নে।

উপালি। না, ভগবান তোমাকে দয়া করেছেন, তিনি জানেন।

নটী। প্রভু, তা হলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন যা আছে আমার।

উপালি। তাই নেবেন, তোমার পূজার ফুল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে পুষ্পবনের আত্মদানকে আপনিই জাগিয়ে তোলেন। তোমার সেইদিন এসেছে আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী।

নটী। আমি অপেক্ষা করে থাকব। [প্রস্থান

রাজকন্যাদের প্রবেশ

প্রভু, ভিক্ষা নিয়ে যান। ফিরে যাবেন না, ফিরে যাবেন না। এ কী হল? চলে গেলেন?

রত্নাবলী। ভয় কী তোমাদের বাসবী? ভিক্ষা নেবার লোকের অভাব নেই— ভিক্ষা দেবার লোকই কম।

নন্দা। না রত্না, ভিক্ষা নেবার লোককেই সাধনা করে খুঁজে পেতে হয়। আজকের দিন ব্যর্থ হল। [প্রস্থান

নটীর পূজা

প্রথম অঙ্ক

মগধপ্রাসাদ কুঞ্জবনে

মহারানী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা

লোকেশ্বরী। মহারাজ বিম্বিসার আজ আমাকে স্মরণ করেছেন?

ভিক্ষুণী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। আজ তাঁর অশোকচৈত্যে পূজা-আয়োজনের দিন— সেইজন্যেই বুঝি?

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমা।

লোকেশ্বরী। পূজা? কার পূজা?

ভিক্ষুণী। আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব— তাঁর উদ্দেশে পূজা।

লোকেশ্বরী। আর্যপুত্রকে বোলো গিয়ে আমার সব পূজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউ বা ফুল দেয় দীপ দেয়— আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি।

ভিক্ষুণী। কী বলছ মহারানী?

লোকেশ্বরী। আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র— রাজপুত্র আমার— তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।

ভিক্ষুণী। যাকে দিয়েছ তাকে হারাও নি। কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ।

লোকেশ্বরী। নারী, তোমার ছেলে আছে?

ভিক্ষুণী। না।

লোকেশ্বরী। কোনোদিন ছিল?

ভিক্ষুণী। না। আমি প্রথমবয়সেই বিধবা।

লোকেশ্বরী। তা হলে চুপ করো। যে কথা জান না সে কথা বোলো না।

ভিক্ষুণী। মহারানী, সত্যধর্মকে তুমিই তো রাজান্তঃপুরে সকলের প্রথমে আহ্বান করে এনেছিলে। তবে কেন আজ—

লোকেশ্বরী। আশ্চর্য— মনে আছে তো দেখি। ভেবেছিলেম সে কথা বুঝি তোমাদের গুরু ভুলে গিয়েছেন। ভিক্ষু ধর্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, একশো ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতিবৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বুদ্ধের ধর্মবৈরী দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলমল, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই পুরস্কার আমারই! যে-মহিষীরা বিদ্বেষে জ্বলেছিল, আমার অন্নে বিষ মিশিয়েছে যারা, তাদের তো কিছুই হল না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

ভিক্ষুণী। সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয় মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

লোকেশ্বরী। যেদিন দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কুমার অজাতশত্রু, আমি নির্বোধ সেদিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সমুদ্র পার হতে চায়। দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা

থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভয়ে সগর্বে বললেম, দেবদত্তের চেয়েও যে-গুরু পুণ্যের জোর বেশি তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার। ভগবান বুদ্ধকে— শাক্যসিংহকে— আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্যপুত্রকে আশীর্বাদ করালেম। তবু জয় হল কার?

ভিক্ষুণী। তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিয়ো না।

লোকেশ্বরী। আমারই!

ভিক্ষুণী। নয় তো কী! পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে রাজ্য জয় করেছিলেন—

লোকেশ্বরী। সে রাজ্য মুখের কথা, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সে বিদ্রূপ; আর আমার দিকে তাকাও দেখি আমি আজ স্বামীসত্বে বিধবা, পুত্রসত্বে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা। এটা তো মুখের কথা নয়। যারা তোমাদের ধর্ম কোনোদিন মানে নি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে তোমরা যাঁকে বল শ্রীবজ্রসত্ত্ব, আজ কোথায় তিনি— পড়ুক-না তাঁর বজ্র এদের মাথায়।

ভিক্ষুণী। মহারানী, এর মধ্যে সত্য আছে কোথায়? এ তো ক্ষণকালের স্বপ্ন— যাক-না ওরা হেসে

লোকেশ্বরী। স্বপ্ন বটে! তা এই স্বপ্নটা আমি চাই নে। আমি চাই অন্য স্বপ্নটা, যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে বলে মান। সেই স্বপ্নে বিকশিত হয়ে ঐ দিকে যাঁরা মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছেন, বলো-না তাঁদের গিয়ে। পুজা দিন-না তাঁরা।

ভিক্ষুণী। যাই তবে।

লোকেশ্বরী। যাও, কিন্তু আমার মতো নির্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছুই হারাবে না, সবই থাকবে। ওরা তো বুদ্ধকে মানে নি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়ে নি, তাই বেঁচে গেল, বেঁচে গেল ওরা। অমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ধৈর্যের ভান করতে শিখেছ?

ভিক্ষুণী। কেমন করে বলব? এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী। ধৈর্য ভঙ্গ হয় তবু মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করছ। তোমাদের এই নীরব স্পর্ধা অসহ্য। যাও।

ভিক্ষুণীর প্রস্থানোদ্যম

শোনো শোনো, ভিক্ষুণী। চিত্র কী-একটা নতুন নাম নিয়েছে।— জান তুমি?

ভিক্ষুণী। জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী। যে-নামে তার মা তাকে ডেকেছে সেটা আজ তার কাছে অশুচি! তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল।

ভিক্ষুণী। মহারানী যদি ইচ্ছা কর তাঁকে একদিন তোমার কাছে আনতে পারি।

লোকেশ্বরী। আমি ইচ্ছা করতে যাব কোন্ লজ্জায়। আর আজ তুমি আনবে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেছে তাকে এই পৃথিবীতে!

ভিক্ষুণী। তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী। একটু থামো। তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

ভিক্ষুণী। হয়।

লোকেশ্বরী। আচ্ছা, একবার নাহয় তাকে— যদি সে— না, থাক্।

ভিক্ষুণী। আমি তাঁকে বলব। হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

[প্রস্থা

লোকেশ্বরী। হয়তো, হয়তো, হয়তো! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে 'হয়তো' ছিল না। এতদিনের সেই মাতৃঋণের দাবি আজ এই একটুখানি 'হয়তো'য় এসে ঠেকল। একে বলে ধর্ম! মল্লিকা!—

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। দেবী।

লোকেশ্বরী। কুমার অজাতশত্রুর সংবাদ পেলে?

মল্লিকা। পেয়েছি। দেবদত্তকে আনতে গেছেন। এ রাজ্যে ত্রিরত্ন-পূজার কিছুই বাকি থাকবে না।

লোকেশ্বরী। ভীরু! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে। বুদ্ধধর্মের কত যে শক্তি তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তবু ঐ অপদার্থ দেবদত্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হল না।

মল্লিকা। মহারানী, যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অমনি উনি দেবদত্ত-শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরো বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী। আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা। দেবী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মতোই তোমার এ কথা। তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারানীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে-সব খোঁটায় মানুষকে বাঁধে, ভগবান মহাবোধির কৃপায় সেই-সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী। দেখো ঐ-সব বানানো কথা শুনলে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতিনির্মল ফাঁকা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ঐ মাটিতে-মাখা খুঁটি ক'টা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তা হলে আবার নাহয় অশোকচৈত্যে দীপ জ্বালব, একশো শ্রমণকে অন্ন দেব, ওদের যত মন্ত্র আছে সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর তা যদি না হয় তো আসুন দেবদত্ত, তা তিনি সাঁচ্চাই হোন আর ঝুঁটোই হোন। যাই, একবার প্রাসাদশিখরে গিয়ে দেখি গে এঁরা কত দূরে।

[উভয়ের প্রস্থান

বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ

শ্রীমতী। (লতাবিতানতলে আসন বিছাইয়া, দূরে চাহিয়া) সময় হল, এসো তোমরা।

আপন-মনে গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে
কী জানি কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি কী জানি।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। তুমি শ্রীমতী?

শ্রীমতী। হাঁ গো, কেন বলো তো।

মালতী। প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে।

শ্রীমতী। প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্বে কখনো দেখি নি।

মালতী। নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী।

শ্রীমতী। কেন এলে বাছা? সেখানে কি দিন কাটছিল না? ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুশি; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে। ব্যর্থ হবে তোমার বসন্ত। গান শিখতে এসেছ? এইটুকু তোমার আশা?

মালতী। সত্যি বলব ? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বলতে সংকোচ হয়।

শ্রীমতী। ও, বুঝেছি। রাজরানী হবার দুরাশা। পূর্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি করে থাক তো হতেও পার। বনের পাখি সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুষ্টবুদ্ধি। যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী। কী তুমি বলছ দিদি, ভালো বুঝতে পারছি নে।

শ্রীমতী। আমি বলছি—

গান

বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায়
হায় অভাগী!
মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,
হায় অভাগী!

মালতী। তুমি আমাকে কিছুই বোঝ নি। তবে স্পষ্ট করে বলি। শুনেছি একদিন ভগবান বুদ্ধ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায়। মহারাজ বিম্বিসার সেইখানেই নাকি বেদী গড়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী। হাঁ, সত্য।

মালতী। রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন। আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধুলা ঝাঁট দেব এই আশা করে এখানে গায়িকার দলে ভর্তি হয়েছি।

শ্রীমতী। এসো এসো বোন, ভালো হল। রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোঁওয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম। তোমার নির্মল হাতদুখানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে ?

মালতী। কেমন করে বলব দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চলে। তার বয়স আঠারো। হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, 'কোথায় যাচ্ছিস ভাই', সে বললে, 'খুঁজতে।'

শ্রীমতী। নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ এক ডাকে ডেকেছে। পূর্ণচাঁদ উঠল।— এ কী। তোমার হাতে যে আংটি দেখি! কেমন লাগছে যে। স্বর্গের মন্দারকুঁড়ি তো ধুলোর দামে বিকিয়ে গেল না ?

মালতী। তবে খুলে বলি— তুমি সব কথা বুঝবে।

শ্রীমতী। অনেক কেঁদে বোঝবার শক্তি হয়েছে।

মালতী। তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চুপ করে তাঁকে দেখেছি। একদিন নিজে এসে বললেন, 'মালতীকে আমার ভালো লাগে।' বাবা বললেন, 'মালতীর সৌভাগ্য।' সব আয়োজন সারা হল যেদিন এলেন তিনি দ্বারে। বরের বেশে নয় ভিক্ষুর বেশে। কাষায়বস্ত্র, হাতে দণ্ড। বললেন, 'যদি দেখা হয় তো মুক্তির পথে, এখানে নয়।'— দিদি, কিছু মনে কোরো না— এখনো চোখে জল আসছে, মন যে ছোটো।

শ্রীমতী। চোখের জল বয়ে যাক-না। মুক্তিপথের ধুলো ঐ জলে মরবে।

মালতী। প্রণাম করে বললেম, 'আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয় নি। যে আংটি পরাবে কথা দিয়েছিলে, সেটি দিয়ে যাও।' এই সেই আংটি। ভগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খসে পড়বে সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী। কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চীবর পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে না পথিকের টানে। কতবার হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি— বলি, 'মহাপুরুষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।' রাজবাড়ির মেয়েরা ঐ আসছেন।

বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ

বাসবী। এ মেয়েটি কে! দেখি দেখি, চুল চূড়া করে বেঁধেছে, অলকে দিয়েছে জবা! নন্দা, দেখে যাও আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কী রকম উঁচু করে জড়িয়েছে। গলায় বুঝি কুঁচফলের হার? শ্রীমতী, এ কোথ থেকে এল?

শ্রীমতী। গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী। পেয়েছ একটি শিকার। ওকে শিষ্যা করবে বুঝি? আমাদের উদ্ধার করতে পারলে না, এখ গ্রামের মেয়ে ধরে মুক্তির ব্যাবসা চালাবে!

শ্রীমতী। গ্রামের মেয়ের মুক্তির ভাবনা কী? ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়ে নি, না ধুলায়, ন মণিমাণিক্যে; স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী। স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো, কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাই নে। গণেশে ইঁদুরের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই; বরঞ্চ যমরাজের মহিষটাকে মানতে রাজি আছি

নন্দা। রত্না, তোমার বাহন তো তৈরিই আছে, লক্ষ্মীর পেঁচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কে বিদ্রূপ? ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী। ওর চুপ করে থাকাই তো রাশীকৃত উপদেশ। ঐ দেখো-না, চুপি চুপি হাসছে! ওটা কি উপদে হল না?

রত্নাবলী। মহৎ উপদেশ! অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে জয় করবে, হাস্যের দ্বারা ভাষ্যকে

বাসবী। একটু ঝগড়া কর -না কেন, শ্রীমতী? এত মধুর কি সহ্য হয়! মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী। ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভান করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কে ভান করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু অমাবস্যা! সে যদি মেঘের মুখোশ পরে!

অজিতা। ঐ দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে, রাজবাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম, ভুলে গেছি।

মালতী। মালতী।

অজিতা। কী ভাবছিলে বলো-না।

মালতী। দিদিকে ভালোবেসেছি, তাই ব্যথা লাগছিল।

অজিতা। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলংকারশাস্ত্রের এ নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা। মালতী, কী একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিলে? বলেই ফেলো-না। আমাদের তুমি কী ভা জানতে ভারি কৌতূহল হয়।

মালতী। আমি বলতে চাচ্ছিলেম, 'হাঁ গা, তোমরা নিজের কথা শুনতেই এত ভালোবাস, গান শোনবা সময় বয়ে যায়।'

সকলের উচ্চহাস্য

বাসবী। হাঁ গা! হাঁ গা! রাজবাড়ির ব্যাকরণচঞ্চুকে ডাকো, তাঁর শিক্ষা সম্বোধনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছ নি।

রত্নাবলী। হাঁ গা বাসবী! হাঁ গা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা!

বাসবী। হাঁ গা রত্নাবলী! হাঁ গা ভুবনমোহনলাবণ্যকৌমুদী! ব্যাকরণের এ কী নূতন সম্পদ! সম্বোধ হাঁ গা!

মালতী। দিদি, এঁরা কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

নন্দা। ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্‌বালিকারা শিউলিবনে যখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ ক'রে কর না, তাদের আদর করবার প্রথাই ঐ।

মালতী। সত্যি বলব? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বলতে সংকোচ হয়।

শ্রীমতী। ও, বুঝেছি। রাজরানী হবার দুরাশা। পূর্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি করে থাক তো হতেও পার। বনের পাখি সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুষ্টবুদ্ধি। যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী। কী তুমি বলছ দিদি, ভালো বুঝতে পারছি নে।

শ্রীমতী। আমি বলছি—

গান

বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায়
হায় অভাগী!
মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,
হায় অভাগী!

মালতী। তুমি আমাকে কিছুই বোঝ নি। তবে স্পষ্ট করে বলি। শুনেছি একদিন ভগবান বুদ্ধ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায়। মহারাজ বিম্বিসার সেইখানেই নাকি বেদী গড়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী। হাঁ, সত্য।

মালতী। রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন। আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধুলা ঝাঁট দেব এই আশা করে এখানে গায়িকার দলে ভর্তি হয়েছি।

শ্রীমতী। এসো এসো বোন, ভালো হল। রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোঁওয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম। তোমার নির্মল হাতদুখানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে?

মালতী। কেমন করে বলব দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চলে। তার বয়স আঠারো। হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, 'কোথায় যাচ্ছিস ভাই', সে বললে, 'খুঁজতে।'

শ্রীমতী। নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ এক ডাকে ডেকেছে। পূর্ণচাঁদ উঠল।— এ কী। তোমার হাতে যে আংটি দেখি! কেমন লাগছে যে। স্বর্গের মন্দারকুঁড়ি তো ধুলোর দামে বিকিয়ে গেল না?

মালতী। তবে খুলে বলি— তুমি সব কথা বুঝবে।

শ্রীমতী। অনেক কেঁদে বোঝবার শক্তি হয়েছে।

মালতী। তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চুপ করে তাঁকে দেখেছি। একদিন নিজে এসে বললেন, 'মালতীকে আমার ভালো লাগে।' বাবা বললেন, 'মালতীর সৌভাগ্য।' সব আয়োজন সারা হল যেদিন এলেন তিনি দ্বারে। বরের বেশে নয় ভিক্ষুর বেশে। কাষায়বস্ত্র, হাতে দণ্ড। বললেন, 'যদি দেখা হয় তো মুক্তির পথে, এখানে নয়।'— দিদি, কিছু মনে কোরো না— এখনো চোখে জল আসছে, মন যে ছোটো।

শ্রীমতী। চোখের জল বয়ে যাক-না। মুক্তিপথের ধুলো ঐ জলে মরবে।

মালতী। প্রণাম করে বললেম, 'আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয় নি। যে আংটি পরাবে কথা দিয়েছিলে, সেটি দিয়ে যাও।' এই সেই আংটি। ভগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খসে পড়বে সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী। কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চীবর পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে না পথিকের টানে। কতবার হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি— বলি, 'মহাপুরুষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।' রাজবাড়ির মেয়েরা ঐ আসছেন।

বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ

বাসবী। এ মেয়েটি কে! দেখি দেখি, চুল চূড়া করে বেঁধেছে, অলকে দিয়েছে জবা! নন্দা, দেখে যাও, আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কী রকম উঁচু করে জড়িয়েছে। গলায় বুঝি কুঁচফলের হার? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এল?

শ্রীমতী। গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী। পেয়েছ একটি শিকার। ওকে শিষ্যা করবে বুঝি? আমাদের উদ্ধার করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধরে মুক্তির ব্যাবসা চালাবে!

শ্রীমতী। গ্রামের মেয়ের মুক্তির ভাবনা কী? ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়ে নি, না ধুলায়, না মণিমাণিক্যে; স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী। স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো, কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাই নে। গণেশের ইঁদুরের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই; বরঞ্চ যমরাজের মহিষটাকে মানতে রাজি আছি।

নন্দা। রত্না, তোমার বাহন তো তৈরিই আছে, লক্ষ্মীর পেঁচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিদ্রূপ? ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী। ওর চুপ করে থাকাই তো রাশীকৃত উপদেশ। ঐ দেখো-না, চুপি চুপি হাসছে! ওটা কি উপদেশ হল না?

রত্নাবলী। মহৎ উপদেশ! অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে জয় করবে, হাস্যের দ্বারা ভাষ্যকে।

বাসবী। একটু ঝগড়া কর -না কেন, শ্রীমতী? এত মধুর কি সহ্য হয়! মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী। ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভান করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কের ভান করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু অমাবস্যা! সে যদি মেঘের মুখোশ পরে!

অজিতা। ঐ দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে, রাজবাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই, কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম, ভুলে গেছি।

মালতী। মালতী।

অজিতা। কী ভাবছিলে বলো-না।

মালতী। দিদিকে ভালোবেসেছি, তাই ব্যথা লাগছিল।

অজিতা। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলংকারশাস্ত্রের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা। মালতী, কী একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিলে? বলেই ফেলো-না। আমাদের তুমি কী ভাব জানতে ভারি কৌতূহল হয়।

মালতী। আমি বলতে চাচ্ছিলেম, 'হাঁ গা, তোমরা নিজের কথা শুনতেই এত ভালোবাস, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।'

সকলের উচ্চহাস্য

বাসবী। হাঁ গা! হাঁ গা! রাজবাড়ির ব্যাকরণচঞ্চুকে ডাকো, তাঁর শিক্ষা সম্বোধনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

রত্নাবলী। হাঁ গা বাসবী! হাঁ গা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা!

বাসবী। হাঁ গা রত্নাবলী! হাঁ গা ভুবনমোহনলাবণ্যকৌমুদী! ব্যাকরণের এ কী নূতন সম্পদ! সম্বোধনে হাঁ গা!

মালতী। দিদি, এঁরা কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

নন্দা। ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্‌বালিকারা শিউলিবনে যখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ ক'রে করে না, তাদের আদর করবার প্রথাই ঐ।

অজিতা। ঐ দেখো, শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্ছে। আমাদের কথা ওর কানেই পৌঁচচ্ছে না। শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাও-না, আমরাও যোগ দেব!

শ্রীমতীর গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি!
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি, কী জানি!
নানা কাজে নানা মতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে—
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি!
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়—
একি ভয়, একি জয়!
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
'আর নয়, আর নয়।'
সে কথা কি নানা সুরে
বলে মোরে, 'চলো দূরে'—
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি!

বাসবী। মালতী, তোমার চোখে যে জল ভরে এল। এ গানের মধ্যে কী বুঝলে বলো তো।
মালতী। শ্রীমতী ডাক শুনেছে।
বাসবী। কার ডাক?
মালতী। যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—
বাসবী। কে, কে তোমার?
শ্রীমতী। মালতী, বোন আমার, চুপ, আর বলিস নে। চোখ মুছে ফেল্, এ কাঁদবার জায়গা নয়।
বাসবী। শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন? তুমি কি মনে ভাব আমরা কেবল হাসতেই জানি?
ভদ্রা। আমরা কি একেবারেই জানি নে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না?
মালতী। রাজকুমারী, আজ তো বাতাসে বাতাসে কথা চলছে, তোমরা শোন নি?
নন্দা। সকালের আলোতে পদ্মের পাপড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল তো খোলে না।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ। সকলের প্রণাম

লোকেশ্বরী। আমি সহ্য করতে পারছি নে। ঐ শুনছ না রাস্তায় রাস্তায় স্তবের ধ্বনি— ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সংঘায় মহত্তমায়। শুনলে এখনো আমার বুকের ভিতর দুলে ওঠে।
(কানে হাত দিয়া) আজই থামিয়ে দেওয়া চাই। এখনই! এখনই!
মল্লিকা। দেবী, শান্ত হোন।
লোকেশ্বরী। শান্ত হব কিসে? কোন্ মন্ত্রে শান্ত করবে? সেই, নমঃ পরমশান্তায় মহাকারুণিকায়— এ মন্ত্র আর নয়, আর নয়। আমার মন্ত্র, নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায়। অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের মতো খসে খসে পড়বে।— তোমরা কুমারীরা এখানে কী করছ?

রত্নাবলী। (হাসিয়া) অপেক্ষা করছি উদ্ধারের। মলিন মনকে নির্মল করে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু করে এগোচ্ছি।

বাসবী। অশ্রাব্য তোমার এই অত্যুক্তি।

লোকেশ্বরী। এই নটীর শিষ্যা! শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে! শ্রীমতী বুঝি আজ হঠাৎ সাধ্বী হয়ে উঠেছে? যেদিন ভগবান বুদ্ধ অশোকবনে এসেছিলেন রাজপুরীর সকলেই তাঁকে দেখতে এল, একেও দয়া করে ডাকতে পাঠিয়েছিলেম। পাপিষ্ঠা এলই না। তবু আজ নাকি ভিক্ষু উপালি রাজবাড়িতে একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায়। মূঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম। যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে— একে ধর্ম বলিস তোরা আত্মঘাতিনীরা? উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর্ দেখি নটী। দেখি কতবড়ো সাহস। পাপরসনায় পক্ষাঘাত হবে না?

শ্রীমতী। (করজোড়ে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

লোকেশ্বরী। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে— থাক্ থাক্, থাম্ থাম্।

শ্রীমতী। মদ্বিতায় অনাথায় অনুকম্পায় যে বিভো—

লোকেশ্বরী। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) ওরে অনাথা অনাথা! শ্রীমতী, একবার বলো তো, মহাকারুণিকো নাথো—

উভয়ে আবৃত্তি

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমম্।

লোকেশ্বরী। হয়েছে, হয়েছে, থাক্ আর নয়। নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ!

অনুচরীর প্রবেশ

অনুচরী। মহারানী, এই দিকে আসুন নিভৃতে।

(জনান্তিকে) রাজকুমার চিত্র এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লোকেশ্বরী। কে বলে ধর্ম মিথ্যা! পুণ্যমন্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল। ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি। মহাকারুণিকো নাথো— তাঁর করুণার কতবড়ো শক্তি। পাথর গলে যায় এই আমি তোদের সবাইকে বলে যাচ্ছি, পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করেছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি। [বলিতে বলিতে অনুচরীসহ প্রস্থান

রত্নাবলী। মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্ দিক থেকে বইল?

মল্লিকা। আজকাল আকাশ জুড়ে এ-যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির স্থিরতা আছে? হঠাৎ কাকে কোন্ দিকে নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। সেই যে কলন্দক আজ চল্লিশ বছর জুয়ো খেলে কাটালে, সে হঠাৎ শুনি নাকি ওদের অর্হৎ হয়ে উঠেছে! আবার নন্দিবর্ধন, যজ্ঞে যে সর্বস্ব দিতে পণ করলে আজ ব্রাহ্মণ দেখলে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী। তা হলে রাজকুমার চিত্র ফিরে এলেন।

মল্লিকা। দেখো-না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মালতী। ভগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন সেদিন শ্রীমতীদিদি, তাঁকে দেখতে যাও নি, একি সত্য ?

শ্রীমতী। সত্য। তাঁকে দেখা দেওয়াই যে পূজা দেওয়া। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না।

মালতী। হায় হায়, তবে কী হল দিদি ?

শ্রীমতী। অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখলেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুনলেই কি শোনা যায় ?

রত্নাবলী। ইস, এটা আমাদের 'পরে কটাক্ষপাত হল। একটু প্রশ্রয়ের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্যের আবরণ উড়ে যায়।

শ্রীমতী। কৃত্রিম সৌজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পষ্টই বলব, তোমাদের চোখ যাঁকে দেখেছে তোমরা তাঁকে দেখ নি।

রত্নাবলী। বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্ধা সহ্য করছ কেমন করে !

বাসবী। বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তা হলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর-একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার খয়ে যাক।

শ্রীমতী

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা। ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী। বিনয় ভুলেছ নটী ! এ কথার প্রতিবাদ করবে না ?

শ্রীমতী। কেন করব রাজকুমারী ? তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই ?

বাসবী। থাক্ থাক্, মুখের কথায় কথা বেড়ে যায়। তুমি গান গাও।

শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে ?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।
তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে-ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।

নেপথ্যে। ওঁ নমো রত্নত্রয়ায় বোধিসত্ত্বায় মহাসত্ত্বায় মহাকারুণিকায় !

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

সকলে। ভগবতী, নমস্কার!

ভিক্ষুণী। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্বদেবতা।
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থী ভবন্তু তে॥

শ্রীমতী!

শ্রীমতী। কী আদেশ!

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।

রত্নাবলী। বোধ হয় ভুল শুনলেম। কোন্ শ্রীমতীর কথা বলছেন?

ভিক্ষুণী। এই যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী। রাজবাড়ির এই নটী?

ভিক্ষুণী। হাঁ, এই নটী।

রত্নাবলী। স্থবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন?

ভিক্ষুণী। তাঁদেরই এই আদেশ।

রত্নাবলী। কে তাঁরা? নাম শুনি।

ভিক্ষুণী। একজন তো উপালি।

রত্নাবলী। উপালি তো নাপিত।

ভিক্ষুণী। সুনন্দও বলেছেন।

রত্নাবলী। তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষুণী। সুনীতেরও এই আদেশ।

রত্নাবলী। তিনি নাকি জাতিতে পুক্কুস।

ভিক্ষুণী। রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।

রত্নাবলী। নিশ্চয় জানি নে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন?

ভিক্ষুণী। সে কথা সত্য। রাজপিতা বিম্বিসার রাজগৃহ-নগরীর নির্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে ব্রতপালন করবেন। তাঁকে সংবর্ধনা করে আনি গে। [প্রস্থান

অজিতা। কোথায় চলেছ শ্রীমতী?

শ্রীমতী। অশোকবনের আসনবেদী ধৌত করতে যাব।

মালতী। দিদি আমাকে সঙ্গে নিয়ো।

নন্দা। আমিও যাব।

অজিতা। ভাবছি গেলে হয়।

বাসবী। আমিও দেখি গে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কিরকম।

রত্নাবলী। কী শোভা! শ্রীমতী করবে পূজার উদ্‌যোগ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবীজন!

বাসবী। আর, এখান থেকে তুমি অভিশাপের উষ্ণ নিশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দগ্ধ হবে না, শ্রীমতীর শান্তিও থাকবে অক্ষুণ্ণ।

রত্নাবলী ও মল্লিকা ব্যতীত আর-সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। সইবে না! সইবে না! এ একেবারে সমস্তর বিরুদ্ধ। মল্লিকা, পুরুষ হয়ে জন্মালুম না কেন! এই কঙ্কণপরা হাতের 'পরে ধিক্‌কার হয়। যদি থাকত তলোয়ার! তুমিও তো মল্লিকা সমস্তক্ষণ চুপ করে বসে ছিলে, একটি কথাও কও নি। তুমিও কি ঐ নটীর পরিচারিকার পদ কামনা কর?

মল্লিকা। করলেও পাব না। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী। চুপ করে সহ্য কর কী করে বুঝতে পারি নে। ধৈর্য নিরুপায় ইতর লোকের অস্ত্র, রাজার মেয়েদের না।

মল্লিকা। আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপব্যয় করি নে।

রত্নাবলী। নিশ্চিত জান ?

মল্লিকা। নিশ্চিত।

রত্নাবলী। গোপন কথা যদি হয় বোলো না। কেবল এইটুকু জানতে চাই ঐ নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় পূজা করবে আর রাজকন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

মল্লিকা। না কিছুতেই না। আমি কথা দিচ্ছি।

রত্নাবলী। রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সার্থক করুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

লোকেশ্বরী ও মল্লিকা

মল্লিকা। পুত্রের সঙ্গে তো দেখা হল মহারানী। তবে এখনো কেন—

লোকেশ্বরী। পুত্রের সঙ্গে ? পুত্র কোথায় ? এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি। আগে বুঝতে পারি নি।

মল্লিকা। এমন কথা কেন বলছেন।

লোকেশ্বরী। পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মার কাছে আসে তার মতো দুঃখ আর নেই। কিরকম করে সে চাইলে আমার দিকে ! তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে— কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই ! নিজের এতবড়ো নিঃশেষে সর্বনাশ কল্পনাও করতে পারতুম না।

মল্লিকা। রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্মল নূতন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী। হায় রে রক্তমাংস ! হায় রে অসহ্য ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা ! রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম !

মল্লিকা। কিন্তু যাই বল দেবী, তাঁকে দেখলেম— সে কী রূপ ! আলো দিয়ে ধোওয়া যেন দেবমূর্তিখানি।

লোকেশ্বরী। ঐ রূপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল ! যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হৃদয়ে, তাকে ঐ রূপ ধিক্কার দিলে ! যে জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে জন্মের সঙ্গে তার এ জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ। দেখ্ মল্লিকা, আজ খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেম এ ধর্ম পুরুষের তৈরি। এ ধর্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক ; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না পুত্র, না স্বামী, না ভাই, সেই-সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব ! মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব।

মল্লিকা। কিন্তু দেবী, দেখ নি ? মেয়েরাই যে দলে দলে চলেছে বুদ্ধকে পূজা দেবার জন্যে !

লোকেশ্বরী। মূঢ় ওরা, ভক্তি করবার ক্ষুধার ওদের অন্ত নেই। যা ওদের সব চেয়ে মারে তাকেই ওরা সব চেয়ে বেশি করে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিই নে।

মল্লিকা। মুখে বলছ মহারানী, নিশ্চয় জানি, তোমার ঐ পুত্র আজ তোমার সেবাকক্ষের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার পূজাকক্ষের দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তোমার মানব-পুত্র কোল থেকে নেমে আজ দেবতা-পুত্র হয়ে তোমার হৃদয়ের পূজাবেদীতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী। চুপ চুপ! বলিস নে! আমি হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করলেম ; বললেম, ‘একরাত্রির জন্যে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।’ সে বললে, ‘আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই— আছে আকাশ।’ মল্লিকা, যদি মা হতিস তো বুঝতিস কতবড়ো কঠিন কথা! বজ্র দেবতার হাতের, কিন্তু সে তো বজ্র। বুক বিদীর্ণ হয়ে যায় নি! সেই বিদীর্ণ বুকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঐ-যে রাস্তার শ্রমণদের গর্জন আমার পাঁজরগুলোর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে— বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

মল্লিকা। একি মহারানী, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজও আপনি যে নমস্কার করেন।

লোকেশ্বরী। ঐ তো বিপদ। মল্লিকা, দুর্বলের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বলবে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বলবে ভিক্ষা করো। এই ধর্মের বিষ অনেকদিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেছি। সেইজন্যে আজ আমিই একে সব চেয়ে ভয় করি। ঐ কে আসছে?

মল্লিকা। রাজকুমারী বাসবী। পূজাস্থলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

বাসবীর প্রবেশ

লোকেশ্বরী। পূজায় চলেছ?

বাসবী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। তোমাদের তো বয়স হয়েছে?

বাসবী। আমাদের ব্যবহারে তার কি কোনো বৈলক্ষণ্য দেখছেন?

লোকেশ্বরী। শিশু! তোমরা নাকি বলে বেড়াচ্ছ, অহিংসা পরমো ধর্মঃ!

বাসবী। আমাদের চেয়ে যাঁদের বয়স অনেক বেশি তাঁরাই বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা তো কেবল মুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী। নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম! হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।

বাসবী। শক্তির কি কোমল রূপ নেই?

লোকেশ্বরী। আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় করে বাঁধে তখন না। পর্বতকে সৃষ্টিকর্তা নির্দয় পাথর দিয়ে গড়েছেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুর কৃপায় উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সবই কি হবে পাঁক? রাজবাড়িতে মানুষ হয়েও এই কথাটা মানতে ঘৃণা হয় না? চুপ করে রইলে যে?

বাসবী। ভেবে দেখছি, মহারানী।

লোকেশ্বরী। ভাববার কী আছে। চোখের সামনে দেখলে তো রাজপুত্র একমুহূর্তে রাজা হতে ভুলে গেল! বলে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব! শোন নি, বাসবী?

বাসবী। শুনেছি।

লোকেশ্বরী। তা হলে নির্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ করবে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি? যত-সব মাথা-হেঁট-করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্নিম্লান নির্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে? তোরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেকছে কেন বাসবী!

বাসবী। এই পুরানো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিনে ঢাকা পড়ে গেছে, বসন্তে নিষ্পত্র কিংশুকের শাখা যেমন করে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী। কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম ভুলে যায়, কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুলতে দেয় তা হলে মরণ যে সেই নারীর। মহালতার জন্যে কি মহাবৃক্ষের দরকার নেই! সব গাছই গুল্ম হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো? বল-না। মুখে যে উত্তর নেই!

বাসবী। মহাবৃক্ষ চাই বৈকি।

লোকেশ্বরী। কিন্তু, বনস্পতি নির্মূল করবার জন্যেই এসেছেন তোমাদের গুরু। তাও যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের পোকা তলায় তলায় লাগিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মজ্জাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে! তার আগেই যেন মর, আমার এই আশীর্বাদ। কী ভাবছ? কথাটা মনে লাগছে না?

বাসবী। ভালো করে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী। ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্যপুত্র বিম্বিসার, ক্ষত্রিয় রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিস নয়, তাতেই তাঁর ধর্মসাধনা। কিন্তু কোন্ মরুর ধর্ম কানে মন্ত্র দিল অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খসে পড়লেন— অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, একদিন তুমিও রাজার মহিষী হবে এ আশা কি ত্যাগ করেছ?

বাসবী। কেন ত্যাগ করব?

লোকেশ্বরী। তা হলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান, তাকে শ্রদ্ধা করে বরণ করতে পারবে?

বাসবী। না।

লোকেশ্বরী। আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিম্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবছ ওঁর জন্যে সাজব! যে-মানুষ রাজাও নয় ভিক্ষুও নয়, যে-মানুষ ভোগেও নেই ত্যাগেও নেই, তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না। বাসবী, তোমাকে বার বার বলছি, এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্মকে কিছুতে স্বীকার কোরো না।

মল্লিকা। রাজকুমারী, কোথায় চলেছ?

বাসবী। ঘরে।

মল্লিকা। এদিকে নটী যে প্রস্তুত হয়ে এল।

বাসবী। থাক্ থাক্। [প্রস্থান

মল্লিকা। মহারানী, শুনতে পাচ্ছ?

লোকেশ্বরী। শুনছি বৈকি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা। নিশ্চয় ওঁরা এসে পড়েছেন।

লোকেশ্বরী। কিন্তু ঐ যে এখনো শুনছি, নমো—

মল্লিকা। সুর বদলেছে। 'নমো বুদ্ধায়' গর্জন আরো প্রবল হয়ে উঠেছে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ঐ শোনো— 'নমঃ পিনাকহস্তায়'। আর ভয় নেই।

লোকেশ্বরী। ভাঙল রে ভাঙল! যখন সব ধুলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম! হায় রে, কত ভক্তি! মল্লিকা, ভাঙার কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে বাঁচি— ওর ভিতরটা যে আমার বুকের মধ্যে।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্না, তুমিও চলেছ পূজায়?

রত্নাবলী। ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার অপরাধ আমার দ্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী। তবে কোথায় যাচ্ছ?

রত্নাবলী। মহারানীর কাছেই এখানে এসেছি। আবেদন আছে।

লোকেশ্বরী। কী, বলো।

রত্নাবলী। ঐ নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায় তা হলে এই অশুচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী। আশ্বাস দিচ্ছি আজ এ পূজা ঘটবে না।

রত্নাবলী। আজ না হোক কাল ঘটবে।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই, কন্যা, পূজাকে সমূলে উচ্ছেদ করব।

রত্নাবলী। যে অপমান সহ্য করেছি তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী। তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্বাসন, এমন-কি, প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

রত্নাবলী। তাতে ওর গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী। তবে তোমার কী ইচ্ছা?

রত্নাবলী। ও যেখানে পূজারিনী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চুপ করে রইলে যে। তুমি কী বল?

মল্লিকা। প্রস্তাবটা কৌতুকজনক।

লোকেশ্বরী। আমার মন সায় দিচ্ছে না রত্না।

রত্নাবলী। ঐ নটীর 'পরে মহারানীর এখনো দয়া আছে দেখছি।

লোকেশ্বরী। দয়া! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়াতে পারি। আমার দয়া! অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েছি। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে সেও সইতে পারি। কিন্তু রাজরানীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত!

রত্নাবলী। প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন। ঐটুকু ব্যথাকে যদি প্রশ্রয় দেন তবে ঐ ব্যথার উপরেই ভাঙা পূজার বেদী বারে বারে গড়ে উঠবে।

লোকেশ্বরী। সে ভয় মনে একেবারে নেই তা নয়।

রত্নাবলী। মোহে পড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান করুন তবে মুক্তি পাবেন।

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, ঐ শোনো। উদ্যানের উত্তর দিক থেকে শব্দ আসছে। ভেঙে ফেললে, সব ভেঙে ফেললে! ওঁ নমো— যাক যাক ভেঙে যাক।

রত্নাবলী। চলো-না, মহারানী, দেখে আসি গে।

লোকেশ্বরী। যাব যাব, কিন্তু এখনো না।

রত্নাবলী। আমি দেখে আসি গে!

[প্রস্থান

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, বাঁধন ছিঁড়তে বড়ো বাজে।

মল্লিকা। তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে!

লোকেশ্বরী। ঐ শোনো-না, 'জয় কালী করালী'— অন্য ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এল, এ আমি সইতে পারছি নে।

মল্লিকা। বুদ্ধের ধর্মকে নির্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে; অন্য ধর্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নূতন মন্ত্র নেবে তখনই সান্ত্বনা পাবে।

লোকেশ্বরী। ছি ছি, বোলো না, বোলো না, মুখে এনো না। দেবদত্ত ক্রূর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলেম তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব! (জানু পাতিয়া) ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। দ্বারত্রয়েণ কৃতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো।

(উঠিয়া) ভয় নেই, মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে, সে ভিতরেই থাক্‌, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা, আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বসি গে, যখন ধুলার সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো।

[উভয়ের প্রস্থান

ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য মঙ্গলঘট প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া রাজবাটীর
একদল নারীর প্রবেশ। পুষ্পপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে

বণ্ণ-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্‌স সিরি-পাদ-সরোরুহে।

প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি। ধূপপাত্রকে ঘিরিয়া

গন্ধ-সম্ভার-যুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্ত্যং পূজাভাজনমুত্তমং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম

শ্রীমতী প্রদীপের থালা ঘেরিয়া

ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম। আহার্য নৈবেদ্য ঘেরিয়া

অধিবাসে তু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায় পতিগণ্‌হাতুমমুত্তমং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম। জানু পাতিয়া

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারস্‌স সনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগচ্ছি অনন্তঞ্‌ঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি·বুদ্ধং।

বনের প্রবেশপথে পূজা সমাধা হল। এবার চলো স্তূপমূলে।
মালতী। কিন্তু শ্রীমতীদিদি, ঐ দেখো, এ দিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ।
শ্রীমতী। বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো।
নন্দা। বোধ হচ্ছে রাজার নিষেধ!
শ্রীমতী। কিন্তু প্রভুর আদেশ আছে।
নন্দা। কী ভয়ংকর গর্জন! একি রাষ্ট্রবিপ্লব!
শ্রীমতী। গান ধরো।

গান

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে।
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে।
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে।

একদল অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। ফেরো তোমরা এখান থেকে।
শ্রীমতী। আমরা প্রভুর পূজায় চলেছি।
রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।
মালতী। আজ প্রভুর জন্মোৎসব।
রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।
শ্রীমতী। এও কি সম্ভব!
রক্ষিণী। পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানি নে। দাও তোমাদের অর্ঘ্য।

পূজার থালা প্রভৃতি ছিনাইয়া লইল

শ্রীমতী। এ কী পরীক্ষা আমার! অপরাধ কি ঘটেছে কিছু!

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুবরুত্তমং।
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

রক্ষিণী। বন্ধ করো স্তব।
শ্রীমতী। দ্বারের কাছেই অবরোধ! প্রবেশ আমার ঘটল না, ঘটল না!
মালতী। কাঁদ কেন শ্রীমতীদিদি। বিনা অর্ঘ্যে বিনা মন্ত্রে কি পূজা হয় না? ভগবান তো আমাদের মনের ভিতরেও জন্মলাভ করেছেন।
শ্রীমতী। শুধু তাই নয় মালতী, তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মোৎসব।
নন্দা। শ্রীমতী, হঠাৎ এক মুহূর্তে আজ এমন দুর্দিন ঘনিয়ে এল কেন?
শ্রীমতী। দুর্দিনই যে সুদিন হয়ে ওঠবার দিন আজ। যা ভেঙেছে তা জোড়া লাগবে, যা পড়েছে তা উঠবে আবার।
অজিতা। দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যে পূজার ভার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে নিশ্চয় ভুল আছে। সব তাই নষ্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।
শ্রীমতী। আমি ভয় করি নে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।
ভদ্রা। রাজার বাধাও সরাতে পারবে?
শ্রীমতী। সেখানে রাজার রাজদণ্ড পৌঁছয় না।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। কী বলছিলে, শুনেছি শুনেছি। তুমি রাজার বাধাও মান না এতবড়ো তোমার সাহস!
শ্রীমতী। পূজাতে রাজার বাধাই নেই।
রত্নাবলী। নেই রাজার বাধা? সত্যি নাকি! যেয়ো তুমি পূজা করতে, আমি দেখব দুই চোখের আশ মিটিয়ে।
শ্রীমতী। যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখবেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে। এখন—

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা।

রত্নাবলী। তোমার দিন এবার হয়ে এসেছে, অহংকার ঘুচবে।

শ্রীমতী। তা ঘুচবে। কিছুই বাকি থাকবে না, কিছুই না।

রত্নাবলী। এখন আমার পালা, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি। [প্রস্থান

ভদ্রা। কিছুই ভালো লাগছে না। বাসবী বুদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় সরে পড়েছে।

অজিতা। আমার কেমন ভয় করছে।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

নন্দা। ভগবতী, কোথায় চলেছেন?

উৎপলপর্ণা। উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষামন্ত্র পড়তে চলেছি।

শ্রীমতী। ভগবতী, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?

উৎপলপর্ণা। কেমন করে নিয়ে যাই? তোমার উপরে যে পূজার আদেশ আছে।

শ্রীমতী। পূজার আদেশ এখনো আছে দেবী?

উৎপলপর্ণা। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে আদেশের তো অবসান নেই।

মালতী। মাতঃ, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে!

উৎপলপর্ণা। ভয় নেই, ধৈর্য ধরো। সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে। [প্রস্থান

ভদ্রা। শুনছ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন, না গর্জন?

নন্দা। আমার তো মনে হচ্ছে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর করছে। শ্রীমতী, শীঘ্র চলো রাজমহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিই গে। [প্রস্থান

ভদ্রা। এসো অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

[রাজকুমারী প্রভৃতির প্রস্থান

মালতী। দিদি, বাইরে ঐ যেন মরণের কান্না শুনতে পাচ্ছি! আকাশে দেখছ ঐ শিখা! নগরে আগুন লাগল বুঝি? জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন!

শ্রীমতী। মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।

মালতী। মনে ভয় আসছে বলে বড়ো লজ্জা পাচ্ছি দিদি। পূজা করতে যাব, ভয় নিয়ে যাব— এ আমার সহ্য হচ্ছে না।

শ্রীমতী। তোর ভয় কিসের বোন?

মালতী। বিপদের ভয় না। কিছুই যে বুঝতে পারছি নে, অন্ধকার ঠেকছে, তাই ভয়।

শ্রীমতী। আপনাকে এই বাইরে দেখিস নে। আজ যাঁর অক্ষয় জন্ম তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখ্‌, তোর ভয় ঘুচে যাবে।

মালতী। তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

শ্রীমতীর গান

আর রেখো না আঁধারে আমায়
দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখতে দাও।
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয় না যে আর,

যাক্‌-না ধুয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে,
আমায় দেখতে দাও।
জানি না তো কোন্‌ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন
ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও।

একজন অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। শোনো, শোনো, শ্রীমতী।

মালতী। কেন নিষ্ঠুর হচ্ছ তোমরা! আর আমাদের যেতে বোলো না। আমরা দুটি মেয়ে এই উদ্যানের কাছে মাটির 'পরে বসে থাকি-না— তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে?

রক্ষিণী। তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন?

মালতী। ভগবান বুদ্ধ যে-উদ্যানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন তার শেষপ্রান্তেও তাঁর পদধুলা আছে। তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও তা হলে আমরা এইখানে সেই ধুলায় বসে মনের মধ্যে তাঁর জন্মোৎসব গ্রহণ করি— মন্ত্রও বলব না, অর্ঘ্যও দেব না।

রক্ষিণী। কেন বলবে না মন্ত্র? বলো বলো। শুনতেও পাব না এত কী পাপ করেছি! অন্য রক্ষিণীরা দূরে আছে, এইবেলা আজ পুণ্যদিনে শ্রীমতী, তোমার মধুর কণ্ঠ থেকে প্রভুর স্তব শুনে নিই। তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোকছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপচোখে দেখেছি, তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন।

শ্রীমতী।
নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গোতম-চন্দিমায়,
নমো নমো নন্তগুণন্নবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়॥

রক্ষিণী, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো।

রক্ষিণী। আমার মুখে কি পুণ্যমন্ত্র বের হবে?

শ্রীমতী। ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই পুণ্য হবে। বলো—
নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়।

[ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া লইল।

রক্ষিণী। আমার বুকের বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক হল। যে কথা বলতে এসেছিলেম এবার বলে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী। কেন?

রক্ষিণী। মহারাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোকতলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েছেন।

মালতী। হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হল না! আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেল সব!

শ্রীমতী। কী বলিস মালতী! তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিম্বিসার যা গড়েছিলেন তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে। ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।

রক্ষিণী। রাজা প্রচার করেছেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী, তা হলে তুমি আর কী করবে এখানে?

শ্রীমতী। অপেক্ষা করে থাকব।

রক্ষিণী। কতদিন?

শ্রীমতী। যতদিন না পূজার ডাক আসে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই।

রক্ষিণী। পূর্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কিসের ক্ষমা?

রক্ষিণী। হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী। কোরো আঘাত।

রক্ষিণী। সে আঘাত হয়তো রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী। আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। বুদ্ধো খমতু! বুদ্ধো খমতু!

অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ

দ্বিতীয় রক্ষিণী। রোদিনী!

প্রথম রক্ষিণী। কী পাটলী?

পাটলী। ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে ফেলেছে।

রোদিনী। কী সর্বনাশ!

শ্রীমতী। কে মারলে?

পাটলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা।

রোদিনী। রক্তপাত তবে শুরু হল। তাই যদি হলই তা হলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পা[প] সইবে না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। শ্রীমতী, ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।

শ্রীমতী। লোভ দেখিয়ো না রোদিনী। আমি নটী, তোমার ঐ তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাত[ও] চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী। তা হলে এই নাও।

তরবারি দান

শ্রীমতী। (শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না না! প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চল[ে] আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হোক, প্রভুর জয় হোক!

পাটলী। চল্‌ রোদিনী, ভগবতীর দেহ বহন করে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে।

[উভয়ের প্রস্থা[ন]

কয়েকজন রক্ষিণী সহ রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। এই-যে এখানেই আছে। ওকে রাজাদেশ শুনিয়ে দাও।

রক্ষিণী। মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী, তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে।

শ্রীমতী। নাচ! আজ!

মালতী। তোমরা এ কী কথা বলছ গো! মহারাজের ভয় হল না এমন আদেশ করতে?

রত্নাবলী। ভয় হবারই তো কথা ! সেই দিনই তো এসেছে। তাঁর নটীদাসীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর ! গ্রাম্য বর্বর !

শ্রীমতী। কখন নাচ হবে ?

রত্নাবলী। আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী। প্রভুর আসনবেদীর সামনে ?

রত্নাবলী। হাঁ।

শ্রীমতী। তবে তাই হোক।

[সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চির-মধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।
এসো দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভসংগীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

তৃতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

মালতী ও শ্রীমতী

মালতী। দিদি, শান্তি পাচ্ছি নে।

শ্রীমতী। কী হয়েছে।

মালতী। তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করাতে নিয়ে গেল আমি চুপি চুপি ঐ প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেম। দেখি ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে, আর—

শ্রীমতী। থামলে কেন ? বলো।

মালতী। রাগ করবে না দিদি ? আমি বড়ো দুর্বল।

শ্রীমতী। কিছুতে না।

মালতী। দেখলেম অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

শ্রীমতী। কে যাচ্ছিলেন ?

মালতী। দূর থেকে মনে হল যেন তিনি।

শ্রীমতী। অসম্ভব নেই।

মালতী। পণ করেছিলেম, মুক্তি যতদিন না পাই তাঁকে দূর থেকেও দেখব না।

শ্রীমতী। রক্ষা করিস সেই পণ। সমুদ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকলেই তো পার দেখা যায় না। দুরাশায় মনকে প্রশ্রয় দিস নে।

মালতী। তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করছি মনে কোরো না। ভয় হচ্ছে ওঁকে তারা মারবে তাই কাছে থাকতে চাই। পণ রাখতে পারছি নে বলে আমাকে অবজ্ঞা কোরো না দিদি।

শ্রীমতী। আমি কি তোর ব্যথা বুঝি নে ?

মালতী। তাঁকে বাঁচাতে পারব না কিন্তু মরতে তো পারব। আর পারলুম না দিদি, এবারকার মতো সব ভেঙে গেল। এ জীবনে হবে না মুক্তি।

শ্রীমতী। যাঁর কাছে যাচ্ছিস তিনিই তোকে মুক্তি দিতে পারেন। কেননা তিনি মুক্ত। তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলুম।

মালতী। কী বুঝলে দিদি ?

শ্রীমতী। এখনো আমার মনের মধ্যে পুরানো ক্ষত চাপা আছে, সে আবার ব্যথিয়ে উঠল। বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।

মালতী। রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মানুষ আর কেউ নেই, তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু যেতে হল। যখন সময় পাবে আমার জন্যে ক্ষমার মন্ত্র পোড়ো।

শ্রীমতী। বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মম।

মালতী। (প্রণাম করিতে করিতে) বুদ্ধো খমতু তং মম। যাবার মুখে একটা গান শুনিয়ে দাও। তোমার ঐ মুক্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না। একটা পথের গান গাও।

শ্রীমতীর গান

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে,
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে !
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।

ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছ কাছে,
তবু ভয় হয় পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে।

মালতী। শোনো দিদি, আবার গর্জন। দয়া নেই, কারও দয়া নেই। অনন্ত-কারুণিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না! আর দেরি করতে পারি নে। প্রণাম দিদি! মুক্তি যখন পাবে আমাকে একবার ডাক দিয়ো, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো।

শ্রীমতী। চল্‌, তোকে প্রাচীরদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি গে। [উভয়ের প্রস্থান

রত্নাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ

রত্নাবলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষুণীকে মেরেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের? ও তো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা। কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।

রত্নাবলী। মন্ত্র পড়ে কি রক্ত-বদল হয়!

মল্লিকা। আজকাল তো দেখছি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী। রেখে দে ও-সব কথা। প্রজারা উত্তেজিত হয়েছে বলে রাজার ভাবনা! এ আমি সইতে পারি নে। তোমার ভিক্ষুধর্ম রাজধর্মকে নষ্ট করেছে।

মল্লিকা। উত্তেজনার আরো একটু কারণ আছে। মহারাজ বিম্বিসার পূজার জন্য যাত্রা করে বেরিয়েছেন কিন্তু এখনো পৌঁছন নি, প্রজারা সন্দেহ করছে!

রত্নাবলী। কানাকানি চলছে আমিও শুনেছি। ব্যাপারটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু কর্মফলের মূর্তি হাতে হাতে দেখা গেল।

মল্লিকা। কী কর্মফল দেখলে?

রত্নাবলী। মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে যে-যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন, সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ওঁকে খাবে।

মল্লিকা। চুপ চুপ, আস্তে। জান তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কিরকম অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

রত্নাবলী। কার অভিশাপ?

মল্লিকা। বুদ্ধের। মনে মনে মহারাজ ওঁকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী। বুদ্ধ তো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মল্লিকা। তাই তার এত মান। দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় দামি অর্ঘ্য।

রত্নাবলী। যে-দেবতা হিংসা করতে জানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।

মল্লিকা। যাই হোক এই বলে যাচ্ছি, আজ সন্ধেবেলায় ঐ অশোকচৈত্যে পুজো হবেই।

রত্নাবলী। তা হয় হোক, কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্ছি। [মল্লিকার প্রস্থান

বাসবীর প্রবেশ

বাসবী। প্রস্তুত হয়ে এলেম।

রত্নাবলী। কিসের জন্যে?

বাসবী। শোধ তুলব বলে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ঐ নটী।

রত্নাবলী। উপদেশ দিয়ে ?

বাসবী। না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী। তাই ছুরি হাতে এসেছ ?

বাসবী। সেজন্যে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা ঘটেছে। বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী। নটীর উপর শোধ তুলবে কী দিয়ে ?

বাসবী। (হার দেখাইয়া) এই হার দিয়ে।

রত্নাবলী। তোমার হীরের হার !

বাসবী। বহুমূল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রত্নাবলী। ও যদি তিরস্কার ক'রে ফিরে ফেলে দেয় তোমার গায়ে। যদি না নেয়।

বাসবী। (ছুরি দেখাইয়া) তখন এই আছে।

রত্নাবলী। শীঘ্র ডেকে আনো মহারানী লোকেশ্বরীকে, তিনি খুব আমোদ পাবেন।

বাসবী। আসবার সময় খুঁজেছিলেম তাঁকে। শুনলেম ঘরে দ্বার দিয়ে আছেন। একি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে, না স্বামীর 'পরে অভিমানে ? বোঝা গেল না।

রত্নাবলী। কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য, তাতে মহারানীর উপস্থিত থাকা চাই।

বাসবী। নটীর নতিনাট্য ! নামটি বেশ বানিয়েছ।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। যা মনে করেছিলেম তাই ঘটেছে। রাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে মহারাজ অজাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েছেন। এমনি করে গ্রহপূজা চলছেই, কখনো বা শনিগ্রহ কখনো বা রবিগ্রহ।

রত্নাবলী। ভালোই হয়েছে। বুদ্ধের সব-কটি শিষ্যকেই দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে একসঙ্গে সমর্পণ করে দিন। তাতে সময়-সংক্ষেপ হবে।

মল্লিকা। সেজন্যে নয়। ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আসছে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

বাসবী। কেন এই দুর্বলতা ?

মল্লিকা। লোকে কী বলছে শোন নি বুঝি ? দেবদত্তের শিষ্যদের মহারাজ এখন আর নিজেই সামলাতে পারছেন না।

বাসবী। তাতে কী হয়েছে ?

মল্লিকা। কী আশ্চর্য ! এখনো জনশ্রুতি তোমার কানে পৌঁছয় নি ! সবাই অনুমান করছে, পথের মধ্যে ওরা বিম্বিসার মহারাজকে হত্যা করেছে।

বাসবী। সর্বনাশ ! এ কখনো সত্য হতেই পারে না।

মল্লিকা। কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কোন্‌-একটা অনুশোচনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।

বাসবী। হায় হায়, এ কী সংবাদ !

রত্নাবলী। লোকেশ্বরী মহারানী কি শুনেছেন ?

মল্লিকা। এতবড়ো অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে তাকে তিনি দুখানা করে ফেলবেন। কেউ সাহস পাচ্ছে না।

বাসবী। সর্বনাশ হল ! এতবড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ির কেউ বাঁচবে না। ধর্মকে নিয়ে যা খুশি করতে গেলে কি সহ্য হয় !

রত্নাবলী। ঐ রে ! বাসবী আবার দেখছি নটীর চেলা হবার দিকে ঝুঁকছে। ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে।

বাসবী। কখনো না। আমি কিছু ভয় করি নে। ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে আসি গে।

রত্নাবলী। মিথ্যা ছুতো করে পালিয়ো না। ভয় তুমি পেয়েছ। তোমাদের এই অবসাদ দেখলে আমার বড়ো লজ্জা করে। এ কেবল নীচসংসর্গের ফল।

বাসবী। অন্যায় বলছ তুমি, আমি কিছুই ভয় করি নে।

রত্নাবলী। আচ্ছা, তা হলে অশোকবনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী। কেন যাব না? তুমি ভাবছ আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ?

রত্নাবলী। আর দেরি নয়, মল্লিকা, শ্রীমতীকে এখনই ডাকো, সাজ হোক বা না হোক। রাজকন্যারা যদি না আসতে চায় রাজকিংকরীদের সবাইকে চাই, নইলে কৌতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী। ঐ যে শ্রীমতী আসছে। দেখো দেখো, যেন চলছে স্বপ্নে! যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই।

ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ— লইনু শরণ!
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ।

রত্নাবলী। এই দিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পৌঁচচ্ছে না? এই-যে এই দিকে।

শ্রীমতী। পরশরতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।

রত্নাবলী। বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো।

বাসবী। না, আমি যাব না।

রত্নাবলী। কেন যাবে না?

বাসবী। তবে সত্য কথা বলি। আমি পারব না।

রত্নাবলী। ভয় করছে?

বাসবী। হাঁ, ভয় করছে।

রত্নাবলী। ভয় করতে লজ্জা করছে না?

বাসবী। একটুমাত্রও না। শ্রীমতী, সেই ক্ষমার মন্ত্রটা।

শ্রীমতী। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুবরুত্তমং
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

বাসবী। বুদ্ধো খমতু তং মম! বুদ্ধো খমতু তং মম!
বুদ্ধো খমতু তং মম!

শ্রীমতীর গান

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হল খান খান।

এবার তবে জ্বালো
আপন তারার আলো,
রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হোক অবসান।
এসো পারের সাথি—
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে
অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে
এনেছি এই গান।

[সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

সকলকলুষতামসহর,
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর'
নিখিল ভুবনময়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম!
জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি।
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর' ভয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম।
মোহমলিন অতিদুর্দিন
শঙ্কিত-চিত পান্থ
জটিলগহনপথসংকট-
সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ—
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম!

চতুর্থ অঙ্ক

অশোকতল। ভাঙা স্তূপ। ভগ্নপ্রায় আসনবেদী

রত্নাবলী। রাজকিংকরীগণ। একদল রক্ষিণী

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হচ্ছে।

রত্নাবলী। আর-একটু অপেক্ষা করো। মহারানী লোকেশ্বরী স্বয়ং এসে দেখতে চান। তিনি না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না।

দ্বিতীয় কিংকরী। আপনার আদেশে এসেছি। কিন্তু অধর্মের ভয়ে মন ব্যাকুল।

তৃতীয় কিংকরী। এইখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা। ছি ছি, কেমন করে এ পাপের স্খালন হবে?

চতুর্থ কিংকরী। এতবড়ো বীভৎস ব্যাপার এখানে হবে জানতেম না। থাকতে পারব না আমরা, কিছুতে না।

রত্নাবলী। মন্দভাগিনী তোরা শুনিস নি, বুদ্ধের পূজা এ রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ কিংকরী। রাজাকে অমান্য করা আমাদের সাধ্য নেই। ভগবানের পূজা নাই করলেম কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারি নে।

প্রথম কিংকরী। রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্যা-রাজবধূদেরই জন্যে। এ সভায় আমাদের কেন? চলো তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান সেখানে যাই।

রত্নাবলী। (রক্ষিণীদের প্রতি) যেতে দিয়ো না ওদের। এইবার শীঘ্র নটীকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, এ পাপ নটীকে স্পর্শ করবে না। এ পাপ তোমারই।

রত্নাবলী। তোরা ভাবিস তোদের নতুন ধর্মের নতুন-গড়া পাপকে আমি গ্রাহ্য করি!

দ্বিতীয় কিংকরী। মানুষের ভক্তিকে অপমান করা এ তো চিরকালের পাপ।

রত্নাবলী। এই নটীসাধ্বীর হাওয়া তোমাদের সবাইকে লাগল দেখছি। আমাকে পাপের ভয় দেখিয়ো না, আমি শিশু নই।

রক্ষিণী। (প্রথম কিংকরীর প্রতি) বসুমতী, আমরা শ্রীমতীকে ভক্তি করেছি কিন্তু ভুল করেছি তো। সে তো নাচতে রাজি হল।

রত্নাবলী। রাজি হবে না! রাজার আদেশকে ভয় করবে না!

রক্ষিণী। ভয় তো আমরাই করি, কিন্তু—

রত্নাবলী। নটীর পদ কি তোমাদেরও উপরে?

প্রথম কিংকরী। আমরা তো ওকে নটী বলে আর ভাবতুম না। আমরা ওর মধ্যে স্বর্গের আলো দেখেছি।

রত্নাবলী। নটী স্বর্গে গিয়েও নাচে তা জানিস নে!

রক্ষিণী। শ্রীমতীকে পাছে রাজার আদেশে আঘাত করতে হয় এই ভয় ছিল কিন্তু আজ মনে হচ্ছে রাজার আদেশের অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

প্রথম কিংকরী। ও পাপীয়সীদের কথা থাক্। কিন্তু এই পাপদৃশ্যে দুই চোখকে কলঙ্কিত করলে আমাদের গতি হবে কী!

রত্নাবলী। এখনো নটীর সাজ শেষ হল না। দেখছ তো তোমাদের নটীসাধ্বীর সাজের আনন্দ কত।

প্রথম কিংকরী। ঐ-যে এল! ইস্, দেখেছিস ঝলমল করছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। পাপদেহে একশো বাতির আলো জ্বালিয়েছে।

শ্রীমতীর প্রবেশ

প্রথম কিংকরী। পাপিষ্ঠা! শ্রীমতী! ভগবানের আসনের সম্মুখে, নির্লজ্জ, তুই আজ নাচবি! তোর

দুখানা পা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল না এখনো!

শ্রীমতী। উপায় নেই, আদেশ আছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। নরকে গিয়ে শতলক্ষ বৎসর ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে তোকে দিনরাত নাচতে হবে এ আমি বলে দিলেম।

তৃতীয় কিংকরী। দেখো একবার! পাতকিনী আপাদমস্তক অলংকার পরেছে। প্রত্যেক অলংকারটি আগুনের বেড়ি হয়ে তোর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাকবে, তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার স্রোত বইয়ে দেবে তা জানিস?

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। (জনান্তিকে, রত্নাবলীকে) রাজ্যে বুদ্ধপূজার যে-নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দুন্দুভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলছে। হয়তো এখনই এখানেও আসবে তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরো একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

রত্নাবলী। একবার দৌড়ে যাও তা হলে মল্লিকা— শীঘ্র মহারানী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এসো।

মল্লিকা। ঐ-যে তিনি আসছেন।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ

রত্নাবলী। মহারানী, এই আপনার আসন!

লোকেশ্বরী। থামো। শ্রীমতীর সঙ্গে নিভৃতে আমার কথা আছে। (শ্রীমতীকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া) শ্রীমতী!

শ্রীমতী। কী মহারানী?

লোকেশ্বরী। এই লও, তোমার জন্যে এনেছি।

শ্রীমতী। কী এনেছেন?

লোকেশ্বরী। অমৃত।

শ্রীমতী। বুঝতে পারছি নে।

লোকেশ্বরী। বিষ। খেয়ে মরো, পরিত্রাণ পাবে।

শ্রীমতী। পরিত্রাণের আর উপায় নেই ভাবছেন?

লোকেশ্বরী। না। রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার জন্যে নাচার আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছুতেই ফিরবে না জানি।

রত্নাবলী। মহারানী, আর সময় নেই, নৃত্য আরম্ভ হোক।

লোকেশ্বরী। এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল। এখানে মলে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচলে যাবি অবীচি নরকে।

শ্রীমতী। সর্বাগ্রে আদেশ পালন করে নিই।

লোকেশ্বরী। নাচবি?

শ্রীমতী। হাঁ, নাচব।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই তোর?

শ্রীমতী। না, কিছু না।

লোকেশ্বরী। তবে তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

শ্রীমতী। যিনি উদ্ধারকর্তা তিনি ছাড়া।

রত্নাবলী। মহারানী, আর এক মুহূর্ত দেরি চলবে না। বাইরে গোলমাল শুনছ না? হয়তো বিদ্রোহীরা এখনই রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে। নটী, নাচ শুরু হোক।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো—
তোমায় স্মরি হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচ! এ তো নাচের ভান। আর এই গানের অর্থ কী!

লোকেশ্বরী। না না বাধা দিয়ো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়,
কাঁপন বক্ষে লাগে।
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়,
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী হচ্ছে! গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ঐ স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে! ঐ গেল কঙ্কণ, ঐ গেল কেয়ূর, ঐ গেল হার! মহারানী, দেখছেন এ-সমস্ত রাজবাড়ির অলংকার— এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলংকার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনই।

লোকেশ্বরী। শান্ত হও, শান্ত হও। ওর দোষ নেই, এমনি করে আভরণ ফেলে দেওয়া, এই নাচের এই তো অঙ্গ। আনন্দে আমারও শরীর দুলে উঠছে। (গলা হইতে হার খুলিয়া ফেলিয়া) শ্রীমতী, থেমো না, থেমো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমি কানন হতে তুলি নি ফুল,
মেলে নি মোরে ফল।
কলস মম শূন্যসম,
ভরি নি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা,
তোমার চরণে হোক তা সারা,
পূজার পুণ্য কাজে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচের বিড়ম্বনা! নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে! দেখছ তো মহারানী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। একেই কি পূজা বলে না? রক্ষিণী, তোমরা দেখছ! মহারাজ কী দণ্ড বিধান করেছেন মনে নেই?

রক্ষিণী। শ্রীমতী তো পূজার মন্ত্র পড়ে নি।

শ্রীমতী। (জানু পাতিয়া) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি—

রক্ষিণী। (শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া) থাম্ থাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্!

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি—

কিংকরীগণ। সর্বনাশ করিস নে শ্রীমতী, থাম্ থাম্!

রক্ষিণী। যাস নে মরণের মুখে উন্মত্তা!

দ্বিতীয় রক্ষিণী। আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।

কিংকরীগণ। চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা। [পলায়ন

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি—
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। (জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে)
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি—
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল। 'ক্ষমা করো ক্ষমা করো', বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধুলা লইল।

লোকেশ্বরী। (শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া) নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।

রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল

মল্লিকা। কী ভাবছ?

রত্নাবলী। (বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া) এইবার আমার ভয় হচ্ছে।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী। মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের পূজা নিয়ে কাননদ্বারে অপেক্ষা করছেন, দেবীদের সম্মতি চান।

মল্লিকা। চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসি গে। [প্রস্থান

লোকেশ্বরী। বলো তোমরা সবাই,
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
লোকেশ্বরী। সংঘং সরণং গচ্ছামি।
রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নত্থি মে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। মহারাজ এলেন না, ফিরে গেলেন।
লোকেশ্বরী। কেন?
মল্লিকা। সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।
লোকেশ্বরী। কাকে তাঁর ভয়?
মল্লিকা। ঐ হৃতপ্রাণ নটীকে।
লোকেশ্বরী। চলো, পালঙ্ক নিয়ে আসি। এর দেহকে সকলে বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

[রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। (শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম। জানু পাতিয়া বসিয়া)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নটরাজ

ঋতুরঙ্গশালা

নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে "নটরাজ" দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালাগানের এই মর্ম্ম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নটরাজ

মুক্তিতত্ত্ব

মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস
তত্ত্বশিরোমণির পিছে ?
হায় রে মিছে, হায় রে মিছে !

মুক্ত যিনি দেখ্‌-না তাঁরে,
আয় চলে তাঁর আপন দ্বারে,
তাঁর বাণী কি শুকনো পাতায়
হলদে রঙে লেখেন তিনি ।

মরা ডালে ঝরা ফুলের
সাধন কি তাঁর মুক্তি-কূলের
মুক্তি কি পণ্ডিতের হাটে
উক্তিরাশির বিকিকিনি ।

এই নেমেছে চাঁদের হাসি
এইখানে আয় মিলবি আসি,
বীণার তারে তারণ-মন্ত্র
শিখে নে তোর কবির কাছে ।

আমি নটরাজের চেলা
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে ।

দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে ।

যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী অবাক মানি
তারি নাচের প্রসাদ যাচে ।

শুনবি রে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।

রবির মুক্তি দেখ্‌-না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আয় তবে আয় কবির সাথে
মুক্তি-দোলের শুক্লরাতে,
জ্বলল আলো, বাজল মৃদঙ্
নটরাজের নাট্যশালে।

উদ্‌বোধন

মন্দিরার মন্দ্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ,
নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব নৃত্যচ্ছন্দের সন্ধানে।
মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে ;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি
চতুর্দিকে। নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণভঙ্গি, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে— যে নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশষ্পদল ;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কালপানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে,
যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,

ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন সাদা,
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধবাক্ বাধা,
বন্ধ্যতার অন্ধ দুঃশাসন ; শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে ; যে নৃত্য আঘাতে
বহ্নিবাষ্প-সরোবরে ঊর্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,
অতল আবর্তবক্ষে গ্রহনক্ষত্রের শতদল
প্রস্ফুটিয়া স্ফুরে নিত্যকাল ; ধূমকেতু অকস্মাৎ
উড়ায় উত্তরী হাস্যবেগে, করে ক্ষিপ্র পদপাত
তোমার ডম্বরুতালে, পূজা-নৃত্য করি দেয় সারা
সূর্যের মন্দির-সিংহদ্বারে, চলে যায় লক্ষ্যহারা
গৃহশূন্য পান্থ উদাসীন।
নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি ;
সর্বঅমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত লয়ে।
প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর করে দুরু দুরু।
পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠালে নিমন্ত্রণে
বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণবায়ুর আলিঙ্গনে,
মল্লিকার গন্ধোল্লাসে, কিংশুকের দীপ্ত রক্তাংশুকে,
বকুলের মত্ততায়, অশোকের দোদুল কৌতুকে,
বেণুবনবীথিকার নিরন্তর মর্মরে কম্পনে
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, আম্রমঞ্জরীর সর্বত্যাগপণে,
পলাশের গরিমায়। অবসাদে যেন অন্যমনে
তাল ভঙ্গ নাহি করি, তব নামে আমার আহ্বান
জড়ের স্তব্ধতা ভেদি উৎসারিত করে দিক গান।
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হতে
উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রসসুধাস্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দ মন্দাকিনীধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণহারা।

নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
তোমার চরণ-পবন-পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে;
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।
নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।
মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

ঋতুনৃত্য

বৈশাখ

ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত ;
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।
রসহীন তরু, নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ওই চারি ধার করে হাহাকার
ধরাভাণ্ডার রিক্ত।
তব তপ-তাপে হেরো সবে কাঁপে,
দেবলোক হল ক্লান্ত।
ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।
দুর্দিনে আনে নির্দয় বায়ু,
সংহার করে কাননের আয়ু,
ভয় হয় দেখি, নিখিল হবে কি
জড়দানবের ভৃত্য।
জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে
তাপস, লোচন মেলো হে।
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেলো হে।

জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,
আশ্বাসহারা উদাস পরানে
জাগাও উদার নৃত্য।
ভুলেছে ছন্দ, ভালোয় মন্দ
একাকার তাই হায় রে।
কদর্য তাই করিছে বড়াই,
ধরণী লজ্জা পায় রে।
পিনাকে তোমার দাও টংকার,
ভীষণে মধুরে দিক ঝংকার,
ধুলায় মিশাক যা কিছু ধুলার,
জয়ী হোক যাহা নিত্য।

বৈশাখ-আবাহন

গান

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক সব গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্ ঝটি-জাল যাক দূরে যাক।

বৈশাখের প্রবেশ

গান

নমো, নমো, হে বৈরাগী
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি।
নমো নমো হে বৈরাগী।

সম্বোধন

ধূসরবসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন, হে নির্বাক,
শুষ্কপথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।
স্তম্ভিত হল সে ডাকে পৃথ্বী,
ভাণ্ডারে তার কাঁপিল ভিত্তি,
শঙ্কায় তার শুকায় তালু,
অট্ট হাসিল মরুর বালু।
হুংকার সেই তপ্ত হাওয়ায়
প্রান্তর হতে প্রান্তরে ধায়,
দিগ্‌বধূদের নীরবে কাঁদায়,
শূন্যে শূন্যে উড়ায় ধূলি,
বিজয়পতাকা আকাশে তুলি।
দুহিয়া লয়েছ গগন-ধেনুরে,
ঝরায়ে দিয়েছ শিরীষরেণুরে
উদাস করেছ রাখাল-বেণুরে
তৃষ্ণাকরুণ সারঙ-তানে।
শীর্ণ নদীর গেল সঞ্চয়,
ঝিরিঝিরি জল ধীরি ধীরি বয়,
আকুলিয়া উঠে কাননের ভয়
ভীরু কপোতের কাকলি গানে।
ধূসরবসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন হে নির্বাক,
শুষ্ক পথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।

গান

হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে,
বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
মোহন এল ভীষণ বেশে
আকাশ ঢাকা জটিল কেশে,
এল তোমার সাধন-ধন চরম সর্বনাশে।
বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
জাগ্‌ রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
এল তোমার পথের সাথি বিপুল অট্টহাসে।

কালবৈশাখী

ডাকো বৈশাখ, কালবৈশাখী,
করো তারে লীলাসঙ্গিনী—
কেন সন্ন্যাসী রয়েছ একাকী
আসুক প্রলয়রঙ্গিণী।
হৃত-নিশ্বাস অম্বর তলে
রুদ্ধ বাতাস তাপ-শৃঙ্খলে,
ঘন ঝঞ্ঝার দিক্‌ ঝংকার
অন্তর তব চঞ্চলি,
মন্থি আনুক মর্তস্বর্গ
তোমার অর্ঘ্য-অঞ্জলি।

বাজায় ডমরু তব তাণ্ডবে
গুরু গুরু মেঘ মন্দ্রিয়া—
দিগ্‌বধূ যত হাহাকার রবে
দুর্দাম উঠে ক্রন্দিয়া।
গৈরিক তব জয় পতাকায়
সন্ধ্যা-রবির রঙ সে মাখায়,
কুঞ্জে বাজায় শাখায় শাখায়
তাল-তমালের খঞ্জনি।
সপ্তুতারার লুপ্তির পরে
নাচে সে সুপ্তি ভঞ্জনী।
তপোভঙ্গের দিবে মন্ত্রণা
তব শান্তিরে তর্জিয়া,
তন্ত্র পরাবে রুদ্রবীণায়
রেখেছিলে যারে বর্জিয়া।
দিগন্তরের সঞ্চয় টুটি
অঞ্চলে মেঘ আনিবে সে লুটি—
বাজিয়া উঠিবে কল-কল্লোল
বনপল্লবে-পল্লবে—
শ্যাম উত্তরী নির্মল করি'
সাজাবে আপন বল্লভে।

মাধুরীর ধ্যান

গান

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি ;
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী।

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ-ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি,
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে
পুরব কূলে বকুলবীথিমাঝে,
লুটায়ে-পড়া অমল-নীল সাজে
নবকেতকী-কেশর আছে লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে তব জাগি।

রাখাল বেণু বাজায় তরুতলে
রাগিণী তার তাহারি কথা বলে।
ভূতলে খসি পড়িছে পাতাগুলি
চলিতে পাছে চরণে লাগে ধূলি—
কৃষ্ণচূড়া রয়েছে খেলা ভুলি
পথে তাহারে ছায়া দিবারি লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে আছে জাগি।

কাঁকন-ধ্বনি তপোবনের পারে
চপল বায়ে আসিছে বারে বারে,
কপোত দুটি তাহারি সাড়া পেয়ে
চাঁপার ডালে উঠিছে গেয়ে গেয়ে,
মরমে তব মৌনী আছে চেয়ে
আপন-মাঝে তাহারি বাণী মাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে আছে জাগি।

কঠোর, তুমি মাধুরী-সাধনাতে
মগন হয়ে রয়েছ দিনে রাতে ।
নীরস কাঠে আগুন তুমি জ্বালো,
আঁধার যাহা করিবে তারে আলো,
অশুচি যাহা, যা-কিছু আছে কালো
দহিবে তারে, সুদূরে যাবে ভাগি—
মাধুরী-ধ্যান পরানে তব জাগি ।

ব্যঞ্জনা

শুনিতে কি পাস
এই যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনি,
মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি ?
রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্যমাল্য সাঙ্গ হয় সংগোপনে সুন্দরের লাগি ।
মগ্না যেথা ধেয়ানের সর্বশূন্য গহনে বৈরাগী,
সেথা কে বুভুক্ষু আসে ভিক্ষা-অন্বেষণে ;
জীর্ণ পর্ণশয্যা-'পরে একা রহে জাগি
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পদস্পর্শ মাগি ।
তাপিত আকাশে
হঠাৎ নীরবে চলে আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা ।
অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্‌বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ-কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে ;
মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্‌বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় ঔদাসীন্য কঠোর বন্ধন ।

বর্ষায় প্রবেশ

গান

নমো, নমো করুণাঘন নম হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
তব দর্শন-ধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।

প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে ॥

ওই কি এলে আকাশ-পারে
দিক্‌ললনার প্রিয়,
চিত্তে আমার লাগল তোমার
ছায়ার উত্তরীয়।

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণজলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল
নিবিড় হর্ষণে।

মেঘের মাঝে মৃদঙ্গ তোমার
বাজিয়ে দিলে কি ও
ওই তালেতেই মাতিয়ে আমায়
নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো।

ভরুক গগন, ভরুক কানন
ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদন ভরা।
পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির-আকাশ করুক আড়াল,
নয়ন ভুলুক বিজুলি ঝলুক
পরম দর্শনে।

আষাঢ়

কোন্ বারতার করিল প্রচার
দূর আকাশের ইঙ্গিতে
ঐরাবতের বৃংহিতে।
নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন
ধরণী তপস্বিনী,
রুক্ষ অঙ্গ পাংশু-ধূসর,
ধ্যান-অঙ্গন শুষ্ক উষর,
নাহি সখী সঙ্গিনী ;
বুঝি আসন্ন হল তার বর,
শুনি গর্জন রথঘর্ঘর,
বুঝি আসে কাঙ্ক্ষিত,
তাই চিত্ত যে হল চঞ্চল,
আঁখিপল্লব বাষ্পসজল,
তাই সে রোমাঞ্চিত।

ওগো বিরহিণী, গেল দুর্দিন,
দুঃখ ঘুচিবে নিঃশেষে,
মনোমাঝে যারে রুদ্ধ নয়নে
পূজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে,
দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে।
ওই বুঝি আসে আকাশে আকাশে
সমারোহ তার বিস্তারি,
বিজয়ী সে বীর, ওরে ভয়ভীতা
যাবে তোর ভয়, ওরে পিপাসিতা
তৃষা হতে দিবে নিস্তারি।
ললাটে নিপুণ পত্রলেখাটি
আঁকো কুঙ্কুম চন্দনে।
দুলাও চামেলি অলকে তোমার
কবরী রচিয়া এলো কেশভার
বেঁধে তোলো বেণীবন্ধনে।

উঠ ধূলি হতে ওগো দুঃখিনী
ছাড়ো গৈরিক উত্তরী।
নীলবসনের অঞ্চলখানি
কম্পিত বুকে লহো লহো টানি
হাসিমুখে চাহো সুন্দরী।
বীর-মঙ্গল ঘোষুক মন্ত্র
মুখে তুলে তোর শঙ্খ নে।

কৌতুকসুখ চক্ষে ফুটুক,
বিদ্যুৎ-শিখা কম্পি উঠুক
তব চঞ্চল কঙ্কণে।
কুঞ্জকানন জাগ্রত হোক
আজি বন্দনাসংগীতে—
শিহর লাগুক শাখায় শাখায়,
মাতন লাগুক শিখীর পাখায়
তব নৃত্যের ভঙ্গিতে।
শ্যামবন্ধুরে শ্যামল তৃণের
আসনে বসাবি অঙ্গনে।
রাখিবি দুয়ারে আল্‌পনা আঁকি,
চরণের তলে ধুলা দিবি ঢাকি,
টগর করবী রঙ্গনে।
গাও জয় জয়, গাও জয়গান
ঢেউ তোলো স্বরসপ্তকে,
বনপথে আসে মনোরঞ্জন,
নয়নে পরাবে প্রেম-অঞ্জন,
সুধা দিবে চিরতপ্তকে।

লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব।
জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁক এ কোন্ ছবি রে।
মেঘমল্লারে কী বল আমারে
কেমনে কব।
বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো,
শ্বেত-উত্তরী আজ কেন কালো ?
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব।

বর্ষামঙ্গল

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনাল মনে।
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারংবার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ।
শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন ছন্দ?
মনে পড়িল কি নীল নদীজলে,
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছলছলে
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ;
স্থকিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথার আভাসের মতো
নীলাম্বরের প্রান্ত?
মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে ঝারি
তরুতলে-তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচন-শিথিল বাহু দুটি তারি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত?

ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি
ঝরঝর ধারাজলে—
তমালবনের শ্যামল তিমিরতলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চিরবিরহের কথা,
বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।

কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি
আতুর নয়নে দু-হাতে আঁচল ঝাঁপে।
তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লাররাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।
যাক যাক তব মন গলে গলে যাক,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চলে চলে যাক,
বেদনার ধারা দুর্দাম দিশাহারা
দুখ-দুর্দিনে দুই কূল তার ছাপে।
কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেইমতো তব কম্পিত বাহু তুলি
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
আজ, সন্ন্যাসী, কাজ নাই জপে জাপে।

শ্রাবণ-বিদায়

গান

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার
আভাস পেলে।
পথে তারি সকল বারি
দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পুব হাওয়া কয়, ওর তো সময় নাই বাকি আর।
শরৎ বলে, যাক-না সময় ভয় কিবা তার—
কাটবে বেলা আকাশমাঝে বিনা কাজে
অসময়ের খেলা খেলে।

কালো মেঘের আর কি আছে দিন
ও যে হল সাথিহীন।
পুব হাওয়া কয়, কালোর এবার যাওয়াই ভালো,
শরৎ বলে, গেঁথে দেব কালোয় আলো।
সাজবে বাদল আকাশমাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে।

যায় রে শ্রাবণকবি রসবর্ষা ক্ষান্ত করি তার,
কদম্বের রেণুপুঞ্জে পদে পদে কুঞ্জবীথিকার

ছায়াঞ্চল ভরি দিল। জানি, রেখে গেল তার দান
বনের মর্মের মাঝে ; দিয়ে গেল অভিষেকস্নান
সুপ্রসন্ন আলোকেরে ; মহেন্দ্রের অদৃশ্য বেদীতে
ভরি গেল অর্ঘ্যপাত্র বেদনার উৎসর্গ অমৃতে ;
সলিল গণ্ডূষ দিতে তটিনী সাগরতীর্থে চলে,
অঞ্জলি ভরিল তারি ; ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে
রেখে গেল তৃষ্ণার সম্বল ; অগ্নিতীক্ষ্ণ বজ্রবাণ
দিগন্তের তূণ ভরি একান্তে করিয়া গেল দান
কালবৈশাখীর তরে, নিজ হস্তে সর্ব ম্লানতার
চিহ্ন মুছে দিয়ে গেল। আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ।

শেষ মিনতি

গান

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?
কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা।

যাত্রাবেলায় রুদ্ররবে
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে,
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে।

নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত
বিদায়বিষাদে উদাসমতো,
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা।

মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে
বন্দী করে কে আমারে।
যাই চলে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে।

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে
মর্মর মুখরিল মৃদু পবনে,
বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর
বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য মানো ওগো ধৈর্য মানো,
বরমাল্য গলে তব হয় নি ম্লান,
আজো হয় নি ম্লান,
ফুল-গন্ধ-নিবেদন-বেদন-সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা।

শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ,
কৃশতনু ক্লান্ত,
উড়ে পড়ে উত্তরী-প্রান্ত
উত্তর-পবনে।
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে
আজি তারে বন্দে,
নীপবন মর্মর ছন্দে
জাগে তার স্তবনে।
শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লবপুঞ্জে।
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদগীতিকা,
আজি মেঘ বর্ষণরিক্ত
নিঃশেষবিত্ত,
দিল করি শেষ অভিষিক্ত
কিংশুকবীথিকা।

শরৎ

ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর বীন,
শিশির-বাতাসে দূরে দূরে ডাক দিল কে।
আয় সুলগনে, আজ পথিকের দিন,
এঁকে নে ললাট জয়যাত্রার তিলকে।
গেল খুলি গেল মেঘের ছায়ার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণভার,
তরুণ আলোক মুকুট পরেছে তার,
বিজয়শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে।
শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা
নিত্যকালের বালকবীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
বলে, চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো'সে।
ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে,
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার তরে,
মায়াজাল ভেদি চলো সে রুদ্ধ ঘরে,
লও কার্মুক, দানবের বুকে হানো'সে।
ওরে, শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
বীর-গৌরবে পার হতে হবে সাগরে।
ইন্দ্রের শর ভরি নিতে হবে তূণে
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, জাগো রে।

'দেবী শারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি
দেব-সেনাপতি কুমার দৈত্যজয়ী,
সে প্রসাদখানি দাও গো অমৃতময়ী',
এই মহা বর চরণে তাঁহার মাগো রে।
আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে
শুভ্রের পায়ে অম্লান মনে নমো রে।
স্বর্গের রাখী বাঁধো দক্ষিণ হাতে
আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।
মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস—
'হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে।'

শান্তি

গান

পাগল আজি আগল খোলে
বিদায়রজনীতে,
চরণে ওর বাঁধিবি ডোর,
কী আশা তোর চিতে।
গগনে তার মেঘ-দুয়ার ঝেঁপে,
বুকেরই ধন বুকেতে ছিল চেপে,
হিম হাওয়ায় গেল সে দ্বার কেঁপে,
এসেছে ডাক ভোরের রাগিণীতে।
শীতল হোক বিমল হোক প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান।
যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলালো,
সে ফাঁক দিয়ে আসুক তবে আলো,
বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢালো
শিশিরে-ভরা শিউলি-ঝরা গীতে।

শরতের প্রবেশ

গান

নির্মল কান্ত, নমো হে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নমঃ।
বন-অঙ্গনময় রবিকর-রেখা
লেপিল আলিম্পনলিপিলেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ।

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-ভোলানো সুরে—
চপল করে হাঁসের দুটি পাখা
ওড়ায় তারে দূরে।
শিউলিকুঁড়ি যেমনি ফোটে শাখে
অমনি তারে হঠাৎ ফিরে ডাকে,
পথের বাণী পাগল করে তাকে,
ধুলায় পড়ে ঝুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে।

শরৎ আজি বাজায় এ কী ছলে
পথ-ভোলানো বাঁশি।
অলস মেঘ যায় যে দলে দলে
গগনতলে ভাসি।
নদীর ধারা অধীর হয়ে চলে
কী নেশা আজি লাগল তার জলে,
ধানের বনে বাতাস কী যে বলে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা,
কাজ-খোওয়ানো সুরে।

শরৎ আজি শুভ্র আলোকেতে
মন্ত্র দিল পড়ি,
ভুবন তাই শুনিল কান পেতে
বাজে ছুটির ঘড়ি।
কাশের বনে হাসির লহরীতে
বাজিল ছুটি মর্মরিত গীতে—
ছুটির ধ্বনি আনিল মোর চিতে
পথিকবন্ধুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে।

শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।

সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু
এই তো।

আমার মনের ভাবনাগুলি
বাহির হল পাখা তুলি,
ওই কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে।

সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
এই আলো তার এই তো আঁধার
এই আছে এই নেই তো।

শরৎবাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলিতলে।
তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ খেতে,
বনের প্রাণে মর্‌মরানির
ঢেউ উঠালে।

শরতের বিদায়

কেন গো যাবার বেলা
গোপনে চরণ ফেলা,
যাওয়ার ছায়াটি পড়ে যে হৃদয়-মাঝে,
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে।
সুদূর বিরহতাপে
বাতাসে কী যেন কাঁপে,
পাখির কণ্ঠ করুণ ক্লান্তি-ভরা,
হারাই হারাই মনে করে তাই সংশয়-ম্লান ধরা।
জানি নে গহন বনে
শিউলি কী ধ্বনি শোনে,
আনমনে তার ভূষণ খসায়ে ফেলে।
মালতী আপন সব ঢেলে দেয় শেষ খেলা তার খেলে।
না হতে প্রহর শেষ
হবে কি নিরুদ্দেশ,
তোমার নয়নে এখনো রয়েছে হাসি,
বাজায়ে সোহিনী এখনো মোহিনী বাঁশি ওঠে উচ্ছ্বাসি।

এই তব আসা-যাওয়া
একি খেয়ালের হাওয়া,
মিলনপুলক তাতেও কি অবহেলা,
আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কি কেবলই খেলা।

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল ?
রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই
ফিরিবারেই হলি ব্যাকুল।
কেন রে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা ?
কোন্ ভাষায় চাস বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলেই যায় বকুল।

বিলাপ

গান

চরণরেখা তব যে-পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি।
ছিল তো শেফালিকা
তোমারি লিপি-লিখা
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি।
কাশের শিখা যত কাঁপিছে থরথরি,
মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি।
তোমার যে-আলোকে
অমৃত দিত চোখে,
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি।

হেমন্তের প্রবেশ

গান

নমো, নমো, নমো।
তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগধন্য
করো অন্তর মম।

—

হেমন্তেরে বিভল করে কিসে,
চলিতে পথে হারালো কেন দিশে।
যেন রে ওর আলোর স্মৃতিখানি
বিস্মৃতির বাষ্পে নিল টানি,
কণ্ঠ তাই হারালো তার বাণী,
অশ্রু কাঁপে নয়ন-অনিমিষে।
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে।

ক্ষণেকতরে লও-না ঘরে ডাকি,
যাত্রা ওর অনেক আছে বাকি।
শিশিরকণা লাগিবে পায়ে পায়ে,
রুক্ষ কেশ কাঁপিবে হিমবায়ে,
আঁধার-করা ঘনবনের ছায়ে
শুষ্ক পাতা রয়েছে পথ ঢাকি।
ক্ষণেকতরে লও-না ঘরে ডাকি।

বাসা যে ওর সুদূর হিমাচলে,
শেওলা-ঝোলা তিমিরগুহাতলে।
যে পথ বাহি বলাকা যায় ফিরে
সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে,
সে পথ দিয়ে ধানের খেত ঘিরে
হিমের ভারে চলিবে পলে পলে।
যেতে যে হবে সুদূর হিমাচলে।

চলিতে পথে এল আঁধার রাতি,
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।
অসুরদলে গগনে রচে কারা,
তাই তো শশী হয়েছে জ্যোতিহারা,
আকাশ ঘেরি ধরিবে যত তারা
কে যেন জেলে কুহেলি-জাল পাতি।
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।

বধূরা যবে সাঁজের জ্যোতি জ্বাল
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।
দেবতা যারে বিঘ্ন দিয়ে হানে
তোমরা তারে বাঁচায়ো দয়াদানে
কল্যাণী গো, তোদেরই কল্যাণে
ছুটিয়া যাক কুস্বপন কালো,
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।

গান

শিউলি-ফোটা ফুরালো যেই শীতের বনে,
এলে যে সেই শূন্য খনে।
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণমালা
গাঁথি মনে মনে
শূন্য খনে।
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠবে যবে
সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে
মনে মনে।

—

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে
মলিন হেরি কুয়াশাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা।
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে
রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা।

হেমন্ত

হে হেমন্তলক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ চুলে ঢাকা,
ললাটের চন্দ্রলেখা অযত্নে এমন কেন ম্লান।
হাতে তব সন্ধ্যাদীপ কেন গো আড়াল করে আন
কুয়াশায়? কণ্ঠে বাণী কেন হেন অশ্রুবাষ্পে মাখা
গোধূলিতে আলোতে আঁধারে। দূর হিমশৃঙ্গ ছাড়ি
ওই হেরো রাজহংসশ্রেণী, আকাশে দিয়েছে পাড়ি
উজায়ে উত্তরবায়ুস্রোত, শীতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত পাখা
মাগিছে আতিথ্য তব জাহ্নবীর জনশূন্য তটে
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে। প্রান্তরসীমায় ছায়াবটে
মৌনব্রত বউ-কথা-কও। গ্রামপথ আঁকাবাঁকা
বেণুতলে পান্থহীন অবলীন অকারণ ত্রাসে,
ক্বচিৎ চকিত-ধূলি অকস্মাৎ পবন উচ্ছ্বাসে।

কেন বলো, হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত করে রাখা,
মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধূমলবর্ণে আঁকা।

২

ভরেছ, হেমন্তলক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক্ব ধানে।
দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে
শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে। বলেছিল ডাকি,
'কোথায় গো, অন্নপূর্ণা, ক্ষুধার্তেরে অন্ন দিবে না কি।
শান্ত করো প্রাণের ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়ানে
ধরার ভাণ্ডার পানে।' শুনিয়া লুকায়ে হাস্যখানি,
লুকায়ে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণা দিয়েছ তুমি আনি,
ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিলে সাবধানে।

স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।
অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রানে।
তোমার অমৃত-নৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।

দীপালি

গান

হিমের রাতে ওই গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
'দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'
শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।
যাক অবসাদ বিষাদ কালো
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়বাণীরে।

দেব্‌তারা আজ আছে চেয়ে—
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।
এল আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে।

শীতের উদ্‌বোধন

ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু,
শীতের রাতে তোমার সাথে কী খেলা হবে শুরু।
ভাবিয়াছিনু খেলার দিন
গোধূলি-ছায়ে হল বিলীন,
পরান মন হিমে মলিন
আড়াল তারে ঘেরি—
এমন ক্ষণে কেন গগনে বাজিল তব ভেরী।

উতর-বায় কারে জাগায়, কে বুঝে তার বাণী ?
অন্ধকারে কুঞ্জদ্বারে বেড়ায় কর হানি।
কাঁদিয়া কয় কানন-ভূমি—
'কী আছে মোর, কী চাহ তুমি ?
শুষ্ক শাখা যাও যে চুমি
কাঁপাও থরথর,
জীর্ণপাতা বিদায়গাথা গাহিছে মরমর।'

বুঝেছি তব এ অভিনব ছলনাভরা খেলা,
তুলিছ ধ্বনি কী আগমনী আজি যাবার বেলা।
যৌবনেরে তুষার-ডোরে
রাখিয়াছিলে অসাড় ক'রে ;
বাহির হতে বাঁধিলে ওরে
কুয়াশা-ঘন জালে—
ভিতরে ওর ভাঙালে ঘোর নাচের তালে তালে।

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক খান্‌খান্‌,
মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক প্রাণ।
নৃত্য তব ছন্দে তারি
নিত্য ঢালে অমৃতবারি,
শঙ্খ কহে হুহুংকারি
বাঁধন সে তো মায়া,
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া।

এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরই জয়—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়-তোরণ গড়ে
আনন্দের তানে,
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে।

বাঁধন যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি তারে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবে না যে
ঢাকিয়া তারে আঁধার-মাঝে,
নিশীথ-নাচে ডমরু বাজে
অরুণদ্বার খোলে—
জাগে মুরতি, পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে।

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা,
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।
ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্য-লোল চরণতলে
মুক্তি পায় ধরা—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা।

আসন্ন শীত

গান

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।
আম্‌লকী-ডাল সাজল কাঙাল,
খসিয়ে দিল পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি
যায় যে চলে।
সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুমকো লতা।

উত্তরবায় জানায় শাসন,
পাতল তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কার
অট্টরোলে।

শীত

ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্মম,
তোমার উত্তরবায়ু দুরন্ত দুর্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থরথর কম্পমান, শীর্ষ করি নত
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে। 'জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো' এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস।
হে নির্মল,
সংশয়-উদ্‌বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল।
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,
শূন্য করি দাও মন; সর্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক শান্ত উদাত্ত মুরতি,
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জনাভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তার
সম্মার্জন করি দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি, সে-শূন্য তোমারি আয়োজন,
সেইমতো মোর চিত্তে পূর্ণের আসন
মুক্ত করো রুদ্র-হস্তে; কুজ্‌ঝটিকারাশি
রাখুক পুঞ্জিত করি প্রসন্নের হাসি।
বাজুক তোমার শঙ্খ মোর বক্ষতলে
নিঃশঙ্ক দুর্জয়। কঠোর উদগ্রবলে
দুর্বলেরে করো তিরস্কার; অট্টহাসে
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো; হিমশ্বাসে
আরাম করুক ধূলিসাৎ। হে নির্মম,
গর্বহরা, সর্বনাশা, নমো নমো নমঃ।

নৃত্য

গান

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
　　আম্‌লকীর এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে
　　ঝরিয়ে দিল তালে তালে।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
　　রইল না আর অন্তরালে।

শূন্য করে ভরে-দেওয়া
　　যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে
　　সারা বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার
　　হবে কখন কোন্‌ সকালে।

শীতের প্রবেশ

গান

নমো, নমো, নমো নমো।
　　নির্দয় অতি করুণা তোমার
　　　　বন্ধু তুমি হে নির্মম,
　যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
　　　　দণ্ড তোমার দুর্দম।

—

সর্বনাশার নিশ্বাস বায়
　　লাগল ভালে।
নাচল চরণ শীতের হাওয়ায়
　　মরণতালে।
করব বরণ, আসুক কঠোর,
ঘুচুক অলস সুপ্তির ঘোর,
যাক ছিঁড়ে মোর বন্ধনডোর
　　যাবার কালে।

ভয় যেন মোর হয় খান্‌খান্‌
ভয়েরই ঘায়ে,
ভয়ে যেন প্রাণ ভেসে এসে দান
ক্ষতির বায়ে।
সংশয়ে মন না যেন দুলাই,
মিছে শুচিতায় তারে না ভুলাই,
নির্মল হব পথের ধুলাই
লাগিলে পায়ে।

শীত, যদি তুমি মোরে দাও ডাক
দাঁড়ায়ে দ্বারে—
সেই নিমেষেই যাব নির্বাক্‌
অজানা পারে।
নাই দিল আলো নিবে-যাওয়া বাতি—
শুকনো গোলাপ, ঝরা যূথী জাতী,
নির্জন পথ হোক মোর সাথি
অন্ধকারে।

জানি জানি, শীত, আমার যে-গীত
বীণায় নাচে
তারে হরিবার কভু কি তোমার
সাধ্য আছে।
দক্ষিণ বায়ে করে যাব দান
রবিরশ্মিতে কাঁপিবে সে তান,
কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান
লতায় গাছে।

যাহা-কিছু মোর তুমি, ওগো চোর,
হরিয়া লবে,
জেনো বারেবারে ফিরে ফিরে তারে
ফিরাতে হবে।
যা-কিছু ধুলায় চাহিবে চুকাতে
ধুলা সে কিছুতে নারিবে লুকাতে,
নবীন করিয়া নবীনের হাতে
সঁপিবে কবে।

স্তব

গান

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য।
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।
যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষণ্ণ ;
হও প্রসন্ন।

সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা
মরণসত্রে।
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি
শুকানো পত্রে ?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য ;
হও প্রসন্ন।

শীতের বিদায়

তুঙ্গ তোমার ধবলশৃঙ্গশিরে
উদাসীন শীত, যেতে চাও বুঝি ফিরে ?
চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার
নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যার।
হেলায় যে-জন ফেলায় সকল তার
অমিত দানের বেগে ?

দণ্ড তোমার তার হাতে বেণু হবে,
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে
জাগাবে, রহিবে জেগে।

সে যে মুছে দিবে তোমার আঘাতচিহ্ন,
কঠোর বাঁধন করিবে ছিন্ন ছিন্ন।

এতদিন তুমি বনের মজ্জামাঝে
বন্দী রেখেছ যৌবনে কোন্ কাজে,
ছাড়া পেয়ে আজ কত অপরূপ সাজে
বাহিরিবে ফুলে দলে।

তব আসনের সম্মুখে যার বাণী
আবদ্ধ ছিল বহুকাল ভয় মানি
কণ্ঠ তাহার বাতাসেরে দিবে হানি
বিচিত্র কোলাহলে।

তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা,
নগ্ন তরুর শাখা পেত তাই লজ্জা।
তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে
নীল পীত রাঙা নানা রঙ ফিরে এসে,
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে
জাগাইবে মত্ততা।

সম্পদ তুমি যার যত নিলে হরি
তার বহুগুণ ও যে দিতে চায় ভরি,
পল্লবে যার ক্ষতি ঘটেছিল ঝরি,
ফুল পাবে সেই লতা।

ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা যাহারে দিলে,
সব দিকে যার বাহুল্য ঘুচাইলে,
প্রাচুর্যে তারি হল আজি অধিকার।
দক্ষিণবায়ু এই বলে বার বার,
বাঁধন-সিদ্ধ যে-জন তাহারি দ্বার
খুলিবে সকলখানে।

কঠিন করিয়া রচিলে পাত্রখানি
রসভারে তাই হবে না তাহার হানি,
লুঠি লও ধন, মনে মনে এই জানি,
দৈন্য পূরিবে দানে।

বসন্তের প্রবেশ

গান

নমো নমো নমো নমো
তুমি সুন্দরতম।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব,
ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ—
উৎসবপতি মহানন্দ
তুমি সুন্দরতম।

—

লুকানো রহে না বিপুল মহিমা
বিঘ্ন হয়েছে চূর্ণ,
আপনি রচিলে আপনার সীমা
আপনি করিলে পূর্ণ।
ভরেছে পূজার সাজি,
গান উঠিয়াছে বাজি,
নাগকেশরের গন্ধরেণুতে
উড়ে চন্দনচূর্ণ।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
ম্লান আবরণ আড়ালে দেখালে
সব দৈন্যের অন্ত।

অমানিত মাটি, দিবে তারে মান
এসেছ তাহারি জন্য ;
পথে পথে দিলে পরশের দান
ধূলিরে করিলে ধন্য।
যেথা আস তুমি, বীর,
জাগে তব মন্দির,
বর্ণছটায় মাতে মহাকাশ
স্তব করে মহারণ্য।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
অনেক ভুলায়ে নিমেষে সহসা
দেখালে আপন পন্থ।

ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি এ কী দৃশ্য,
শক্তি তোমার সুন্দর হয়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।
তব পুষ্পিত তরু
জয় করি নিল মরু,
মূক চিত্তের জাগাইলে গান,
কবি হল তব শিষ্য।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তি-বিহীন
করিলে প্রজ্বলন্ত।

আবাহন

গান

তোমার আসন পাতব কোথায়,
হে অতিথি।
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায়
কাননবীথি।
ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দকলি,
উত্তরবায় লুঠ করে তায় গেল চলি,
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরলগীতি,
হে অতিথি।

সুর-ভোলা ওই ধরার বাঁশি
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্মে তাহার তোমার হাসি
দাও-না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগবে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি।

বসন্ত

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্তে মূর্তি ধর ভুবনমোহন
নব বরবেশে।
তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।

সূর্য প্রদক্ষিণ করি ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তার প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মিটিকা।
সমুদ্রতরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা।

আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুনে গুনে।
সার্থক হল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।
হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলনমাঙ্গল্য-হোম প্রজ্বলিত পলাশে পলাশে,
রক্তিম আগুনে।

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম, যত প্রয়োজন
হল অবসান।
বৃক্ষশাখা রিক্তভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন,
ক্ষেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি,
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোকমঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবসশর্বরী
বনে জাগে গান।

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্তসন্ধ্যাস্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীরধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়।
শ্রান্তিক্লান্তিভরে।

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজালবলে
কর অলংকার।
সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্তে দোলে ছন্দভরে,
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম বাণীর মানসসরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সংগীতনির্ঝরে
বর্ষিছে ঝংকার।

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্তে, হে মর্তের প্রিয়
নিত্য নাই হলে।
সুদূরমাধুর্য-পানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে,
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দাররেণু শিরে তার ঊর্ধ্ব হতে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাসরসে ভরা
রবে তার কোলে।

রাগরঙ্গ

গান

রঙ লাগালে বনে বনে,
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা,
দোল দিয়েছে বনের দোলা,
কোন্ ভোলা সে ভাবে-ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে।

আন্ বাঁশি তোর আন্ রে,
লাগল সুরের বান রে,
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে
শেষ বেলাকার গান রে।
সন্ধ্যাকাশের বুকফাটা সুর
বিদায়রাতি করবে মধুর,
মাতল আজি অস্তসাগর
সুরের প্লাবনে।

বসন্তের বিদায়

মুখখানি কর মলিন বিধুর
যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর
ছলের খেলা।
জানি গো বন্ধু, ফিরে আসিবার পথে
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে,
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে,
যার সাথে তব হল একদিন
মিলন-মেলা।
জানি আমি, যবে আঁখিজল ভরে
রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়রোমাঞ্চদান,
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে
মিথ্যা হেলা।

প্রার্থনা

গান

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি ।
বিদায়লগনে ধরিয়া দুয়ার
তবু যে তোমায় বলি বার বার
'ফিরে এসো, এসো, বন্ধু আমার'
বাষ্পবিভল বাণী ।

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো ।
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয় ।
বনপথে যবে যাবে সে-ক্ষণের
হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি ।

অহৈতুক

গান

মনে রবে কি না রবে আমারে
সে আমার মনে নাই গো ।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে,
অকারণে গান গাই গো ।
চলে যায় দিন, যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো ।

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে ।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া,
আর কিছু নাহি জানে ।
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ ;
গান সারা হবে, থেমে যাবে বীন ;
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি
এ খেলারই ভেলাটাই গো ।
তাই অকারণে গান গাই গো ।

মনের মানুষ[১]

কত-না দিনের দেখা
কত-না রূপের মাঝে,
সে কার বিহনে একা
মন লাগে নাই কাজে।
কার নয়নের চাওয়া
পালে দিয়েছিল হাওয়া,
কার অধরের হাসি
আমার বীণায় বাজে।
কত ফাগুনের দিনে
চলেছিনু পথ চিনে,
কত শ্রাবণের রাতে
লাগে স্বপনের ছোঁওয়া।
চাওয়া-পাওয়া নিয়ে খেলা,
কেটেছিল কত বেলা,
কখনো বা পাই পাশে
কখনো বা যায় খোওয়া।
শরতে এসেছে ভোরে
ফুলসাজি হাতে ক'রে,
শীতে গোধূলির বেলা
জ্বালায়েছে দীপশিখা।
কখনো করুণ সুরে
গান গেয়ে গেছে দূরে,
যেন কাননের পথে
রাগিণীর মরীচিকা।
সেই সব হাসি কাঁদা,
বাঁধন খোলা ও বাঁধা,
অনেক দিনের মধু,
অনেক দিনের মায়া—
আজ এক হয়ে তারা
মোরে করে মাতোয়ারা,
এক বীণারূপ ধরি
এক গানে ফেলে ছায়া।
নানা ঠাঁই ছিল নানা,
আজ তারে হল জানা,

১ এই ছন্দ চৌপদীজাতীয় নহে। ইহার যতিবিভাগ নিম্নলিখিত রূপে :

কত-না দিনের। দেখা ॥ কত-না রূপের। মাঝে ॥
সে কার বিহনে। একা ॥ মন লাগে নাই। কাজে ॥

বাহিরে সে দেখা দিত
মনের মানুষ মম—
আজ নাই আধাআধি,
ভিতর বাহির বাঁধি
এক দোলাতেই দোলে
মোর অন্তরতম।

চঞ্চল

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে।
অস্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে।
বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুলরেণু
পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভ'রে।

যে-গুণী তাহার কীর্তিনাশার নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে,
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তার হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে
ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে।

উৎসব

সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই, জাগিল ওই, জাগিল।
হাস্যভরা দখিনবায়ে
অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে
শ্মশানচিতাভস্মরাশি, ভাগিল কোথা, ভাগিল।
মানসলোকে শুভ্র আলো
চূর্ণ হয়ে রঙ জাগালো,
মদির রাগ লাগিল তারে,
হৃদয়ে তার লাগিল।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
রঙের ধারা ওই যে বহে যায় রে।

রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে ;
ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।
নাকাড়া বাজে, কানাড়া বাজে বাঁশিতে,
কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে,
প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে।

এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো,
এসেছে পথ-ভোলানো,
এসেছে ডাক ঘরের দ্বার-খোলানো।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
রঙের ধারা ওই যে বহে যায় রে।

উদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে
পূর্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,
চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল ;
অরুণবীণা যে-সুর দিল রনিয়া
সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
বাঁধনহারা রঙের ধারা ওই যে বহে যায় রে।

শেষের রঙ

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে।
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে,
আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে।
যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে
রক্তে তোমার চরণদোলা
লাগিয়ে দিয়ে।

আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝরধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে।

দোল

আলোকরসে মাতাল রাতে
বাজিল কার বেণু।
দোলের হাওয়া সহসা মাতে,
ছড়ায় ফুলরেণু।
অমলরুচি মেঘের দলে
আনিল ডাকি গগনতলে,
উদাস হয়ে ওরা যে চলে
শূন্যে-চরা ধেনু।

দোলের নাচে সে বুঝি আছে
অমরাবতীপুরে ?
বাজায় বেণু বুকের কাছে,
বাজায় বেণু দূরে।
শরম ভয় সকলি ত্যেজে
মাধবী তাই আসিল সেজে,
শুধায় শুধু 'বাজায় কে যে
মধুর মধু সুরে'।

গগনে শুনি এ কী এ কথা,
কাননে কী যে দেখি—
এ কি মিলনচঞ্চলতা।
বিরহব্যথা এ কি।
আঁচল কাঁপে ধরার বুকে,
কী জানি তাহা সুখে না দুখে।
ধরিতে যারে না পারে তারে
স্বপনে দেখিছে কি।

লাগিল দোল জলে স্থলে,
জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে,
বিরহিণীর মনে।

মধুর মোরে বিধুর করে
সুদূর তার বেণুর স্বরে,
নিখিল হিয়া কিসের তরে
দুলিছে অকারণে।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি
করবীমালা লয়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি
কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীত বসনে সাজি,
কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি
যামিনী যাক বয়ে।

এসো গো এসো দোলবিলাসী,
বাণীতে মোর দোলো।
ছন্দে মোর চকিতে আসি
মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে
সময় তারি হল।

কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরান মম জাগে।
নবীন কবে করিবে তারে
রঙিন তব রাগে।
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি আগে।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

ত্যাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচুগাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখুজ্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছু চঞ্চলভাবে কখনো তার স্ত্রীর একগুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখনো তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠুং ঠুং শব্দ করিতেছে, কখনো তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া তাহার মুখের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একটু-আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু কুসুম সম্মুখের চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীর চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অবশেষে হেমন্ত কিছু অধীরভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল, "কুসুম, তুমি আছ কোথায়? তোমাকে যেন একটা মস্ত দুরবীন কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে এমনি দূরে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটু কাছাকাছি এসো। দেখো দেখি কেমন চমৎকার রাত্রি।"

কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল, "এই জ্যোৎস্নারাত্রি, এই বসন্তকাল, সমস্ত এই মুহূর্তে মিথ্যা হইয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।"

হেমন্ত বলিল, "যদি জান তো সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোনো মন্ত্র জানা থাকে যাহাতে সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার আসে কিংবা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত টিকিয়া যায় তো তাহা শুনিতে রাজি আছি।" বলিয়া কুসুমকে আর-একটু টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুসুম সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল, "আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে-কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে, তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও-না কেন আমি বহন করিতে পারিব।"

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লোক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটিজুতার চটাচট শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে। হেমন্তের পিতা হরিহর মুখুজ্যের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর দ্বারের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ গর্জনে কহিল, "হেমন্ত, বউকে এখনই বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।" হেমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, স্ত্রী কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারও কানে গেল না। পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কি।"

স্ত্রী কহিল, "সত্য।"

"এতদিন বল নাই কেন।"

"অনেকবার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই। আমি বড়ো পাপিষ্ঠা।"

"তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বলো।"

কুসুম গম্ভীর দৃঢ়স্বরে সমস্ত বলিয়া গেল— যেন অটলচরণে ধীরগতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দগ্ধ হইতেছিল কেহ বুঝিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া হেমন্ত উঠিয়া গেল।

কুসুম বুঝিল, যে-স্বামী চলিয়া গেল সে-স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য মনে হইল না ; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মতো অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল ; মনের মধ্যে এমন একটা শুষ্ক অসাড়তার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল পৃথিবীকে এবং ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমন-কি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মতো তাহার মনের একধার হইতে আর-একধার পর্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে-ভালোবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না— সেই ভালোবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চূর্ণ হইয়া একমুষ্টি ধূলি হইয়া গেল। হেমন্ত কম্পিতস্বরে এই কিছু পূর্বে কানের কাছে বলিতেছিল, "চমৎকার রাত্রি।" সে রাত্রি তো এখনো শেষ হয় নাই ; এখনো সেই পাপিয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস মশারি কাঁপাইয়া যাইতেছে, এবং জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মতো বাতায়নবর্তী পালঙ্কের একপ্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা। ভালোবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশুষ্ক হেমন্ত পাগলের মতো হইয়া প্যারিশংকর ঘোষালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশংকর জিজ্ঞাসা করিল, "কী হে বাপু, কী খবর।"

হেমন্ত মস্ত একটা আগুনের মতো যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছ, সর্বনাশ করিয়াছ— তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"— বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশংকর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আর তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ, আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড়ো যত্ন, বড়ো ভালোবাসা।"

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্তেই প্যারিশংকরকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে, কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে লাগিল, প্যারিশংকর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার কী করিয়াছিলাম।"

প্যারিশংকর কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কী অপরাধ করিয়াছিল। তুমি তখন ছোটো ছিলে, তুমি হয়তো জানো না— ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোনো। ব্যস্ত হইয়ো না বাপু, ইহার মধ্যে অনেক কৌতুক আছে।

"আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলে। তাহার পর পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিংবা তুমি না জানিতেও পার, তুমি

তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন— মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা, এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি, তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি তোমার বাপ কন্যাকর্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।— এইবার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ— কিন্তু আর-একটু সবুর করো— সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুশি হইবে— ইহার মধ্যে একটু রস আছে।

"তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাটুজ্যের বাড়ি ছিল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাটুজ্যেমহাশয়ের বাড়িতে কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড়ো সুন্দরী— বুড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সংবরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বুড়োমানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না। পরস্পরের ছাত হইতে তোমাদের কোনোরূপ কথাবার্তা হইত কি না সে তোমরাই জানো, কিন্তু মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ, কাজকর্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মতো দিন দিন সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে বুড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না।

"অবশেষে বুড়া আবিষ্কার করিল, ছাতে তোমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে নীরব দেখাসাক্ষাৎ চলিয়া থাকে— এমন-কি, কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে ; নির্জন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খুড়ো, তুমি তো অনেক দিন হইতে কাশী যাইবার মানস করিয়াছ— মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও, আমি তাহার ভার লইতেছি।

"বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুজ্যের বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার আছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড়ো আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মতো। ইচ্ছা আছে, সমস্ত লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শুনিতেছি একটু-আধটু লেখে— তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেয়ে ভালো হয়, কারণ, গল্পের উপসংহারটি আমার ভালো করিয়া জানা নাই।"

হেমন্ত প্যারিশংকরের এই শেষ কথাগুলিতে বড়ো একটা কান না দিয়া কহিল, "কুসুম এই বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই ?"

প্যারিশংকর কহিল, "আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জান তো বাপু, মেয়েমানুষের মন ; যখন 'না' বলে তখন 'হাঁ' বুঝিতে হয়। প্রথমে তো দিনকতক নূতন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত— এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে— ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কালেজের রাস্তা খুঁজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড়ো দুঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়োই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সংকটাপন্ন।

"একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম, বাছা, আমি বুড়ামানুষ, আমার কাছে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই— তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার জো হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তোমাদের মিলন হয়। শুনিবামাত্র কুসুম একেবারে বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া মিলনের আর কোনো উপায় নাই। কুসুম কহিল, কেমন করিয়া হইবে। আমি কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব। অনেক তর্কের পর সে এ-বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে খেপিয়া যাইবার জো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ-সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যক কী। কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সকল দিকে সুখের হইবে। বিশেষত এ কথা যখন কখনো প্রকাশ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মতো অসুখী করা।

"কুসুম বুঝিল কি বুঝিল না, আমি বুঝিতে পারিলাম না। কখনো কাঁদে কখনো চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি 'তবে কাজ নাই' তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপূর্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে, বলে, ইহাতে কাজ নাই, জ্যাঠামশায়। আমি বলিলাম, কী সর্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কী বলিয়া ফিরাইব। কুসুম বলে, তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও। আমি বলিলাম, তাহা হইলে ছেলেটির দশা কী হইবে। তাহার বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব! আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়াবয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।

"তাহার পর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল— আমি আমার একটা কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কী হইল তুমি জান।"

হেমন্ত কহিল, "আমাদের যাহা করিবার তাহা তো করিলেন, আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন।"

প্যারিশংকর কহিলেন, "দেখিলাম তোমার ছোটো ভগ্নীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি কিন্তু সে কেবল কর্তব্যবোধে। আবার আর-একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমন্ত বহুকষ্টে ধৈর্য সংবরণ করিয়া কহিল, "এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কী হইবে। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?"

প্যারিশংকর কহিলেন, "আমার যাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে।— ওরে, হেমন্তবাবুর জন্য বরফ দিয়া একগ্লাস ডাবের জল লইয়া আয়, আর পান আনিস।"

হেমন্ত এই সুশীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচুগাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কী একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগৃহে দীপ জ্বালা নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুসুম ভূমিতলে দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মতো স্থির হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশীথিনীর উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে— চারি দিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজুতার শব্দ হইল। হরিহর মুখুজ্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, "অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও।"

কুসুম এই স্বর শুনিবামাত্র একবার মুহূর্তের মতো চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল— চরণ চুম্বন করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া পা ছাড়িয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল, "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।"

হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, "জাত খোয়াইবি?"

হেমন্ত কহিল, "আমি জাত মানি না।"

"তবে তুইসুদ্ধ দূর হইয়া যা।"

বৈশাখ ১২৯৯

একরাত্রি

সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।"

ছোটো ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না— আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল— কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব, ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন— নানা উপলক্ষে মাছটা তরকারিটা টাকাটা সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল, এইজন্য আদালতে ছোটো কর্মচারী এমন-কি, পেয়াদাগুলাকে পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইঁহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা। তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশি— সুতরাং পূর্বে গণেশের যাহা-কিছু পাওনা ছিল, আজকাল ইঁহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া একসময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না।

কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, কলিকাতার ইঁচড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই, সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভা-স্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

আমি পনেরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি, তখন সুরবালার বয়স আট ; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এদিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব— বাপকে বলিলাম, বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এন্ট্রেন্স পাস করিয়াছি, ফার্স্ট আর্টস দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই, মাতা এবং দুটি ভগিনী আছে। সুতরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোটো শহরে এন্ট্রেন্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেড্‌মাস্টার রাগ করে। মাস-দুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে ; লম্ফে-ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাস্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মানুষ, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড়ো আটচালার সংলগ্ন একটি চালায় আমি বাস করিতাম।

স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে। একটি বড়ো পুষ্করিণীর ধারে। চারি দিকে সুপারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুলগৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অনতিদূরে। এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী— আমার বাল্যসখী সুরবালা— ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচনবাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা যে কোনোকালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনোরূপে জড়িত ছিল, সে কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাবুর বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনর্গল শখের দুঃখ করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম ; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল— বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি যাহা করি কিছুতেই মনের ভার দূর হয় না ; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্‌-না, সুরবালা আমার কে।

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত— সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত ; কেবল গোটা-দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর-সকলের নিকট হইতে এক মুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই ; বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে-সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুরবেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন্‌ গুন্‌ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত— কী ইচ্ছা করিত জানি না— এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ভারতবর্ষের এই-সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিকিত না, অথচ কোনো ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত। সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি-নারিকেলের অর্থহীন মর্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

তোমার মতো লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত, তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবাল্‌ডি এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার। আর রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোনো জরুরি আবশ্যক ছিল না ; বিবাহের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশংকরীও তেমন, সেই কিনা কিছুমাত্র না ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া সরকারি উকিল হইয়া দিব্য পাঁচটাকা রোজগার করিতেছে— যেদিন দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোনো অসন্তোষ নাই, পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।

রামলোচন একটা বড়ো মকদ্দমায় কিছুকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সেদিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেড্‌মাস্টার সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকেলের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়িল, এই দুর্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল— সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের পুষ্করিণীর পাড়— সে পর্যন্ত যাইতে না-যাইতে আমার হাঁটুজল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর-একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে।

পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর-সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল-হাত-পাঁচছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে— তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না— কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন্‌-এক জন্মান্তর, কোন্‌-এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন

হইয়াছিল ; আর, আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ংকর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে— এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্রগৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল— ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল— সুরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্‌ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল— আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

একটা আষাঢ়ে গল্প

১

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা-দহলা পর্যন্ত আরো অনেক-ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা-দহলারা অন্ত্যজ— তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই। সকলেই যথানির্দিষ্টমতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ববর্তীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কী কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলাফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ছবির মতো। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না ; সকলেই মৌন নির্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায় ; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারও কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখি ঝট্‌পট্‌ করে, এই চিত্রিতবৎ মূর্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোনো-একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল— তখন খাঁচা দুলিত এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শোনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত।— এখন কেবল

পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত লৌহশলাকাগুলাই অনুভব করা যায়— পাখি উড়িয়াছে কি মরিয়াছে কি জীবন্মৃত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে।

আশ্চর্য স্তব্ধতা এবং শান্তি। পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলই সুসংহত, সুবিহিত— শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই— কেবল নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতানশব্দপূর্বক তটের উপর সহস্র ফেনশুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে— পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ দিগ্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মতো বিদেশের আভাস দেখা যায়— সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে, সেই বিদেশে এক দুয়ারানীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্রতীরে আপনমনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিগ্‌দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে আকাশের সীমায় ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে— খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মানিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি, রুপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের পুত্রের কাছে দেশ-বিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল-বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে— গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বলো। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব দেশের অপূর্ব গল্প বলিতেন— বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল, সাঙাত, পড়াশুনা তো সাঙ্গ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব তাই বিদায় লইতে আসিলাম।

রাজার পুত্র কহিল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র কহিল, আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে ; আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি— এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল— তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল— নৌকাগুলা রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া একনৌকা শঙ্খ, চন্দনদ্বীপে গিয়া একনৌকা চন্দন, প্রবালদ্বীপে গিয়া একনৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্যয় ঝড় আসিল।

সব-কটা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা-নহলাগুলাও তাহাদের পদানুবর্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোনো উপদ্রব ছিল না। এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে প্রথম এই একটা তর্ক উঠিল— এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে।

প্রথমত, ইহারা কোন্ জাতি— টেক্কা, সাহেব, গোলাম না দহলা-নহলা?

দ্বিতীয়ত, ইহারা কোন্ গোত্র— ইস্কাবন, চিড়েতন, হরতন অথবা রুহিতন?

এ-সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনোরূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ুকোণে, কেই বা নৈর্ঋতকোণে, কেই বা ঈশানকোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড়ো বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ-সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোনো গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্তত করিতে লাগিল এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে-খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দুরি তিরি পর্যন্ত অবাক্। তিরি কহিল, ভাই দুরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। দুরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি, ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা-কিছু করিতেছে তাহা যেন আর-একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুৎলাবাজির দোদুল্যমান পুতুলগুলির মতো। তাই কাহারও মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারি দিকে এই জীবন্ত নির্জীবতার পরম গম্ভীর রকমসকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এমনি একান্ত যথাযথ, এমনি পরিপাটি, এমনি প্রাচীন, এমনি সুগম্ভীর যে কৌতুক আপনার অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া ম্লান হইয়া নির্বাপিত হইয়া গেল— চারি দিকের লোকপ্রবাহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল, ভাই সাঙাত, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়। এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।

রাজপুত্র কহিল, না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মতো দেখিতে— ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।

৫

এমনি তো কিছুকাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোনো নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগবাজি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার

কিছুই করে না বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই-সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য আছে, ইহারা তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন।

তিন বন্ধু উত্তর করিল, আমাদের ইচ্ছা।

হাঁড়ির মতো গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মতো বলিল, ইচ্ছা? সে বেটা কে?

ইচ্ছা কী সেদিন বুঝিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে— বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছানামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল— গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগরসর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

৬

নির্বিকারমূর্তি বিবি এতদিন কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, নির্বাক্ নিরুদ্‌বিগ্নভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্নে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মতো ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্ম ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এ কী সর্বনাশ! আমি জানিতাম, ইহারা এক-একটা মূর্তিবৎ— তাহা তো নহে, দেখিতেছি এ যে নারী।

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল, ভাই, ইহার মধ্যে বড়ো মাধুর্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম। এতদিন যে ধৈর্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, সত্য নাকি সাঙাত।

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহুর্মুহু তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে করো, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়— গোলাম অবিচলিত ভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, বিবি, তোমার ভুল হইল। শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবত-রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়, কিছু ভুল হয় নাই, আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা, এ কী অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তাহার গতিতে এ কী সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কী হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি সুগন্ধি আরতি-উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই নব অপরাধিনীর ভ্রমসংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা-নহলাগুলা পর্যন্ত কেমন হইয়া গেল।

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর-কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একসুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে— আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল

বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভঙ্গিতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম। কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি। কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারও বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারও বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারও ঈর্ষা, কাহারও অনুরাগ, কাহারও ব্যাকুলতা, কাহারও সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সংগীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাত মন্দ না হউক কিন্তু উহার শ্রী নাই— আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

সাহেব ভাবিতেছে, টেক্কা সর্বদা ভারি টক্‌টক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে, উহাকে দেখিয়া বিবিগুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল।— বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আ মরিয়া যাই। গর্বিণীর এত সাজের ধুম কিসের জন্য গো বাপু। উহার রকমসকম দেখিয়া লজ্জা করে! বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া গোপন কথাবার্তা হইতে থাকে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে, কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।

যুবকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া অলসভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপনমনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোনো কোনো খেপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মতো একটাও কথা জোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্তের মতো ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখি ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হুহু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্‌ঝর্ মর্‌মর্ করে এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন, জোয়ারভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্‌থম্ করিতেছে— কথা নাই, কেবল মুখ-চাওয়াচাওয়ি; কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছনো; কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে। কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে, এবং অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, বাঁশি আনো, তূরীভেরী বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি করো, হরতনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা-নহলা বাঁশিতে ফুঁ দিতে লাগিল, দুরি তিরি তুরীভেরী লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস। কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চহাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে, ইহাদের মধ্যে তেমনি হইতে লাগিল।

এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড়ো মধুর স্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিল। যাহারা ভালো করিয়া ভালোবাসে নাই তাহারা ভালোবাসিল, যাহারা ভালোবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্তদিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়া ছিল। তাহার কানেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল ; হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে ; সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্তদিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৯

রাত্রে শতসহস্র দীপের আলোকে, মালার সুগন্ধে, বাঁশির সংগীতে, অলংকৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায় একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিত চরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

১০

সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়ারানী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্বের মতো সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্তনীয় গাম্ভীর্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদুঃখ রাগদ্বেষ বিপদসম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নবরাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভালো, কেহ মন্দ, কাহারও আনন্দ, কাহারও বিষাদ— এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলঙ্ঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

আষাঢ় ১২৯৯

জীবিত ও মৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না ; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাশুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকি কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না ; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি— কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল— সময় জগতের আর-সর্বত্রই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিসের উপদ্রব ঘটে এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটির এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর-কোথাও কিছু নাই। পূর্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে। সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকে পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থম্‌থমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না ; অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেষ্টাতেও জ্বলিল না— যে-লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, "ভাই রে, এক ছিলিম তামাকের জোগাড় থাকিলে বড়ো সুবিধা হইত। তাড়াতাড়ি কিছুই আনা হয় নাই।"

অন্য ব্যক্তি কহিল, "আমি চট্‌ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল, "মাইরি! আর, আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব।"

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল— তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই— কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল— যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল। বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে— অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানে সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়া ছিল, তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশংকর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোনো শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভালো।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্বেই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কুটিরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না— কারণ, মৃতদেহ এমন-কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সময়মতো পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই— হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল, চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমতো যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, মনে হইল, এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল 'দিদি'— অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটি বেদনা— শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অগ্নিকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছে— কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল— রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও— আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।" তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল— যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল— কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই সুমিষ্ট ভালোবাসার স্বরে কাকিমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মুহূর্তে তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল; সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমে মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনই ভাবিল, আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি— আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্রে শারদাশংকরের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনো যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়? শারদাশংকরের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহুদূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি— আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী; আমি আমার প্রেতাত্মা।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা— যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভূতপূর্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল— মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না— মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র— কোথাও বা একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিয়াছে তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাখির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যুনদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রিজাগরণে পাগলের মতো হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পালাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল, "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ।"

কাদম্বিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল, "চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই— তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বলো।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি তো নাই— তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক-একসময় রীতিমত ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে— কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভালোবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোনো সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে একদণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, "নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন ; নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল, "ওমা, আমার কী ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে কহিল, "ভাই, শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির একপ্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।"

যোগমায়া কহিল, "ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন! তুমি আমার সই, তুমি আমার"— ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল— মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরূপ সংকোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে, এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না— মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না— কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে— মনে করে, স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহুদূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহমমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না— কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এইজন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে— যদি দুইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্বোধ হইয়া উঠিল, যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল, ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিককে ভয় করে— যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়— বাহিরে তার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-একদিন চীৎকার করিয়া উঠিত— এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌ছম্‌ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল, "দিদি, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া

দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, "হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুরঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কী বুঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে।"

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির 'পরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে এবং সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্রস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

তিনি মনে করিতেন, 'নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই, তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি।' এই বলিয়া তিনি কোনোরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল নাও হইতে পারে, অতএব রানীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিল, "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভালো দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।"

কাদম্বিনী গম্ভীরভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী।"

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল, "তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধূকে কী বলিয়া আটক করিয়া রাখিব।"

কাদম্বিনী কহিল, "আমার শ্বশুরঘর কোথায়।"

যোগমায়া ভাবিল, আ-মরণ! পোড়াকপালী বলে কী:

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল, "আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ পৃথিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া। বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি— আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোনো স্থান গড়িয়া রাখেন নাই, তখন কাজে-কাজেই বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।"

এমনি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কী বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

শ্রীপতি কহিলেন, "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী শুনিলে, বলো।"

শ্রীপতি কহিলেন, "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনোই করে না, যদি-বা করে কোনো সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন, "কিরকম শুনি।"

শ্রীপতি কহিলেন, "যে-স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।"

এমনতরো কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে— বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, "আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে— কী কথার শ্রী।"

শ্রীপতি বুঝাইলেন এ স্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনোরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন, "ঐ শোনো! তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ। কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শুনিতে কী শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"

নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন— কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ-না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারও মতভেদ ছিল না, কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস, তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী— তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন, "ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম।"

আর-একজন দৃঢ়স্বরে বলেন, "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।"

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কাদম্বিনী কবে মরিল বলো দেখি।"

ভাবিলেন কাদম্বিনীর কোনো-একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্বের দিনেই পড়ে। শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া একমুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল, "সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।"

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন— শ্রীপতির বাকস্ফূর্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই পরলোকেও স্থান নাই— ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।" তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল— "ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।"

এই বলিয়া মূর্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রানীহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনোরূপ বাধা দিল না— এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশংকরের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কী ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে, কী হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্‌ণ শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল— তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পর মনে পড়িল, 'আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহার মা সঙ্গ ভালোবাসে, গল্প ভালোবাসে, খেলা ভালোবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোনো দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে।'

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, জল দে।" আ মরিয়া যাই! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনো ভুলিস নাই! তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জলপান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্যবোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?"

কাকিমা কহিল, "হাঁ খোকা।"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে যাবি নে?"

ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই একটা গোল বাধিল— ঝি একবাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মাগো' বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল— সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, তুই যা।"

কাদম্বিনী অনেকদিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে সে মরে নাই— সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান

জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে— খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকিমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।"

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশংকরবাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন— তিনি জোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন, "ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকিমা কাকিমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও— আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।"

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল, "এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

শারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন— খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তখন কাদম্বিনী "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই"— বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে— মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

শ্রাবণ ১২৯৯

স্বর্ণমৃগ

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী দুই শরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ-কখানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃদ্ধির আর-একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ-কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া

বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড়ো বড়ো পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন, এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়। ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী শাড়ি, কথাবার্তার ভঙ্গি এবং চালচলনের গৌরব, মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কী হইতে পারে। অথচ একই তো পরিবার। ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই তো উহাদের এত উন্নতি। যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজ শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভালো লাগে না। সকলই অসুবিধা এবং মানহানি-জনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহবহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামচিকেশাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চক্ষেও জল আসে। এ-সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষজাতির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে। এক-একদিন স্বামীর শিল্পকার্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন, "গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও।"

বৈদ্যনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন, "দুধটা— বন্ধ করিলে কি চলিবে। ছেলেরা খাইবে কী।"

গৃহিণী উত্তর করিতেন, "আমানি।"

আবার কোনোদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত— গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন, "আমি জানি না। যা করিতে হয় তুমি করো।"

বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কী করিতে হইবে।"

স্ত্রী বলিতেন, "এ মাসের মতো বাজার করিয়া আনো।" বলিয়া এমন একটা ফর্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজসূয়যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্বক প্রশ্ন করিতেন 'এত কি আবশ্যক আছে', উত্তর শুনিতেন, 'তবে ছেলেগুলো না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সস্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।'

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা-কিছু উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যাবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেন্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"

সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 'বিধবাবিবাহ করিব' বলিয়া একান্ত পণ

করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাবসত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন ; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কী একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে ; এবং কেন যে তাঁহার স্ত্রীর বিধববিবাহ হইতে পারে না, তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সেজন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ তৈরি করিতেছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল মূর্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর-অভ্যর্থনা ও আহার্য জোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন, সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে-বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে, তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাটাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্তা গৃহিণী কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রাম অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণপ্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্যাস্তপথের মতো জ্বলন্ত সুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল, "কাল সোনার রঙ ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে আর কাহারও ঘুম হইল না ; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্মাণ করিতেলাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই। পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্তত করেন নাই, সে রাত্রে দাম্পত্য-একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চার দিক হইতে সোনার রঙ ঘুচিয়া গিয়া সূর্যকিরণ পর্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্যে বৈদ্যনাথ কোনো-একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুরস্বরে বলেন, "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ, এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাকো।" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপূর্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কী আনিয়াছি বলো দেখি।"

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব, আমি তো আর 'জান' নহি।"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধুলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট স্টুডিয়োর রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল— অপর্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, "আ মরে যাই। এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ করোগে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন জোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকেই হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্যই তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভালো, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গনিয়া বলিল, বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গনৎকার তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জনের কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যাবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জনের সেরূপ কোনো নির্দিষ্ট উপায় নাই। এইজন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনোদিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পুকুরে ডুবুরি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানুষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার পূর্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন, "একটু নড়িয়াচড়িয়া দেখো। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে।"

কথাটা সংগত বটে এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন, কিসের উপর চড়িবেন, তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না। অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু, কুমড়া, শুষ্ক নারিকেল, টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেলতৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্বপ্রায় ধান্যক্ষেত্র থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে— এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাংলাদেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, 'বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন।'

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্বক গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলেদুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়োটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে অবু, এবার পুজোর সময় কী চাস বল্ দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

ছোটোটিও মনে করিল, বড়ো ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল, "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্মণ্য কারুকার্য পাইলে আর-কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্ছা।"

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকিল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে।"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি যে কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কী সর্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ কখনো ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কী করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে 'অশিক্ষিত পটুত্ব' আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই-তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্বরাত্রে যখন নৌকাদুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন, তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে তো নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলনাদুটো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে। তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্মাণ।

ছোটো ছেলে তো ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। 'বোকা ছেলে' বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড়ো ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভানমাত্র করিয়া কহিল, "বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়। তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল, তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কৌতূহল হইল এবং সেইসঙ্গে দুর্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিতহস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে— ওঘরে গেলে মনে হয় এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্র নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্‌ দিকে যাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে, অথচ কোন্‌ দিক হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না ; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়। তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে— বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মতো একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্তী ছোটো কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মতো আছে— কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন— অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্‌ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন, অনতিউচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে— অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড়ো লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল একহাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মুহূর্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিক্‌লিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসি বাঁধা রহিয়াছে, এক-একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিকলি কলসির উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসির কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসি শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না— দুই হস্তে কলসি তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। উপুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না। দেখিলেন কলসির গলা ভাঙা। যেন এককালে এই কলসির মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মতো হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দমস্তরের মধ্যে হাতে কী একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা— সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন— ভিতরে কিছুই নাই। ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন, নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙা ; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহার পূর্ববর্তী যে-ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল, সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া 'মা' বলিয়া মস্ত একটা মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন— প্রতিধ্বনি যেন অতীতকালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মতো শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিসপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে, সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মতো ঝুপ করিয়া ভাঙিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিসপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন— তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল— ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে ম্লান হাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মতো নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ।"

স্ত্রী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল, "সেই নাপিতের গল্প বল্‌।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী একটা যেন ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মতো আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো স্বপ্ন হইতে জাগিয়া, বৈদ্যনাথের বড়োছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, "বাবা।"

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, "বাবা।" কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

রীতিমত নভেল

প্রথম পরিচ্ছেদ

'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিনলক্ষ যবনসেনা, অন্যদিকে তিনসহস্র আর্যসৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থবৃক্ষের মতো হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশজন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল?— কাহার বজ্রমন্দ্রিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিনলক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্তের মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল? বলিতে পার, সেদিনকার আর্যস্থানের সূর্যদেব সহস্ররক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারিকে আশীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন? বলিতে পার কি পাঠক।

ইনিই সেই ললিতসিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুবনক্ষত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ কাঞ্চীনগরে কিসের এত উৎসব। পাঠক জান কি। হর্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কি বায়ুভরে না আনন্দভরে। দ্বারে দ্বারে কদলীতরু ও মঙ্গলঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি। পথে পথে দীপমালা। পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা পুরুষকণ্ঠের জয়ধ্বনি এবং বামাকণ্ঠের হুলুধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অভ্রভেদ করিয়া নির্নিমেষ নক্ষত্রলোকের দিকে উত্থিত হইল। নক্ষত্রশ্রেণী বায়ুব্যাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

ঐ যে প্রমত্ত তুরঙ্গমের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর পুরদ্বারে প্রবেশ করিতেছেন, উঁহাকে চিনিয়াছ কি। উনিই আমাদের সেই পূর্বপরিচিত ললিতসিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শত্রু নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু কাঞ্চীরাজ-পদতলে শত্রুরক্তাঙ্কিত খড়্গ উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু এত যে জয়ধ্বনি, সেনাপতির সেদিকে কর্ণপাত নাই— গবাক্ষ হইতে পুরললনাগণ এত যে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষ্ণাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শুষ্ক পত্ররাশি তাঁহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি ভ্রূক্ষেপ করেন। অধীরচিত্ত ললিতসিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শুষ্ক পত্রের ন্যায় নীরস, লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

অবশেষে অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্তের জন্য সেনাপতি তাঁহার বল্‌গা আকর্ষণ করিলেন, অশ্ব মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইল, মুহূর্তের জন্য ললিতসিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মুহূর্তের জন্য দেখিতে পাইলেন দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মতো তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পুষ্পমালা খসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচূড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর-একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে চাহিলেন। তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্বাপিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত। সেনাপতি বহুকাল ধৈর্যকে পাষাণদুর্গের মতো হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, গতকল্য সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোখের সলজ্জ সসম্ভ্রম দৃষ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য মুহূর্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেছে। কিন্তু, ছি ছি সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মতো রাজান্তঃপুরের উদ্যানপ্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়। তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ?

কিন্তু যে উপন্যাস লেখে, তাহার কোথাও বাধা নাই; দ্বারীরা দ্বাররোধ করে না, অসূর্যম্পশ্যরূপা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না। অতএব এই সুরম্য বসন্তসন্ধ্যায় দক্ষিণবায়ুবীজিত রাজান্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক— হে পাঠিকা, তোমরাও আইস এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা করিলে তোমরাও অনুবর্তী হইতে পার— আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখো, বকুলতলের তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মতো ঐ রমণী কে। হে পাঠক, হে পাঠিকা, তোমরা উঁহাকে জান কি। অমন রূপ কোথাও দেখিয়াছ? রূপের কি কখনো বর্ণনা করা যায়। ভাষা কি কখনো কোনো মন্ত্রবলে এমন জীবন, যৌবন এবং লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে। হে পাঠক, তোমার যদি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীর মুখ স্মরণ করো। হে রূপসী পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সঙ্গিনীকে বলিয়াছ 'ইহাকে কী এমন ভালো দেখিতে, ভাই। হউক সুন্দরী কিন্তু ভাই, তেমন শ্রী নাই।'— তাহার মুখ মনে করো, ঐ তরুতলবর্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি। উনিই রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেহই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক-একবার অঙ্গুলি আপনার সুকুমার কার্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন্-এক অতিদূরবর্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কী ভাবিতেছেন।

কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্যদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঐ দেখো, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইয়া গেল এবং দুইফোঁটা অশ্রুজল দুটি সুকোমল কুসুমকোরকের মতো অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একটি পুরুষের কণ্ঠ গভীর আবেগভরে কম্পিত রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, “রাজকুমারী।”

রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারি দিক হইতে প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন, সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ অপরাধে প্রাণদণ্ডই বিধান। কিন্তু পূর্বোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনপাতি মনে মনে কহিলেন, ‘দেবী, তোমার নেত্রও যখন প্রতারণা করিতে পারে, তখন সত্য পৃথিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্রু।’ একটি বৃহৎ দস্যুদলের অধিপতি হইয়া ললিতসিংহ অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মতো লোক এইরূপ ঘটনায় কী করিত। নিশ্চয় যেখানে নির্বাসিত হইত সেখানে আর-একটা চাকরির চেষ্টা দেখিত, কিংবা একটা নূতন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কষ্ট হইত সন্দেহ নাই— সে অন্নাভাবে। কিন্তু সেনাপতির মতো মহৎ লোক, যাহারা উপন্যাসে সুলভ এবং পৃথিবীতে দুর্লভ, তাহারা চাকরিও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন সুখে থাকে তখন একনিশ্বাসে নিখিলজগতের উপকার করে এবং মনোবাঞ্ছা তিলমাত্র ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, “রাক্ষসী পৃথিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের বুকে পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ দস্যুব্যবসায় আরম্ভ করে। এইরূপ ইংরেজি কাব্যে পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দস্যুর উপদ্রবে দেশের লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসামান্য দস্যুরা অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু, দুর্বলের আশ্রয়, কেবল, ধনী উচ্চকুলজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্মচারীদের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোর অরণ্য, সূর্য অস্তপ্রায়। কিন্তু বনচ্ছায়ায় অকালরাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তরুণ যুবক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে! সুকুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারি বদ্ধ রহিয়াছে, তাহারই ভার দুঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভয়প্রবণ হৃদয় হরিণের মতো চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এই আসন্ন রাত্রি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্যুরা আসিয়া দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, “মহারাজ, বৃহৎ শিকার মিলিয়াছে। মাথায় মুকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারি।”

দস্যুপতি কহিলেন, “তবে এ শিকার আমার। তোরা এখানেই থাক্।”

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শুষ্ক পত্রের খস্‌খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

সহসা বুকের মাঝখানে তীর আসিয়া বিঁধিল, পান্থ ‘মা’ বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জানু পাতিয়া নত হইয়া আহতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদুস্বরে কহিল, “ললিত।”

মুহূর্তে দস্যুর হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙিয়া এক চীৎকারশব্দ বাহির হইল, “রাজকুমারী।”

দস্যুরা আসিয়া দেখিল শিকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপুরের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর-একদিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে তো আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জনা করিয়াছে।

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

জয়পরাজয়

১

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনো চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যেদিন কোনো নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোনো-এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সংগীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখনো ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখনো নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত ; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোনার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে। সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কী সৌভাগ্য কী অনুগ্রহ কী করুণার মতো করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণদুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে-ছায়া দেখিয়াছিল, যে-নূপুর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া, কাহার নূপুর, এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখনো উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল, এমনও বোধ হইত না, যদি-বা আবশ্যক ছিল এমন হয় কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙিন কাপড় এবং কানে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোনো উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোনো অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী ; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরো একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, "আ সর্বনাশ।"

আবার কবির বসন্তবর্ণনার মধ্যে 'মঞ্জুলবঞ্জুলমঞ্জরী' এমনতরো অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন-কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়োই আমোদবোধ করিতেন— তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়—"

কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত ; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যায়— খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয় ; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া— প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে-গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ— সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল— এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের

আভাস দিলেই, অমনি দেশের চতুর্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত— তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত— এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখনো কখনো একটা ছায়া পড়িত, কখনো কখনো একটা নূপুর শুনা যাইত।

২

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিজয়ী কবি শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, "এহি, এহি।"

কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন, "যুদ্ধং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে, যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্যযুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্র নাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যুষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই ; নগরে আর-সমস্ত কাজকর্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন ; পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপুরের বাতায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন— বুঝিতে পারিলেন, সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই ঊর্ধ্বলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন, 'আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারই নামের সার্থকতা হইবে।'

তূরী ভেরি বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ ঊর্ধ্বে হেলাইয়া বিরাটমূর্তি পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না— বৃহৎ সভাগৃহের চারি দিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক।

পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্বাক্ বিস্ময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহু দূরদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে 'সাধু সাধু' করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সংকোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন

লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন সীতা যেন এইরূপভাবে চাহিয়া এমনি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল, "আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয় পরীক্ষা করিতে চাও তো করো। কিন্তু—" তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পুণ্ডরীক সিংহের মতো দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারি দিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মতো দাঁড়াইল। তরু যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হ ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মতো কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন— যেখানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন সেখা হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণপ্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্তী অতীতের মধ্যে বিলু হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধবিগ্রহ, শৌর্যবীর যজ্ঞদান, কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যে সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্তিমান করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয় দিলেন— যেন দূরদূরান্ত হইতে শতসহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এ অতিপুরাতন প্রাসাদকে মহাসংগীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল— ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্প করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, ঊর্ধ্বে অন্তঃপুরের বাতায়নসম্মুখে উত্থিত হইয়া রাজলক্ষ্মীস্বরূপ প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয় রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শতশতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলে "মহারাজ, বাক্যতে হার মানিতে পারি, কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে।" এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয় পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত প্রজাগণ 'জয় জয়' রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয় দাঁড়াইলেন। দৃপ্তগর্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে।" সকলে এক মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল

তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন— বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো। ব্রহ্মা চারিমুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না— পঞ্চান পাঁচমুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।

এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভে সিংহাসন নির্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্বা বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে।"

দর্পভরে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোনো উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহ করিলেন। পণ্ডিতগণ 'সাধু সাধু' 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল— রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখ এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মতো সভাভঙ্গ হইল।

৩

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন— বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীর জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল দক্ষিণপবনে বাজিতেছে, একবা মনে হইল উত্তরে গিরিগোবর্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে; মনে হইল, উদয়াচলের উপরে দাঁড়াই কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে

মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল ; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র— অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল— বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কী বলিতে চাহে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না ; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ-অপযশ জয়পরাজয় উত্তরপ্রত্যুত্তর সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ময়ী মানসী মূর্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমলচরণের নূপুরধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মতো বসিয়া পড়িলেন তখন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্যে— একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসনসম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বলিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনি তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন, "রাধা প্রণব ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ, এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী বিন্দু।" ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। 'রা' অর্থেই বা কী, 'ধা' অর্থেই বা কী, কৃষ্ণ শব্দের 'ক' হইতে মূর্ধন্য 'ণ' পর্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে, তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন, কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন, কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়্‌দর্শন ; তাহার পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা ; রাধিকা উত্তরপ্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে, পণ্ডিতের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন।

রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং কৃষ্ণরাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল ; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রঙটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন ; ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

৪

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শ্লোকোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে-সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল— তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিত— আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহাতে কোনো গুণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না— নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে দুরূহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না সুবিধাও হয় না— কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার, কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দিকবর্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয়পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন তাহার অর্থ এই, আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না— তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই কটি কথা বলিলেন, "বীণাপাণি শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কী গতি হইবে।" মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে বাতায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক সশব্দে হাস্য করিলেন, এবং শেখর শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, "পদ্মবনের সহিত খরের কী সম্পর্ক। এবং সংগীতের বিস্তর চর্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফললাভ করিয়াছে। আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান তো পুণ্ডরীকেই, মহারাজের অধিকারে তিনি কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে।"

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল— তাঁহাদের দেখাদেখি সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক, যাহারা বুঝিল এবং না-বুঝিল, সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বার বার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন— সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কণ নূপুরের শব্দ শুনা গেল— তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়! কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল!' ইহার মধ্যে যে কোনো সৌন্দর্য, মানবের কোনো চির-আনন্দ, কোনো বিশ্বসংগীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার হৃদয়ের কোনো গভীর আত্মপ্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে— আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোনো খাদ্যই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক— আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'বড়ো বড়ো রাজারা অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া থাকেন— আজ আমার এ কাব্যমেধযজ্ঞ।' কিন্তু তখনই মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই।

'অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্বত্র বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখনই অশ্বমেধ হয়— আমার কবিত্ব যেদিন পরাজিত হইয়াছে, আমি সেইদিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি— আরো বহুদিন পূর্বে করিলেই ভালো হইত।'

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন, 'তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম— হে সুন্দরী অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে, হে মোহিনী বহ্নিরূপিণী, যদি সোনা হইতাম তো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম— কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবী, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।'

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালোবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি সাদা ফুল— জুঁই বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারি দিকে প্রদীপ জ্বালাইলেন।

তাহার পর মধুর সঙ্গে একটা উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন, এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিমীলিতনেত্রে কহিলেন, "দেবী, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি। এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে।"

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, "কবি, আসিয়াছি।"

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন— দেখিলেন, শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্তি।

মৃত্যুসমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল, তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন, "রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

কার্তিক ১২৯৯

কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেকসময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমনসময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?"

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়।"

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্‌গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে 'আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম' খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটাদুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল— তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলিঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল— আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরেজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমার লড়কী কোথায় গেল।"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম— সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।" বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চকচকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

"তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে— যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।"

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে, এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত— এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাইকরা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের 'পরে, কেহ বা পদব্রজে, কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বন্দুক— কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য

তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, "কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাসব্যাবসা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা, সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দেখি, মিনি 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফশীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দিন-দুইতিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে— মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে— তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত— মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সসুরাকে মারিতাম কিন্তু, কী করিব, হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত

তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন-কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল— তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে— আমাকে পয়সা দিবেন না।—

"বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে— যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম— তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জ ভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস ?"

মিনি এখন শ্বশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে— তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও ; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

ছুটি

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল, নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল ; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে-ব্যক্তির কাঠ আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল ; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্‌, মার খাবি ! এইবেলা ওঠ্‌।"

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল— সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে ; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল— 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান -সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ঐ হোথা।" কিন্তু কোন্‌দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা।"

সে বলিল, "জানি নে।" বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, "ফটিকদাদা, মা ডাকছে।"

ফটিক কহিল, "যাব না।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস !"

ফটিক কহিল, "না, মারি নি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস !"

"কখ্খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।"

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ, মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যে কথা !"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস !"

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কী হচ্ছে তোমাদের।"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি ?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল— কোন্‌দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায় কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে', 'কখন্ যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে

অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না ; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত— অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, "ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটু পড়োগে যাও।"— তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা— কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন— সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত ; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা, মার কাছে কবে যাব।" মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটি হোক।" কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।"

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল— সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল ; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্তদিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি।"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, "মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—

এ— এ না।” কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত ; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, “ফটিক, সোনা, মানিক আমার।”

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, “অ্যাঁ।”

মা আবার ডাকিলেন, “ওরে ফটিক, বাপধন রে।”

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।”

পৌষ ১২৯৯

সুভা

১

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন। কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন— কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার জন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল— এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো ; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না— মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়, কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম

উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর— অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো ; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসর নহে ; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায় ; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট ; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুতপদক্ষেপে প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনই অবসর পায় তখনই সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা— বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার ; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত— একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না, তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত— তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন্ তাহাদের আদর করিতেছে, কখন্ ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন্ মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল ; গৃহে যেদিন কোনো কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত— তাহার সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার

গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি— তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়— কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজে-কর্মে আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ— ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্ণে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক্‌, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত— মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, "তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।"

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত ; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত ; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত ; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রুপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে— কে বসিয়া ?— আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু— আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া— যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন-কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুইবেলাই মাছভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলো, কলিকাতায় চলো।"

বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশাঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক্ জন্তুর মতো তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত— ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কী রে, সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস ? দেখিস, আমাদের ভুলিস নে।" বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল ; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না ; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল— দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্লাদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল— যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, "তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।"

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয়, এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু-সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন— কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "মন্দ নহে।"

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে-হৃদয় আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ-মা দেশে চলিয়া গেল— তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায়— ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না— বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

মাঘ ১২৯৯

মহামায়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম এই, তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এ পর্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল— দুটো কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা-কোনো-কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল, "আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।" রাজীবের যে-কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে-কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে-ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলংকার, এমন-কি, অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল— আরো দুটো-পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ-একটু নরম করিয়া আনিবে, তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্বোধ লোকটা সুদ্ধ কেবল বলিল, "চলো, আমরা বিবাহ করিগে!"

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচাসোনার প্রতিমা— সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

তাহার বাপ নাই, বড়ো ভাই আছেন— তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাইবোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক। মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটি বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড়োসাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের

ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইহারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে ষোলো, সতেরো, আঠারো, এমন-কি, উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধসত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙালির ছেলের এরূপ অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুশি হইলেন; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারীবয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, পরিণয়বন্ধন যে-দেবতার কার্য তিনি যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি এযাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো-চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না— তাহার নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যতকিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে হয় আমরণ সুখ নয় আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সংকটের দিনে রাজীব কেবল কহিল, "চলো, তবে বিবাহ করা যাউক।" এবং তার পরে বিস্মৃতপাঠ ছাত্রের মতো থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তব্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট এক-একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্তস্বর-সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল— মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্‌সর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্‌ঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই-সমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর-একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত, মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর-কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে— সে কি কখনো রাজীবের মতো অকুলীন ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক, মহামায়া বুঝিতে পারিল, তাহার নিজের বিবেচনাহীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়াছে; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে ভাবটা দেখাইবে— সে খবরে আমার কী আবশ্যক। কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না— শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

রাজীব কহিল, "আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপুরের কুঠিতে বদলি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।"

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল, দুইজনের জীবনের গতি দুই দিকে— একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দি করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল, "আচ্ছা।" সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে, এমন সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "চাটুজ্যেমহাশয়!"

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিল— কেবল একবার নীরবে নিস্তব্ধভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।"

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল— আর, রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন, "এইটে পরিয়া আইস।"

মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে চলো।"

ভবানীচরণের আদেশ, এমন-কি, সংকেতও কেহ কখনো অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান-অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে। সেখানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া বুঝিল, এই মুমূর্ষুর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমাত্রও প্রকাশ করিল না। দুইটি অদূরবর্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যেদিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না— এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেরূপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেইরূপ হইল না। এমন-কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে-ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় আর-একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধুম। মহামায়া সহমৃতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদলি হইয়া সোনাপুরে রওনা হইয়াছে— রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে, "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।" সে কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাতত এক মাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস— এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মতো ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা নয় একটা-কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যাকালে মুষলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে

হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। যখন দেখিল বাহ্য প্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনোরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোমটা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?"

মহামায়া কহিল, "হাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বলো, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না— তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর-সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিয়ো— আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল, "তবে এখনই চলো— তোমার সাহেব যেখানে বদলি হইয়াছে, সেইখানে যাই।"

ঘরে যাহা-কিছু ছিল, সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এমনি ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন— ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মতো গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পড়িবার ভয়ে, পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভস্ম হইয়া তাহার হাতদুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহযন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া, মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কী ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদূরবর্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কী ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানিমাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদবেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছন্ন মূর্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে— বিশেষত মহামায়া পুরাণবর্ণিত কর্ণের মতো সহজকবচধারী— সে আপনার স্বভাবের চারি দিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর-একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে। অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এতদূরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না— কেবল একটা মায়াগণ্ডির বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে— নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রুপার পাতের মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে— বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল— মুখ নত করিয়া দেখিল— মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়। চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল— দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল, এইবার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল— পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা করো।"

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া, মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।

ফাল্গুন ১২৯৯

দানপ্রতিদান

বড়োগিন্নি যে কথাগুলা বলিয়া গেলেন, তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে-হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা— এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল, এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শয়নগৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল, যাহা ইতিপূর্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কণঝংকার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পিত করিয়া তুলিল।

রাধামুকুন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীন্যে স্ত্রীর অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদুগম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্যবশত ভোরে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহূর্তে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, "শোন নাই কি।"

"শুনিয়াছি। কিন্তু বউঠাকরুন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি। তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ-সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি। যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার শামিল করিয়া লইতে হয়।"

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কী।"

"বাঁচিতে তো হইবে।"

"মরণ হইলেই ভালো হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করো, আরাম বোধ করিবে।" বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয় ; প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড়োগিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষত, শশিভূষণ দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে-জিনিসটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটোবউকেই দিতেন। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড়োগিন্নির সর্বদাই সন্দেহ, রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে— তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাঁহার প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প-সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না— কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি

বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন। অসুখ হয় নাই তো?"

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড়োগৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "এই! এ তো নূতন কথা নহে। ও তো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও তো মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।"

রাধা কহিলেন, "মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে। কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি।"

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড়োগৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে— দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত— তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি। জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্নপ্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গবর্মেন্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের একমাত্র জমিদারি পরগণা এনাৎশাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমারই দোষ।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার।"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই— এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন, সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া একমুহূর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে

রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল, এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্তী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জেলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে-কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোনো গর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোনো-একটা বিষয়ে বড়োগিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল— কিন্তু সে কেবল একটিদিন মাত্র— তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল, এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কী কী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর 'রা' রহিল না, বড়োগিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিল— শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই— অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং বলেন, "ছোটোবউ তো সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি, ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে। ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ করো।"

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যক ব্যয় নিয়ম-অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড়োগিন্নির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো বৈ মন্দ নহে, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেকসময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না, কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর-কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেকসময় গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেকসময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, "তোমার কোনো ভাবনা নাই, দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব— কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশিদিন দেরিও নাই।"

বাস্তবিক বেশিদিন দেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে-ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদরখাজনা দিতে হইত— একপয়সা মুনাফা পাইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই-একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যাবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকদ্দমা-মামলা করিয়া বার বার অকৃতকার্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্ব সম্পত্তি পুনর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল, আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্বপ্রান্তে প্রৌঢ়বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই আট-দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কী জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার

তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়— সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী বল, ভাই।"

রাধামুকুন্দ বলিলেন, "অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈকি।"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটোবড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখীকাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারিদিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না।— তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল— বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড়ো শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন, "দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব, সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভূষণ কহিল, "ভাই, আমার কী আছে যে কাহাকে দিব।"

রাধামুকুন্দ কহিলেন, "সবই তো তোমার।"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, "এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বার বার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা-দুটি ধরিয়া কহিল, "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই।"

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না— রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন— সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল, "দাদা, আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে-ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো, হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল— তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম এই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদরখাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল। কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি!" বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, "দাদা, মাপ করিলে তো?"

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল, "দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।"

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না— তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে— রাধামুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেষে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কী বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

চৈত্র ১২৯৯

সম্পাদক

আমার স্ত্রী-বর্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুক দেখিয়া, তাহার আধো আধো কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম ; যতক্ষণ ভালো লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল ঐটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো ; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে, যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো পুতুল সে ইতিপূর্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক— আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্মেন্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না ; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই যে-হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, নাইতে যাবে না ?"

আমি হুংকার দিয়া উঠিলাম, "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিস নে।"

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্বাপিত প্রদীপের মতো অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল ; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোনো নিরীহ পান্থ জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না, আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা

মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মতো দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মুচলেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ববর্তী খুনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল পূর্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ করিয়া এক-একটা মর্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম ; আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মতো বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিয়া বলিত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এইজন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশত এমনি মজা করিয়া এত কূটকৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্মটা কী।

তাহার ফল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি ; কারণ, যথার্থ ভালো জিনিসকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে বিদ্রূপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন-কি, আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি ; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল, মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোনো সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভালো সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হউক, ভাষার বাহাদুরি আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশজনের কাছে ঐ এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মতো ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িতচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখিরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে

আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতেছি কী উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেইরকম ভাবের একটা মুখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না। এমন সময় সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্‌বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল, "বাবা"। কোনো উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ দপ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোনো জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

বৈশাখ ১৩০০

মধ্যবর্তিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোনো নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশ্যক আছে, এমন কথা তাহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটি-জোড়াটার মধ্যে পা দুটো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনোরূপ চিন্তা তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্‌বিগ্নভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারী গান গাহে,

পুরাতন বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায় ; এই-সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন কাঁচা আম অথবা তপসি-মাছওয়ালা আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্বক আর-একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়-ভাত পাঠানো, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচকিবিশেষ ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে-সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে তাহা এ পর্যন্ত কোনো কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই, এবং সেজন্য নিবারণের মনে কখনো ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্গুন মাসে হরসুন্দরীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত উর্ধ্বে চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না ; কী যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়নগৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুইবেলা ডাক্তার-বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত শুশ্রূষা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে 'আছি' বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়কির বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন শখ করিয়া গোটাকতক ক্রোটন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সেদিকে বড়ো একটা দৃক্‌পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে ; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল ; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগুলো ইঁট জড়ো হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে ; তখন যেমন প্রভাতের সূর্যালোক তাহার তলদেশ পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ুস্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত 'কেমন আছ', তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশলাভ করিত।

এইভাবে কিছুদিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবর্তী খর্ব অশথগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গুমট ভাঙিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, "আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর-একটি বিবাহ করো।"

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিল, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড়ো একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওয়া যায়। ঐশ্বর্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

আর, স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মতো শুভ্র, নবনীর মতো কোমল, শিশুকন্দর্পের মতো সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম! কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে, সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এদিকে নিবারণ যত বারংবার এই অনুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, "বুড়াবয়সে একটি কচি খুকিকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না।"

হরসুন্দরী কহিল, "সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস আছে, কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর পাইব না।"

হরসুন্দরী বার বার করিয়া কহিল, তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না। এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল, "আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক।"

নিবারণ সে কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে তর্জনী আঘাত করিল। এই তো গেল ভূমিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি নোলকপরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড়ো মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলোঢলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উলটিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ঐ তো একফোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া তো বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদগ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ো আমোদ বোধ করিত। এক-একদিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "আহা, পালাও কোথায়। এটুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।"

নিবারণ দ্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে রোসো রোসো, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।" বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরসুন্দরী তাহার কানের কাছে বলিত, "আহা, পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।"

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিয়া তাহার আনত মুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, "আহা, কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখো দেখি।"

কোনোদিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত দুটি কৌতূহলী চক্ষু কোনো-না-কোনো ছিদ্রে সংলগ্ন-হইয়া আছে— অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মুখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হইল না।

হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড়ো কৌতূহল, এ বড়ো রহস্য! এক টুকরা হীরক পাইলে তাহাকে নানা ভাবে নানা দিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন— বড়ো অপূর্ব! ইহাকে কতরকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মতো দীর্ঘকাল একদৃষ্টে নব নব সৌন্দর্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি— বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কী আগ্রহ। একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউনপরা কাঁচের পুতুল, কখনো বা এক শিশি এসেন্স, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ-পঁচিশ খেলিতেছে।

বুড়াবয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবঞ্চনার কী আবশ্যক ছিল। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন— যেন আমি উহাদের সুখের কাঁটা।

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড়ো একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল ; কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না ; রাঁধাবাড়া দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো, যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কূল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চিরদারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায় মানুষ বড়ো দীন, হৃদয় বড়ো দুর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সেদিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল ; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল, আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে-শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল, আজ সাতাশ বৎসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন শৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল ; আর একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করিতেছিল এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হাঃ-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই।

লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই-একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়া ছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উলটাপালটা হইয়া গেল। সে বেচারা কোনোকালে জানিত না মানুষের ভিতরে এমন-সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দাম দুরন্ত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাবকিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। মন এখন যাহা চায়, কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন তো এই অন্তর্বিপ্লবের কোনো সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিন্তু তাহার তো কোনো উজ্জ্বলতা, কোনো উত্তাপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রজ্বলিত ইন্ধনের মতো ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামৈশ্বর্যভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মুহূর্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্যই সমস্ত এবং আমি কাহার জন্যও নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহংকার আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মতো হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান তো অনেকগুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে— কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে— শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।"

হরসুন্দরী কোনো উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, "তবে কি আজ হইবে না।"

হরসুন্দরী কহিল, "না।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল, "তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখি গে যাই", বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিল। বুঝিল, নববধূ পূর্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্দুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পারি না।"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারসি শাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক-একখানি করিয়া গহনায় ভরিয়া দিল। ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল, বালিকার মুখখানি বড়ো সুমিষ্ট, একটি সদ্যঃপক্ক সুগন্ধ ফলের মতো নিটোল রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝমঝম শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরার রক্তের মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কী লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ঐ বয়স ছিল, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষরেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সেদিন আসিল এবং কখন সেদিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু কী গর্বে, কী গৌরবে, কী তরঙ্গ তুলিয়া শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নির্বোধের মতো এ-সমস্ত এমন করিয়া এক মুহূর্তে হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকন্না ছাড়া আর একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম, ভবিষ্যতের হিসাব সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোনামানিক ঝকমক করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল, একবার মুহূর্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল, চতুর্দিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে, কারণ সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক-একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীকভাবে অত্যন্ত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যায়, মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রত মানুষেরও তেমনি চিরস্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির হেডবাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘুরিতে লাগিল এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখসৌভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির ক্যাশ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দুটা-একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত, আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দু-আনিটি পর্যন্ত চকিতের মতো চিকমিক করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পুরুষানুক্রমের চাকুরি। সাহেব বড়ো ভালোবাসে, তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগুলো বাহির করো।" হরসুন্দরী কহিল, "সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।"

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটোবউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল।"

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জলে পড়ে নাই।"

ভীরু নিবারণ কাতরস্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোনো ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু আমার মাথা খাও, বলিয়ো না যে আমি চাহিতেছি কিংবা কী জন্য চাহিতেছি।"

তখন হরসুন্দরী মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণা -ভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছলছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।" বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোটোবউ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কী জানি।"

সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে— অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়!

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বলিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।"

নিবারণ দেখিল ঐ দুর্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্দুকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সংকটের সময় স্বামীর দুর্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙিয়া ফেলো-না।"

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।"

নিবারণ কহিল, "আমি আর-একটা চেষ্টা দেখিতেছি," বলিয়া এলোথেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহুকষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরি গেল। স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্থাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোটোবউয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন।

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর-একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে। শৈলবালা খুঁতখুঁত করিয়া বলে, "আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।"

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর-একটা ভালো বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।"

শৈলবালা বলিত, "কেন, ঐ তো পাশে আর-একটা ঘর আছে।"

শৈলবালা তাহার পূর্ব-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নাই। নিবারণের বর্তমান দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল ; শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিস্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতরো উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমন-কি, গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরসুন্দরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ত্রুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তর মাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই সাগু খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া ফেলিত, জ্বরের সময় কাঁচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থপাত করিত। হরসুন্দরী তাহাকে "লক্ষ্মী আমার", "বোন আমার", "দিদি আমার" বলিয়া শিশুর মতো ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যে হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মতো এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্‌বন্ধনরজ্জু।

আর তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল, সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে— কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমত সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনো সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ-সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল— আসল যে-কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে— এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "লেখকমহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বলো দেখি কে ছিল সে রাজা।"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।"

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশত্রু। ভালো, কোন্‌ অজাতশত্রু বলো দেখি।"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশত্রু ছিল তিনজন। একজন খৃস্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আট মাস বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশত্রু সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশত্রু পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস রে, কী পাণ্ডিত্য। এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল। এই লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আচ্ছা লেখকমহাশয়, তার পরে কী হইল।"

হায় রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালোবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও

ষোলো-আনা আছে ; এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেইটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য-উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ ; আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মুখোশ-পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটা কোন্‌টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়— এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয় তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা, আর একটুখানি, কোনোমতে সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা পার করিয়া দাও। তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাস্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিখরে একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্ব পার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নের কোনো একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে, বিশেষত পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতের বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায়, মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবাষ্প এক মুহূর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন-পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাস্টার হইয়া এবং আমার মাস্টারমহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাস্টারমহাশয়ের মাস্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখোমুখি বসিয়া প্রদীপালোকে বিন্তি খেলিতেছিলেন। ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।" আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাস্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোনো সিলেকশন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্‌ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সেজন্য কোনো শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন, "আজ তবে থাক্‌, মাস্টারকে যেতে বলে দে।"

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্‌বিগ্নভাবে বিন্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা গেল যে মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম— আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দুষ্কর।

মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম, "দিদিমা, একটা গল্প বলো।" দুই-চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, "রোস্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।"

আমি কহিলাম, "না, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো, আজ দিদিমাকে গল্প বলতে বলো-না।"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি, উঁহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।" মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, আমার তো কাল মাস্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার মধ্যে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশবালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া, নড়িয়া-চড়িয়া মনের আনন্দ সংবরণ করিতে গেল— তার পরে বলিলাম, "গল্প বলো।"

তখনো ঝুপ ঝুপ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল— দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন— এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রানী। আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রানী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে— বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই। পূর্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোনো চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছেন এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, দুঃখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্য বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাস্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রানী এবং একটি বালিকা কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এদিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু রাজা ফিরিলেন না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রানীর মুখে অন্নজল রুচে না। "আহা, আমার এমন সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবুড়ো হইয়া থাকিবে। ওগো, আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।"

অবশেষে রানী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা।"

রানী তো সেদিন বহুযত্নে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রুপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকাষ্ঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চান আর রাজার খাওয়া হয় না। শেষে রানীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো রানী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো এ মেয়েটি কে গা। এ কাহাদের মেয়ে।"

রানী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারই মেয়ে।"

রাজা বড়ো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়োটি হইয়াছে?"

রানী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তা আর হইবে না! বল কী, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের বিবাহ দাও নাই?"

রানী কহিলেন, "তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়। আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব।"

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রোসো, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।"

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠুং ঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুকনা কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত-আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে লঙ্ঘন করিতে পারে, তখনই ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা-বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছ ঘেঁষিয়া খুব নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম— তার পরে? নিজেকে সেই সাত-আট বৎসরের সৌভাগ্যবান কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই। যখন সেই রাত্রে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুন গুন স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালক-হৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকালবেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো রাজকন্যার সহিত তাহার মালা-বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সিঁথি, কানে তাহার দুল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকন, কটিতে তাহার চন্দ্রহার, এবং আলতাপরা দুটি পায়ে নূপুর ঝম ঝম করিয়া বাজিতেছে।

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত। প্রথমত রাজা যে বারো বৎসর বনে বসিয়া থাকেন এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোনো গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত, কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। একে তো এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়ত সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকেরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে! তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক না হইতে হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে বড়ো যত্নে মানুষ করিতে লাগিল।

আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আরো একটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয়।

ব্রাহ্মণের ছেলে তো ভাবিয়া অস্থির, কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, মেয়েটি তাহার কে হয়। একটু একটু মনে পড়ে— একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুকনা কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল— কিন্তু সেদিন কী একটা মস্ত গোলমালে কাঠ কুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে। এমন করিয়া চারি-পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে পরমারূপসী মেয়েটি থাকে, ও তোমার কে হয়।"

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, "আমাকে আমার

পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে— ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমাসুন্দরী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয়। আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বলো।"

রাজকন্যা বলিল, "আজিকার দিন থাক্, সে কথা আর একদিন বলিব।"

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি আমার কী হও।"

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, "সে কথা আজ থাক্, আর একদিন বলিব।"

এমনি করিয়া আরো চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড়ো রাগ করিয়া বলিল, "আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও, তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

তখন রাজকন্যা কহিলেন, "আচ্ছা, কাল নিশ্চয়ই বলিব।"

পরদিন ব্রাহ্মণতনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল, "আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো।"

রাজকন্যা বলিলেন, "আজ রাত্রে আহার করিয়া তুমি যখন শয়ন করিবে তখন বলিব।"

ব্রাহ্মণ বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া সূর্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গনিতে লাগিল।

এদিকে রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে একটি ধবধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন, ঘরে সোনার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গনিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনোমতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, সাতমহলা বাড়ির একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালঙ্কে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে।

আমার যেন বক্ষঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে কী হইল।

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে—। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কী। সে যে আরো অসম্ভব। গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতেই মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা 'তার পরে' থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে 'তার পরে'র উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস। এইজন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাস্টারবিহীন এক সন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিররুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে— কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র— যে সেই ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের সুখনিদ্রার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্যরসাস্বাদনের জন্যও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কাছে কোনো কিছুর আর 'তার পরে' নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের

যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরোল,
ন'টে গাছটি মুড়োল।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোল না,
ন'টে গাছটি মুড়োল না।
কেন রে নটে মুড়োলি নে কেন।
তোর গোরুতে—

দূর হউক গে, ঐ নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই। আবার কে কোন্‌দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

আষাঢ় ১৩০০

শাস্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে— "ঐ রে, বাধিয়া গিয়াছে", অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব দিকে সূর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না, তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্‌ছড়্‌ খড়্‌খড়্‌ শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যেদিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থমথম ছমছম করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল, সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, স্তব্ধ গৃহ গমগম করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্‌বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন-কি, ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা

আম-কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্তদিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে— উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে— আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সে-ও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে, আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল— তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"

বড়োবউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি।" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কী হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ব ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচ-সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। দেখিলেন ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই-চারিটা অন্ধকার মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে— এবং ছেলেটা যত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীতু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস নাকি।"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্তদিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। ফস করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সেজন্য দুখি কাঁদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোনো বিপদ থাকিতে পারে এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব। মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ! বলিস কী! মরে নাই তো!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম রাম, সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না, কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।"

মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা— বল্‌গে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তীও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন, কহিলেন, "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহুঃ শব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে কথা গাঁ-সুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল, কোনোমতে সে কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর-পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা বলিতেছি তাই কর্, তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব"— আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল; শরীরটি অনতিদীর্ঘ; আঁটসাঁট; সুস্থসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা-কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উলটা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ-হাউ দাউ-দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের— হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্যবর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে— বেশভূষা-সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল— তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর-একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন-কি, দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সে-ও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজেকর্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি, ও কোন্‌দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কেন দিদি, তোমার এত ভয় কিসের।" এই— দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, "এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব— ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর কোনো জবরদস্তি করিল না— কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমন-কি, এক-একবার মনে হইত, এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি।— মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল ; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বার বার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে-সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল, দুখি বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।" ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ-প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, "হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।"

কেন খুন করিয়াছ।

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোনো বচসা হইয়াছিল ?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল ?

না।

তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল ?

না।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—"

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল— বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম— আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুলঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সইসাঙাতরা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই হুজুর, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, 'আমি যদি বলি আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'খবরদার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিথ্যা বলিস না— এতবড়ো মহাপাপ আর নাই'" ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেটুকু বলা ভালো, এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামি এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্‌বর্তী একটি ডোবার অংশ-বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতশত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গুরুতর আর কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউন্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে— তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বার বার কতবার করিয়া বলিব।"

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জানো ?"

চন্দরা কহিল, "না।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল, চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল— ও তোমাকে ভালোবাসে না ?

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না ?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

কেন।

ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্‌গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর ?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরণ।—"

শ্রাবণ ১৩০০

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

গল্প বলিতে হইবে ? কিন্তু আর তো পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারি দিকে কখন জড়ো হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে ; শুভাদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমতো সে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অনির্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্যভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না তাহা লইয়া বিনয় বা অহংকার করিতে চাহি না কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জনচর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন। খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই ; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও তো একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো। চিত্তও সেই নিরালা বাসস্থানটুকুর জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভুল বুঝিয়াই হউক, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন ; আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্যদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফূর্তি পাইতে পারিত কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের ভ্রমক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনাপূর্বক প্রাণিগণকে যথাসাধ্য কর্মে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ত্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আত্মগৌরব অনুভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক। পৃথিবীতে সাধারণত ইহাই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই "সাধারণ" নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অনুগ্রহ-নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক তো কিছু শুনাইব। শ্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতেছে। মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশত শুনিতে ধৈর্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধানিবৃত্তিপূর্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশোকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে বলিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন।"

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া, পৃথিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বারংবার চঞ্চু আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্তসমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভালো লাগিল না? ভালো লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ এই যে, পাঁচ-সাত প্যারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এই গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ পৃথিবীর ভাগ্যদোষে এ গল্প অতিপুরাতন হইয়াও চিরকাল নূতন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক ঠক শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে, এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ খচ শব্দে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে— আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনো রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কী আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে, সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ঐ দুটি বিদ্বেষবিষজর্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পায় না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামুণ্ড অর্থ কী আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয়তো কিঞ্চিৎ বয়সপ্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

যাহাই হউক, সর্বসুদ্ধ জিনিসটা তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই?

তাহার তো কোনো সন্দেহমাত্র নাই।

ভাদ্র ১৩০০

সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বলজ্বল এবং বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বের আগমন-সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি

ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি— কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথগাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনই শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃন্ময়ী। দূরে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃন্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃন্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণপূর্বক মৃন্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনো অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালকসঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমন-কি, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক-একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর-একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে-মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, মৃন্ময়ীর কৌতুকহাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক দুর্ভাগা অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর

বয়স ; অবশ্য ইটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর-দধি-রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল, কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়া ছিল যে, বি. এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপূর্ব ঐ ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোনো-একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশ-করা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহাসমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া একখানি পাতলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার-প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে একনিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া

যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়ি-পরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন মোচনে রাখাল খিল খিল শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা-পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমন-কি, পূর্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত ; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে, বার্নিশ-করা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিজোড়াটা পরিয়া প্যান্টলুন চাপকান পাগড়িসমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ঐ অসংগত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্টদৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে, অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্তদিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার

জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং 'হারমোনিয়ম শিক্ষা' বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ রায় বি. এ. কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো ?"

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি !"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ !

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল, মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্য জড়পুত্তলি মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই-তিনদিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপূর্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃন্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল, তথাপি আশা করিলেন, দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জবজবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানিরূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট বিক্রয়কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভালো আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমতো মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃন্ময়ীর মা এবং পল্লীর যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃন্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য

হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃন্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। একরাত্রির মধ্যে মৃন্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্ব মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাশুড়ি সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"

শাশুড়ি যে ভাবে বলিলেন মৃন্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এ ঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্ণে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলার রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশুড়ি, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃন্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ ঝুপ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃন্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃন্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না। আমি তোমাকে কক্‌খনোই ভালোবাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।" মৃন্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে কলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ি মৃন্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃন্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এসো আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃন্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখো কে এসেছে।"

রাখাল ভূপতিত মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃন্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন মৃন্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃন্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতিকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃন্ময়ী শাশুড়িকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ি অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাবার কাছে যাব। অনাসৃষ্টি আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।'

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃন্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্নারাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃন্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে-পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক 'রানার'গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃন্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মৃন্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝমঝম শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো-না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানি নে।" এই বলিয়া ঘাটে বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কে ও? মিনু মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।" মৃন্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত, সে কহিল, "বাবার কাছে যাবে? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মৃন্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ি আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মৃন্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-একদিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপূর্বকে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্তদিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, "মৃন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে ?"

মৃন্ময়ী সবেগে অপূর্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব।"

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এসো, আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল ; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্‌বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুইধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুইধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ঐ নৌকায় কী আছে, উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহা কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই-সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুনসেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই-সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায়-বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, "বাবা।" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী ; এই-সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পরে আহারের ব্যাপার— সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে-ভাত পাক করিয়া খায়— আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুইবেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল ; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা। এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাঁধাবাড়া। তাহার পরে মৃন্ময়ীর বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর-জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে

অপূর্ব জানাইল, আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরো কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।"

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ নিস্তব্ধ অভিমান লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, "বউয়ের কী করবে।"

অপূর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক্‌।"

মা কহিলেন, "না বাপু, কাজ নাই। তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "আচ্ছা।"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মৃন্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?"

মৃন্ময়ী কহিল, "না।"

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-একসময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?"

মৃন্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতিসূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃন্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না। "বোধ হয় দু-বৎসর কিংবা তারও বেশি হতে পারে।" মৃন্ময়ী আদেশ করিল, "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে এইখানেই থাকবে?"

মৃন্ময়ী কহিল, "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।"

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?"

মৃন্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু অপূর্বর ঘুম হইল না, বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রুপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রুপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মৃন্ময়ীকে জাগাইয়া দিল— কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃন্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি, আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে ?"

মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপূর্ব কহিল; "তুমি ইচ্ছা করিয়া ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃন্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সংবরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল— কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড়ো কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মৃন্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার সহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল ; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে-অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্বপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই ; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর-একটা বাড়ি, আর-একটা ঘর, আর-একটা শয্যার কাছে গুনগুন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, "মা, আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।"

এদিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণ মুখ স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়োই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ির পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ি বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়িকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়িও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন ; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।

তাহার পর, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেই পুষ্করিণী সেই পথ সেই তরুতল সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।

অপূর্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে মৃন্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই ; মৃন্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী বুঝিয়া গেলেন। অপূর্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না, ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি পাড় দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো। আর কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া

প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল ; এইজন্য আরো অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল— এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুঁটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর বাছুর হয়েছে। এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ট রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরো যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ি অথবা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য এ পত্রের কোনো ফল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন, ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনো সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মৃন্ময়ীকে আরো ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে মনে আরো অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছটফট করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্‌কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপু অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে ?" মৃন্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া-চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল ; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া বিষণ্ণ হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃন্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমতো হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে ; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।— শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো।" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।"

অপূর্ব কহিল, "সেজন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল ; আইন-পরীক্ষার পড়াশুনা" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।"

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশুনা" ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।"

ভগ্নী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁতকে উঠতে পারে।"

এইভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ-সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশ্ন করিতে পারিল না— সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও।"

দাদা কহিল, "না, বাড়ি যেতে হবে ; কাজ আছে।"

ভগ্নীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্ত্বে অপূর্ব সে-রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি কোরো না, চলো শুতে চলো।"

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তরপ্রত্যুত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি, তা আলো এনে দেব কি দাদা।"

অপূর্ব কহিল, "না। দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখি নে।"

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল অনেকদিনের একটি হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

আশ্বিন ১৩০০

সমস্যাপূরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝিকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন বদান্যতা, এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি. এ.। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র— এমন-কি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়াকর্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইহার কাছে কোনো ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা-কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না— সেটা তাঁহার একটা দুর্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনোই হইতে পারে না ; অর্ধেক জমিদারি আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমত, যে-সকল অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এই-সব জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যেরূপ নিশ্চিন্তমনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন— এমন-কি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র লিখিলেন যে, কাজটা গর্হিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন যে, পূর্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানাপ্রকারের ছিল— তখন জমিদার এবং প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যেই দানপ্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচরকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে— অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না, আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না— এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে, আমাদের সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপু, এ কয়েকটা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এইভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা মামলা হাঙ্গামা ফেসাদ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্ত প্রায় একপ্রকার মনের মতো গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্রর একটা অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এই মুসলমান-সন্তান যে কী হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্প-করে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

বিপিন পুরাতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন কর্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ অনুগ্রহের কোনো বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের পূর্বেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্যাপ্ত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত ইহারা যেন তাঁহার দয়াদুর্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমদ্দিও উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয় পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমদ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল, তাঁহার অনুগ্রহের 'পরে নির্ভর করাই কর্তব্য, জমিদারের প্রার্থনামত কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক।

অছিমদ্দি কহিল, "মা, তুমি এ-সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।"

মকদ্দমায় অছিমদ্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল, ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বস্বের জন্য সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারি কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভালো করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম— তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো— সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়ো না বাপ।"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতাবশত বুড়ি তাঁহার সহিত ঘরকন্না পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি মেয়েমানুষ, এ-সমস্ত কথা বোঝো না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।"

মির্জা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয়ে কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকদ্দমা ফৌজদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ করিল। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রিজারি করিল। অছিমদ্দির যথাসর্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সেদিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ়

মাসে কাঁঠালের আমদানিই সব চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে— কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিনবাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই-তিনজন লাঠিহস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতূহলবশত তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন, এমন সময় অছিমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিপিনবাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল— অবিলম্বে তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুশি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতি এবং বে-আদবি অসহ্য। যাহা হউক, বেটা যেরূপ বদ্‌মায়েস সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপুরের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা। তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এ দিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল— কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইতে হয় নাই— কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পালকি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিনবাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এজলাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেকদিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিনবাবুর কানে কানে কী একটা কথা বলিয়া দিল— তিনি তটস্থ হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলি, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোব্বা এবং আঁট প্যান্টলুন লইয়া কষ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগড়িটি নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি শশব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্তী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।"

বিপিনের অনুচরগণ কৌতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইজন্যই আপনি কাশী হইতে এতদূরে আসিয়াছেন ? উহাদের 'পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "সে-কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে বাপু।"

বিপিন ছাড়িলেন না— কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্যন্ত অধ্যবসায় ! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে ?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ বাপু।"

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সে-সব কথা পরে হইবে, এখন আপনি ঘরে চলুন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্বক কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ না থাকার এই ফল।

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেতওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম দুই পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভ্রাতা।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্পদিনের মধ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সে-ও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে-কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই নানা কথা কানাকানি করিতে লাগিল।

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন, পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। যাহা হউক কৃষ্ণগোপালের জগদ্‌বিখ্যাত দয়াধর্মমহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

অগ্রহায়ণ ১৩০০

খাতা

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে— জল পড়ে, পাতা নড়ে।

তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নীচে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ছিল, সেটা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেনসিল দিয়া লিখিয়াছে— কালো জল, লাল ফুল।

বাড়ির সর্বদাব্যবহার্য নূতন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে একপ্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে— লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

এ প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যন্ত সে কোনোপ্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে একদিন একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শুনিলে তাহার আত্মীয়স্বজন কিংবা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখনো সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কখনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে ; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সঙ্গে তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রচলিত আছে, সেগুলি গোবিন্দলাল যুক্তির কোনো সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডনপূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল— গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ-পাঠকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ করিয়াছিল তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেনসিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদৃশ গুরুতর লাঞ্ছনার কারণ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিতহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অনুতপ্তচিত্তে উমাকে তাহার লুণ্ঠিত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি লাইন-টানা ভালো বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।

উমার বয়স তখন সাত বৎসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাত্রিকালে উমার বালিশের নীচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সঙ্গে করিয়া যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিস্ময়, কাহারও লোভ, কাহারও বা দ্বেষ হইত।

প্রথম বৎসরে অত যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল— পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল। শয়নগৃহের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল ; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান— ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দুটা-একটা উদ্‌ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যাঘ্র ও বকের গল্পটা যেখানে কাপি করা আছে, তাহার নীচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিংবা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আর কোথাও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই

সে লাইনটি এই— যশিকে আমি খুব ভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বসিয়াছি। যশি পাড়ার কোনো একাদশ কিংবা দ্বাদশবর্ষীয় বালক নহে। বাড়ির একটি পুরাতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দু-পাতা অন্তরে পূর্বোক্ত কথাটির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা-আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা-দোষ লক্ষিত হয়। একস্থলে দেখা গেল— হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।) তার অনতিদূরেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধু তাহার আর ত্রিভুবনে নাই।

তাহার পরবৎসরে বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন একদিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য পাড়ার লোকেরা তাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি শাড়ি পরিয়া ঘোমটায় ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড়ি গেল! মা বলিয়া দিলেন, "বাছা, শাশুড়ির কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্নার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিস নে।"

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, "দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াস নে; সে তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম চালাস নে।"

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বুঝিতে পারিল, সে যেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না। এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, ত্রুটি বলে, তাহা অনেক ভর্ৎসনার পর অনেকদিনে শিখিয়া লইতে হইবে।

সেদিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি এবং অলংকারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কম্পিত হৃদয়টুকুর মধ্যে কী হইতেছিল তাহা ভালো করিয়া বোঝে এমন একজনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

যশিও উমার সঙ্গে গেল। কিছুদিন থাকিয়া উমাকে শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ; তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অঙ্কস্থলীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথম কিছুদিন সে কিছুই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছুদিন পরে যশি তাহার পূর্বস্থানে চলিয়া গেল।

সেদিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল— যশি বাড়ি চলে গেছে, আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চারুপাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছু কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। সুতরাং আজকাল বালিকার সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। পূর্বোদ্‌ধৃত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে— দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তা হলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।

শুনা যায় উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বাড়ি আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার প্রতিবন্ধক হয়।

গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রূপে জড়িত এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবর্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার অকাট্য সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমুখে সেই কথা শুনিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল— দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

একদিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার ননদ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কৌতূহল হইল— সে ভাবিল বউদিদি মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনোই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোটো কনকমঞ্জরী, সে-ও আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল।

তাহার ছোটো অনঙ্গমঞ্জরী, সে-ও পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া বহুকষ্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুদ্ধগৃহের রহস্য ভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কণ্ঠের খিল খিল হাসি শুনিতে পাইল। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া লজ্জায় ভয়ে বিছানায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয় ; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং কিঞ্চিৎ উপহাসও করিল— বলিল, "শামলা ফরমাশ দিতে হইবে, গিন্নী কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।"

উমা ভালো বুঝিতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবন্ধ সে কখনো পড়ে নাই এইজন্য তাহার এখনো ততদূর রসবোধ জন্মে নাই। কিন্তু সে মনে মনে একান্ত সংকুচিত হইয়া গেল— মনে হইল পৃথিবী দ্বিধা হইলে তবে সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু একদিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিনী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না ; কিন্তু লিখিতে শিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শুনিলেই সেটা, লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল—

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনীপ্রায়, অমনি রানী ধায়,
কই উমা বলি কই।
কেঁদে রানী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে।

অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রানীরে বলে—
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।

অভিমানে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে ডাকিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনঙ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।"

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিস নে ভাই, তোদের দুটি পায়ে পড়ি ভাই— আমি আর করব না, আমি আর লিখব না।"

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ করিতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বল প্রয়োগ করিয়া সেটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কৃতকার্য না হইয়া অনঙ্গ দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমন্দ্রস্বরে বলিল, "খাতা দাও।" আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরো দুই-এক সুর গলা নামাইয়া কহিল, "দাও।"

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অনুনয়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল ; শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল ; এবং অপর তিনটি বালিকা-শ্রোতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই। প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।

প্রবন্ধ

জীবনস্মৃতি

সংযোজিত পাদটীকাংশে নিম্ন সংকেতগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থ বা সাময়িকের নামে সাধারণত উদ্‌ধৃতিচিহ্ন দেওয়া হয় নাই।

রচনাবলী= রবীন্দ্র-রচনাবলী

রচনাবলী-অ= রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ

গ্র-পরিচয়= রবীন্দ্র-রচনাবলী, গ্রন্থপরিচয়

চরিতমালা= সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

গ্রন্থোত্তর সংখ্যা (১, ২ ইত্যাদি) খণ্ড-জ্ঞাপক

জ্যোতিস্মৃতি= জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

র-পরিচয়= রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় র-কথা= রবীন্দ্রকথা

দ্র= দ্রষ্টব্য তু= তুলনীয় ইং= ইংরেজি পৃ= পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ । ১৮৭৭

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত পেনসিল-স্কেচ অবলম্বনে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক অঙ্কিত

জীবনস্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা-কিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দু'ই ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে-চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে— তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে— সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে— সুতরাং, পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে— তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মনের মধ্যে যে-ঔৎসুক্য জন্মিল তাহা কি কেবলমাত্র নিজের অতীতজীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্বজনিত। অবশ্য, মমতা কিছু না থাকিয়া যায় না, কিন্তু ছবি বলিয়াই ছবিরও একটা আকর্ষণ আছে। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ যে-ছবিগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সীতার জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে ; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই, তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে-হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।

শিক্ষারম্ভ

আমরা তিনটি বালক[১] একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গীদুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের[২] কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল[৩], কিন্তু সে-কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর, খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'[৪] আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না— তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না— মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালের আর-একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুজ্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো। লোকটি ভারি রসিক। সকলের সঙ্গেই তাহার হাসিতামাশা। বাড়িতে নূতনসমাগত জামাতাদিগকে সে বিদ্রূপে কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। মৃত্যুর পরেও তাহার কৌতুকপরতা কমে নাই, এরূপ জনশ্রুতি আছে। একসময়ে আমার গুরুজনেরা প্ল্যাঞ্চেট-যোগে পরলোকের সহিত ডাক বসাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। একদিন তাঁহাদের প্ল্যাঞ্চেটের পেন্সিলের রেখায় কৈলাস মুখুজ্যের নাম দেখা দিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি যেখানে আছ সেখানকার ব্যবস্থাটা কিরূপ, বলো দেখি। উত্তর আসিল, আমি মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা বাঁচিয়াই তাহা ফাঁকি দিয়া জানিতে চান? সেটি হইবে না।

সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত— কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে— আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

তাহার পরে যে কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর-কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে

১ "আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ, আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ [গঙ্গোপাধ্যায়] এবং আমি।"— পাণ্ডুলিপি

২ মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় —র-কথা

৩ বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায়— ছেলেবেলা, অধ্যায় ৮

৪ দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর -প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ

কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি-অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" সেই শিক্ষকের নামধাম আকৃতিপ্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই— কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর-কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে[১] অকালে ভরতি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে খেলিতেছি। মনে নাই সত্য কী কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য হঠাৎ 'পুলিসম্যান' 'পুলিসম্যান' করিয়া ডাকিতে লাগিল। পুলিসম্যানের কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি রকমের একটা ধারণা আমার ছিল। আমি জানিতাম, একটা লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদের হাতে দিবামাত্রই, কুমির যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলস্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিসকর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম। এরূপ নির্মম শাসনবিধি হইতে নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে অন্তঃপুরে দৌড় দিলাম; পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। মাকে[২] গিয়া আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইলাম; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কিন্তু আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা, আমার মাতার কোনো-এক সম্পর্কে খুড়ি[৩], যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

ঘর ও বাহির

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার

১ গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয় স্থাপিত ১৮২৩। বিদ্যালয়টি তখন "গরানহাটায় গোরাচাঁদ বশাকের বাটীতে" অবস্থিত ছিল।

২ সারদাদেবী (১৮২৪-৭৫), বিবাহ ১৮২৯-৩০। মতান্তরে (রবীন্দ্র কথা পৃ ১-৪): সারদাদেবীর জন্ম, ইং ১৮২৬; বিবাহ, ফাল্গুন ১২৪০ [১৮৩৪]

৩ সারদাদেবীর "কাকার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা স্ত্রী", "তিনি প্রায় মায়ের [সারদাদেবীর] সমবয়সী ছিলেন।"— জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আত্মচরিত, পাণ্ডুলিপি

কালের বিশেষত্ব, তাহার 'পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা— সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম— কারণ এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই ; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম— তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে ; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল ; বড়ো হইলে কোনো-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের-জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা-কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো-আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে— তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

বাহিরবাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট— দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত ; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত ; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাই

লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত ; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত ; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত ; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক ; কাহারও-বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই, ধীরেসুস্থে স্নান করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুলগতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।[১]

কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রীদেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই ; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারি দিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ— মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি[২] লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি, আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"

১ দ্র 'পুরোনো বট', শিশু, রচনাবলী ৯

২ দ্র 'দুই পাখি', সোনার তরী, রচনাবলী ৩

বনের পাখি বলে, "না,"
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূসমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাদের কার্নিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখির সঙ্গে ঐ বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম— চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতার আগাগোড়া বোঝাই-করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত— তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতালার ঘর বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি খুলিয়া হাত গলাইয়া, ছিটকিনি টানিয়া দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল— সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে-ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্যে বাঙালিপাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই। শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে-স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর-একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে; সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সংগতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে-ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া এই ঢেঁকিশালাটি কোন্-একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম-মানব আদমের স্বর্গোদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম-মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন— আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতে যে-পর্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে, সে-পর্যন্ত মানুষের সাজসজ্জার প্রয়োজন কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল— সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুব দিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো-এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সংবৎসরের শস্য রাখা হইত— তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের ভাইভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত, এখন দিদির সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহির,তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই; তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো-একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা[১] সেটাকে রাজার বাড়ি[২] বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, 'আজ সেখানে গিয়াছিলাম।' কিন্তু একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত সেটা অত্যন্ত কাছে; একতলায় বা দোতলায় কোনো-একটা জায়গায়; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে। সে বলিয়াছে, না, এই বাড়ির মধ্যেই। আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে-ঘর তবে কোথায়! রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে— কেবল এইটুকুমাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

১ ইরাবতী (১৮৬১-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর কন্যা, সত্যপ্রসাদের ভগ্নী

২ দ্র 'রাজার বাড়ি', গল্পসল্প; 'রাজার বাড়ি', শিশু, রচনাবলী ৯

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সব চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বলো দেখি। কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম।[১] সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে এ-কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত। আতার বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিস্ময় অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। সেটা আতার বীজের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ। গুণদাদার[২] বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম— তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে, নিতান্তই গাছ বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে বিশ্বাস ছিল, আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্যের সামগ্রী হইবে ; সেই বিশ্বাসের যেদিন পরীক্ষা করিতে গেলাম সেইদিনই আমাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল। ইস্কুলঘরের কোণে যে পাহাড় সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়া বড়োই দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়োদের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া, গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল।

তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত— মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি। মনে ভাবিতাম, একটার পর আর-একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁতা যায়, এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয়তো একরকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে। মাঘোৎসব উপলক্ষে আমাদের উঠানের চারি ধারে সারি সারি করিয়া কাঠের থাম পুঁতিয়া তাহাতে ঝাড় টাঙানো হইত। পয়লা মাঘ হইতেই এজন্য উঠানে মাটি-কাটা আরম্ভ হইত। সর্বত্রই উৎসবের উদ্যোগের আরম্ভটা ছেলেদের কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু আমার কাছে বিশেষভাবে এই মাটি-কাটা ব্যাপারের একটা টান ছিল। যদিচ প্রত্যেক বৎসরই মাটি কাটিতে দেখিয়াছি— দেখিয়াছি, গর্ত বড়ো হইতে হইতে একটু একটু করিয়া সমস্ত মানুষটাই গহ্বরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার মধ্যে কোনোবারই এমন-কিছু দেখা দেয় নাই যাহা কোনো রাজপুত্র বা পাত্রের পুত্রের পাতালপুর-যাত্রা সফল করিতে পারে, তবুও প্রত্যেক বারেই আমার মনে হইত, একটা রহস্যসিন্ধুকের ডালা খোলা হইতেছে। মনে হইত, যেন আর-একটু খুঁড়িলেই হয়— কিন্তু বৎসরের পর বৎসর গেল, সেই আর-একটুকু কোনোবারেই খোঁড়া হইল না। পর্দায় একটুখানি টান দেওয়াই হইল কিন্তু তোলা হইল না। মনে হইত, বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন— আমাদের মতো শিশুর আজ্ঞা যদি খাটিত, তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না। আর, যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে-চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধোদয়[৩] পড়াইবার উপলক্ষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের ঐ নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে, তখন সেটা

১ দ্র 'আতার বিচি' ছড়ার ছবি

২ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৭-৮১), দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র

৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত

কী অসম্ভব আশ্চর্যই মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও-না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না।" আমি ভাবিলাম, সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, আরো সিঁড়ি আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি ; শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম, এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে যাঁহারা মাস্টারমশায় তাঁহারাই কেবল এটা জানেন, আর কেহ নয়।

ভৃত্যরাজক তন্ত্র

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই-সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল-তা'তেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ-সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই— পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্মই এই— বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায়— শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কোন্‌টা দুষ্ট এবং কোন্‌টা শিষ্ট, ব্যাধ তাহা পাখির দিক হইতে দেখে না, নিজের দিক হইতেই দেখে। সেইজন্য গুলি খাইবার পূর্বেই যে সতর্ক পাখি চীৎকার করিয়া দল ভাগায়, শিকারী তাহাকে গালি দেয়। মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইত। রোদন জিনিসটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক, এ-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন এক-একবার ভাবি, ভৃত্যদের হাত হইতে কেন এমন নির্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের উপরে আকারপ্রকারে আমরা যে স্নেহদয়ামায়ার অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটা এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড়ো অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ। ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো ছেলে হইতে দেওয়া যায়— সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর, উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্তার উপরে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ানো হয়। যে-বেচারা কাঁধে করে তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে, কিন্তু ঘোড়া-বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।

এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিলচড় আকারেই মনে আছে— তাহার বেশি আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশ্বর।[1] সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে তাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসদ্ভাব ছিল। এইজন্য এই মৃৎপিণ্ড মেদিনীর মলিনতার সঙ্গে সর্বদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। বিদ্যুদ্‌বেগে ঘটি ডুবাইয়া পুষ্করিণীর তিন-চারহাত নীচেকার জল সে সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় দুই হাত

১ ব্রজেশ্বর, দ্র ছেলেবেলা, অধ্যায় ৩

দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুষ্করিণীর উপরিতলের জল কাটাইতে কাটাইতে, অবশেষে হঠাৎ একসময় দ্রুতগতিতে ডুব দিয়া লইত ; যেন পুষ্করিণীটিকে কোনোমতে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়া ফাঁকি দিয়া মাথা ডুবাইয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়। চলিবার সময় তাহার দক্ষিণ হস্তটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত যে বেশ বোঝা যাইত, তাহার ডান হাতটা তাহার শরীরের কাপড়চোপড়গুলাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেছে না। জলে স্থলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেইগুলাকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল। বিশ্বজগৎটা কোনো দিক দিয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়ে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। অতলস্পর্শ তাহার গাম্ভীর্য ছিল। ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া মন্দ্রস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে, সে বরানগরকে বরাহনগর বলে। এটা জনশ্রুতি হইতে পারে কিন্তু আমি জানি, 'অমুক লোক বসে আছেন' না বলিয়া সে বলিয়াছিল 'অপেক্ষা করছেন'। তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো ভৃত্যের মুখে 'অপেক্ষা করছেন' কথাটা হাস্যকর নহে। ইহা হইতে দেখা যায়, বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে— একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।

এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরো দুই-চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলাকার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচরণ কিশোরী চাটুজ্যে[1] আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল— কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল— অনুপ্রাসের ঝকমকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

কোনো-কোনোদিন পুরাণপাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোটো ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্যসমাজে পদমর্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরুসভায় ভীষ্মপিতামহের মতো সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আপন গুরুগৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।

এই আমাদের পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম খাইত। এই কারণে তাহার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এইজন্য আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন সে আমাদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিত, তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল হইয়া উঠিত। আমরা দুধ খাইতে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্বপালন উপলক্ষেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।

আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সংকোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশকরা থাকিত। প্রথমে দুই-একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে

১ কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে-বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মতো, লুচিকয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত ; তাহাতে পরিবেশনকর্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণহস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কিনা। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমত জলখাবার কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমরা কী খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম, সস্তা জিনিস ফরমাশ করিলে সে খুশি হইবে। কখনো মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য, কখনো-বা ছোলাসিদ্ধ চিনাবাদাম-ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম। দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক সূক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

নর্মাল স্কুল

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে-হীনতা, তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাস খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম। রেলিংগুলার মধ্যে কে ভালো ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে, তাহা একেবারে স্থির করা ছিল। এমন-কি, ভালোমানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিঙের মুখশ্রীর প্রভেদ আমি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। দুষ্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগত আমার লাঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে, প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিত। লাঠির চোটে যতই তাহাদের বিকৃতি ঘটিত ততই তাহাদের উপর রাগ কেবলই বাড়িয়া উঠিত ; কী করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে, তাহা যেন ভাবিয়া কুলাইতে পারিতাম না। আমার সেই নীরব ক্লাসটির উপর কী ভয়ংকর মাস্টারি যে করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ কেহই বর্তমান নাই। আমার সেই সেকালের দারুনির্মিত ছাত্রগণের স্থলে সম্প্রতি লৌহনির্মিত রেলিং ভরতি হইয়াছে— আমাদের উত্তরবর্তিগণ ইহাদের শিক্ষকতার ভার আজও কেহ গ্রহণ করে নাই, করিলেও তখনকার শাসনপ্রণালীতে এখন কোনো ফল হইত না।— ইহা বেশ দেখিয়াছি, শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোনো দুঃখ পাইতে হয় না। শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে-সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, কাঠের রেলিঙের মতো নিতান্ত নির্বাক্ ও অচল পদার্থ ছাড়া আর-কিছুর উপরে সেই সমস্ত বর্বরতা প্রয়োগ করিবার উপায় সেই দুর্বল বয়সে আমার হাতে ছিল না। কিন্তু যদিচ রেলিং-শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণীতে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল, তবু আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না। তাহার পরে নর্মাল স্কুলে[১] ভরতি হইলাম। তখন বয়স অত্যন্ত অল্প। একটা কথা মনে পড়ে, বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে বসিয়া গানের সুরে কী সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের মনোরঞ্জনের আয়োজন থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেই চেষ্টা ছিল। কিন্তু গানের কথাগুলো ছিল ইংরেজি, তাহার সুরও তথৈবচ— আমরা যে কী মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং কী অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা কিছুই

১ ইং ১৮৫৫, জুলাই মাসে "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে" স্থাপিত হয়।— চরিতমালা ১২
"তখন এই বিদ্যালয়টি জোড়াসাঁকোতে তাঁহাদের [রবীন্দ্রনাথের] বাটির সন্নিকটে বাবু শ্যামলাল মল্লিকের বাটিতে অবস্থিত ছিল।"— র-কথা পৃ ১৬৪

বুঝিতাম না। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের কাছে সুখকর ছিল না। অথচ ইস্কুলের কর্তৃপক্ষেরা তখনকার কোনো-একটা থিয়োরি অবলম্বন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁহারা ছেলেদের আনন্দবিধান করিতেছেন; কিন্তু প্রত্যক্ষ ছেলেদের দিকে তাকাইয়া তাহার ফলাফল বিচার করা সম্পূর্ণ বাহুল্য বোধ করিতেন। যেন তাঁহাদের থিয়োরি-অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্তব্য, না পাওয়া তাহাদের অপরাধ। এইজন্য যে ইংরেজি বই হইতে তাঁহারা থিয়োরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে আস্ত ইংরেজি গানটা তুলিয়া তাঁহারা আরাম বোধ করিয়াছিলেন। আমাদের মুখে সেই ইংরেজিটা কী ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে নিঃসন্দেহ মূল্যবান। কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে—

কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।

অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি— কিন্তু 'কলোকী' কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা আমার বোধ হয়— Full of glee, singing merrily, merrily, merrily.

ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থায় পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।[১] ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনোমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানলার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর— আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে একজনের[২] কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ঐ ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ঐ কথাটা মনে মনে আলোচনা করিতাম, তাহা আজও আমার মনে আছে। ভাবিতাম, কুকুর বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের খুব ভালো করিয়া শায়েস্তা করিয়া, প্রথমে তাহাদের দুই-চারি সার যুদ্ধক্ষেত্রে যদি সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে লড়াইয়ের আসরের মুখবন্ধটা বেশ সহজেই জমিয়া ওঠে; তাহার পরে নিজেদের বাহুবল কাজে খাটাইলে জয়লাভটা নিতান্ত অসাধ্য হয় না। মনে মনে এই অত্যন্ত সহজ প্রণালীর রণসজ্জার ছবিটা যখন কল্পনা করিতাম তখন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষের জয় একেবারে সুনিশ্চিত দেখিতে পাইতাম। যখন হাতে কাজ ছিল না তখন কাজের অনেক আশ্চর্য সহজ উপায় বাহির করিয়াছিলাম। কাজ করিবার বেলায় দেখিতেছি, যাহা কঠিন তাহা কঠিনই, যাহা দুঃসাধ্য তাহা দুঃসাধ্যই, ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা আরো সাতগুণ বাড়িয়া উঠে।

এমনি করিয়া সেই ক্লাসে এক বছর যখন কাটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির[৩] নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশি নম্বর পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্তৃপুরুষদের কাছে জানাইলেন যে পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আমার পরীক্ষা হইল। এবার স্বয়ং সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। এবারেও ভাগ্যক্রমে আমি উচ্চস্থান পাইলাম।

১ "গিন্নি বলিয়া একটা ছোটোগল্প লিখিয়াছিলাম, সেটা নর্মালস্কুলেরই স্মৃতি হইতে লিখিত।"— পাণ্ডুলিপি

২ হরনাথ পণ্ডিত

৩ নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক

কবিতা-রচনারম্ভ

আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ[1] আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।" বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য-জিনিসটিকে এ-পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবাচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্যজনোচিত দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না। একদিন আমাদের বাড়িতে চোর ধরা পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরতিশয় কৌতূহলের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মতো। এমন অবস্থায় দরোয়ান যখন তাহাকে মারিতে শুরু করিল, আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। পদ্য সম্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না। এখন দেখিতেছি, পদ্যবেচারার উপরেও মার সয় না। অনেকসময় দয়াও হয় কিন্তু মারও ঠেকানো যায় না, হাত নিস্‌পিস্‌ করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই।

ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেনসিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।

হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্‌গম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত, আমার দাদা[2] আমার এই-সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে, একদিন একতলায় আমাদের জমিদারি-কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় তখনকার 'ন্যাশানাল পেপার'[3] পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া কহিলেন, "নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন-না।" শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্য-গ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারী হয় নাই। কবিকীর্তি কবির জামার পকেটে-পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন। পদ্মের উপরে একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়া উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কী।"

'দ্বিরেফ' এবং 'ভ্রমর' দুটোই তিন অক্ষরের কথা। ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোনো অনিষ্ট হইত না। ঐ দুরূহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মনে নাই। সমস্ত কবিতাটার মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই আমার আশা-ভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল। দফতরখানার আমলামহলে নিশ্চয়ই ঐ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারিল না। এমন-কি, তিনি

১ জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৯), গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কাদম্বিনী দেবীর পুত্র

২ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯-১৯২৩)

৩ দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত (? ১৮৬৬) স্বদেশীভাব-প্রচারক ইংরেজি সাপ্তাহিক

হাসিয়া উঠিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন। তাঁহাকে আর-কখনো কবিতা শুনাই নাই। তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু কে সমজদার, কে নয়, তাহা পরখ করিবার প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাই হোক, নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে কিন্তু 'দ্বিরেফ' শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।

নানা বিদ্যার আয়োজন

তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ,[১] বস্তুবিচার,[১] প্রাণিবৃত্তান্ত[২] হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার[৩] বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের[৪] সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা,[১] মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর[৫] কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত[৬] মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এইজন্যই জল টগবগ করে— ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়, এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।

ইহা ছাড়া, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো-এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল[৭] কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।

ইহারই মাঝে এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে শুরু করিয়া দিলেন। অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্র, দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।

১ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। বস্তুবিচার— ? 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'
২ সাতকড়ি দত্ত-প্রণীত
৩ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪-৮৪), দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র
৪ "হীরা সিং নামক একজন শিখ পালোয়ান।" —প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৩৮৮
৫ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮১৯- ? ১৯০১)
৬ ? সীতানাথ ঘোষ (১২৪৮-৯০), দ্র প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৩৮৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, পৃ ২১৩
৭ দ্র 'কঙ্কাল', গল্পগুচ্ছ ১, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬ (সুলভ ৮)

বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মাস্টার অঘোরবাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন। কাঠ হইতে অগ্নি উদ্‌ভাবনটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো উদ্‌ভাবন, এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা আলো জ্বালিতে পারে না, এটা যে পাখির বাচ্ছাদের পরম সৌভাগ্য এ কথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে ভাষা শেখে সেটা প্রাতঃকালেই শেখে এবং মনের আনন্দেই শেখে, সেটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য, সেটা ইংরেজি ভাষা নয়, এ কথাও স্মরণ করা উচিত।

এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনাসত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেইসময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে-সময়টাতে মাস্টারমহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।[1]

যখন সকল কথা স্মরণ করি তখন দেখিতে পাই, অঘোরবাবু নিতান্তই যে কঠোর মাস্টারমশাই-জাতের মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। মুখেও যেটুকু তর্জন করিতেন, তাহার মধ্যে গর্জনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু তিনি যত ভালোমানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি। সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিম্‌টিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস নহে আমাদের কাছে তাহাই প্রমাণ করিতে অঘোরবাবু একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার সরসতার উদাহরণ দিবার জন্য, পদ্য কি গদ্য তাহা বলিতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি তিনি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই হাসিতে লাগিলাম যে সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ দিতে হইল; বুঝিতে পারিলেন মকদ্দমাটি নিতান্ত সহজ নহে— ডিক্রি পাইতে হইলে আরো এমন বছর দশ-পনেরো রীতিমতো লড়ালড়ি করিতে হইবে।

মাস্টারমশায় মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপানো বহির বাহিরের দক্ষিণহাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন হঠাৎ পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একটি রহস্য বাহির করিয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাইব।" এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুষের একটি কণ্ঠনলী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম, সমস্ত মানুষটাই কথা কয়; কথা-কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরা করিয়া দেখা যায়, ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যতবড়ো আশ্চর্য

১ দ্র 'অসম্ভব কথা', গল্পগুচ্ছ ১

হউক-না কেন, তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে। তখন অবশ্য এমন করিয়া ভাবি নাই কিন্তু মনটা কেমন একটু ম্লান হইল ; মাস্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ দিতে পারিলাম না। কথা কওয়ার আসল রহস্যটুকু যে সেই মানুষটির মধ্যেই আছে, এই কণ্ঠনলীর মধ্যে নাই, দেহব্যবচ্ছেদের কালে মাস্টারমশায় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহার কণ্ঠনলীর ব্যাখ্যা সেদিন বালকের মনে ঠিকমত বাজে নাই। তার পরে একদিন তিনি আমাদিগকে মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল ; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই ; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়াছিল, সে-দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ[১] কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্‌স্[২] কোর্স অফ রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই! এখনকার মতো ছেলেদের বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না। প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাঁধা সিলেবল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্‌সেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না। মাস্টারমহাশয় তাঁহার অপর একটি কোন্ সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রত্যহ ধিক্‌কার দিতেন। এরূপ তুলনামূলক সমালোচনায় সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতিসঞ্চার হইত না, লজ্জাও পাইতাম অথচ সেই কালো বইটার অন্ধকার অটল থাকিত। প্রকৃতিদেবী জীবের প্রতি দয়া করিয়া দুর্বোধ পদার্থমাত্রের মধ্যে নিদ্রাকর্ষণের মোহমন্ত্রটি পড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেমনি পড়া শুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া, বারান্দায় দৌড় করাইয়া, কোনো স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা[৩] যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্তকাল বিলম্ব হইত না।

বাহিরে যাত্রা

একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের[৪] বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালিপাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই

১ Peary Churn Sircar : First Book or Reading, Second Book or Reading

২ ? Macculloch's

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র

৪ আশুতোষ দেব

জোয়ারভাঁটার আসা-যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে ; ওপারের গাছগুলি কালো ; নদীর উপর কালো ছায়া ; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়গ্রহণ করে ; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। সকালবেলায় এখোগুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে-অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে— এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাটবাঁধানো একটা খিড়কির পুকুর— ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুল গাছ ; চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আবরু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা সংকুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাত। এ যেন ঘরের বধূ। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতাপাতা আঁকা সবুজরঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের নিভৃত অবকাশে মনের কথাটিকে মৃদুগুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহ্নেই অনেকদিন জামরুলগাছের ছায়ায়, ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল— কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে— পায়ের শিকল কাটিল না।

একদিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুইজনে সকালে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দে এই ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল, তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন, আমি পিছনে আছি। তখনই ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, "যাও যাও, এখনি ফিরে যাও।"— তাঁহাদের মনে হইয়াছিল বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই— ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সে হয়তো আজ চল্লিশ বছরের কথা। তার পর সেই বাগানের পুষ্পিত চাঁপাতলার স্নানের ঘাটে আর একদিনের জন্যও পদার্পণ করি নাই। সেই গাছপালা, সেই বাড়িঘর নিশ্চয়ই এখনো আছে, কিন্তু জানি সে বাগান আর নাই ; কেননা, বাগান তো গাছপালা দিয়া তৈরি নয়, একটি বালকের নববিস্ময়ের আনন্দ দিয়া সে গড়া— সেই নববিস্ময়টি এখন কোথায় পাওয়া যাইবে ?

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।

কাব্যরচনাচর্চা

সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল। বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারগুলি ছিঁড়িয়া কতকগুলি আঙুলের মতো হইয়া ভিতরের লেখাগুলাকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেই নীল ফুলসক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠরযন্ত্রণার হাত সে এড়াইল।

আমি কবিতা লিখি, এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না। সাতকড়ি দত্ত[১] মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি প্রাণীবৃত্তান্ত নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। আশা করি কোনো সুদক্ষ পরিহাসরসিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ করিয়া তাঁহার স্নেহের কারণ নির্ণয় করিবেন না। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক।" লিখিয়া যে থাকি সে কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-এক পদ কবিতা দিয়া, তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে। আমার সেকালের কবিতাকে কোনোমতেই যে দুর্বোধ বলা চলে না তাহারই প্রমাণস্বরূপে লাইনদুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা আছে তাহা সরোবরসংক্রান্ত— অত্যন্তই স্বচ্ছ।

আর-একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্‌ধৃত করি— আশা করি, ইহার ভাষা ও ভাব অলংকারশাস্ত্রে প্রাঞ্জল বলিয়া গণ্য হইবে—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমাদের ইস্কুলের গোবিন্দবাবু[২] ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ। ইনি ছিলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। কালো চাপকান পরিয়া দোতালায় আপিসঘরে খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়া করিতেন। ইঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামি ছিল পাঁচ-ছয়জন বড়ো বড়ো ছেলে ; আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই

১ হেড্‌মাস্টার (?) নর্মাল স্কুল
২ "খোঁড়া গোবিন্দ ময়রা", দ্র 'ভালোমানুষ', গল্পসল্প

ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল। সেই ফৌজদারিতে আমি জিতিয়াছিলাম এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।

একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীতচিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লেখ।" কবুল করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দবাবুর মতো ভীষণগম্ভীর লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কিরূপ অদ্ভুত সুললিত, তাহা যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "পড়িয়া শোনাও।" আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।

এই নীতিকবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে— এটি সকাল সকাল হারাইয়া গেছে। ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল যাহা দেখা গেল তাহা আশাপ্রদ নহে। অন্তত, এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির প্রতি কিছুমাত্র সদ্‌ভাবসঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এ লেখা নিশ্চয়ই আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। কেহই তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। বিশ্বাস করাই তাহাদের আবশ্যক— প্রমাণ করিতে গেলে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যে পথ অবলম্বন করিল তাহা নৈতিক উন্নতির প্রশস্ত পথ নহে।

এখনকার দিনে ছোটোছেলের কবিতা লেখা কিছুমাত্র বিরল নহে। আজকাল কবিতার গুমর একেবারে ফাঁক হইয়া গিয়াছে। মনে আছে, তখন দৈবাৎ যে দুই-একজনমাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন যদি শুনি, কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না, তবে সেইটেই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পরি না। কবিত্বের অঙ্কুর এখনকার কালে উৎসাহের অনাবৃষ্টিতেও ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের অনেক পূর্বেই মাথা তুলিয়া উঠে। অতএব, বালকের যে কীর্তিকাহিনী এখানে উদ্‌ঘাটিত করিলাম, তাহাতে বর্তমানকালের কোনো গোবিন্দবাবু বিস্মিত হইবেন না।

শ্রীকণ্ঠবাবু

এই সময়ে একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলাম— এমন শ্রোতা আর পাইব না।[১] ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত-সমালোচক-পদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ব বোম্বাই আমটির মতো— অম্লরসের আভাসমাত্রবর্জিত— তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফারসি-পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্, স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না। বেশ মনে পড়ে, তিনি একদিন আমাদের লইয়া একজন ইংরেজ ছবিওয়ালার দোকানে ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দিতে বাংলাতে তিনি

১ "ইনি রায়পুরের সিংহপরিবারের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়।" —পাণ্ডুলিপি
—"সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত।"

এমনি আলাপ জমাইয়া তুলিলেন— অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মতো তাহাকে এমন জোর করিয়া বলিলেন "ছবিতোলার জন্য অত বেশি দাম আমি কোনোমতেই দিতে পারিব না, আমি গরিব মানুষ— না না, সাহেব সে কিছুতেই হইতে পারিবে না"— যে, সাহেব হাসিয়া সস্তায় তাঁহার ছবি তুলিয়া দিল। কড়া ইংরেজের দোকানে তাঁহার মুখে এমনতরো অসংগত অনুরোধ যে কিছুমাত্র অশোভন শোনাইল না, তাহার কারণ সকল মানুষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল— তিনি কাহারও সম্বন্ধেই সংকোচ রাখিতেন না, কেননা তাঁহার মনের মধ্যে সংকোচের কারণই ছিল না।

তিনি এক-একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে গিয়া তিনি গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া, তাহাদের বুটপরা ছোটো দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া সভা এমন জমাইয়া তুলিতেন যে তাহা আর-কাহারও দ্বারা কখনোই সাধ্য হইত না। আর-কেহ এমনতরো ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে ইহা আতিশয্যই নহে— এইজন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুশি হইত।

আবার, তাঁহাকে কোনো অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমানরূপে আসিয়া পড়িত না। আমাদের বাড়িতে একসময়ে একজন বিখ্যাত গায়ক কিছুদিন ছিলেন। তিনি মত্ত অবস্থায় শ্রীকণ্ঠবাবুকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রসন্নমুখে সমস্তই মানিয়া লইতেন, লেশমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সেই গায়কটিকে আমাদের বাড়ি হইতে বিদায় করাই স্থির হইল। ইহাতে শ্রীকণ্ঠবাবু ব্যাকুল হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। বার বার করিয়া বলিলেন, "ও তো কিছুই করে নাই, মদে করিয়াছে।"

কেহ দুঃখ পায়, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না— ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এইজন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা' হইতে কোনো-একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনোমতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না। ঝরনার ধারা যেমন একটুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেন। দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে যথারীতি সংসারে দুঃখকষ্ট ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। শ্রীকণ্ঠবাবু মনে করিলেন, এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পারমার্থিক কবিতা আমার পিতাকে শুনাইলে, নিশ্চয় তিনি ভারি খুশি হইবেন। মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না— কিন্তু খবর পাইলাম যে, সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে পয়ারচ্ছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন। বিষয়ের গাম্ভীর্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ গোবিন্দবাবু হইলে সে কবিতাদুটি আদর বুঝিতেন।

গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয়শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল— 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী।' ঐ গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময় ছোড়োঁ', সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালোলাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন। ইহারই দেওয়া হিন্দিগান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত[১] আছে-

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত, দ্র ব্রহ্মসংগীত

শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও 'আমরা তিনটি বালক' : ১২৮২ ?

রবীন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ শ্রীকণ্ঠ সিংহ সত্যপ্রসাদ

ইন্দিরাদেবীর সৌজন্যে

'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে— ভুলো না রে তাঁয়।' এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন— 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে'— আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন— 'অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে।'

এই বৃদ্ধ যেদিন আমার পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন,[১] পিতৃদেব চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারের বাগানে ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবু তখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চোখের পাতা আঙুল দিয়া তুলিয়া চোখ মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার কন্যার শুশ্রূষাধীনে বীরভূমের রায়পুর হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। বহুকষ্টে একবার মাত্র পিতৃদেবের পদধূলি লইয়া চুঁচুড়ার বাসায় ফিরিয়া আসেন ও অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যার কাছে শুনিতে পাই, আসন্ন মৃত্যুর সময়েও 'কী মধুর তব করুণা, প্রভো' গানটি[২] গাহিয়া তিনি চিরনীরবতা লাভ করেন।

বাংলাশিক্ষার অবসান

আমরা ইস্কুলে তখন ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের এক ক্লাস নীচে বাংলা পড়িতেছি। বাড়িতে আমরা সে-ক্লাসের বাংলা পাঠ্য ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। বাড়িতে আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা শেষ করিয়াছি, মেঘনাদবধও পড়া হইয়া গিয়াছে। পদার্থবিদ্যা পড়িয়াছিলাম কিন্তু পদার্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল পুঁথির পড়া— বিদ্যাও তদনুরূপ হইয়াছিল। সে-সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। আমার তো মনে হয়, নষ্ট হওয়ার চেয়ে বেশি ; কারণ, কিছু না করিয়া যে-সময় নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে-সময়টা নষ্ট করা যায়। মেঘনাদবধকাব্যটিও আমাদের পক্ষে আরামের জিনিস ছিল না। যে-জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার মতো হয়— তরবারির তো অমর্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে। কাব্য-জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।

এই সময়ে আমাদের নর্মাল স্কুলের পালা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কোনো-একজন শিক্ষক কিশোরীমোহন মিত্রের রচিত আমার পিতামহের[৩] এক ইংরেজি জীবনী[৪] পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আমার সহপাঠী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ সাহসে ভর করিয়া পিতৃদেবের নিকট হইতে সেই বইখানি চাহিতে গিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সর্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে। পরদিন সকালে যখন যথানিয়মে দক্ষিণের বারান্দায় টেবিল পাতিয়া দেয়ালে কালো বোর্ড ঝুলাইয়া নীলকমলবাবুর[৫] কাছে পড়িতে বসিয়াছি, এমন সময় পিতার তেতালার ঘরে আমাদের তিনজনের ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, "আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই।" খুশিতে আমাদের মন নাচিতে লাগিল।

১ আশ্বিন ১২৯১

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত। দ্র ব্রহ্মসংগীত

৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)

৪ Memoir of Dwarkanath Tagore by Kissory Chand Mittra (1870)

৫ দ্র পৃ ৪২৪

তখনো নীচে বসিয়া আছেন আমাদের নীলকমল পণ্ডিতমহাশয় ; বাংলা জ্যামিতির বইখানা তখনো খোলা এবং মেঘনাদবধ কাব্যখানা বোধ করি পুনরাবৃত্তির সংকল্প চলিতেছে। কিন্তু মৃত্যুকালে পরিপূর্ণ ঘরকন্নার বিচিত্র আয়োজন মানুষের কাছে যেমন মিথ্যা প্রতিভাত হয়, আমাদের কাছেও পণ্ডিতমশায় হইতে আরম্ভ করিয়া আর ঐ বোর্ডে টাঙাইবার পেরেকটা পর্যন্ত তেমনি একমুহূর্তে মায়ামরীচিকার মতো শূন্য হইয়া গিয়াছে। কী রকম করিয়া যথোচিত গাম্ভীর্য রাখিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে আমাদের নিষ্কৃতির খবরটা দিব, সেই এক মুশকিল হইল। সংযতভাবেই সংবাদটা জানাইলাম। দেয়ালে-টাঙানো কালো বোর্ডের উপরে জ্যামিতির বিচিত্র রেখাগুলা আমাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল ; যে-মেঘনাদবধের প্রত্যেক অক্ষরটিই আমাদের কাছে অমিত্র ছিল সে আজ এতই নিরীহভাবে টেবিলের উপর চিত হইয়া পড়িয়া রহিল যে, তাহাকে আজ মিত্র বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব ছিল না।

বিদায় লইবার সময় পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "কর্তব্যের অনুরোধে তোমাদের প্রতি অনেকসময় অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, সে কথা মনে রাখিয়ো না। তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।"

মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা-জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে— তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে— মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তার পরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে-পাক-করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলাধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারি দিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমি[১] নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভরতি হইলাম। ইহাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল। মনে হইল, আমরা অনেকখানি বড়ো হইয়াছি— অন্তত স্বাধীনতার প্রথম তলাটাতে উঠিয়াছি। বস্তুত, এ বিদ্যালয়ে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম সে কেবলমাত্র ঐ স্বাধীনতার দিকে। সেখানে কী-যে পড়িতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না, পড়াশুনা করিবার কোনো চেষ্টাই করিতাম না— না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ করিত না। এখানকার ছেলেরা ছিল দুর্বৃত্ত কিন্তু ঘৃণ্য ছিল না, সেইটে অনুভব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম। তাহারা হাতের তেলোয় উলটা করিয়া ass লিখিয়া 'হেলো' বলিয়া যেন আদর করিয়া পিঠে চাপড় মারিত, তাহাতে জনসমাজে অবজ্ঞাভাজন উক্ত চতুষ্পদের নামাক্ষরটি পিঠের কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত ; হয়তো-বা হঠাৎ চলিতে চলিতে মাথার উপরে খানিকটা কলা থেঁতলাইয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইত, ঠিকানা পাওয়া যাইত না ; কখনো-বা ধাঁ করিয়া মারিয়া অত্যন্ত নিরীহ ভালোমানুষটির মতো অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিত, দেখিয়া পরম সাধু বলিয়া ভ্রম হইত। এ-সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে, মনে ছাপ দেয় না— এ সমস্তই উৎপাতমাত্র, অপমান নহে। তাই আমার মনে হইল, এ যেন পাঁকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম— তাহাতে পা কাটিয়া যায় সেও ভালো, কিন্তু মলিনতা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। এই বিদ্যালয়ে আমার মতো ছেলের একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, আমরা যে লেখাপড়া করিয়া উন্নতিলাভ করিব সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারও মনে ছিল না। ছোটো

১ "ডিক্রুজ সাহেব [DeCruz] ছিলেন ইস্কুলের মালিক।" —'মুন্‌শী', গল্পসল্প

ইস্কুল, আয় অল্প, ইস্কুলের অধ্যক্ষ[১] আমাদের একটি সদ্‌গুণে মুগ্ধ ছিলেন— আমরা মাসে মাসে নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিতাম। এইজন্য ল্যাটিন ব্যাকরণ আমাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে নাই এবং পাঠচর্চার গুরুতর ত্রুটিতেও আমাদের পৃষ্ঠদেশ অনাহত ছিল। বোধ করি বিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এ-সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন— আমাদের প্রতি মমতাই তাহার কারণ নহে।

এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো— ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত— অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।

পলায়নের একটি সহায় পাইয়াছিলাম। দাদারা একজনের কাছে ফারসি পড়িতেন— তাঁহাকে সকলে মুনশি[২] বলিত— নামটা কী ভুলিয়াছি। লোকটি প্রৌঢ়— অস্থিচর্মসার। তাঁহার কঙ্কালটাকে যেন একখানা কালো মোমজামা দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে রস নাই, চর্বি নাই। ফারসি হয়তো তিনি ভালোই জানিতেন, এবং ইংরেজিও তাঁর চলনসই-রকম জানা ছিল, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে যশোলাভ করিবার চেষ্টা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লাঠিখেলায় তাঁহার যেমন আশ্চর্য নৈপুণ্য সংগীতবিদ্যায় সেইরূপ অসামান্য পারদর্শিতা। আমাদের উঠানে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া তিনি নানা অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাঠি খেলিতেন— নিজের ছায়া ছিল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। বলা বাহুল্য, তাঁহার ছায়া কোনোদিন তাঁহার সঙ্গে জিতিতে পারিত না— এবং হুহুংকারে তাহার উপরে বাড়ি মারিয়া যখন তিনি জয়গর্বে ঈষৎ হাস্য করিতেন তখন ম্লান হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে নীরবে পড়িয়া থাকিত। তাঁহার নাকী বেসুরের গান প্রেতলোকের রাগিণীর মতো শুনাইত— তাহা প্রলাপে বিলাপে মিশ্রিত একটা বিভীষিকা ছিল। আমাদের গায়ক বিষ্ণু মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেন, "মুনশিজি, আপনি আমার রুটি মারিলেন।"— কোনো উত্তর না দিয়া তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া হাসিতেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, মুনশিকে খুশি করা শক্ত ছিল না। আমরা তাঁহাকে ধরিলেই, তিনি আমাদের ছুটির প্রয়োজন জানাইয়া ইস্কুলের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া দিতেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এরূপ পত্র লইয়া অধিক বিচারবিতর্ক করিতেন না— কারণ, তাঁহার নিশ্চয় জানা ছিল যে আমরা ইস্কুলে যাই বা না যাই, তাহাতে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ঘটিবে না।

এখন, আমার নিজের একটি স্কুল[৩] আছে এবং সেখানে ছাত্রেরা নানাপ্রকার অপরাধ করিয়া থাকে— কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম। যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় অসহিষ্ণু হন ও তাহাদিগকে সদ্যই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র-অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।

অমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়োদের মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে ছোটো ছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে— সে জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেননা সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে, বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ— সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এইজন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে।

১ ডিক্রুজ সাহেব

২ দ্র 'মুন্‌শী', গল্পসল্প

৩ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত

জাত বাঁচাইবার জন্য বাঙালি ছাত্রদের একটি স্বতন্ত্র জলখাবারের ঘর ছিল। এই ঘরে দুই-একটি ছাত্রের সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল। তাহাদের সকলেই আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। তাহাদের মধ্যে একজন কাফি রাগিণীটা খুব ভালোবাসিত এবং তাহার চেয়ে ভালোবাসিত শ্বশুরবাড়ির কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তিকে— সেইজন্য সে ঐ রাগিণীটা প্রায়ই আলাপ করিত এবং তাহার অন্য আলাপটারও বিরাম ছিল না।

আর-একটি ছাত্রসম্বন্ধে[১] কিছু বিস্তার করিয়া বলা চলিবে। তাহার বিশেষত্ব এই যে, ম্যাজিকের শখ তাহার অত্যন্ত বেশি। এমন-কি, ম্যাজিক সম্বন্ধে একখানি চটি বই বাহির করিয়া সে আপনাকে প্রোফেসর উপাধি দিয়া প্রচার করিয়াছিল। ছাপার বইয়ে নাম বাহির করিয়াছে, এমন ছাত্রকে ইতিপূর্বে আর-কখনো দেখি নাই। এজন্য অন্তত ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল। কারণ, ছাপা অক্ষরের খাড়া লাইনের মধ্যে কোনোরূপ মিথ্যা চালানো যায়, ইহা আমি মনেই করিতে পারিতাম না। এ-পর্যন্ত ছাপার অক্ষর আমাদের উপর গুরুমশায়গিরি করিয়া আসিয়াছে, এইজন্য তাহার প্রতি আমার বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। যে-কালি মোছে না, সেই কালিতে নিজের রচনা লেখা— এ কি কম কথা! কোথাও তার আড়াল নাই, কিছুই তার গোপন করিবার জো নাই— জগতের সম্মুখে সার বাঁধিয়া সিধা দাঁড়াইয়া তাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হইবে— পলায়নের রাস্তা একেবারেই বন্ধ, এতবড়ো অবিচলিত আত্মবিশ্বাসকে বিশ্বাস না করাই যে কঠিন। বেশ মনে আছে, ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা অথবা আর-কোথাও হইতে একবার নিজের নামের দুই-একটা ছাপার অক্ষর পাইয়াছিলাম। তাহাতে কালি মাখাইয়া কাগজের উপর টিপিয়া ধরিতেই যখন ছাপ পড়িতে লাগিল, তখন সেটাকে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে হইল।

সেই সহপাঠী গ্রন্থকার বন্ধুকে রোজ আমরা গাড়ি করিয়া ইস্কুলে লইয়া যাইতাম। এই উপলক্ষে সর্বদাই আমাদের বাড়িতে তাহার যাওয়া-আসা ঘটিতে লাগিল। নাটক-অভিনয় সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাহার সাহায্যে আমাদের কুস্তির আখড়ায় একবার আমরা গোটাকতক বাঁখারি পুঁতিয়া, তাহার উপর কাগজ মারিয়া, নানা রঙের চিত্র আঁকিয়া একটা স্টেজ খাড়া করিয়াছিলাম।[২] বোধ করি উপরের নিষেধে সে-স্টেজে অভিনয় ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু বিনা স্টেজেই একদা একটা প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল। তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে ভ্রান্তিবিলাস। যিনি সেই প্রহসনের রচনাকর্তা পাঠকেরা তাঁহার পরিচয় পূর্বে কিছু কিছু পাইয়াছেন। তিনি আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। তাঁহার ইদানীন্তন শান্ত সৌম্য মূর্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিবেন না, বাল্যকালে কৌতুকচ্ছলে তিনি সকলপ্রকার অঘটন ঘটাইবার কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন।

যে-সময়ের কথা লিখিতেছিলাম ঘটনাটি তাহার পরবর্তী কালের। তখন আমার বয়স বোধ করি বারো-তেরো হইবে। আমাদের সেই বন্ধু সর্বদা দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এমন সকল আশ্চর্য কথা বলিত, যাহা শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম— পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমার এত ঔৎসুক্য জন্মিত যে আমাকে অধীর করিয়া তুলিত। কিন্তু দ্রব্যগুলি প্রায়ই এমন দুর্লভ ছিল যে, সিন্দবাদ নাবিকের অনুসরণ না করিলে তাহা পাইবার কোনো উপায় ছিল না। একবার, নিশ্চয়ই অসতর্কতাবশত, প্রোফেসর কোনো-একটি অসাধ্যসাধনের অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা বলিয়া ফেলাতে আমি সেটাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলাম। মনসাসিজের আঠা একুশবার বীজের গায়ে মাখাইয়া শুকাইয়া লইলেই যে সে-বীজ হইতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছ বাহির হইয়া ফল ধরিতে পারে, এ কথা কে জানিত। কিন্তু যে-প্রোফেসর ছাপার বই বাহির করিয়াছে তাহার কথা একেবারে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আমরা আমাদের বাগানের মালীকে দিয়া কিছুদিন ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মনসাসিজের আঠা সংগ্রহ করিলাম এবং একটা আমের আঁটির উপর পরীক্ষা করিবার জন্য রবিবার ছুটির দিনে আমাদের নিভৃত রহস্যনিকেতনে তেতালার ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

১ দ্র 'ম্যাজিসিয়ান', গল্পসল্প (হ. চ. হ.— হরিশ্চন্দ্র হালদার)

২ দ্র 'মুক্তকুন্তলা', গল্পসল্প

আমি তো একমনে আঁটিতে আঠা লাগাইয়া কেবলই রৌদ্রে শুকাইতে লাগিলাম— তাহাতে যে কিরূপ ফল ধরিয়াছিল, নিশ্চয়ই জানি, বয়স্ক পাঠকেরা সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু সত্য তেতালার কোন্-একটা কোণে এক ঘন্টার মধ্যেই ডালপালা-সমেত একটা অদ্ভুত মায়াতরু যে জাগাইয়া তুলিয়াছে, আমি তাহার কোনো খবরই জানিতাম না। তাহার ফলও বড়ো বিচিত্র হইল।

এই ঘটনার পর হইতে প্রোফেসর যে আমার সংস্রব সসংকোচে পরিহার করিয়া চলিতেছে, তাহা আমি অনেকদিন লক্ষ্যই করি নাই। গাড়িতে সে আমার পাশে আর বসে না, সর্বত্রই সে আমার নিকট হইতে কিছু যেন দূরে দূরে চলে।

একদিন হঠাৎ আমাদের পড়িবার ঘরে মধ্যাহ্নে সে প্রস্তাব করিল, "এসো, এই বেঞ্চের উপর হইতে লাফাইয়া দেখা যাক, কাহার কিরূপ লাফাইবার প্রণালী।" আমি ভাবিলাম, সৃষ্টির অনেক রহস্যই প্রোফেসরের বিদিত, বোধ করি লাফানো সম্বন্ধেও কোনো-একটা গূঢ়তত্ত্ব তাহার জানা আছে। সকলেই লাফাইল, আমিও লাফাইলাম। প্রোফেসর একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। অনেক অনুনয়েও তাহার কাছ হইতে ইহা অপেক্ষা স্ফুটতর কোনো বাণী বাহির করা গেল না।

একদিন জাদুকর বলিল, "কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চায়, একবার তাহাদের বাড়ি যাইতে হইবে।" অভিভাবকেরা আপত্তির কারণ কিছুই দেখিলেন না, আমরাও সেখানে গেলাম।

কৌতূহলীর দলে ঘর ভরতি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি দুই-একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, কণ্ঠস্বরও সিংহগর্জনের মতো সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল— তাইতো, ভারি মিষ্ট গলা!

তাহার পরে যখন খাইতে গেলাম তখনো সকলে ঘিরিয়া বসিয়া আহারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তৎপূর্বে বাহিরের লোকের সঙ্গে নিতান্ত অল্পই মিশিয়াছি, সুতরাং স্বভাবটা সলজ্জ ছিল। তাহা ছাড়া পূর্বেই জানাইয়াছি, আমাদের ঈশ্বর-চাকরের লোলুপদৃষ্টির সম্মুখে খাইতে খাইতে, অল্প খাওয়াই আমার চিরকালের মতো অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সেদিন আমার আহারে সংকোচ দেখিয়া দর্শকেরা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেদিন সকলে নিমন্ত্রিত বালকের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহা যদি স্থায়ী এবং ব্যাপক হইত, তাহা হইলে বাংলাদেশে প্রাণিবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারিত।

ইহার অনতিকাল পরে পঞ্চমাঙ্কে জাদুকরের নিকট হইতে দুই-একখানা অদ্ভুত পত্র পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। ইহার পরে যবনিকাপতন।

সত্যর কাছে শোনা গেল, একদিন আমের আঁটির মধ্যে জাদু প্রয়োগ করিবার সময় সে প্রোফেসরকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য আমার অভিভাবকেরা আমাকে বালকবেশে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছিলেন কিন্তু ওটা আমার ছদ্মবেশ। যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কৌতূহলী তাঁহাদিগকে এ কথা বলিয়া রাখা উচিত, লাফানোর পরীক্ষায় আমি বাঁ পা আগে বাড়াইয়াছিলাম— সেই পদক্ষেপটা যে আমার কত বড়ো ভুল হইয়াছিল, তাহা সেদিন জানিতে পারি নাই।

পিতৃদেব

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা[১] প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন ; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন ; তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবি চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

যে-সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিতসিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি— ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জুনের প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা— ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম। বউঠাকুরানীর[১] ঘরে একটা কাচাবরণে-ঢাকা খেলার জাহাজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রঙকরা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন-বাদ্যের সঙ্গে দুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই আশ্চর্য সামগ্রীটি বউঠাকুরানীর কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া, প্রায় মাঝে মাঝে এই পাঞ্জাবিকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা-কিছু বিদেশের, যাহা-কিছু দূরদেশের, তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদি তাহার ঘুন্টি-দেওয়া য়িহুদি পোশাক পরিয়া যখন আতর বেচিতে আসিত, আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত, এবং ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা-পরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রত রহস্যের সামগ্রী ছিল।

যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেন্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান -কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন[২] পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্-একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুসীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে, তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, "রাসিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো।" মাতার উদ্‌বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির[৩] শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন— ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাসিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাসিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না— কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য মহানন্দের দফতরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েকদিন মহানন্দ খসড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাসুলের সংগতি তো নাই। মনে ধারণা ছিল, মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই হইবে না— চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবে। বলা বাহুল্য, মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং এ-চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্যন্ত পৌঁছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প-কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন।

১ কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী
২ ইং মে ১৮৬৮ - ডিসেম্বর ১৮৭০
৩ দ্র ঘরোয়া, পৃ ২

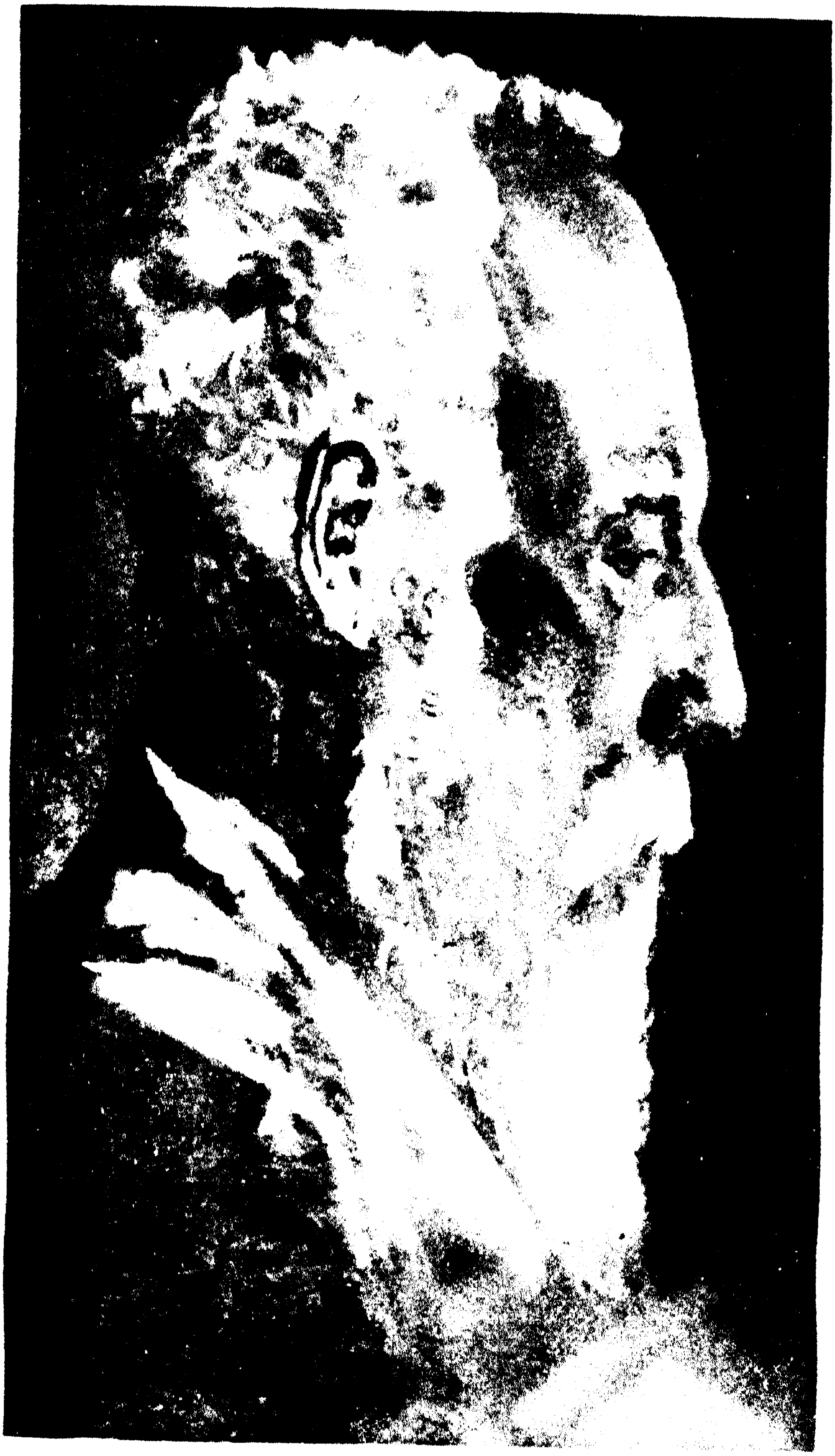

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক অঙ্কিত প্রতিকৃতি

সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিনজনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে[১] লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু[২] প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে-সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল।[৩] মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল— বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নীচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ্‌ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম— তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। বস্তুত, গুরুগৃহে ঋষিবালকদের যে-ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা আমাদের ঠিক সে-ভাবে দিন কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মতো ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে; তাহারা খুব যে বেশি ভালোমানুষ ছিল, তাহার প্রমাণ নাই। শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ-বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন, এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই— কারণ, শিশুচরিত্র নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মতো প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা— বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি; যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিসটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব-একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না— তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না তখন প্রচুর-ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো-আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই— নিতান্ত আবছায়া-গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম— পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই কিন্তু আমার পক্ষে সে-পড়া ততবড়ো শূন্য হয় নাই। একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায়

১ আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য (পরে, বেদান্তবাগীশ)

২ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু

৩ বাংলা ২৫ মাঘ, ১২৭৯

বোটে-বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'— এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত— ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত— সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'— এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরো-একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ—

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর-কিছুই বুঝি নাই— কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিতদেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিতমহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে-ময়ূরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে, এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।

নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনোই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়— এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন, যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা, এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে, তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়— সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুঃখের দিন আসে। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না-বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাটবাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।

তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহা চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে— আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো-একটা

কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।

হিমালয়যাত্রা

পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল, ইস্কুল যাইব কী করিয়া। গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাক্, ব্রাহ্মণের প্রতি তো তাহাদের ভক্তি নাই। অতএব, নেড়ামাথার উপরে তাহারা আর-কোনো জিনিস বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।

এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতলার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। 'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়।

বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি-অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়ামাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, "মাথায় পরো।" পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন-তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্তব্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্পস্বল্প এদিক-ওদিক হওয়াকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সকলকেই অত্যন্ত ভীত ও সতর্ক থাকিতে হইত। উনিশ-বিশ হইলে হয়তো কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থার যে লেশমাত্র নড়চড় ঘটে সেইখানে তিনি আঘাত পাইতেন। তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে, সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার পরে সে-কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলে নানা লোকের কাছে তাহার বিবরণ শুনিতেন। প্রত্যেকের বর্ণনা মিলাইয়া লইয়া এবং মনের মধ্যে জোড়া দিয়া ঘটনাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। এ-সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতিগত ধর্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয়যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনো কারণে কোনো বাধাই দিতেন না, যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।

যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকিবার কথা। কিছুকাল পূর্বে পিতামাতার[১] সঙ্গে সত্য[২]

১ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৮৮৩) ও দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)

২ ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৯-১৯৩৩); ইনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসংগ্রহ 'কাব্যগ্রন্থাবলী' (১৩০৩) প্রকাশ করেন।

সেখানে গিয়াছিল। তাহার কাছে ভ্রমণবৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছিলাম, উনবিংশ শতাব্দীর কোনো ভদ্রঘরের শিশু তাহা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু আমাদের সেকালে সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখাটা যে কোথায় তাহা ভালো করিয়া চিনিয়া রাখিতে শিখি নাই। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস এ-সম্বন্ধে আমাদের কোনো সাহায্য করেন নাই। রঙকরা ছেলেদের বই এবং ছবি-দেওয়া ছেলেদের কাগজ সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে আমাদিগকে আগেভাগে সাবধান করিয়া দেয় নাই। জগতে যে একটা কড়া নিয়মের উপসর্গ আছে সেটা আমাদিগকে নিজে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে।

সত্য বলিয়াছিল, বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ংকর সংকট— পা ফসকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তার পর, গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। কিন্তু গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল, এখনো হয়তো গাড়ি-ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল; তরুশ্রেণীর সবুজ নীল পাড়-দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম।[১] পালকিতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে, এই আমার ইচ্ছা— সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।

ভোরে উঠিয়া বুক দুরুদুরু করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ এই ছিল যে, কুঠিবাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনো প্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্রবৃষ্টি কিছুই লাগে না। এই অদ্ভুত রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন না যে, আজ পর্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমরা শহরের ছেলে, কোনোকালে ধানের খেত দেখি নাই এবং রাখালবালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে আঁকিয়াছিলাম। সত্যর কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারি দিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখালবালকদের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধানখেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাওয়া, এই খেলার একটা প্রধান অঙ্গ।

ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে চাহিলাম। হায় রে, মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের খেত। রাখালবালক হয়তো-বা মাঠের কোথাও ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখালবালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না— যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধসঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া, প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার

১ বাংলা ফাল্গুন, ১২৭৯

এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!" আমি বলিতাম, "এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।" তিনি বলিতেন, "সে হইলে তো বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।"

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই অসমাপ্ত গর্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটি উচ্চ স্তূপ তৈরি হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় এই রাশীকৃত পাথরের সঞ্চয় সঙ্গে করিয়া আনিতে পারি নাই বলিয়া, মনে বড়োই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। বোঝামাত্রেরই যে বহনের দায় ও মাসুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না; এবং সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়াই যে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধরক্ষা করিতে পারিব এমন কোনো দাবি নাই, সে কথা আজও বুঝিতে ঠেকে। আমার সেদিনকার একান্তমনের প্রার্থনায় বিধাতা যদি বর দিতেন যে 'এই পাথরের বোঝা তুমি চিরদিন বহন করিবে', তাহা হইলে এ কথাটা লইয়া আজ এমন করিয়া হাসিতে পারিতাম না।

খোয়াইয়ের মধ্যে একজায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোটো ছোটো মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম, "ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।" তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন "তাই তো, সে তো বেশ হইবে" এবং আবিষ্কারকর্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতেই জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি যখন-তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো-একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন একটা দুরবীনের উলটা দিকের দেশ। নদীপাহাড়গুলোও যেমন ছোটো ছোটো, মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো-জাম বুনো-খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটেখাটো। আমার আবিষ্কৃত ছোটো নদীটির মাছগুলিও তেমনি, আর আবিষ্কারকর্তাটির তো কথাই নাই।

পিতা বোধ করি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।" তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবলবেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

বড়ো বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইল সেইদিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক স্ট্রীটে থাকিতেন।[১] প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তিনি তখন নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয়ব্যয়ের বিবরণ[২] তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। প্রথমত মোটা অঙ্কগুলা তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে তাহার যোগবিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোনোদিন অসংগতি অনুভব

১ ৫২ নং বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি ছিলেন।

২ আদি ব্রাহ্ম সমাজের আয়ব্যয়ের বিবরণ।

করিতেন তবে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলা শুনাইয়া যাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে, হিসাবে যেখানে কোনো দুর্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্য চাপিয়া গিয়াছি, কিন্তু কখনো তাহা চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্তপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেইখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ঐ দুটা দিন বিশেষ উদ্‌বেগের দিন ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল— তা হিসাবের অঙ্কই হোক বা প্রাকৃতিক দৃশ্যই হোক বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেইজন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার 'পরে এইসকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়'[1] বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো-একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট-পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর-একজন আসিল— উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উসখুস্ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয় বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্‌টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে।" পিতা কহিলেন, "না।" তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল, "ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।" আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে-টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল— টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা একসময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন—

১ তু পরে-প্রকাশিত রুদ্রচণ্ড নাটিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী-অ ১

বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

একবার পিতা গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাসায় আনাইয়া তাহার কাছ হইতে ভজনাগান শুনিয়াছিলেন। বোধ করি তাহাকে যে-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম দিলেও সে খুশি হইত। ইহার ফল হইল এই, আমাদের বাসায় গান শোনাইবার উমেদারের আমদানি এত বেশি হইতে লাগিল যে, তাহাদের পথরোধের জন্য শক্ত বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। বাড়িতে সুবিধা না পাইয়া তাহারা সরকারি রাস্তায় আসিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রতিদিন সকালবেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। এই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ সম্মুখে তানপুরা-ঘাড়ে গায়কের আবির্ভাব হইত। যে-পাখির কাছে শিকারী অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারও ঘাড়ের উপর বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে, রাস্তার সুদূর কোনো-একটা কোণে তানপুরা-যন্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা হইত। কিন্তু শিকার এমনি সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের তানপুরার আওয়াজ নিতান্ত ফাঁকা আওয়াজের কাজ করিত— তাহা আমাদিগকে দূরে ভাগাইয়া দিত, পাড়িয়া ফেলিতে পারিত না।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে— আমি বেহাগে গান গাহিতেছি[১]—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব-অন্ধকারে—

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন— সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে[২] সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান— 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার[৩] ডাক পড়িল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parly's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক-এক

১ গানটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত (মাঘ ১২৭৫)। দ্র ব্রহ্মসংগীত

২ বাংলা মাঘ ১২৯৩

৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর-কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ[১] পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃতশিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলটপালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রক্‌টরের[২] লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।[৩]

তাঁহার নিজের পড়ার জন্য তিনি যে-বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশ-বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের রোম।[৪] দেখিয়া মনে হইত না ইহার মধ্যে কিছুমাত্র রস আছে। আমি মনে ভাবিতাম, আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিস পড়িতে হয়, কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই— কিন্তু ইনি তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ কেন।

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্বতে উপত্যকা-অধিত্যকাদেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধ রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না— পাছে কিছু-একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া, শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া, ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্‌কুল্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ-সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন। এইখানে থাকিলেই তো হয়।

নূতন পরিচয়ের ঐ একটা মস্ত সুবিধা। মন তখনো জানিতে পারে না যে এমন আরো অনেক আছে। তাহা জানিতে পারিলেই হিসাবি মন মনোযোগের খরচটা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। যখন প্রত্যেক জিনিসটাকেই একান্ত দুর্লভ বলিয়া মনে করে তখনই মন আপনার কৃপণতা ঘুচাইয়া পূর্ণ মূল্য দেয়। তাই আমি এক-একদিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নিজেকে বিদেশী বলিয়া কল্পনা করি। তখনই বুঝিতে পারি, দেখিবার জিনিস ঢের আছে, কেবল মন দিবার মূল্য দিই না বলিয়া দেখিতে পাই না। এই কারণেই দেখিবার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য লোকে বিদেশে যায়।

আমার কাছে পিতা তাঁহার ছোটো ক্যাশবাক্সটি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি, সে কথা মনে করিবার হেতু ছিল না। পথখরচের জন্য তাহাতে অনেক টাকাই থাকিত। কিশোরী

১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর -প্রণীত

২ Richd. A. Proctor

৩ "রবীন্দ্র এখানে ভালো আছে এবং আমার নিকটে সংস্কৃত ও ইংরাজি অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্মও পড়াইয়া থাকি।"— দেবেন্দ্রনাথের পত্র, বক্রোটা, ২৫ এপ্রিল ১৮৭৩

৪ The History of the Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gibbon (1838 ed.)

'পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায়। আমি বেহাগে গান গাহিতেছি।'

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

চাটুর্জের[1] হাতে দিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কিন্তু আমার উপর বিশেষ ভার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া একদিন বাক্সটি তাঁহার হাতে না দিয়া ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন-কি, পথের যে-অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

এখানেও কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ! কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না! বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কতরাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।

সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন। অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়ে-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত।[2] তাহার পর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না ; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহশীতল জলে স্নান করিয়াছেন, আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

দুধ খাওয়া আমার আর-এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপানশক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কি না নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু পূর্বেই জানাইয়াছি কী কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উলটাদিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত। ভৃত্যদের শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতাবশত বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিয়া দিত।

১ কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথের অনুচর

২ "ফিরিয়া আসিয়া পিতার কাছে বেঞ্জমিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী পড়িতাম।"— পাণ্ডুলিপি

মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর-একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের শোধ লইত। আমি ঘুমে বার বার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।

এক-একদিন দুপুরবেলায় লাঠিহাতে একলা এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম ; পিতা তাহাতে কখনো উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধে কাজ অনেক করিয়াছি— তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না— তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায় কিন্তু কৃত্রিমশাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

আমার যৌবনারম্ভে এক সময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল, আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল। কিন্তু আমার পিতাকে যখনই বলিলাম, তিনি বলিলেন, "এ তো খুব ভালো কথা ; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে।" এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিলেন। আমার যে ইহাতে কোনো কষ্ট বা বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

আর-একবার যখন[১] আমি আদিসমাজের সেক্রেটারিপদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, "আদিব্রাহ্মসমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যবর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।" তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, "বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিয়ো।" যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম, প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙিয়া সে-জায়গায় কিছু গড়িব, এমন উপকরণ কই। যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্‌বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।

পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারও চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর-কাহারও কাছ হইতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

বড়দাদা মেজদাদার[২] কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কী করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে, এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই সমস্ত কায়দাকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

আমার বেশ মনে আছে, মেজদাদার কোনো চিঠিতে ছিল তিনি 'কর্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু' হইয়া খাটিয়া মরিতেছেন— সেই স্থানের কয়েকটি বাক্য লইয়া পিতা আমাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি

১ প্রথম নিয়োগ, আশ্বিন ১২৯৬

২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)

যেরূপ অর্থ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই— তিনি অন্য অর্থ করিলেন। কিন্তু আমার এমন ধৃষ্টতা ছিল যে সে-অর্থ আমি স্বীকার করিতে চাহিলাম না। তাহা লইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। আর-কেহ হইলে নিশ্চয় আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালে বড়োমানুষির অনেক কথা শুনিতাম। ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তখনকার দিনের শৌখিন লোকেরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত— এই সব গল্প তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। গয়লা দুধে জল দিত বলিয়া দুধ পরিদর্শনের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল, পুনশ্চ তাহার কার্যপরিদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। এইরূপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল দুধের রঙও ততই ঘোলা এবং ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছনীল হইয়া উঠিতে লাগিল— এবং কৈফিয়ত দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক যদি আরো বাড়ানো হয় তবে অগত্যা দুধের মধ্যে শামুক ঝিনুক ও চিংড়িমাছের প্রাদুর্ভাব হইবে। এই গল্প তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিয়া খুব আমোদ পাইয়াছি।

এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিলে পর, পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুর্জের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।[১]

প্রত্যাবর্তন

পূর্বে যে-শাসনের মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে। যে-লোকটা চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না; দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম।

ফিরিবার সময়ে রেলের পথেই আমার ভাগ্যে আদর শুরু হইল। মাথায় এক জরির টুপি পরিয়া আমি একলা বালক ভ্রমণ করিতেছিলাম— সঙ্গে কেবল একজন ভৃত্য ছিল— স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে শরীর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পথে যেখানে যত সাহেব-মেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।

বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে— এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আর আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ[২] ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।

ছোটোবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো-বাতাসে তাহার যেমন দরকার এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলো বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষভাবে অনুভব করে না— মেয়েদের যত্ন সম্বন্ধেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই না ভাবাটাই স্বাভাবিক। বরঞ্চ শিশুরা এইপ্রকার যত্নের জাল হইতে কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্যই ছটফট করে। কিন্তু যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়। আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপর্যাপ্ত স্নেহ

১ "রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি"— রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের পত্র, বক্রোটা, ১৪ আষাঢ় ১৭৯৫ শক [১৮৭৩]

২ কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী (১৮৫৯-৮৪), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী

পাইয়া সে জিনিসটাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। শিশুবয়সে অন্তঃপুর যখন আমাদের কাছে দূরে থাকিত তখন মনে মনে সেইখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলাম। যে-জায়গাটাকে ভাষায় বলিয়া থাকে অবরোধ সেইখানেই সকল বন্ধনের অবসান দেখিতাম। মনে করিতাম, ওখানে ইস্কুল নাই, মাস্টার নাই, জোর করিয়া কেহ কাহাকেও কিছুতে প্রবৃত্ত করায় না— ওখানকার নিভৃত অবকাশ অত্যন্ত রহস্যময়— ওখানে কারও কাছে সমস্তদিনের সময়ের হিসাবনিকাশ করিতে হয় না, খেলাধুলা সমস্ত আপন ইচ্ছামত। বিশেষত দেখিতাম, ছোড়দিদি[1] আমাদের সঙ্গে সেই একই নীলকমল পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে পড়িতেন কিন্তু পড়া করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে যেমন বিধান, না করিলেও সেইরূপ। দশটার সময় আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়া ইস্কুল যাইবার জন্য ভালোমানুষের মতো প্রস্তুত হইতাম— তিনি বেণী দোলাইয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে বাড়ির ভিতর দিকে চলিয়া যাইতেন দেখিয়া মনটা বিকল হইত। তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ[2] আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত। কিন্তু কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন, "এখানে তোমরা কী করতে এসেছ, যাও বাইরে যাও।"— তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দু'ই মনে বড়ো বাজিত। তার পরে আবার তাঁহাদের আলমারিতে সার্শির পাল্লার মধ্য দিয়া সাজানো দেখিতে পাইতাম, কাঁচের এবং চীনামাটির কত দুর্লভ সামগ্রী— তাহার কত রঙ এবং কত সজ্জা! আমরা কোনোদিন তাহা স্পর্শ করিবার যোগ্য ছিলাম না— কখনো তাহা চাহিতেও সাহস করিতাম না। কিন্তু এইসকল দুষ্প্রাপ্য সুন্দর জিনিসগুলি অন্তঃপুরের দুর্লভতাকে আরো কেমন রঙিন করিয়া তুলিত।

এমনি করিয়া তো দূরে দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরে প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনই। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোরমাস্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি— খড়খড়ে-দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে— সেই বারান্দা পার হইয়া গোটাচারপাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি— বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে— বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার— সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তার পরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম— শংকরী কিংবা প্যারী কিংবা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর-মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত— সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত— দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম, দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানাপ্রকারের রেখাপাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্‌ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম— তার পরে অর্ধরাত্রে কোনো কোনো দিন আধঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতি বৃদ্ধ স্বরূপসর্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর-এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।

সেই অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত, তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়া সমেত পাইয়া যে বেশ ভালো করিয়া তাহা বহন করিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র ভ্রমণকারী বাড়ি ফিরিয়া কিছুদিন ঘরে ঘরে কেবলই ভ্রমণের গল্প বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বার বার বলিতে বলিতে কল্পনার সংঘর্ষে ক্রমেই তাহা এত অত্যন্ত ঢিলা হইতে লাগিল যে, মূল বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার

১ স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৮-১৯৩২)
২ কাদম্বরী দেবী, বিবাহ ১৩ জুলাই ১৮৬৮

খাপ খাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। হায়, সকল জিনিসের মতোই গল্পও পুরাতন হয়, ম্লান হইয়া যায়, যে গল্প বলে তাহার গৌরবের পুঁজি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। এমনি করিয়া পুরাতন গল্পের উজ্জ্বলতা যতই কমিয়া আসে ততই তাহাতে এক এক পোঁচ করিয়া নূতন রঙ লাগাইতে হয়।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসার পর ছাদের উপরে মাতার বায়ুসেবনসভায় আমিই প্রধানবক্তার পদ লাভ করিয়াছিলাম। মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন এবং যশ লাভ করাটাও অত্যন্ত দুরূহ নহে।

নর্মাল স্কুলে পড়িবার সময় যেদিন কোনো-একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল সূর্য পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দলক্ষগুণে বড়ো সেদিন মাতার সভায় এই সত্যটাকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছিল, যাহাকে দেখিতে ছোটো সেও হয়তো নিতান্ত কম বড়ো নয়। আমাদের পাঠ্য ব্যাকরণে কাব্যালংকার অংশে যে-সকল কবিতা উদাহৃত ছিল তাহাই মুখস্থ করিয়া মাকে বিস্মিত করিতাম। তাহার একটা আজও মনে আছে।—

ওরে আমার মাছি!
আহা কী নম্রতা ধর, এসে হাত জোড় কর,
কিন্তু কেন বারি কর তীক্ষ্ণ শুঁড়গাছি!

সম্প্রতি প্রক্টরের গ্রন্থ হইতে গ্রহতারা সম্বন্ধে অল্প যে-একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাও সেই দক্ষিণবায়ুবীজিত সান্ধ্যসমিতির মধ্যে বিবৃত করিতে লাগিলাম।

আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুর্জে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত, "আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম, সে আর কী বলিব।" শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত— পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরের গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম, 'ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অন্ত হল আমার কমল-আঁখি', 'রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়', 'কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে', 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে'— এই গানগুলিতে[১] আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।

পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়, আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।"

হায়, একে ঋজুপাঠের সামান্য উদ্‌ধৃত অংশ,[২] তাহার মধ্যে আবার আমার পড়া অতি অল্পই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝে মাঝে অনেকখানি অংশ বিস্মৃতিবশত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে-মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাকে 'ভুলিয়া গেছি' বলিবার মতো শক্তি আমার ছিল না। সুতরাং ঋজুপাঠ হইতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল। স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুক স্নেহহাস্যে মার্জনা করিয়াছেন, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন না।

মা মনে করিলেন, আমার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাই আর-সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন, "একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।" তখন মনে-মনে সমূহ বিপদ গনিয়া প্রচুর আপত্তি করিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই

১ রচয়িতা দাশরথি রায়
২ "ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ হইতে কৈকেয়ীদশরথসংবাদ"— পাণ্ডুলিপি

কহিলেন, "রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন্-না।" পড়িতেই হইল। দয়ালু মধুসূদন তাঁহার দর্পহারিত্বের একটু আভাসমাত্র দিয়া আমাকে এ-যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন। বড়দাদা বোধ হয় কোনো-একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন— বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বের চেয়ে আরো অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে শুরু করিলাম। সেন্টজেবিয়ার্সে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল,[1] সেখানেও কোনো ফল হইল না।

দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি[2] কহিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" আমি বেশ বুঝিতাম, ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারি দিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল -জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।

সেন্টজেবিয়ার্সের একটি পবিত্রস্মৃতি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান হইয়া রহিয়াছে— তাহা সেখানকার অধ্যাপকদের স্মৃতি। আমাদের সকল অধ্যাপক সমান ছিলেন না, বিশেষভাবে যে দুই-একজন আমার ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভগবদ্‌ভক্তির গম্ভীর নম্রতা আমি উপলব্ধি করি নাই। বরঞ্চ সাধারণত শিক্ষকেরা যেমন শিক্ষাদানের কল হইয়া উঠিয়া বালকদিগকে হৃদয়ের দিকে পীড়িত করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহার চেয়ে বেশি উপরে উঠিতে পারেন নাই। একে তো শিক্ষার কল একটা মস্ত কল, তাহার উপরে মানুষের হৃদয়প্রকৃতিকে শুষ্ক করিয়া পিষিয়া ফেলিবার পক্ষে ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের মতো এমন জাঁতা জগতে আর নাই। যাহারা ধর্মসাধনার সেই বাহিরের দিকেই আটকা পড়িয়াছে তাহারা যদি আবার শিক্ষকতার কলের চাকায় প্রত্যহ পাক খাইতে থাকে, তবে উপাদেয় জিনিস তৈরি হয় না— আমার শিক্ষকদের মধ্যে সেইপ্রকার দুইকলে-ছাঁটা নমুনা বোধ করি ছিল। কিন্তু তবু সেন্টজেবিয়ার্সের সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের আদর্শকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, এমন একটি স্মৃতি আমার আছে। ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার[3] সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না— বোধ করি কিছুদিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদলিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত, ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না কিন্তু আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন— অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কাপি লিখিবার সময় ছিল— আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা-তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডি পেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুই-তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সস্নেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাগোর, তোমার কি শরীর ভালো নাই।"— বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার

১ ইং ১৮৭৪ (?), বিদ্যালয়ত্যাগ ১৮৭৬ (?)

২ সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০)

৩ De Penaranda

একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম— আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

সে-সময় আর-একজন প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাকে ছাত্রেরা বিশেষ ভালোবাসিত। তাঁহার নাম ফাদার হেন্‌রি। তিনি উপরের ক্লাসে পড়াইতেন, তাঁহাকে আমি ভালো করিয়া জানিতাম না। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা আমার মনে আছে, সেটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা জানিতেন। তিনি নীরদ নামক তাঁহার ক্লাসের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার নামের ব্যুৎপত্তি কী।" নিজের সম্বন্ধে নীরদ চিরকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল— কোনোদিন নামের ব্যুৎপত্তি লইয়া সে কিছুমাত্র উদ্‌বেগ অনুভব করে নাই— সুতরাং এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অভিধানে এত বড়ো বড়ো অপরিচিত কথা থাকিতে নিজের নামটা সম্বন্ধে ঠকিয়া যাওয়া যেন নিজের গাড়ির তলে চাপা পড়ার মতো দুর্ঘটনা— নীরু তাই অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "নী ছিল রোদ, নীরদ— অর্থাৎ, যা উঠিলে রৌদ্র থাকে না তাহাই নীরদ।"

ঘরের পড়া

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব[১] পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা[২] না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হালকা হইয়াছে।

রামসর্বস্ব[৩] পণ্ডিতমশায়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর[৪] মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[৫] বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল— তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই— অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।

আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।[৬] তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভৃত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু

১ দ্র রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ, 'কুমারসম্ভব'— বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ ; অপিচ 'রূপান্তর', ১৩৭২

২ দ্র ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭। পুনর্মুদ্রিত, র-পরিচয়

৩ রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য, হেড্‌পণ্ডিত, মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন্‌

৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)

৫ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-৮৬)

৬ দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৫৫০ (সুলভ সংস্করণ ৫, পৃ ৮০৭)

বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে-বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম— যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাইবারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল[1] তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো-একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সে বই তিনি বাক্সে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরো বাড়িয়া উঠিল, আমি তাঁহাকে শাসাইলাম, "এ বই আমি পড়িবই।"

মধ্যাহ্নে তিনি গ্রাবু খেলিতেছিলেন— আঁচলে-বাঁধা চাবির গোচ্ছা তাঁর পিঠে ঝুলিতেছিল। তাসখেলায় আমার কোনোদিন মন যায় নাই, তাহা আমার কাছে বিশেষ বিরক্তিকর বোধ হইত। কিন্তু সেদিন আমার ব্যবহারে তাহা অনুমান করা কঠিন ছিল। আমি ছবির মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। কোনো-এক পক্ষে আসন্ন ছক্কাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এ কার্যে অঙ্গুলির দক্ষতা ছিল না, তাহার উপর আগ্রহেরও চাঞ্চল্য ছিল— ধরা পড়িয়া গেলাম। যাঁহার চাবি তিনি হাসিয়া পিঠ হইতে আঁচল নামাইয়া চাবি কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

এখন আমি একটা উপায় ঠাওরাইলাম। আমার এই আত্মীয়ার দোক্তা খাওয়া অভ্যাস ছিল। আমি কোথাও হইতে একটি পাত্রে পান দোক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। যেমনটি আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। পিক ফেলিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল; চাবি-সমেত আঁচল কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িল এবং অভ্যাসমত সেটা তখনই তুলিয়া তিনি পিঠের উপর ফেলিলেন। এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন— আমারও সেই দশা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ[2] বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরনের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন। এক দিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ত্ব, অন্য দিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স্‌ ম্যাগাজিন, স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

১ মার্চ ১৮৭২

২ "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ, অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা, শিল্পসাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিকপত্র"; প্রকাশ কার্তিক ১৭৭৩ শক [১৮৫১]

বাল্যকালে আর-একটি ছোটো কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু[১]। ইহার আঁবাধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণ দিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই-সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ[২] পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল-চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথার রঙিন রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল!

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন[৩] আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ[৪] সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা[৫] ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।[৬]

বাড়ির আবহাওয়া

ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনে পড়ে, খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক-একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে, দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কী হইতেছে ভালো বুঝিতাম না, কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে

১ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ -কর্তৃক প্রকাশিত মাসিকপত্র ; প্রকাশ এপ্রিল ১৮৬৩, পুনঃপ্রকাশ ফাল্গুন ১২৭৩

২ 'পৌল ভর্জ্জীনী' ; কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য -কর্তৃক "পল বর্জ্জিনিয়া গ্রন্থের ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ," প্রকাশকাল ১২৭৫-৭৬

৩ প্রকাশ এপ্রিল ১৮৭২ (বৈশাখ ১২৭৯)

৪ প্রকাশ ১৮৭৩-৭৪

৫ "আমার পূজনীয় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এই সংগ্রহের অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত খণ্ডগুলি আসিত। তাঁহাদের পড়া হইতেই আমি এগুলি জড় করিয়া আনিতাম।"— পাণ্ডুলিপি

৬ দ্র 'প্রাচীন-কাব্য সংগ্রহ', ভারতী, শ্রাবণ, ভাদ্র ১২৮৮ ; 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' ; ভারতী, কার্তিক ১২৮৮

তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝখানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না, তবু সে আমার শিশুজগৎ হইতে বহুদূরের আলো। আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রদাদা[1] তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক[2] লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসচর্চায় গণদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিক্রমোর্বশী[3] নাটকের একটি অনুবাদ অনেকদিন হইল ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি এখনো ধর্মসংগীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গাও হে তাঁহার নাম
রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম
ঝরে অবিরত ধারে—

বিখ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন সে আজ কতদিনের কথা যখন গণদাদার রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে' গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত। যুবাবয়সেই গণদাদার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। কিন্তু তাঁহার সেই সৌম্যগম্ভীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভুলিবার জো থাকে না। তাঁহার ভারি একটা প্রভাব ছিল। সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারি দিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন— তাঁহার আকর্ষণের জোরে সংসারের কিছুই যেন ভাঙিয়াচুরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে পারিত না।

আমাদের দেশে এক-একজন এইরকম মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তিপ্রভাবে সমস্ত পরিবারের অথবা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অনায়াসে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ইঁহারাই যদি এমন দেশে জন্মিতেন যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাণিজ্যব্যবসায়ে ও নানাবিধ সর্বজনীন কর্মে সর্বদাই বড়ো বড়ো দল বাঁধা চলিতেছে তবে ইঁহারা স্বভাবতই গণনায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেন। বহুমানবকে মিলাইয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া তোলা বিশেষ একপ্রকার প্রতিভার কাজ। আমাদের দেশে সেই প্রতিভা কেবল এক-একটি বড়ো বড়ো পরিবারের মধ্যে অখ্যাত ভাবে আপনার কাজ করিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমার মনে হয়, এমন করিয়া শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে— এ যেন জ্যোতিষ্কলোক হইতে নক্ষত্রকে পাড়িয়া তাহার দ্বারা দেশলাইকাঠির কাজ উদ্ধার করিয়া লওয়া।

ইঁহার কনিষ্ঠ ভাই গুণদাদাকে বেশ মনে পড়ে। তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়বন্ধু আশ্রিত-অনুগত অতিথি-অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল ওদার্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে মাছ ধরিবার সভায়, তিনি মূর্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীর-মনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত। নাট্যকৌতুক আমোদ-উৎসবের নানা সংকল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত। শৈশবের অনধিকারবশত তাঁহাদের সে-সমস্ত উদ্‌যোগের মধ্যে আমরা সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পাইতাম না— কিন্তু উৎসাহের ঢেউ চারি দিক হইতে আসিয়া আমাদের ঔৎসুক্যের উপরে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। বেশ মনে পড়ে, বড়দাদা একবার কী-একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য (Burlesque) রচনা করিয়াছিলেন— প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল

১ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯), দেবেন্দ্রনাথের অনুজ গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র
২ রচনা মে ১৮৬৬ ; প্রথম অভিনয় ৫ জানুয়ারি, ১৮৬৭
৩ প্রকাশ ১২৭৫ [১৮৬৮]

চলিত। আমরা এ-বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার[১] মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনো মনে আছে—

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে—
এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।—

এতবড়ো হাসির কথাটা যে কী তাহা আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই— কিন্তু এক সময়ে জানিতে পাইব, এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।[২]

একটা নিতান্ত সামান্য ঘটনায় আমার প্রতি গুণদাদার স্নেহকে আমি কিরূপ বিশেষভাবে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলাম সে কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা ছন্দোমালা[৩] বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো-একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়া ছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, "গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে।" তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রাইজ পাও নাই?" আমি কহিলাম, "না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।" ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যের প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি, ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্‌গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার সামনেই সে কথাটা অন্য লোকের কাছে বলিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে, তাহা আমার মনেও ছিল না— হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম— কিন্তু সেটা ভালো হইল না। আমার তো মনে হয়, ছেলেদের দান করা ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে— ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না, ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গুণদাদা এ-বাড়িতে কাছারি করিতে আসিতেন। কাছারি তাঁহাদের একটা ক্লাবের মতোই ছিল— কাজের সঙ্গে হাস্যালাপের বড়োবেশি বিচ্ছেদ ছিল না। গুণদাদা কাছারিঘরে একটা কৌচে হেলান দিয়া বসিতেন— সেই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার কোলের কাছে আসিয়া বসিতাম। তিনি প্রায় আমাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প বলিতেন। ক্লাইভ ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশেষে দেশে ফিরিয়া গলায় ক্ষুর দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার কাছে শুনিয়া আমার ভারি আশ্চর্য লাগিয়াছিল। এক দিকে ভারতবর্ষের নব ইতিহাস তো গড়িয়া উঠিল কিন্তু আর-এক দিকে মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যে এ কী বেদনার রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল। বাহিরে যখন এমন সফলতা অন্তরে তখন এত নিষ্ফলতা কেমন করিয়া থাকে। আমি সেদিন অনেক ভাবিয়াছিলাম।— এক-একদিন গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে আমার পকেটের মধ্যে একটা খাতা লুকানো আছে। একটুখানি প্রশ্রয় পাইবামাত্র খাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লজ্জভাবে বাহির হইয়া আসিত। বলা বাহুল্য, তিনি খুব কঠোর সমালোচক ছিলেন না; এমন-কি, তাঁহার অভিমতগুলি বিজ্ঞাপনে ছাপাইলে কাজে লাগিতে পারিত। তবু বেশ মনে পড়ে, এক-একদিন কবিত্বের মধ্যে ছেলেমানুষির মাত্রা এত অতিশয় বেশি থাকিত যে তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। ভারতমাতা সম্বন্ধে কী-একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম।

১ দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরোয়া

২ বস্তুত, এই 'অদ্ভুতনাট্য' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। দ্র জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ৭২

৩ মধুসূদন বাচস্পতি -প্রণীত; প্রকাশ ৩১ বৈশাখ ১২৭৫ [১৮৬৮]

তাহার কোনো-একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটা ছিল 'নিকটে', ঐ শব্দটাকে দূরে পাঠাইবার সামর্থ্য ছিল না অথচ কোনোমতেই তাহার সংগত মিল খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পরের ছত্রে 'শকটে' শব্দটা যোজনা করিয়াছিলাম। সে জায়গায় সহজে শকট আসিবার একেবারেই রাস্তা ছিল না— কিন্তু মিলের দাবি কোনো কৈফিয়তেই কর্ণপাত করে না; কাজেই বিনা কারণেই সে জায়গায় আমাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণদাদার প্রবল হাস্যে, ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এ পর্যন্ত তাহার আর-কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোটো ডেস্ক্ লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ[1] লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্তবাতাসের মতো কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার— বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না; পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম— তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলই মনে হয়, তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল, এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিসি মানুষ তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম— হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারি দিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসিগল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি— সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে তবু সেই-সব বারান্দা, সেই-সব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত আসবাব-আয়োজন ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই দশজনের জন্য ছিল— এইজন্য তাহার মধ্যে যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়োমানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু তাহা নির্মম, তাহা নির্বিচারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না— খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না। আমরা আজকাল যাহাদের নকল করিয়া ঘর তৈরি করি ও ঘর সাজাই, নিজের প্রণালীমত তাহাদেরও সমাজ আছে এবং তাহাদের সামাজিকতাও বহুব্যাপ্ত। আমাদের মুশকিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই— মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য, দেশহিতের জন্য, দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি— কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা, মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ সৃষ্টি করা, এ এখনকার দিনে

১ দ্র প্রথম সর্গ, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮০। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৭৯৭ শক [১৮৭৫ খৃ]

একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এতবড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার দিনে যাঁহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হালকা করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর-কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী[1] মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম· এ·। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে-গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে-সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা-কিছু হাতের কাছে পাইতেন, তাহাকে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইঁহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই-সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত, সে দিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। উদাসিনী নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার[2] বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।

সাহিত্যে যেমন তাঁহার ঔদার্য বন্ধুত্বেও তেমনি। অপরিচিত সভায় তিনি ডাঙায়তোলা মাছের মতো ছিলেন, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তিনি বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বাছবিচার করিতেন না। বালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন। দাদাদের সভা হইতে যখন অনেক রাত্রে বিদায় লইতেন তখন কতদিন আমি তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও রেড়ির তেলের মিট্‌মিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠা ছিল না। এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।

গীতচর্চা

সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম— তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।

১ "হাওড়া জিলার আন্দুলে ইঁহার নিবাস। এম· এ, বি· এল· পাস করিয়া হাইকোর্টের এটর্নী হন।" —র-কথা, পৃ ১৯৬। দ্র জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৫৩-৫৬

২ বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১

তিনি আমাকে খুব-একটা বড়োরকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর-কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না— সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে-সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবলপক্ষেরা সর্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্ব্যয়ের যে-শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত, আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি— স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাতনিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র-দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহা-কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে-শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই— ধর্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিসের পায়ে আমি গড় করি— ইহাতে যে-দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মতো বালাই জগতে আর-কিছুই নাই।

এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।[1] তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।

সাহিত্যের সঙ্গী

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই বাড়িয়া চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না। আমাদের পূর্বশিক্ষক জ্ঞানবাবু আমাকে কিছু কুমারসম্ভব, কিছু আর দুই-একটা জিনিস এলোমেলোভাবে পড়াইয়া ওকালতি করিতে গেলেন। তাঁহার পর শিক্ষক আসিলেন ব্রজবাবু।[2] তিনি আমাকে প্রথমদিন গোল্‌ড্‌স্মিথের ভিকর অফ ওয়েকফীল্‌ড্ হইতে তর্জমা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না। তাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরো অনেকটা ব্যাপক দেখিয়া তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনোকিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে-লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে— সেই

১ "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।"— পাণ্ডুলিপি
২ ব্রজনাথ দে, "মেট্রোপলিটান্ ইনস্টিটিউসনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।" দ্র বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪৬২

সাহিত্যের সঙ্গী

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাদম্বরী দেবী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাষ্পভরা বুদ্‌বুদরাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা-কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।

সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে— তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভালো লাগিত। বিশেষত, আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই, এইরকমের কিছু-একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কতরকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারি দিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড়ো জিনিসকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি, এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।

এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর[১] সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শন[২] পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরানী এই কাব্যের মাধুর্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজে-হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন[৩] দিয়াছিলেন।

এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে-দুপুরে যখন-তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনই প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারি দিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত, তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল— তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতালার নিভৃত ছোটো ঘরটিতে পঙ্খের কাজ করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন্‌ গুন্‌ আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন, এমন অবস্থায় অনেকদিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি— আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সংকোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না— যে-সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্‌গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে— 'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে',[৪] 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে'[৫]। তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।

১ বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪)। দ্র 'বিহারীলাল', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ (সুলভ সং ৫)
২ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশ, ১২৮১
৩ দ্র বিহারীলালের 'সাধের আসন' কাব্য, প্রকাশ ১২৯৫
৪ প্রকাশ, ভারতী, আশ্বিন, ১২৮৭, পৃ ২৯৮। দ্র কবিতা ও সঙ্গীত, পঞ্চম গীত
৫ প্রকাশ, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯, পৃ ১৬৫। দ্র মায়াদেবী, কাব্যগ্রন্থের শেষ গান

কালিদাস ও বাল্মীকির কবিত্বে তিনি মুগ্ধ ছিলেন।

মনে আছে, একদিন তিনি আমার কাছে কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকটি খুব গলা ছাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে পরে পরে যে এতগুলি দীর্ঘ আ-স্বরের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা আকস্মিক নহে— হিমালয়ের উদার মহিমাকে এই আ-স্বরের দ্বারা বিস্ফারিত করিয়া দেখাইবার জন্যই 'দেবতাত্মা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নগাধিরাজ' পর্যন্ত কবি এতগুলি আকারের সমাবেশ করিয়াছেন।

বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ঐ পর্যন্ত দৌড়িত। হয়তো কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাঁহার মতোই কাব্য লিখিতেছি— কিন্তু এই গর্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারীকবির ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্বদাই আমাকে এ কথাটি স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে, 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' আমি 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্'। আমার অহংকারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে, এ কথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন— তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনোমতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না, আর দুই-একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন তাহাদের গলা কেমন মিষ্ট। আমারও মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে আমার গলায় যথোচিত মিষ্টতা নাই। কবিত্বশক্তি সম্বন্ধেও আমার মনটা যথেষ্ট দমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু আত্মসম্মানলাভের পক্ষে আমার এই একটিমাত্র ক্ষেত্র অবশিষ্ট ছিল, কাজেই কাহারও কথায় আশা ছাড়িয়া দেওয়া চলে না— তা ছাড়া ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল, তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

রচনাপ্রকাশ

এ-পর্যন্ত যাহা-কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর[1] নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ[2] নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্‌দিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।

প্রথম যে-গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা[3] নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী[4] কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এড়ুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু[5] এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন— তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী' কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।

১ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক মাসিকপত্র, প্রকাশক যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১২৮২। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে রাজসাহী হইতে শ্রীকৃষ্ণ দাস-এর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১২৭৯।

২ 'বনফুল' 'প্রলাপ' (১২৮২-৮৩)

৩ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২)-প্রণীত। দ্র উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৮৬

৪ প্রকাশ, কার্তিক ১২৮০

৫ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। গেজেটের সম্পাদক ১২৬৮

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।[১]

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত। আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন, "একজন বি. এ. তোমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন।" বি. এ. শুনিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। বি. এ.! শিশুকালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে পুলিসম্যানকে ডাকিয়াছিল সেদিন আমার যে-দশা আজও আমার সেইরূপ। আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমি যে-কীর্তিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি বড়ো বড়ো কোটেশনের নির্মম আঘাতে তাহা সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে এবং পাঠকসমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ। 'কুক্ষণে জনম তোর, রে সমালোচনা!' উদ্‌বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বি. এ. সমালোচক বাল্যকালের পুলিসম্যানটির মতোই দেখা দিলেন না।

ভানুসিংহের কবিতা

পূর্বেই লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় -কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের[২] বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না— বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিতে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল।[৩] চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা[৪] লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলোবছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'— জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, কার্তিক ১২৮৩
"হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর দুঃখসঙ্গিনী ও রাজকৃষ্ণ রায়ের অবসরসরোজিনী"— পাণ্ডুলিপি

২ Thomas Chatterton (1752-70)

৩ দ্র 'চ্যাটার্টন— বালককবি', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬

৪ Rowley poems, Thomas Rowley, an imaginary 15th-cent, Bristol poet and monk

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম— তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল[১] ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন।[২] তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি-বই[৩] লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুসিংহ যিনিই হউন, তাঁহার লেখা যদি বর্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু-না-কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাংমাত্র।[৪]

স্বাদেশিকতা

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

১ বাংলা ১২৮৪-৮৮

২ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০)
দ্র 'রুসিয়া প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'; ভারতী, বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ১২৮৭

৩ The Yatras; or, the Popular Dramas of Bengal (Trubner & Co., London, 1882)
বস্তুত ইহাতে ভানুসিংহ ঠাকুরের উল্লেখ নাই। দ্র জীবনীকোষ, শশিভূষণ বিদ্যালংকার

৪ দ্র রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী'— নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯২;
দ্র ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ, ১৩৭৬

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা[1] বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান'[2] রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ[3] লিখিয়াছি— লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে[4]। তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইম্‌স্ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের সাস্থিত্য সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন[5] মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা[6] হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু[7] ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত।[8] সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি— ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক্-না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান করিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই

১ বাংলা ১২৭৩ চৈত্রসংক্রান্তিতে 'চৈত্রমেলা' নামে প্রথম অনুষ্ঠিত
সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র

২ দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরু-বিক্রম' নাটক [১৮৭৪], প্রথম অঙ্ক
দ্র 'অত্যুক্তি', রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪

৩ ইং ১৮৭৭ সালে লিখিত। দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটক, বা র-পরিচয়, পৃ ৬৬

৪ তু হিন্দুমেলায় প্রথম কবিতাপাঠ 'হিন্দুমেলায় উপহার', ১৮৭৫, র-পরিচয়, পৃ ৬০

৫ কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

৬ সঞ্জীবনী সভা, সাংকেতিক নাম— হা ম্ চু পা মু হা ফ (? ১৮৭৬) ; দ্র জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৬৭-৭০

৭ রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০)

৮ "ঠন্‌ঠনের একটা পোড়োবাড়িতে এই সভা বসিত"— জ্যোতিস্মৃতি

থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে-বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইঁটও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন— আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল। রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল— আমরা হত-আহত পশুপক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে, ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন।" মালি তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা ডাব পাড়িয়া আন্।" সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান[১] জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে

১ "'আজি উন্মদ পবনে' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গান"— ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ১৩-সংখ্যক
দ্র জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৭০

ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল ; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুইধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে— আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না— কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।" বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য— তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না— না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক দিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-এক দিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের[১] তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুইচক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন— গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

১ Capt. D. L. Richardson (Hindu College, 1835-43)

আমেদাবাদ

ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন, আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আর-একটি অযাচিত বদান্যতায়[1] আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।

বিলাতযাত্রার পূর্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে জজ ছিলেন। আমার বউঠাকরুন[2] এবং ছেলেরা[3] তখন ইংলন্ডে— সুতরাং বাড়ি একপ্রকার জনশূন্য ছিল।

শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদশাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না— শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একটি বড়ো ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক-ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বার বার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না তাহা নহে— কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতোই ছিল। লাইব্রেরিতে আর-একখানি বই ছিল, সেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

এ শাহিবাগ-প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। কেবল একটি চাকভরা বোলতার দল আমার এই ঘরের অংশী। রাত্রে আমি সেই নির্জন ঘরে শুইতাম— এক-একদিন অন্ধকারে দুই-একটা বোলতা চাক হইতে আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িত— যখন পাশ ফিরিতাম তখন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও তাহা তীক্ষ্ণভাবে অপ্রীতিকর হইত। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।[4] তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি[5] এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

ইংরেজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্শনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা-কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ-একরকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভালো মন্দ দুইপ্রকার ফলই আমি আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি।

১ তু 'হিমালয়যাত্রা' পৃ ৩০৯

২ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১), সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী, বিবাহ ১৮৫৯

৩ সুরেন্দ্রনাথ (১৮৭২-১৯৪০), ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩-১৯৬০) ও কবীন্দ্র (১৮৭৫-৭৬)

৪ সর্বপ্রথম গান : 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়'— ভগ্নহৃদয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী অ ১। তু গীতবিতান

৫ দ্র পূর্বপাঠ, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী অ ১

বিলাত

এইরূপে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম।[১] অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র[২] প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতশবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশ লাভ করিবার শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎশক্তি এবং বিনয়ের দ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায়— কাঁচাবয়সে এ কথা মন বুঝিতে চায় না। ভালোলাগা, প্রশংসা করা, যেন একটা পরাভব— সে যেন দুর্বলতা— এইজন্য কেবলই খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।

ছেলেবেলা হইতে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ সতেরোবছর বয়সে বিলাতের জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার মেজোবউঠাকরুন তখন ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে[৩] বাস করিতেছিলেন— তাঁহার আশ্রয়ে গিয়া বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না।

তখন শীত আসিয়া পড়িয়াছে। একদিন রাত্রে ঘরে বসিয়া আগুনের ধারে গল্প করিতেছি, ছেলেরা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, বরফ পড়িতেছে।[৪] বাহিরে গিয়া দেখিলাম, কনকনে শীত, আকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না এবং পৃথিবী সাদা বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। চিরদিন পৃথিবীর যে-মূর্তি দেখিয়াছি এ সে-মূর্তিই নয়— এ যেন একটা স্বপ্ন, যেন আর-কিছু— সমস্ত কাছের জিনিস যেন দূরে গিয়া পড়িয়াছে, শুভ্রকায় নিশ্চল তপস্বী যেন গভীর ধ্যানের আবরণে আবৃত। অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইয়াই এমন আশ্চর্য বিরাট সৌন্দর্য আর-কখনো দেখি নাই।

বউঠাকুরানীর যত্নে এবং ছেলেদের বিচিত্র উৎপাত-উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিতে লাগিল। ছেলেরা আমার অদ্ভুত ইংরেজি উচ্চারণে ভারি আমোদ বোধ করিল। তাহাদের আর সকলরকম খেলায় আমার কোনো বাধা ছিল না, কেবল তাহাদের এই আমোদটাতে আমি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারিতাম না। Warm শব্দে a-র উচ্চারণ o-র মতো এবং worm শব্দে o-র উচ্চারণ a-র মতো— এটা যে কোনোমতেই সহজজ্ঞানে জানিবার বিষয় নহে, সেটা আমি শিশুদিগকে বুঝাইব কী করিয়া। মন্দভাগ্য আমি, তাহাদের হাসিটা আমার উপর দিয়াই গেল, কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ পাওনা ছিল ইংরেজি উচ্চারণবিধির। এই দুটি ছোটো ছেলের[৫] মন ভোলাইবার, তাহাদিগকে হাসাইবার, আমোদ দিবার নানাপ্রকার উপায় আমি প্রতিদিন উদ্‌ভাবন করিতাম। ছেলে ভোলাইবার সেই উদ্‌ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন তাহার পরে আরো অনেকবার ঘটিয়াছে— এখনো সে-প্রয়োজন যায় নাই। কিন্তু সে-শক্তির আর সে অজস্র প্রাচুর্য অনুভব করি না। শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল— দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রের এপারের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ওপারের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য তো আমি যাত্রা করি নাই। কথা ছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিস্টর হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি

১ ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮, 'পুনা' স্টিমারে যাত্রা। দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, প্রথম— রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

২ দ্র 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র', ভারতী, বৈশাখ-পৌষ, ফাল্গুন, ১২৮৬ বৈশাখ-শ্রাবণ ১২৮৭। তু য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

৩ Brighton, Sussex। দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ষষ্ঠ

৪ দ্র 'বরফ পড়া' বালক, আশ্বিন ১২৯২

৫ সুরেন্দ্র ও ইন্দিরা

পাবলিক স্কুলে আমি ভরতি হইলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, তোমার মাথাটা তো চমৎকার!" (What a splendid head you have !) এই ছোটো কথাটা যে আমার মনে আছে তাহার কারণ এই যে, বাড়িতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার প্রবল অধ্যবসায় ছিল— তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আশা করি, এটাকে পাঠকেরা আমার গুণ বলিয়াই ধরিবেন যে, আমি তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং আমার সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্তার নানাপ্রকার কার্পণ্যে দুঃখ অনুভব করিয়া নীরব হইয়া থাকিতাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতের সঙ্গে বিলাতবাসীর মতের দুটো-একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইয়া অনেকবার আমি গম্ভীর হইয়া ভাবিয়াছি, হয়তো উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম— ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ, ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ-ইস্কুলেও আমার বেশিদিন পড়া চলিল না— সেটা ইস্কুলের দোষ নয়। তখন তারক পালিত মহাশয়[১] ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এমন করিয়া আমার কিছু হইবে না। তিনি মেজদাদাকে বলিয়া আমাকে লন্ডনে আনিয়া প্রথমে একটা বাসায় একলা ছাড়িয়া দিলেন। সে-বাসাটা ছিল রিজেন্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তখন ঘোরতর শীত। সম্মুখের বাগানের গাছগুলায় একটিও পাতা নাই— বরফে-ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া তাহারা সারি সারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে— দেখিয়া আমার হাড়গুলার মধ্যে পর্যন্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লন্ডনের মতো এমন নির্মম স্থান আর-কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভালো করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাহির তখন মনোরম নহে, তাহার ললাটে ভ্রূকুটি ; আকাশের রঙ ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মতো দীপ্তিহীন ; দশ দিক আপনাকে সংকুচিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই। ঘরের মধ্যে আসবাব প্রায় কিছুই ছিল না। দৈবক্রমে কী কারণে একটা হার্মোনিয়ম ছিল। দিন যখন সকাল-সকাল অন্ধকার হইয়া আসিত তখন সেই যন্ত্রটা আপনমনে বাজাইতাম। কখনো কখনো ভারতবর্ষীয় কেহ কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পই ছিল। কিন্তু যখন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আমার ইচ্ছা করিত, কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা— গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়— শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতোই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। এক-একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া জানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন, পৃথিবীতে এক-একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য-অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কেবলই তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, তাঁহার মেয়েরা তাঁহার মতের

১ স্যর তারকনাথ পালিত (? ১৮৪১-১৯১৪)

প্রতি শ্রদ্ধামাত্র করে না এবং সম্ভবত এই পাগলামির জন্য তাঁহাকে সর্বদা ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। এক-একদিন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যাইত— ভালো কোনো-একটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেই বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহ সঞ্চার করিতাম, আবার এক-একদিন তিনি বড়ো বিমর্ষ হইয়া আসিতেন— যেন যে-ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোখদুটো কোন্ শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনোমতেই প্রথমপাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত, অনশনক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়োই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিতেছিলাম, ইহার দ্বারা আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না তবুও কোনোমতেই ইহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে-কয়দিন সে-বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণস্বরে আমাকে কহিলেন, "আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি তো কোনো কাজই করি নাই, আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না।" আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার সেই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণসহ উপস্থিত করেন নাই, তবু তাঁহার সে-কথা আমি এ-পর্যন্ত অবিশ্বাস করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে, সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে ; তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

এখান হইতে পালিতমহাশয় আমাকে বার্কার নামক একজন শিক্ষকের বাসায় লইয়া গেলেন।[১] ইনি বাড়িতে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইহার ঘরে ইহার ভালোমানুষ স্ত্রীটি ছাড়া অত্যল্পমাত্রও রম্য জিনিস কিছুই ছিল না। এমন শিক্ষকের ছাত্র যে কেন জোটে তাহা বুঝিতে পারি, কারণ ছাত্রবেচারাদের নিজের পছন্দ প্রয়োগ করিবার সুযোগ ঘটে না— কিন্তু এমন মানুষেরও স্ত্রী মেলে কেমন করিয়া সে-কথা ভাবিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। বার্কার-জায়ার সান্ত্বনার সামগ্রী ছিল একটি কুকুর— কিন্তু স্ত্রীকে যখন বার্কার দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিতেন তখন পীড়া দিতেন সেই কুকুরকে। সুতরাং এই কুকুরকে অবলম্বন করিয়া মিসেস বার্কার আপনার বেদনার ক্ষেত্রকে আরো খানিকটা বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এমন সময়ে বউঠাকুরানী যখন ডেভনশিয়রে টর্কিনগর[২] হইতে ডাক দিলেন তখন আনন্দে সেখানে দৌড় দিলাম। সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় আমার দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। দুই চক্ষু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত এবং অবকাশে পূর্ণ দিনগুলি নিষ্কণ্টক সুখের বোঝা লইয়া প্রত্যহ অনন্তের নিস্তব্ধ নীলাকাশসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে, তখনো কেন যে মনের মধ্যে কবিতা লেখার তাগিদ আসিতেছে না, এই কথা চিন্তা করিয়া এক-একদিন মনে আঘাত পাইয়াছি। তাই একদিন খাতা-হাতে ছাতামাথায় নীল সাগরের শৈলবেলায় কবির কর্তব্য পালন করিতে গেলাম। জায়গাটি সুন্দর বাছিয়াছিলাম কারণ, সেটা তো ছন্দও নহে, ভাবও নহে। একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরব্যগ্রতার মতো সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে— সম্মুখের ফেনরেখাঙ্কিত তরল নীলিমার দোলার উপর দিনের আকাশ দোল খাইয়া তরঙ্গের কলগানে হাসিমুখে ঘুমাইতেছে— পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের সুগন্ধি ছায়াখানি বনলক্ষ্মীর আলস্যস্খলিত আঁচলটির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই শিলাসনে বসিয়া মগ্নতরী[৩] নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিসটা বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্তমান। গ্রন্থাবলী হইতে যদিও সে নির্বাসিত তবু সপিনাজারি করিলে তাহার ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।

১ দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, সপ্তম

২ Torquay, Devonshire। দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, নবম

৩ দ্র 'ভগ্নতরী', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬ ; শৈশব সঙ্গীত, রবীন্দ্র রচনাবলী-অ ১

কিন্তু কর্তব্যের পেয়াদা নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। আবার তাগিদ আসিল— আবার লন্ডনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার স্কট নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল।[১] একদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্বকেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড়ো মেয়েটি আছেন। ছোটো দুইজন মেয়ে, ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, আমার দ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস স্কট আমাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি— মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকর-বাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়— এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটোখাটো কাজটিও মিসেস স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্বেই আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরামকেদারা ও তাঁহার পশমের জুতাজোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের কী ভালো লাগে আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয়, সে কথা মুহূর্তের জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজনমাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজার গায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন। ইহার পরে লোকলৌকিকতার নানা কর্তব্য তো আছেই। গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদপ্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্তব্যেরই অঙ্গ।

মেয়েদের লইয়া এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে টেবিল-চালা হইত। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত লাগাইয়া থাকিতাম, আর টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মতো দাপাদাপি করিয়া বেড়াইত। ক্রমে এমন হইল, আমরা যাহাতে হাত দিই তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস স্কটের এটা যে খুব ভালো লাগিত তাহা নহে। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া এক-একবার মাথা নাড়িয়া বলিতেন, "আমার মনে হয়, এটা ঠিক বৈধ হইতেছে না।" কিন্তু তবু তিনি আমাদের এই ছেলেমানুষি কাণ্ডে জোর করিয়া বাধা দিতেন না, এই অনাচার সহ্য করিয়া যাইতেন। একদিন ডাক্তার স্কটের লম্বা টুপি লইয়া সেটার উপর হাত রাখিয়া যখন চালিতে গেলাম, তিনি ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "না না, ও-টুপি চালাইতে পারিবে না।" তাঁহার স্বামীর মাথার টুপিতে মুহূর্তের জন্য শয়তানের সংস্রব ঘটে, ইহা তিনি সহিতে পারিলেন না।

এই-সমস্তের মধ্যে একটি জিনিস দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি, স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনি পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদপ্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে, সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রীপ্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।

কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমি খুশি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণকালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে

১ দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, দশম

আসিলে।"— লন্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই— এই ডাক্তারপরিবারের কেহ-বা পরলোকে কেহ-বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনো সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্[১] শহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছুদূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন।"— বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয়তো আমার মনে থাকিত না কিন্তু ইহার অনুরূপ আর-একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি স্টেশনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকা গাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনি-জাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্ধক্রাউন ছিল— সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো-কিছু দাবি করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, "আপনি বোধ করি পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্ধক্রাউন দিয়াছেন।"

যতদিন ইংলন্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই, তাহা বলিতে পারি না— কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড়ো করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে, যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুশি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি— তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া ছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কবিতাটি বেহাগরাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন, "এই গানটা তুমি বেহাগরাগিণীতে গাহিয়া আমাকে শুনাও।" আমি নিতান্ত ভালোমানুষি করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্ভুত কবিতার সঙ্গে বেহাগ সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছিল, তাহা আমি ছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। আমি মনে করিলাম, এইখানেই পালা শেষ হইল— কিন্তু হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহারান্তে বৈঠকখানাঘরে যখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে সমবেত হইতেন তখন তিনি আমাকে সেই বেহাগ গান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অন্য সকলে ভাবিতেন, ভারতবর্ষীয় সংগীতের একটা বুঝি আশ্চর্য নমুনা শুনিতে পাইবেন— তাঁহারা সকলে মিলিয়া সানুনয় অনুরোধে যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপানো কাগজখানি বাহির হইত— আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম— স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম, এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর-কাহারও পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম, "Thank you very much. How interesting!" তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই

১ Tunbridge Wells, Kent— দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, অষ্টম

ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতবড়ো একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে, তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত।

তাহার পরে আমি যখন ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকিয়া লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম তখন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লন্ডনের বাহিরে কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যাইবার জন্য তিনি প্রায় আমাকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোকগাথার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাঁহার সানুনয় একটি টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন কলেজে যাইতেছি। এ দিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম, এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে বিধবার অনুরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে স্টেশনে গেলাম। সেদিন বড়ো দুর্যোগ। খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। যেখানে যাইতে হইবে সেই স্টেশনেই এ-লাইনের শেষ গম্যস্থান— তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে তাহা সন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম, স্টেশনগুলি সব ডান দিকে আসিতেছে। তাই ডান দিকের জানালা ঘেঁষিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকাল-সকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে— বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লন্ডন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল তারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একে একে নামিয়া গেল।

গন্তব্য স্টেশনের পূর্ব স্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্ল্যাটফর্ম নাই, কিছুই নাই। ভিতরে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত তত্ত্ব জানা হইতে বঞ্চিত— রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই, অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল— মনে ঠিক করিলাম রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। কিন্তু যখন দেখিলাম যে স্টেশনটি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম সেই স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল, তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। স্টেশনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক স্টেশন কখন পাওয়া যাইবে। সে কহিল, সেইখান হইতেই তো এ গাড়ি এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইতেছে। সে কহিল, লন্ডনে। বুঝিলাম এ গাড়ি খেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কখন পাওয়া যাইবে। সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি, ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া যখন দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে তখন নিবৃত্তিই সব চেয়ে সোজা। মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্যন্ত আঁটিয়া স্টেশনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics[১], সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত্যন্তর যখন নাই তখন, এইজাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে— আধঘন্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এত স্ফূর্তির সঞ্চার হইল যে তাহার পর হইতে Data of Ethics-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌঁছিবার কথা সেখানে পৌঁছিতে সাড়ে-নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন, "এ কী রুবি, ব্যাপারখানা কী!" আমি আমার আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব-যে সগর্বে বলিলাম তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ

১ The Data of Ethics by Herbert Spencer (June, 1879)

যখন স্বেচ্ছাকৃত নহে তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না— বিশেষত রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারতকর্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "এসো রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।"

আমি কোনোদিন চা খাই না কিন্তু জঠরানল নির্বাপণের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাদুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানাঘরে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন, তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামিনীর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, "এবার তবে নৃত্য শুরু করা যাক।" আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং শরীরমনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালোমানুষ যাহারা জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে যদিচ এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহূত, তথাপি দশঘণ্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকাল-উত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই দুঃখের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুবি, আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায়।" এ-প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম তিনি কহিলেন, "রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায়, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য।" সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না— সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়তো শাপে বর হইল— হয়তো এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক, কিছু খাইতে পাইব কি। তাহারা কহিল, মদ্য যত চাও পাইবে, খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল, তিনি আহার না দিন বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠাণ্ডা কন্‌কন্ করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখ ধুইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকালবেলায় ইঙ্গভারতীয় বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠাণ্ডা খানা বলে তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারও কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না— অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্যের মতো এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, "যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ, শয্যাগত; তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে।" সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "ঐ ঘরে তিনি আছেন।" আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগরাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কী হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লন্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই-তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষির প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, "দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষের নিমকের গুণ।"

লোকেন পালিত

বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি-সাহিত্য-ক্লাসে[১] তখন সেখানে লোকেন পালিত[২] ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে বছর-চারেকের ছোটো। যে বয়সে জীবনস্মৃতি লিখিতেছি সে বয়সে চার বছরের তারতম্য চোখে পড়িবার মতো নহে; কিন্তু সতেরোর সঙ্গে তেরোর প্রভেদ এত বেশি যে সেটা ডিঙাইয়া বন্ধুত্ব করা কঠিন। বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সম্বন্ধে সে বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ, বুদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না।

য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করে; আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে কাজটা চুপিচুপি সারিলে কাহারও আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না— কিন্তু হাসির প্রভূত বাষ্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্বদা পরিস্ফীত হইয়া ছিল, সামান্য একটু নাড়া পাইলে তাহা সশব্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত। সকল দেশেই ছাত্রীদের পাঠনিষ্ঠায় অন্যায় পরিমাণ আতিশয্য দেখা যায়। আমাদের কত পাঠরত প্রতিবেশিনী ছাত্রীর নীল চক্ষুর নীরব ভর্ৎসনাকটাক্ষ আমাদের সরব হাস্যালাপের উপর নিষ্ফলে বর্ষিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে আজ আমার মনে অনুতাপ উদয় হয়। কিন্তু তখনকার দিনে পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাতপীড়া সম্বন্ধে আমার চিত্তে সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। কোনোদিন আমার মাথা ধরে নাই এবং বিধাতার প্রসাদে বিদ্যালয়ের পড়ার বিয়ে আমাকে একটু কষ্ট দেয় নাই।

এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হাস্যালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম। সে-আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্বাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল, কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।

আমাদের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল।[৩] তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে— পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে-সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।

তাহার পর কয়েক বৎসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন যখন ভারতবর্ষে ফিরিল তখন সেই কলেজের লাইব্রেরিঘরে হাস্যোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত যে-আলোচনা শুরু হইয়াছিল তাহাই ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণযৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক[৪] হইয়া অবিশ্রামগতিতে যখন গদ্যপদ্যের

১ "ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেন্‌রি মর্‌লি।... আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র।"— ছেলেবেলা, অধ্যায় ১৪

২ লোকেন্দ্রনাথ পালিত (জন্ম ? ১৮৬৫), তারক পালিতের পুত্র

৩ দ্র উত্তরকালীন প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ', শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ (সুলভ সং ৬)

৪ সাধনা— অগ্রহায়ণ ১২৯৮-কার্তিক ১৩০২

"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন— চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।"— পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, আত্মপরিচয়; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৭

জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই।[১] তখনকার কত পঞ্চভূতের ডায়ারি এবং কত কবিতা মফস্বলে তাহারই বাংলাঘরে বসিয়া লেখা। আমাদের কাব্যালোচনা ও সংগীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে শুরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে-সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। সরস্বতীর পদ্মবনে বন্ধুত্বের পদ্মটির 'পরেই দেবীর বিলাস বুঝি সকলের চেয়ে বেশি। এই বনে স্বর্ণরেণুর পরিচয় বড়ো বেশি পাওয়া যায় নাই কিন্তু প্রণয়ের সুগন্ধি মধু সম্বন্ধে নালিশ করিবার কারণ আমার ঘটে নাই।

ভগ্নহৃদয়

বিলাতে আর-একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া[২] ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল[৩], তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী[৪] আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমার এই আঠারোবছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশবছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধৃত করি— "ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়— আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল— তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।"

আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না। তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর-একটা-কিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য

১ দ্র 'পত্রালাপ'— সাধনা (ফাল্গুন ১২৯৮ ভাদ্র - আশ্বিন, ১২৯৯) রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮ (সুলভ সং ৪)
২ দেশে প্রত্যাবর্তন ? ফেব্রুয়ারি ১৮৮০
৩ জুন ১৮৮১। দ্র প্রথম ৬ সর্গ— ভারতী, কার্তিক-ফাল্গুন ১২৮৭
৪ মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি রাধারমণ ঘোষ। দ্র 'ত্রিপুরার রাজবংশ ও রবীন্দ্রনাথ'— প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তখন সেই অনুদ্গত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্যপদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সঙ্গে তাহারা আপন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মতো মনকে পীড়া দেয়।

তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে— কিন্তু তাই বলিয়াই সেটা অবজ্ঞার যোগ্য নহে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলাকে যাহা-কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেয় না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শেষ পরিণাম পর্যন্ত যাইতে দেয় না— তাহাকে পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে চায় না— এইজন্য সকলপ্রকার আঘাত আতিশয্য অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের সাথী। মঙ্গলকর্মে যখন তাহারা একেবারে মুক্তিলাভ করে তখনই তাহাদের বিকার ঘুচিয়া যায়— তখনই তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে— আনন্দেরও পথ সেই দিকে।

নিজের মনের এই যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল। সেই কালটার বেগ এখনই যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে, ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে-একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।

আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন-সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না— সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এইজন্য ইংরেজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব-একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।

য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁশের যুগ আসিয়াছিল, শেক্‌স্‌পীয়রের সমসাময়িককালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। এ সাহিত্যে ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না। মানুষ আপনার হৃদয়প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এইজন্যই এই সাহিত্যের প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা প্রাচুর্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণপরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপকরাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

ইংরেজি সাহিত্যে আর-একদিন যখন পোপ-এর কালের টিমাতেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসি-বিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল, বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনেবউকে, উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।

তাই ইংরেজি সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমাদিগকে চারি দিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে, তাহা উত্তেজনারই দিন।

অথচ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প-একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্যসুরটি মর্মরধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না— কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না, এইজন্যই আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম। এখনো সেই ঝোঁকটা কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সহজে কাটিবে না তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্যকলার সংযম এখনো আসে নাই; এখনো সেখানে বেশি করিয়া বলা ও তীব্র করিয়া প্রকাশ করার প্রাদুর্ভাব সর্বত্রই। হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণমাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে— সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনো ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র এই ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। য়ুরোপের যে-সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সাহিত্যকলার মর্যাদা সংযমের সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে— এইজন্যই সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তখনকার কালের ইংরেজি-সাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি[১] আমাদের কাছে মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন। সত্যকে যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা নহে, তাহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিলেই যেন তাহার সার্থকতা হইল, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্মে তাঁহার কোনো আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এ স্থলে কোনো সত্য বস্তু তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে-কোনো কল্পনায় হৃদয়াবেগকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহাকেই তিনি সত্যের মতো ব্যবহার করিতে চাহিতেন। সত্য-উপলব্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন প্রবল হওয়াতেই, যাহাতে সেই প্রয়োজন মেটে তাহা স্থূল হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার বাধা ছিল না।

তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম[২], মিল[৩] ও কোঁতের[৪] আধিপত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন। য়ুরোপে এই মিল্-এর যুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্যায়। মানুষের চিত্তের আবর্জনা দূর করিয়া দিবার জন্য স্বভাবের চেষ্টারূপেই এই ভাঙিবার ও সরাইবার প্রলয়শক্তি কিছুদিনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া-পাওয়া জিনিস। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্য ব্যবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনারূপেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল। এইজন্য তখন আমরা দুই দল মানুষ দেখিয়াছি। এক দল ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য সর্বদাই গায়ে পড়িয়া তর্ক করিতেন। পাখিশিকারে শিকারির যেমন আমোদ, গাছের

১ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী
২ Jeremy Bentham (1748-1832)
৩ John Stuart Mill (1806-73)
৪ Auguste Comte (1798-1857)

উপরে বা তলায় একটা সজীব প্রাণী দেখিলেই তখনই তাহাকে নিকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য শিকারির হাত যেমন নিশপিশ করিতে থাকে, তেমনি যেখানে তাঁহারা দেখিতেন কোনো নিরীহ বিশ্বাস কোথাও কোনো বিপদের আশঙ্কা না করিয়া আরামে বসিয়া আছে তখনই তাহাকে পাড়িয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাদের উত্তেজনা জন্মিত। অল্পকালের জন্য আমাদের একজন মাস্টার ছিলেন, তাঁহার এই আমোদ ছিল। আমি তখন নিতান্ত বালক ছিলাম, কিন্তু আমাকেও তিনি ছাড়িতেন না। অথচ তাঁহার বিদ্যা সামান্যই ছিল— তিনি যে সত্যানুসন্ধানের উৎসাহে সকল মতামত আলোচনা করিয়া একটা পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; তিনি আর-একজন ব্যক্তির মুখ হইতে তর্কগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি তাঁহার নিতান্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড়ো দুঃখ পাইতে হইত। এক-একদিন এত রাগ হইত যে কাঁদিতে ইচ্ছা করিত।

আর-এক দল ছিলেন তাঁহারা ধর্মকে বিশ্বাস করিতেন না, সম্ভোগ করিতেন। এইজন্য ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া যত কলাকৌশল, যতপ্রকার শব্দগন্ধরূপরসের আয়োজন আছে, তাহাকে ভোগীর মতো আশ্রয় করিয়া তাঁহারা আবিষ্ট হইয়া থাকিতে ভালোবাসিতেন; ভক্তিই তাঁহাদের বিলাস। এই উভয় দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সত্যসন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না; তাহা প্রধানত আবেগের উত্তেজনা ছিল।

যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সম্রেব ছিল না— আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলই অগ্নিপূজা; সে কেবলই আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর-কোনো লক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে যত বাড়ানো যায় তত বাড়ানোই চলে।

যেমন ধর্ম সম্বন্ধে তেমনি নিজের হৃদয়াবেগ সম্বন্ধেও কোনো সত্য থাকিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, উত্তেজনা থাকিলেই যথেষ্ট। তখনকার কবির[১] একটি শ্লোক মনে পড়ে—

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে,
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে।

সত্যের দিক দিয়া হৃদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনোপ্রকার দুর্ঘটনা নিতান্তই অনাবশ্যক; দুঃখবৈরাগ্যের সত্যটা স্পৃহনীয় নয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহার ঝাঁঝটুকু উপভোগের সামগ্রী— এইজন্য কাব্যে সেই জিনিসটার কারবার জমিয়া উঠিয়াছিল— ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপাসনার রসটুকু ছাঁকিয়া লওয়া। আজও আমাদের দেশে এ বালাই ঘুচে নাই। সেইজন্য আজও আমরা ধর্মকে যেখানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি সেখানে ভাবুকতা দিয়া আর্টের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার সমর্থন করি। সেইজন্যই বহুল পরিমাণে আমাদের দেশহিতৈষিতা দেশের যথার্থ সেবা নহে, কিন্তু দেশ সম্বন্ধে হৃদয়ের মধ্যে একটা ভাব অনুভব করার আয়োজন করা।

১ ? অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর

বিলাতি সংগীত

ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা ভুলিতেছি— মাডাম নীল্‌সন[১] অথবা মাডাম আল্‌বানী[২] হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো ওস্তাদ গায়কেরাও গান গাহিবার প্রয়াসটাকে ঢাকিতে পারেন না— যে-সকল খাদসুর বা চড়াসুর সহজে তাঁহাদের গলায় আসে না, যেমন-তেমন করিয়া সেটাকে প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কোনো লজ্জা নাই। কারণ, আমাদের দেশে শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা নিজের মনের মধ্যে নিজের বোধশক্তির জোরেই গানটাকে খাড়া করিয়া তুলিয়া খুশি হইয়া থাকেন ; এই কারণে তাঁহারা সুকণ্ঠ গায়কের সুললিত গানের ভঙ্গিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন ; বাহিরের কর্কশতা এবং কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণতাতেই আসল জিনিসটার যথার্থ স্বরূপটা যেন বিনা আবরণে প্রকাশ পায়। এ যেন মহেশ্বরের বাহ্য দারিদ্র্যের মতো— তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য নগ্ন হইয়া দেখা দেয়। য়ুরোপে এ-ভাবটা একেবারেই নাই। সেখানে বাহিরের আয়োজন একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই— সেখানে অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মানুষের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকে না। আমরা আসরে বসিয়া আধঘণ্টা ধরিয়া তানপুরার কান মলিতে ও তবলটাকে ঠকাঠক্ শব্দে হাতুড়িপেটা করিতে কিছুই মনে করি না। কিন্তু য়ুরোপে এইসকল উদ্‌যোগকে নেপথ্যে লুকাইয়া রাখা হয়— সেখানে বাহিরে যাহা-কিছু প্রকাশিত হয় তাহা একেবারেই সম্পূর্ণ। এইজন্য সেখানে গায়কের কণ্ঠস্বরে কোথাও লেশমাত্র দুর্বলতা থাকিলে চলে না। আমাদের দেশে গান সাধাটাই মুখ্য, সেই গানেই আমাদের যতকিছু দুরূহতা ; য়ুরোপে গলা সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গানটাকে শুনিলেই সন্তুষ্ট থাকে, য়ুরোপে শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে। সেদিন ব্রাইটনে তাই দেখিলাম— সেই গায়িকাটির গান-গাওয়া অদ্ভুত, আশ্চর্য। আমার মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে। কণ্ঠনলীর মধ্যে সুরের লীলা কোথাও কিছুমাত্র বাধা পাইতেছে না। মনে যতই বিস্ময় অনুভব করি-না কেন সেদিন গানটা আমার একেবারেই ভালো লাগিল না। বিশেষত, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে পাখির ডাকের নকল ছিল, সে আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যজনক মনে হইয়াছিল। মোটের উপর আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে। তাহার পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনিয়া আমার আরাম বোধ হইতে লাগিল— বিশেষত 'টেনর' গলা যাহাকে বলে সেটা নিতান্ত একটা পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীরী বিলাপের মতো নয়— তাহার মধ্যে নরকণ্ঠের রক্তমাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সংগীতের রস পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার এই কথা মনে হয় যে, য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন— ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকলরকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে— আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য— সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত ; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর— সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনোপ্রকার সুব্যবস্থা নাই।

য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা

১ Christine Nilsson (1843-1922), Swedish prima donna

২ Dame Albani (1852-1930) , Candadian prima donna

বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোকছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক ; আর-একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে কিন্তু আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারংবার মনের মধ্যে বলিয়াছি, ইহা রোমান্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে ; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

বাল্মীকিপ্রতিভা

আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি মুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ[১] ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লন্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল। তখন এই কবিতার সুরগুলি শুনি নাই— তাহা আমার কল্পনার মধ্যে ছিল। ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত। এই আইরিশ মেলডীজ্ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের কোনো কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং পূর্ণ হইয়াই আত্মহত্যা সাধন করে। আইরিশ মেলডীজ্ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেকগুলি সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্লন্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া এইসকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের মজার রকমের হইয়াছে। এমন-কি, তাঁহারা বলিতেন, আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর বদল হইয়া গিয়াছে।

এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল।[২] ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি ; কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে ; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে— এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা— অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ

১ 'Irish Melodies' by Thomas Moor (1779-1852)। দ্র রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ— 'সম্পাদকের বৈঠক', ভারতী, মাঘ ১২৮৪ ও কার্তিক ১২৮৬

২ প্রথম অভিনয়ের প্রোগ্রাম (?) রূপে প্রকাশ, শক ফাল্গুন ১৮০২ (১৮৮১)। দ্র গ্রন্থপরিচয়-অ ১

সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে— ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র— স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জন সমাগম[1] নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল[2]— ইহাই শেষবার।[3] এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা[4] সরস্বতী সাজিয়াছিল— বাল্মীকিপ্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না— কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার-আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমত সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ— ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে— ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা— কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।

বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া[5], দশরথকর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল[6]— ইহার করুণরসে শ্রোতা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম[7] বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা'[8] বলিয়া আর-একটা গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।

১ প্রথম আহূত, শনিবার, ৬ বৈশাখ ১২৮১ [১৮৭৪]
দ্র 'সেকালের কথা', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০; জ্যোতিস্মৃতি, পৃ ১৫৭, গ্রন্থপরিচয় ১৭

২ শনিবার, ১৬ ফাল্গুন, ১২৮৭ [১৮৮১]

৩ তু 'কালমৃগয়া'র অভিনয়কাল, নিম্ন পাদটীকা ৫

৪ প্রতিভাসুন্দরী দেবী (১৮৬৫-১৯২২), হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা। উল্লেখ করা যায় যে, বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম অভিনয়ে শরৎকুমারী দেবীর কন্যা সুশীলা দেবী লক্ষ্মী সাজিয়াছিলেন।

৫ প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১২৮৯ (ডিসেম্বর ১৮৮২)

৬ 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সম্মিলন উপলক্ষে প্রথম অভিনয়, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২

৭ দ্র বাল্মীকিপ্রতিভা, ২য় সংস্করণ, ফাল্গুন ১২৯২

৮ প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১২৯৫। দ্র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন— রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ করিত।

এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারংবার উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীতের দুই-একস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই দুটি গীতিনাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না, তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়[1]। তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না; তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরলবিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নবযৌবনের নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না, তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি— আমার সেই কুড়িবছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা। তাঁহার কোনো ভয় ছিল না। যখন নিতান্তই বালক ছিলাম তখন তিনি আমাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুট করাইয়াছেন, আনাড়ি সওয়ার পড়িয়া যাইব বলিয়া কিছুমাত্র উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন নাই। সেই আমার বাল্যবয়সে একদিন শিলাইদহে যখন খবর আসিল যে গ্রামের বনে একটা বাঘ আসিয়াছে তখন আমাকে তিনি শিকারে লইয়া গেলেন— হাতে আমার অস্ত্র নাই, থাকিলেও তাহাতে বাঘের চেয়ে আমারই বিপদের ভয় বেশি, বনের বাহিরে জুতা খুলিয়া একটা বাঁশগাছের আধ-কাটা কঞ্চির উপর চড়িয়া জ্যোতিদাদার পিছনে কোনোমতে বসিয়া রহিলাম— অসভ্য জন্তুটা গায়ে হাত তুলিলে তাহাকে যে দুই-এক ঘা জুতা কষাইয়া অপমান করিতে পারিব সে পথও ছিল না। এমনি করিয়া ভিতরে বাহিরে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন— কোনো বিধিবিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

১ ইং ১৮৭৭ সালে। দ্র রবীন্দ্র-কথা, পৃ ১৯২; শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬, পৃ ৪৪৫

সন্ধ্যাসংগীত[১]

নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থার কথা পূর্বে লিখিয়াছি, মোহিতবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে[২] সেই অবস্থার কবিতাগুলি 'হৃদয়-অরণ্য' নামের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসংগীতে 'পুনর্মিলন'-নামক কবিতায়[৩] আছে—

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে-বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।—

হৃদয়-অরণ্য নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপে বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল, তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে— কেবল সন্ধ্যাসংগীতে-প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

একসময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন— তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেইসময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই-সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।

একটা স্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল কিন্তু স্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। স্লেট জিনিসটা বলে— ভয় কী তোমার, যাহা খুশি তাহাই লেখো-না, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি-একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল— বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

ইহাকে কেহ যেন গর্বোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে না করেন। পূর্বের অনেক রচনায় বরঞ্চ গর্ব ছিল— কারণ গর্বই সে-সব লেখার শেষ বেতন। নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিতৃপ্তি তাহাকে অহংকার বলিব না। ছেলের প্রতি মা-বাপের প্রথম যে আনন্দ সে ছেলে সুন্দর বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থ আমারই বলিয়া। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহারা গর্ব অনুভব করিতে পারেন কিন্তু সে আর-একটা জিনিস। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটাখালের মতো সিধা চলে না— আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে

১ প্রকাশ ১২৮৮ (১৮৮২)— রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

২ মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত— কাব্যগ্রন্থ (১-৯ ভাগ, ১৩১০)

৩ দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১। তু ভারতী, চৈত্র ১২৮৯

নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে— তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।

আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজনমাত্র লোক তখন ছিলেন— অক্ষয়বাবু। তিনি হঠাৎ আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কাছ হইতে অনুমোদন পাইয়া আমার পথ আরো প্রশস্ত হইয়া গেল।

বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী[১] কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক, যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়— তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘনঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না। লিখিয়া গিয়াছি, কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনোপ্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম, আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতটাকে যেমন-খুশি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

আবার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব— মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।

গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

ব্যারিস্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন শুরু করিয়াছিলাম, এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন।[২] এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম।[৩] সঙ্গে আরো একজন আত্মীয়[৪] ছিলেন। ব্যারিস্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন যে, বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না— বিশেষ কারণে মান্দ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ঘটনাটা যত বড়ো গুরুতর, কারণটা তদনুরূপ কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে-হাস্যটা ষোলো-আনা আমারই প্রাপ্য নহে

১ প্রকাশ: অবোধবন্ধু মাসিকপত্রে, ১২৭৪-৭৬; গ্রন্থাকারে, ১২৭৬

২ দ্র দেবেন্দ্রনাথের পত্র, গ্রন্থপরিচয় ১৭

৩ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা— বৈশাখ ১২৮৮ [১৮৮১]

৪ ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

এইজন্যই সেটাকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না। যাহা হউক, লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বার-লাইব্রেরির ভূভারবৃদ্ধি না করাতে আইনদেবতা আমাকে সদয় চক্ষে দেখিবেন।

পিতা তখন মসুরি পাহাড়ে ছিলেন। বড়ো ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, বরং মনে হইল তিনি খুশি হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে এবং এই মঙ্গল ঈশ্বর-আশীর্বাদেই ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ[১] পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।[২] প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতিমহাশয় 'বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং' বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো— বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এ দেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর[৩] গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্যবিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এ দেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে। গুন গুন করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম, 'তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে'— তখনই দেখিলাম, সুর যে-জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল, আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে— তাহা যেন সমস্ত জলস্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা। বহু-বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!' সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে,

১ দ্র 'সঙ্গীত ও ভাব', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

২ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫)

৩ রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮২৯)

ওগো বিদেশিনী'— সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে— কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি— তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই— হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।

ইহার অনেকদিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়— মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!

এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সংকোচ বোধ করি। কেননা, গানের বহিতে আসল জিনিসই বাদ পড়িয়া যায়। সংগীত বাদ দিয়া সংগীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়, যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।

গঙ্গাতীর

বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন— আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।[১] আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেশন হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ— তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল। সে তো খুব বেশি দিনের কথা নহে— তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা উর্ধ্বফণা সাপের মতো প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খরমধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিগ্ধচ্ছায়া সংকীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্বত্রই অনবসর আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হয়তো সে ভালোই— কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো, এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম-যন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত

১ ইং ১৮৮১ সালে, মসুরিতে পিতার সহিত সাক্ষাতের পরে

জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম ; কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম— জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম ; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

আমরা যে-বাগানে ছিলাম তাহা মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বারান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে— কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই-চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানাঘরের সার্শিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড়-পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা— সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে ; আর-একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে-সজ্জিত নরনারী কেহ-বা উঠিতেছে কেহ-বা নামিতেছে। সার্শির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূরদেশের, কোন্ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া মেলিয়া দিত— এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারি দিক খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘনগাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর-কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসংগীতের পালা চলিতেছে— এই ঘরের প্রতি লক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলাম[১]—

অনন্ত এ আকাশের কোলে
　　টলমল মেঘের মাঝার—
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
　　তোর তরে কবিতা আমার।

এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে, আমি ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক-না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডিবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়। কিন্তু একটা কথা আমি মানিতে পারি না। তাঁহারা আমার কবিতাকে যখন ঝাপসা বলিতেন তখন সেইসঙ্গে এই খোঁচাটুকুও ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে যোগ করিয়া দিতেন— ওটা যেন একটা ফ্যাশান। যাহার নিজের দৃষ্টি খুব ভালো সে ব্যক্তি কোনো যুবককে চশমা পরিতে দেখিলে অনেক সময়ে রাগ করে এবং মনে করে, ও বুঝি চশমাটাকে অলংকাররূপে ব্যবহার করিতেছে। বেচারা চোখে কম দেখে, এ অপবাদটা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু কম দেখার ভান করে, এটা কিছু বেশি হইয়া পড়ে।

যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থার সত্য— তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাহা সত্য সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া। এরূপ কবিতার মূল নাই

১ 'গান আরম্ভ', সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১। দ্র 'কবিতা সাধনা' ভারতী, পৌষ ১২৮৮

বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়— ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকৃতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই— যত অপরাধ ব্যক্ত না করিতে পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না— সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ায় বেদনায় মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না— ইহার বর্ণনা নাই— এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে, তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে— অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সকল সৃষ্টিতেই যেমন দুই শক্তির লীলা, কাব্যসৃষ্টির মধ্যেও তেমনি। যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কাব্য লেখা বোধ হয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম[১] হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই, তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে[২] আমি বলিয়াছি— রমেশ দত্ত[৩] মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন[৪]; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ মালা ইহারই প্রাপ্য— রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন, "না।" তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

প্রিয়বাবু

এই সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন।[৫] তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী

১ বাংলা ১২৮৮ [১৮৮২]
"ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত"— বিজ্ঞাপন, ১ম সংস্করণ
২ 'বঙ্কিমচন্দ্র', সাধনা, বৈশাখ ১৩০১। দ্র গ্রন্থপরিচয় ৯, পৃ ৫৫৫ (সুলভ সং ৫, পৃ ৮১০)
৩ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)
৪ ২০ নং বীডন স্ট্রীট বাড়িতে কমলা দেবীর সহিত প্রমথনাথ বসুর বিবাহে, শ্রাবণ ১২৮৯ [১৮৮২]
৫ প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬)

ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন— তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্য দিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস— এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

প্রভাতসংগীত[১]

গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসংগীত ছাড়া কিছু-কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে— সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেইরকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম— মন বুক-ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব— কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না কিন্তু আমিই লিখিব, এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে[২]— প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।

বোধ করি এই সময়েই 'বউঠাকুরানীর হাট' নামে এক বড়ো নভেল লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।[৩]

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বউঠাকুরানীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছি এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলটপালট হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্ণের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই-যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদুমাত্র। কখনোই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে— আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়াছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে-শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে— তাহা আনন্দময় সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে

১ প্রকাশ, বৈশাখ ১৮০৫ শক [১৮৮৩]। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

২ ভাদ্র ১৮০৫ শক [১৮৮৩]। রবীন্দ্র-রচনাবলী-অ ১

৩ দ্র ভারতী, কার্তিক ১২৮৮ - আশ্বিন ১২৮৯। গ্রন্থপ্রকাশ, পৌষ ১৮০৪ শক [১৮৮৩]। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত। আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমত দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয়, সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম— কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই, তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-ইস্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি[১] নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। সেইদিনই কিংবা তাহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, "আচ্ছা মশায়, আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।" আমাকে স্বীকার করিতেই হইত, দেখি নাই— তখন সে বলিত, "আমি দেখিয়াছি।" যদি জিজ্ঞাসা করিতাম "কিরূপ দেখিয়াছ" সে উত্তর করিত, চোখের সম্মুখে বিজবিজ করিতে থাকেন। এরূপ মানুষের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় কালযাপন সকল সময়ে প্রীতিকর হইতে পারে না। বিশেষত, তখন আমি প্রায় লেখার ঝোঁকে থাকিতাম। কিন্তু লোকটা ভালোমানুষ ছিল বলিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম না, সমস্ত সহিয়া যাইতাম।

এইবার, মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "এসো এসো।" সে যে নির্বোধ এবং অদ্ভুতরকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম সে তাহার ভিতরকার লোক— আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না, মনে হইল না যে আমার সময় নষ্ট হইবে, তখন আমার ভারি আনন্দ হইল— বোধ হইল, এই আমার মিথ্যাজাল কাটিয়া গেল, এতদিনে এই সম্বন্ধে নিজেকে বার বার যে কষ্ট দিয়াছি তাহা অলীক এবং অনাবশ্যক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত ; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না— বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারি দিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে-গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই— এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর

১ প্রথম প্রকাশ, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৯

"আমি সেই দিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিলাম।— একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তি দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"— পাণ্ডুলিপি

সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে— সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর-একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম[১]—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন সময়ে জ্যোতিদাদারা স্থির করিলেন, তাঁহারা দার্জিলিঙে যাইবেন। আমি ভাবিলাম, এ আমার হইল ভালো— সদর স্ট্রীটে শহরের ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরো ভালো করিয়া, গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে।

কিন্তু সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন-না, তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমি দেবদারুবনে ঘুরিলাম, ঝরনার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম— কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া এখন কৌটা দেখিতেছি। কিন্তু কৌটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক্, তাহাকে আর কেবল শূন্য কৌটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।

প্রভাতসংগীতের গান থামিয়া গেল, শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ প্রতিধ্বনি নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম।[২] সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে, একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থনির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না। ইহার মধ্যে সুখের বিষয় এই যে, দুজনের কাহাকেও হারের টাকা দিতে হইল না। হায় রে, যেদিন পদ্মের উপরে এবং বর্ষার সরোবরের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলাম সেই অত্যন্ত পরিষ্কার রচনার দিন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে।

কিছু-একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে 'বুঝিলাম না' তখন বিষম মুশকিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে 'কিছু বুঝিলাম না' তাহাকে এই কথা বলিতে হয়, ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ। উত্তর শুনি, 'সে তো জানি, কিন্তু খামকা গন্ধই বা কেন, ইহার মানেটা কী।' হয় ইহার জবাব বন্ধ করিতে হয়, নয় খুব একটা ঘোরালো করিয়া বলিতে হয়, প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ এমনি করিয়া গন্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষকে যে কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয় সে কথার যে মানে আছে। এইজন্য তো ছন্দোবন্ধ প্রভৃতি নানা উপায়ে কথা কহিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি উলটপালট করিয়া দিয়া কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, যাহাতে কথার ভাবটা বড়ো হইয়া কথার

১ দ্র 'প্রভাত-উৎসব', ভারতী, পৌষ ১২৮৯
২ 'প্রতিধ্বনি', প্রভাতসংগীত; দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, পৃ ৭৬

অর্থটাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবটা তত্ত্বও নহে, বিজ্ঞানও নহে, কোনোপ্রকারের কাজের জিনিস নহে, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মতো অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা আর-কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিস মিলাইয়া দিতে পার তো দাও কিন্তু সেটা গৌণ। খেয়ানৌকায় পার হইবার সময় যদি মাছ ধরিয়া লইতে পার তো সে তোমার বাহাদুরি কিন্তু তাই বলিয়া খেয়ানৌকা জেলেডিঙি নয়— খেয়ানৌকায় মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গালি দিলে অবিচার করা হয়।

প্রতিধ্বনি কবিতাটা আমার অনেকদিনের লেখা— সেটা কাহারও চোখে পড়ে না সুতরাং তাহার জন্য কাহারও কাছে আজ আমাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। সেটা ভালোমন্দ যেমনি হোক এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধা লাগাইবার জন্য সে-কবিতাটা লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর তত্ত্বকথা ফাঁকি দিয়া কবিতায় বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।

আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে-একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর-কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

ওগো প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে— প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি, কেননা ইহা যে দেখা গেছে, একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই আর-একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্-একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে— এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ-হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্বচনীয়রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানেই আমাদের প্রীতি; সেখানে আমাদেরও মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। প্রতিধ্বনি কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টার ফলটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না, কারণ চেষ্টাটাই আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়া জানিত না।

আরো কিছু অধিক বয়সে প্রভাতসংগীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করি—

"'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'— ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে, সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়— যেমন নবোদ্‌গতদন্ত

শিশু মনে করেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন।

"ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায়, মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনো-কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাতসংগীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর-কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।"

প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা সাধারণভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়— বিলের জল ক্রমে যেন নদী হইয়া বাহির হইতে চায়— তখন পূর্বরাগ অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তুত, অনুরাগ পূর্বরাগের অপেক্ষা এক হিসাবে সংকীর্ণ। তাহা একগ্রাসে সমস্তটা না লইয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে চাপিয়া লইতে থাকে। প্রেম তখন একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে যাহা পায় তাহা কেবল নিজের মনের একটা অনির্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে— বাহিরের সহিত, প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্বাঙ্গীণ সত্য হইয়া উঠে।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলিকে 'নিষ্ক্রমণ' নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। তার পরে সুখদুঃখ-আলোক-অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে-একে খণ্ডে-খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে— অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর-একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে, তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্মাল স্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীলমেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে— মনটা তখনই এক নিমিষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে অনাবৃত হইয়া গেল— সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগি করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল— চেতনা তখন আপনার ভিতর দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্‌ণ হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনই পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল। শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরো একটু বিচিত্র হইয়া শুরু হইয়া, আবার আরো একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চলিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে— পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া

বাড়িতে থাকে— প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।

যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাতসংগীত যখন লিখিতেছিলাম কিংবা তাহার কিছু পর হইতে ঐরূপ গদ্য লেখাগুলি আলোচনা[১] নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।[২]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এই সময়ে বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ[৩] স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান সাহিত্যপরিষৎ[৪] যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র[৫] মহাশয় উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকেই এই সভায় সভাপতি করা হইয়াছিল। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভার আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো— 'হোমরাচোমরা'দের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলিবে না।" এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন,[৬] কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

বলিতে গেলে যে-কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল।[৭] পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের ছিল।

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল— হোমরাচোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

১ প্রকাশ, (?) এপ্রিল ১৮৮৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী-অ ২

২ "সদরস্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর-একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্‌স্‌লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্ইয়ার নিউকোম প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষতত্ত্ব আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত"— পাণ্ডুলিপি।

৩ 'সারস্বত সমাজ', প্রথম অধিবেশন, ২ শ্রাবণ ১২৮৯
দ্র 'কলিকাতা সারস্বত-সম্মিলনী', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯

৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, প্রতিষ্ঠা বৈশাখ ১৩০১

৫ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)

৬ অন্যতম 'সহযোগী সভাপতি' রূপে

৭ 'ভৌগোলিক পরিভাষা' (?), ১২৯০

এ পর্যন্ত বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।

মানিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ছিল সেখানে আমি যখন-তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম— দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনাবশতই অসংকোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মুহূর্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। এইজন্য পারতপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনসমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে-সব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেনসিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক-একদিন সেইরূপ কোনো-একটা বই উপলক্ষ করিয়া তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা-কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। তখন যে বাংলাসাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত, তবে বর্তমান সাহিত্য-পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মতো অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া, ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন— অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এমন-কি, আমি তাঁহার কাছ হইতে 'যমের কুকুর'[1] নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইতে পারিয়াছিলাম ; তখনকার কালের আর-কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং এতটা প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না। অথচ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। ম্যুনিসিপাল-সভায় সেনেট-সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল[2] ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এসিয়াটিক সোসাইটি[3] সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে, এই উপলক্ষে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে আমিই বুঝি কৃতী, আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র। কলম-বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন্-একদিন সে মনে করিয়া বসিত— লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালি পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ

১ ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯

২ কৃষ্ণদাস পাল (? ১৮৩৮-৮৪)

৩ ইং১৮৪৬ সালে রাজেন্দ্রলাল ইহার "আসিস্টান্ট সেক্রেটারি ও লাইব্রেরিয়ানের পদ" পান, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ইহার প্রেসিডেন্ট হন।

কোনো সম্মান লাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ ইহার মৃত্যুর[১] অনতিকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু[২] ঘটে— সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগবেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার আর-একটা কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এইজন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

কারোয়ার

ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমরা সদর স্ট্রীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে স্থিত কর্নাটের প্রধান নগর। তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ। মেজদাদা তখন সেখানে জজ ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে— সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য; এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে, একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকায় করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজির একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন, পাহাড় এবং এই নির্জন সংকীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল। আমরা তীরে নামিয়া একজন চাষার কুটিরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের ঢালু ছায়াটির উপর দিয়া যেখানে চাঁদের আলো আড় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে তাহাদের দাওয়াটির সামনে আসন পাতিয়া আহার করিয়া লইলাম। ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি[৩] লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত। সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। কিন্তু আশা করি জীবনস্মৃতির মধ্যে তাহাকে এইখানে একটি আসন দিলে তাহার পক্ষে অনধিকার-প্রবেশ হইবে না।—

যাই যাই ডুবে যাই, আরো আরো ডুবে যাই
বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্ খানে কোন্ দূরে, নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন।

১। ১১ শ্রাবণ ১২৯৮
২। ১৩ শ্রাবণ ১২৯৮
৩। 'পূর্ণিমায়', ভারতী, পৌষ ১২৯০। দ্র ছবি ও গান, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

হে ধরণী, পদতলে দিয়ো না দিয়ো না বাধা,
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও।
অনন্ত দিবসনিশি এমনি ডুবিতে থাকি,
তোমরা সুদূরে চলে যাও।...
তোমরা চাহিয়া থাকো, জ্যোৎস্না-অমৃত-পানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি ;
অপার দিগন্ত ওগো, থাকো এ মাথার 'পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি।
গান নাই, কথা নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম, নাই জাগরণ—
কোথা কিছু নাহি জাগে, সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লাগে,
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে,
তারে যেন দেখা নাহি যায় ;
নিশীথের মাঝে শুধু মহান একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়!
গাও বিশ্ব, গাও তুমি সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান,
শতলক্ষ যাত্রী লয়ে কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

এ কথা এখানে বলা আবশ্যক, কোনো সদ্য-আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে— কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয়, সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই— মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'[১] নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া, একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব-কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল— ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখে মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝবাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কী করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর মধ্যে এক দিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী— তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর-এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল— এই প্রকৃতির প্রতিশোধ -এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার[২] ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

তখনো আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।[৩] সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর স্থান কী তাহা জানি না— কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

১ রচনা ১২৯০, গ্রন্থপ্রকাশ ১২৯১ (১৮৮৪)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১
২ ৩০-সংখ্যক কবিতা, নৈবেদ্য (১৩০৮), রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮ (সুলভ ৪)
৩ দ্র 'ডুব দেওয়া' ভারতী, বৈশাখ ১২৯১; রবীন্দ্র-রচনাবলী অ ২

হ্যাদে গো নন্দরানী—
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে যাইতেছে— সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না— সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়— সেইখানেই মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে— দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য— পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট— কেননা, সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ[১] হয়, তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর।

ছবি ও গান

ছবি ও গান[২] নাম ধরিয়া আমার যে-কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগান-বাড়িতে[৩] আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত— সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে ; আমিও সেইদিন নবযৌবনের নানান রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলই রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশবছর বয়সের সঙ্গে

১ মৃণালিনী [ভবতারিণী] দেবীর সহিত। মৃণালিনী দেবী (১২৮০-১৩০৯)

২ গ্রন্থপ্রকাশ, শক ফাল্গুন ১৮০৫ [১৮৮৪]। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১

"এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা"— বিজ্ঞাপন, প্রথম সংস্করণ

দ্র রবীন্দ্রনাথের 'চিঠি', সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ ২৩৬। গ্রন্থপরিচয়

৩ ২৩৭ নং লোয়ার সার্কুলার রোড -এর বাড়ি, সত্যেন্দ্রনাথ ভাড়া লইয়াছিলেন।

এই ছবিগুলাকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা-কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্বেই লিখিয়াছি, প্রভাতসংগীতে একটা পর্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর-একরকম করিয়া শুরু হইল। একটা জিনিসের আরম্ভের আয়োজনে বিস্তর বাহুল্য থাকে। কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে তত সে-সমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নূতন পালার প্রথমের দিকে বোধ করি বিস্তর বাজে জিনিস আছে। সেগুলি যদি গাছের পাতা হইত তবে নিশ্চয় ঝরিয়া যাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা তো অত সহজে ঝরে না, তাহার দিন ফুরাইলেও সে টিকিয়া থাকে। নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গান-এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসংগীতের ঝংকার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। এক-একদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে। ছোটো শিশু যেমন ধুলা বালি ঝিনুক শামুক যাহা-খুশি তাহাই লইয়া খেলিতে পারে, কেননা তাহার মনের ভিতরেই খেলা জাগিতেছে; সে আপনার অন্তরের খেলার আনন্দ দ্বারা জগতের আনন্দখেলাকে সত্যভাবেই আবিষ্কার করিতে পারে, এইজন্য সর্বত্রই তাহার আয়োজন; তেমনি অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানা সুরে ভরিয়া ওঠে তখনই আমরা সেই বোধের দ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার-লক্ষ তার নিত্য সুরে যেখানে বাঁধা নাই এমন জায়গাই নাই— তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দূরে যাইতে হয় না।

বালক

'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'-এর মাঝখানে বালক[1] নামক একখানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসংবরণ[2] করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবউঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র[3] বলেন্দ্র[4] প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না— ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা, এ কী! এ-যে রক্ত!" বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।— জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ

১ প্রকাশ, বৈশাখ ১২৯২। সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

২ বৈশাখ ১২৯৩ হইতে বালক ভারতী-র সহিত যুক্ত হয়

৩ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯) দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র

৪ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-৯৯) দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র

গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি[১] গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।

তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কী আমার জীবনে কী আমার গদ্যে পদ্যে, কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তখনো যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম— এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূরপ্রবাসের অতিথির মতো অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত।— কিন্তু শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার ছোটো ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার আর সীমা নাই; তাহারা যেন নোঙরছেঁড়া নৌকা— কোনো তাহাদের প্রয়োজন নাই, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারই মধ্যে দুই-একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন ছিল না— তখন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল পড়িবার বেতন দিয়াছি যাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ-পর্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বাচুলওয়ালা ছেলে তাহার কাল্পনিক ভগিনীর এক চিঠি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মতো কাল্পনিক এক বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটিই কাল্পনিক নহে, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু যে-পাখি উড়িতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তাগবাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক— ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, সে বি. এ. পড়িতেছে কিন্তু মাথার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শুনিয়া আমি উদ্‌বিগ্ন হইলাম কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্তারি বিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না, সুতরাং কী উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, "স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্বজন্মে আপনার স্ত্রী আমার মাতা ছিলেন, তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে।" বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আপনি বোধ হয় এ-সমস্ত বিশ্বাস করেন না।" আমি বলিলাম, "আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার রোগ যদি সারে তো সারুক।" স্ত্রীর পাদোদক বলিয়া একটা জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অন্নে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসংকোচে সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘর ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমেই অত্যন্ত স্থূল কয়েকটি ঘটনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতে লাগিল, তাহার অন্য যে-ব্যাধি থাক্ মস্তিষ্কের দুর্বলতা ছিল না। ইহার পরে পূর্বজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষেও কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম, এ-সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন চিঠি পাইলাম, আমার গতজন্মের একটি কন্যাসন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, পুত্রটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু গতজন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

এ দিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার[২] মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো-কোনোদিন দিনও এমনি করিয়া কাটিত। আসল কথা, মানুষের 'আমি' বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট হইয়া না ওঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়, আমার তখন সেইরূপ অবস্থা।

১ বালক, আষাঢ়-মাঘ ১২৯২, প্রথম ২৬ অধ্যায়। গ্রন্থপ্রকাশ ১২৯৩ [১৮৮৭]। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২(সুলভ ১)

২ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (? ১৮৫৮-১৯০৮)। দ্র পত্র নং ২, ৩ ছিন্নপত্র

বঙ্কিমচন্দ্র[১]

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা।[২] তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন।[৩] বোধ করি তিনি আশা করিয়াছিলেন কোনো-এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব— সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কী একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবাবয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্মান যোদ্ধ কবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জমা তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিবীরের বামপার্শ্বের প্রেয়সী সঙ্গিনী তরবারির প্রতি তাঁহার প্রেমোল্লাসগীতি যে একদিন চন্দ্রনাথবাবুর প্রিয় কবিতা ছিল ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবেন যে, কেবল যে এক সময়ে চন্দ্রনাথবাবু যুবক ছিলেন তাহা নহে, তখনকার সময়টাই কিছু অন্যরকম ছিল।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র— যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে, কেবলমাত্র, তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল, তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ ঘটে নাই। অবশেষে একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন[৪] সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ, আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।

তাহার পরে বয়সে আরো কিছু বড়ো হইয়াছি ; সে-সময়কার লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)

২ ইং১৮৭৬, জানুয়ারি মাসে "রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'এমারেল্ড বাওয়ারে' দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়ন নামক মিলন-সভায়"— চরিতমালা ২২। দ্র 'বঙ্কিমচন্দ্র', রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৪০৭ (সুলভ ৫)

৩ চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) সেই বৎসর সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন

৪ ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর ১৮৮১

একটা আসন পাইয়াছি— কিন্তু সে-আসনটা কিরূপ ও কোন্‌খানে পড়িবে তাহা ঠিকমত স্থির হইতেছিল না ; ক্রমে ক্রমে যে একটু খ্যাতি পাইতেছিলাম তাহার মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ও অনেকটা পরিমাণে অবজ্ঞা জড়িত হইয়া ছিল ; তখনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতি ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমার্সন, কেহ আর-কিছু ; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন— সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল ; তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি ; তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্য পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি, সুতরাং তাহাকে ভালো বলিতে গেলেও জোর দিয়া প্রশংসা করা যাইত না। তখন আমার বেশ ভূষা ব্যবহারেও সেই অর্ধস্ফুটতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল ; চুল ছিল বড়ো বড়ো এবং ভাবগতিকেও কবিত্বের একটা তুরীয় রকমের শৌখিনতা প্রকাশ পাইত ; অত্যন্তই খাপছাড়া হইয়াছিলাম, বেশ সহজ মানুষের প্রশস্ত প্রচলিত আচার-আচরণের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়া সকলের সঙ্গে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারি নাই।

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় নবজীবন[১] মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন— আমিও তাহাতে দুটা-একটা লেখা দিয়াছি।[২]

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার[৩] বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচার-এ একটি গান[৪] ও কোনো বৈষ্ণব-পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য-ভাবোচ্ছ্বাস[৫] প্রকাশ করিয়াছি।

এই সময়ে কিংবা ইহারই কিছু পূর্ব হইতে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি[৬], তখন তিনি ভবানীচরণ দত্তর স্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি-কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না। এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু[৭] তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা-কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত— ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া ; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে।[৮] বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত

১ প্রকাশ শ্রাবণ ১২৯১

২ 'বৈষ্ণব কবির গান' (কার্তিক ১২৯১), 'রাজপথের কথা' (অগ্রহায়ণ ১২৯১), ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী (শ্রাবণ ১২৯২)

৩ প্রকাশ, শ্রাবণ ১২৯১, মাসিকপত্র, সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ 'মথুরায়' (মাঘ ১২৯১)। দ্র কড়ি ও কোমল

৫ দ্র 'বৈষ্ণব কবির গান', রবীন্দ্র-রচনাবলী-অ ২। বস্তুত ইহা নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রচার-এ 'কাঙালিনী' (কার্তিক ১২৯১) ও 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি' (অগ্রহায়ণ ১২৯১) কবিতা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্র কড়ি ও কোমল

৬ ইং ১৮৮২ সালে "বঙ্কিমের বাসা কলিকাতায় বউবাজার স্ট্রীটে ছিল,-- দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন।... ১৮৮২ খৃস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাটীতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ ছিল"— চরিতমালা ২২

৭ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯), বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ

৮ বাংলা ? ১২৯১। দ্র 'পিতাপুত্র', বঙ্গ-ভাষার লেখক, পৃ ৬৪৫-৪৬

মৃত্যুশোক

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প।[১] অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়— তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।" তখনই বউঠাকুরানী[২] তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন— পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না— সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম ; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম— তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ[২] ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ— শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম— তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত— আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ; জগতে তাহার আর অন্ত নাই— তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

কিন্তু আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর[৩] সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়— কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত

১ সারদাদেবীর মৃত্যু, ২৫ ফাল্গুন, ১২৮১, [৮ মার্চ ১৮৭৫]— রবীন্দ্র-কথা

২ কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী

৩ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, ৮ বৈশাখ ১২৯১ [১৯ এপ্রিল ১৮৮৪]— রবীন্দ্র-জীবনী ১ (১৩৭৭), পৃ ১৯৭

সারদা দেবী

সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমনসময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল— এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া![1]

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি— যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে— তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারি দিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারি দিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না— একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না— এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারি দিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল।

১ দ্র 'কোথায়' (ভারতী, পৌষ ১২৯১) কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১) 'পুষ্পাঞ্জলি' (ভারতী, বৈশাখ ১২৯২) এবং 'প্রথম শোক' ('কথিকা', সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২৬) লিপিকা

আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ-দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের[১] বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতলায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এ-সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টর্লনি মনুমেন্টটা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ঐটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল— পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারি দিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ

এক-এক বৎসরে বিশেষ এক-একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তাহার সংবাদ পাই। তেমনি দেখিতেছি, জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক-একটি ঋতু বিশেষভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি।[২] বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি; দরমায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে; অপরাহ্নে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে; দেখিতে দেখিতে

১ Thacker Spink & Co.

২ দ্র 'বর্ষার চিঠি', বালক, শ্রাবণ ১২৯২। দ্র গ্রন্থপরিচয় ১৭

নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোন্ পাগলী ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; বাতাসের দমকায় দরমার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়; অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না— পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড়-বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি-মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়— সেই শিশিরে ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি— সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।[১]

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে— বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল— একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না; সেও শরতের দিনে।—

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপনমনে।[২]

মনে পড়ে, দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি-আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপনমনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এ দিকে সেই কর্মহীন শরৎমধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ— সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা-বোঝাই-করা শরৎ— আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার

১ দ্র 'আকাঙ্ক্ষা', কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১)
২ দ্র 'সারাবেলা', কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২

হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই-সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

'কড়ি ও কোমল'[1] মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।[2]

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যখন যাত্রা করি[3] তখন আশুর[4] সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম· এ· পাস করিয়া কেম্‌ব্রিজে ডিগ্রি লইয়া ব্যারিস্টর হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত কেবল কয়টা দিন মাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিল না সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়সম্বন্ধ[5] স্থাপিত হইল। তখনো ব্যারিস্টরি ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া ল-য়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণবিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধুসঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন।[6] তখন দেখিতাম, সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে-সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরি-শেল্‌ফের মরক্কো-চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিল না। সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন্‌-একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই-সকল লেখায় তিনি ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূলকথা।

১ দ্র পৃ ৫১১, পাদটীকা
২ দ্র 'প্রাণ', কড়ি ও কোমল -এর প্রথম কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ৪)
৩ দ্র পৃ ৪৮৬, পাদটীকা ৩
৪ স্যার আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)
৫ হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীর সহিত বিবাহ হয়, শ্রাবণ ১২৯৩ [১৮৮৬]
৬ দ্র আশুতোষ চৌধুরী -লিখিত প্রবন্ধ 'কাব্যজগৎ', 'কথার উপকথা'— ভারতী ও বালক, ১২৯৩

আশু বলিলেন, "তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।" তাঁহারই 'পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'— এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

অসম্ভব নহে। বাল্যকালে যখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম তখন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া দিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেয়ানৌকা পাল তুলিয়া ঢেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে, তীরে দাঁড়াইয়া আমার মন বুঝি তাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন-যে জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায়।

কড়ি ও কোমল[১]

জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার পক্ষে আমার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত কোনো বাধা ছিল বলিয়াই যে আমি পীড়াবোধ করিতেছিলাম, সে কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের যাহারা সমাজের মাঝখানটাতে পড়িয়া আছে তাহারাই যে চারি দিক হইতে প্রাণের প্রবল বেগ অনুভব করে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। চারি দিকে পাড়ি আছে এবং ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে ; স্নিগ্ধ পল্লবরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোকিল পুরাতন পঞ্চমস্বরে ডাকিতেছে— কিন্তু এ তো বাঁধাপুকুর, এখানে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে। মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগরযাত্রায় চলিয়াছে, তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কি আমার ঐ গলির ওপারটার প্রতিবেশীসমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। তাহা নহে। যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা-ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে-দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল— আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না।[২] আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারি দিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত ; আমার প্রাণ বলিত— 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!'[৩]

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে—
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।[৪]

এ তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই ; আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র— সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই।

১ প্রকাশ, ১২৯৩ [১৮৮৬]— রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১)
২ তু আত্মশক্তি নামক গ্রন্থ, (১৩১২), রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩ (সুলভ ২)
৩ দ্র 'দুরন্ত আশা', মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১)
৪ দ্র 'কাঙালিনী' (প্রচার, কার্তিক ১২৯১), কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১)

মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলই জীবনের উপরে চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে, কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই— এ দিকে খেতে খেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই-সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে-একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।[1] সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর যাহা-কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম।

১ দ্র 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', বঙ্গভাষার লেখক। আত্মপরিচয় গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধ রূপে পুনর্মুদ্রিত।

সঞ্চয়

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া
তাঁহার প্রতি আমার হৃদয়ের
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন
করিলাম।

সঞ্চয়

রোগীর নববর্ষ

আমার রোগশয্যার উপর নববৎসর আসিল। নববৎসরের এমন নবীন মূর্তি অনেকদিন দেখি নাই।

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড়ো জিনিসকে ঠিক বড়ো করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিসকে খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। মানুষের ইতিহাসে যত বড়ো মহৎ ঘটনাই ঘটুক-না, নিজের পেটের ক্ষুধাকে উপস্থিতমত যদি একান্ত করিয়া না দেখা যায় তবে বাঁচাই শক্ত হয়। যে মজুর কোদাল হাতে মাটি খুঁড়িতেছে সে লোক মনেও ভাবে না যে সেই মুহূর্তেই রাজা-মহারাজার মন্ত্রণাসভায় রাজ্যসাম্রাজ্যের ব্যবস্থা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ যত বড়োই হোক, তবু মানুষের কাছে এক মুহূর্তের বর্তমান তাহার চেয়ে ছোটো নয়। এইজন্য এই-সমস্ত ছোটো ছোটো নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারী এমন যুগ-যুগান্তরের ভার নহে— এইজন্য তাহার চোখের সামনে এই নিমেষের পর্দাটাই সকলের চেয়ে মোটা— যুগ-যুগান্তরের প্রসারের মধ্যে এই পর্দার স্থূলতা ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। বিজ্ঞানে পড়া যায় পৃথিবীর গায়ের কাছের বাতাসের আচ্ছাদনটা যত ঘন, এমন তাহার দূরের আচ্ছাদন নহে— পৃথিবীর নীচের টানে ও উপরের চাপে তাহার আবরণ এমন নিবিড় হইয়া উঠে। আমাদেরও তাই। যত আমাদের কাছের দিকে, ততই আমাদের নিজের টানে ও পরের চাপে আমাদের মনের উপরকার পর্দা অত্যন্ত বেশি নিরেট হইয়া দাঁড়ায়।

শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। নিজের দিকে যতই টান দিব নিজের উপরকার ঢাকাটাকে ততই ঘন করিয়া তুলিব। এই টান হালকা হইলে তবেই পর্দা ফাঁক হইয়া যায়।

দেখিতেছি রুগ্‌ণ শরীরের দুর্বলতায় এই টানের গ্রন্থিটাকে খানিকটা আলগা করিয়া দিয়াছে। নিজের চারি দিকে যেন অনেকখানি ফাঁকা ঠেকিতেছে। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতে কাজ আছে আমি না হইলে তাহা সম্পন্নই হইবে না এই চিন্তায় নিজেকে একটুও অবসর দেওয়া ঘটে না, অবসরটাকে যেন অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্তব্যের যে অন্ত নাই, জগৎসংসারের দাবির যে বিরাম নাই ; এইজন্য যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ সমস্ত মন কাজের দিকে ছটফট করিতে থাকে। এই টানাটানি যতই প্রবল হইয়া উঠে ততই নিজের অন্তরের ও বাহিরের মাঝখানে সেই স্বচ্ছ অবকাশটি ঘুচিয়া যায়— যাহা না থাকিলে সকল জিনিসকে যথাপরিমাণে সত্য আকারে দেখা যায় না। বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশের উপরে আছে বলিয়াই, অর্থাৎ তাহা খানিকটা করিয়া আছে ও অনেকটা করিয়া নাই বলিয়াই তাহার ছোটো বড়ো নানা আকৃতি আয়তন লইয়া তাহাকে এমন বিচিত্র করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু জগৎ যদি আকাশে না থাকিয়া একেবারে আমাদের চোখের উপরে চাপিয়া থাকিত— তাহা হইলে ছোটোও যা বড়োও তা, বাঁকাও যেমন সোজাও তেমন।

তেমনি যখন শরীর সবল ছিল তখন অবকাশটাকে একেবারে নিঃশেষে বাদ দিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কেবল কাজ এবং কাজের চিন্তা ; কেবল অন্তবিহীন দায়িত্বের নিবিড় ঠেসাঠেসির মাঝখানে চাপা পড়িয়া নিজেকে এবং জগৎকে স্পষ্ট করিয়া ও সত্য করিয়া দেখিবার সুযোগ যেন একেবারে হারাইয়াছিলাম। কর্তব্যপরতা যত মহৎ জিনিস হোক, সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি

বড়ো হইয়া উঠিয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। সেটা একটা বিপরীত ব্যাপার। মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়ো।

এমন সময় শরীর যখন ধাঁকিয়া বসিল, বলিল, আমি কোনোমতেই কাজ করিব না তখন দায়িত্বের বাঁধন কাটিয়া গেল। তখন টানাটানিতে ঢিল পড়িতেই কাজের নিবিড়তা আলগা হইয়া আসিল— মনের চারি দিকের আকাশে আলো এবং হাওয়া বহিতে লাগিল। তখন দেখা গেল আমি কাজের মানুষ এ কথাটা যত সত্য, তাহার চেয়ে ঢের বড়ো সত্য আমি মানুষ। সেই বড়ো সত্যটির কাছেই জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া দেখা দেয়— বিশ্ববীণা সুন্দর হইয়া বাজে— সমস্ত রূপরসগন্ধ আমার কাছে স্বীকার করে যে "তোমারই মন পাইবার জন্য আমরা বিশ্বের প্রাঙ্গণে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

আমার কর্মক্ষেত্রেকে আমি ক্ষুদ্র বলিয়া নিন্দা করিতে চাই না কিন্তু আমার রোগশয্যা আজ দিগন্তপ্রসারিত আকাশের নীলিমাকে অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আজ আমি আপিসের চৌকিতে আসীন নই, আমি বিরাটের ক্রোড়ে শয়ান। সেইখানেই সেই অপরিসীম অবকাশের মাঝখানে আজ আমার নববর্ষের অভ্যুদয় হইল— মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কী সুগভীর আমি যেন আজ তাহার আস্বাদন পাইলাম। আজ নববর্ষ অতলস্পর্শ মৃত্যুর সুনীল শীতল সুবিপুল অবকাশপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝখানে জীবনের পদ্মটিকে যেন বিকশিত করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

তাই তো আজ বসন্তশেষের সমস্ত ফুলগন্ধ একেবারে আমার মনের উপরে আসিয়া এমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই তো আমার খোলা জানালা পার হইয়া বিশ্বআকাশের অতিথিরা এমন অসংকোচে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আলো যে ঐ অন্তরীক্ষে কী সুন্দর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর পৃথিবী ঐ তার পায়ের নীচে আঁচল বিছাইয়া কী নিবিড় হর্ষে পুলকিত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা যেন এত কাল দেখি নাই। এই আজ আমি যাহা দেখিতেছি এ যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি ; যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তব্ধ পূর্ণতা, তাহারই উপরে দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুরনিক্বণ, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।

আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজায় লক্ষ লক্ষ চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন ঘাত-প্রতিঘাত উচ্চকলরবে উতলা হইয়া ফিরিতেছে— কিন্তু সেও তো ঐ বাহিরের প্রাঙ্গণে। আমি দেখিতেছি ঐ যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের পর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেঘ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাবি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল— ভিতর বাড়িতে একি দেখা যায় ! সেখানে আলোয় তো চোখ ঠিকরিয়া পড়ে না, সেখানে সৈন্যসামন্তে ঘর জুড়িয়া তো দাঁড়ায় নাই ! সেখানে মণি নাই মানিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে তো মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধুলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে, তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজ-আস্তরণ তো কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবকযুবতীরা মালা বদল করিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়াছে কিন্তু রাজোদ্যানের মালী আসিয়া তো কিছুমাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। বৃদ্ধ সেখানে কর্মশালার বহু কালিমাচিহ্নিত অনেকদিনের জীর্ণ কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পট্টবসন পরিতেছে, কোথাও তো কোনো নিষেধ দেখি না। ইহাই আশ্চর্য যে এত ঐশ্বর্য এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন ! ইহাই আশ্চর্য, পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ময় লোকলোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোটো নয়, সামান্য নয়, অসংগত নয়— সেজন্য কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছে না। সবাই বলিতেছে তোমার ঐটুকু খেলা, ঐটুকু হাসিকান্নার জন্যই এত আয়োজন— ইহার যতটুকুই তুমি গ্রহণ করিতে পার ততটুকুই সে তোমারই— যতদূর পর্যন্ত তুমি দেখিতেছ সে তোমারই দুই চক্ষুর ধন— যতদূর পর্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে তোমারই মনের সম্পত্তি। তাই এত বড়ো জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না— ইহার অন্তবিহীন ভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরো ভিতরে যাও— সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য। সেইখানেই ধরা পড়ে,

কৌটার মধ্যে কৌটা, তাহার মাঝখানে যে রত্নটি সেই তো প্রেম। কৌটার বোঝা বহিতে পারি না কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমনি যে, তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বুকের কাছে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বড়ো নিভৃতে ঐ একটি প্রেম আছে— চারি দিকে সূর্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার মাঝখানকার স্তব্ধতার মধ্যে ঐ প্রেম ; চারি দিকে সপ্তলোকের ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহারই মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ঐ প্রেম। ঐ প্রেমের মূল্যে ছোটোও যে সে বড়ো, ঐ প্রেমের টানে বড়োও যে সে ছোটো। ঐ প্রেমই তো ছোটোর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়োর সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ঐ প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারই ভাষাতে গান করিতেছে— সেখানে একি কাণ্ড ! সেখানে নির্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উন্মুখ গুচ্ছ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিঃশব্দচরণে দূত আসিল ! এও কি বিশ্বাস করিতে পারি ! হাঁ সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত। সেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করিল। সেই তো এতবড়ো জগতের মাঝখানেও এত ছোটোকে বড়ো করিয়া তুলিল। বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না, সে যে আপনারই আনন্দে ছোটোকে গৌরব দান করিতে পারে।

এইজন্যই তো ছোটোকে তাহার এতই দরকার। নইলে সে আপনার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কী করিয়া ? ছোটোর কাছে সে আপনার অসীম বৃহত্ত্বকে বিকাইয়া দিয়াছে ; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়, ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সেই জন্যই এমন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাখচিত আকাশের নীচে, এই পুষ্পবিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্র-বেলায় ছোটোর কাছে বড়ো আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোটো হইয়াও ছোটো নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার ; প্রত্যেক তিলপরিমাণ দেশকে ও পলপরিমাণ কালকে অসীমত্বে উদ্ভাসিত করা তাহার স্বভাব ;— আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় সুখেদুঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা।

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ সেই সংসার তো আছেই— কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিন-মজুরি লইতে হইবে ? সেইখানেই কি চরম দেনাপাওনা ? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিল ভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে ফলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই, কেবল আনন্দ আছে ; কর্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়— সেখানে একবার যাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া, হাসিমুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেবলই আপনাকে আপনিই জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে ? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই— অমৃতহস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন— হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ হইয়া সেইখানে চল্‌— আজ নববর্ষের পাখি সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অযাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্য প্রতি বৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিল না বলিয়া সেই কথাটি আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিবার সময় পাইলাম— আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণপত্রটিকে প্রণাম করিয়া মাথায় করিয়া গ্রহণ করি।

১৩১৯

রূপ ও অরূপ

জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়া বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বলে না, আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু পরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহারকালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই জানি। স্ফটিক জিনিসটা যে কঠিন জিনিস তাহা দুর্যোধন একদিন ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন অথচ আলোকের কাছে যেন সে জিনিসটা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এদিকে যে মহাপ্রবল আকর্ষণ সূর্য হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে সূর্যে প্রসারিত, যাহা লক্ষ কোটি হাতির বলকে পরাস্ত করে আমরা তাহার ভিতর দিয়া চলিতেছি কিন্তু মাকড়সার জালটুকুর মতোও তাহা আমাদের গায়ে ঠেকিতেছে না। আমাদের সম্বন্ধে যেটা আছে এবং যেটা নাই অস্তিত্বরাজ্যে যমজ ভাইয়ের মতো তাহারা হয়তো উভয়েই পরমাত্মীয়; তাহাদের মাঝখানে হয়তো একেবারেই ভেদ নাই। বস্তুমাত্রই একদিক থেকে দেখিতে গেলে বাষ্প— সেই বাষ্প ঘন হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে দৃঢ় আকারে বদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখি, কিন্তু উত্তাপের তাড়ায় তাহা আলগা হইয়া গেলেই মরীচিকার মতো তাহা ক্রমশই দৃষ্টির অগোচর হইবার উপক্রম করিতে থাকে। বস্তুত হিমালয় পর্বতের উপরকার মেঘের সহিত হিমালয়ের প্রভেদকে আমরা গুরুতর বলি বটে কিন্তু সেই গুরুতরত্ব ভাবিয়া দেখিলেই লঘু হইয়া পড়ে। মেঘ যেমন অদৃশ্য বাষ্পের চেয়ে নিবিড়তর, হিমালয়ও সেইরূপ মেঘের চেয়ে নিবিড়তর।

তার পর কালের ভিতর দিয়া দেখো সমস্ত জিনিসই প্রবহমান। তাই আমাদের দেশে বিশ্বকে জগৎ বলে— সংসার বলে; তাহা মুহূর্তকাল স্থির নাই, তাহা কেবলই চলিতেছে, সরিতেছে।

যাহা কেবলই চলে, সরে, তাহার রূপ দেখি কী করিয়া? রূপের মধ্যে তো একটা স্থিরত্ব আছে। যাহা চলিতেছে, তাহাকে, যেন চলিতেছে না, এমন ভাবে না দেখিলে আমরা দেখিতেই পাই না। লাটিম যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে তখন আমরা তাহাকে স্থির দেখি। মাটি ভেদ করিয়া যে অঙ্কুরটি বাহির হইয়াছে প্রতি নিমেষেই তাহার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়াই তাহার পরিণতি ঘটে। কিন্তু যখন তাহার দিকে তাকাই সে কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখায় না; যেন অনন্তকাল সে এইরকম অঙ্কুর হইয়াই খুশি থাকিবে, যেন তাহার বাড়িয়া উঠিবার কোনো মতলবই নাই। আমরা তাহাকে পরিবর্তনের ভাবে দেখি না, স্থিতির ভাবেই দেখি।

এই পৃথিবীকে আমরা ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ইহাকে ধ্রুব বলিয়া বর্ণনা করিতেছি— ধরণী আমাদের কাছে ধৈর্যের প্রতিমা। কিন্তু বৃহৎকালের মধ্যে ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার ধ্রুবরূপ আর দেখি না তখন ইহার বহুরূপী মূর্তি ক্রমেই ব্যাপ্ত হইতে হইতে এমন হইয়া আসে যে, আমাদের ধারণার অগোচর হইয়া যায়। আমরা বীজকে ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বীজরূপে দেখিতেছি কিন্তু বৃহৎকালে তাহাকে দেখিতে গেলে তাহা গাছ হইয়া অরণ্য-পরম্পরার মধ্য দিয়া নানা বিচিত্ররূপে ধাবিত হইয়া পাথুরে কয়লার খনি হইয়া আগুনে পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া ছাই হইয়া ক্রমে যে কী হইয়া যায় তাহার আর উদ্দেশ পাওয়াই শক্ত।

আমরা ক্ষণকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত তাহার সে রূপ নাই কেননা সত্যই তাহা বদ্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার জন্য জানিবার জন্য তাহাকে স্থির করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে যে নাম দিতেছি সে নাম তাহার চিরকালের সত্য নাম নহে। এইজন্যই আমরা যাহা-কিছু দেখিতেছি জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে মায়া বলা হইয়াছে। নাম ও রূপ যে শাশ্বত নহে এ কথা আমাদের দেশের চাষারাও বলিয়া থাকে।

কিন্তু গতিকে এই যে স্থিতির মধ্য দিয়া আমরা জানি এই স্থিতির তত্ত্বটা তো আমাদের নিজের গড়া নহে। আমাদের গড়িবার ক্ষমতা কিসের? অতএব, গতিই সত্য, স্থিতি সত্য নহে, এ কথা বলিলে চলিবে কেন? বস্তুত সত্যকেই আমরা ধ্রুব বলিয়া থাকি, নিত্য বলিয়া থাকি। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতিসূত্রে আমরা যাহা-কিছু জানিতেছি নহিলে সে জানার বালাইমাত্র থাকিত না— তাহাকে

মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি, নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্র অর্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই-সমস্ত নিমেষ মুহূর্তগুলিকে আমরা এক দিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর-এক দিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতাসূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এইজন্যই কাল বিশ্বচরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চক্‌মকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গপরম্পরার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার মতো প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্তকালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্তকে অন্য মুহূর্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি, বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।

যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা এক দিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর-এক দিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। এক দিকে তাহা হইয়াছে আর-এক দিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলই চলিতেছে। এইজন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার। এইজন্য কোনো বিশেষরূপ আপনাকে চরমভাবে বদ্ধ করে না— যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।

তাই যাঁহারা অনন্তের সাধনা করেন, যাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদিগকে বার বার এ কথা চিন্তা করিতে হয়, চারি দিকে যাহা-কিছু দেখিতেছি জানিতেছি ইহাই চরম নহে, স্বতন্ত্র নহে, কোনো মুহূর্তেই ইহা আপনাকে আপনি পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছে না। যদি তাহা করিত তবে ইহারা প্রত্যেকে স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ হইয়া স্থির হইয়া থাকিত। ইহারা অন্তহীন গতি দ্বারা যে অন্তহীন স্থিতিকে নির্দেশ করিতেছে সেইখানেই আমাদের চিত্তের চরম আশ্রয় চরম আনন্দ।

অতএব আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে-কোনো বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই-সমস্ত নাম রূপের আবরণ চিরন্তন হইত। যদি ইহারা অবিশ্রাম প্রবহমান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত, তবে ইহারা ছাড়া আর-কিছুর জন্য কোনো চিন্তাও মানুষের মনে মুহূর্তকালের জন্য স্থান পাইত না— তবে ইহাদিগকেই সত্য জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতাম— তবে বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই-সমস্ত অচল প্রত্যক্ষ সত্যের ভীষণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া একেবারে মূক হইয়া মূর্ছিত হইয়া থাকিত। ইহার পিছনে কিছুই দেখিতে পাইত না। কিন্তু সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনো মতে উজান পথে চলিতে পারে না।

এই তো আধ্যাত্মিক সাধনা। শিল্প-সাহিত্যের সাধনাটা কী? এই সাধনায় মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।

সৌন্দর্যের মধ্যে আনন্দ আপনাকেই বাহিরে দেখিতে পায় সেইজন্যই সৌন্দর্যের গৌরব। মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়— শিল্পীর শিল্পে কবির কাব্যে মানুষের সেইজন্যই এত অনুরাগ। শিল্পে সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত, আপনাকে না দেখিত, তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।

এইজন্য শিল্প-সাহিত্যে ভাবব্যঞ্জনার (suggestiveness) এত আদর। এই ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা রূপ আপনার একান্ত ব্যক্ততা যথাসম্ভব পরিহার করে বলিয়াই অব্যক্তের অভিমুখে আপনাকে বিলীন করে বলিয়াই

মানুষের হৃদয় তাহার দ্বারা প্রতিহত হয় না। রাজোদ্যানের সিংহদ্বারটা কেমন? তাহা যতই অভ্রভেদী হোক, তাহার কারুনৈপুণ্য যতই থাক্‌, তবু সে বলে না আমাতে আসিয়াই সমস্ত পথ শেষ হইল। আসল গন্তব্য স্থানটি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়াই আছে এই কথাই তাহার জানাইবার কথা। এইজন্য সেই তোরণ কঠিন পাথর দিয়া যত দৃঢ় করিয়াই তৈরি হউক-না কেন, সে আপনার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া দেয়। বস্তুত সেই ফাঁকটাকেই প্রকাশ করিবার জন্য সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যতটা আছে তাহার চেয়ে নাই অনেক বেশি। তাহার সেই 'নাই' অংশটাকে যদি সে একেবারে ভরাট করিয়া দেয় তবে সিংহোদ্যানের পথ একেবারেই বন্ধ। তবে তাহার মতো নিষ্ঠুর বাধা আর নাই। তবে সে দেয়াল হইয়া উঠে এবং যাহারা মূঢ় তাহারা মনে করে এইটেই দেখিবার জিনিস, ইহার পশ্চাতে আর কিছুই নাই; এবং যাহারা সন্ধান জানে তাহারা ইহাকে অতি স্থূল একটা মূর্তিমান বাহুল্য জানিয়া অন্যত্র পথ খুঁজিতে বাহির হয়। রূপমাত্রই এইরূপ সিংহদ্বার। সে আপনার ফাঁকটা লইয়াই গৌরব করিতে পারে। সে আপনাকেই নির্দেশ করিলে বঞ্চন করে, পথ নির্দেশ করিলেই সত্য কথা বলে। সে ভূমাকে দেখাইবে, আনন্দকে প্রকাশ করিবে, কী শিল্প-সাহিত্যে কী জগৎ-সৃষ্টিতে এই তাহার একমাত্র কাজ। কিন্তু সে প্রায় মাঝে মাঝে দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত দাসের মতো আপনার প্রভুর সিংহাসনে চড়িয়া বসিবার আয়োজন করে। তখন তাহার সেই স্পর্ধায় আমরা যদি যোগ দিই তবে বিপদ ঘটে— তখন তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলাই তাহার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য— তা সে যতই প্রিয় হোক, এমন-কি, সে যদি আমার নিজেরই অহংরূপটা হয় তবুও। বস্তুত রূপ যাহা তাহাকে তাহার চেয়ে বড়ো করিয়া জানিলেই সেই বড়োকে হারানো হয়।

মানুষের সাহিত্য শিল্পকলায় হৃদয়ের ভাব রূপে ধরা দেয় বটে কিন্তু রূপে বদ্ধ হয় না। এইজন্য সে কেবলই নব নব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই প্রতিভাকে বলে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'। প্রতিভা রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করে কিন্তু বন্দী করে না— এইজন্য নব নব উন্মেষের শক্তি তাহার থাকা চাই।

মনে করা যাক পূর্ণিমা রাত্রির শুভ্র সৌন্দর্য দেখিয়া কোনো কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, সুরলোকে নীলকান্তমণিময় প্রাঙ্গণে সুরাঙ্গনারা নন্দনের নবমল্লিকায় ফুলশয্যা রচনা করিতেছেন। এই বর্ণনা যখন আমরা পড়ি তখন আমরা জানি পূর্ণিমা রাত্রিসম্বন্ধে এই কথাটা একেবারে শেষ কথা নহে— অসংখ্য ব্যক্ত ও অব্যক্ত কথার মধ্যে এ একটা কথা— এই উপমাটিকে গ্রহণ করার দ্বারা অন্য অগণ্য উপমার পথ বন্ধ করা হয় না, বরঞ্চ পথকে প্রশস্তই করা হয়।

কিন্তু যদি আলংকারিক বলপূর্বক নিয়ম করিয়া দেন যে, পূর্ণিমা রাত্রিসম্বন্ধে সমস্ত মানবসাহিত্যে এই একটিমাত্র উপমা ছাড়া আর কোনো উপমাই হইতে পারে না— যদি কেহ বলে, কোনো দেবতা রাত্রে স্বপ্ন দিয়াছেন যে এই রূপই পূর্ণিমার সত্য রূপ— এই রূপকেই কেবল ধ্যান করিতে হইবে, প্রকাশ করিতে হইবে, কাব্যে পুরাণে এই রূপেরই আলোচনা করিতে হইবে, তবে পূর্ণিমা সম্বন্ধে সাহিত্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এরূপ চরম উপমার দৌরাত্ম্য একেবারে অসহ্য— কারণ ইহা মিথ্যা। যতক্ষণ ইহা চরম ছিল না ততক্ষণই ইহা সত্য ছিল। বস্তুত এই কথাটাই সত্য যে পূর্ণিমা সম্বন্ধে নিত্য নব নব রূপে মানুষের আনন্দ আপনাকেই প্রকাশ করে। কোনো বিশেষ একটিমাত্র রূপই যদি সত্য হয় তবে সেই আনন্দই মিথ্যা হইয়া যায়। জগৎ-সৃষ্টিতেও যেমন সৃষ্টিকর্তার আনন্দ কোনো একটিমাত্র রূপে আপনাকে চিরকাল বদ্ধ করিয়া শেষ করিয়া ফেলে নাই— অনাদিকাল হইতে তাহার নব নব বিকাশ চলিয়া আসিতেছে, তেমনি সাহিত্যশিল্প সৃষ্টিতেও মানুষের আনন্দ কোনো একটিমাত্র উপমায় বর্ণনায় আপনাকে চিরকালের মতো বন্দী করিয়া থামিয়া যায় নাই, সে কেবলই নব নব প্রকাশের মধ্যে লীলা করিতেছে। কারণ, রূপ জিনিসটা কোনোকালে বলিতে পারিবে না যে, আমি এইখানেই থামিয়া দাঁড়াইলাম, আমিই শেষ— সে যদি চলিতে না পারে তবে তাহাকে বিকৃত হইয়া মরিতে হইবে। বাতি যেমন ছাই হইতে হইতে শিখাকে প্রকাশ করে, রূপ তেমনি কেবলই আপনাকে লোপ করিতে করিতে একটি শক্তিকে আনন্দকে প্রকাশ করিতে থাকে। বাতি যদি নিজে অক্ষয় হইতে চায় তবে শিখাকেই গোপন করে— রূপ যদি আপনাকেই ধ্রুব করিতে চায় তবে সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। এইজন্য রূপের

অনিত্যতাই রূপের সার্থকতা, তাহাই তাহার গৌরব। রূপ নিত্য হইবার চেষ্টা করিলেই ভয়ংকর উৎপাত হইয়া ওঠে। সুরের অমৃত অসুর পান করিলে স্বর্গলোকের বিপদ, তখন বিধাতার হাতে তাহার অপঘাত মৃত্যু ঘটে। পৃথিবীতে ধর্মে কর্মে সমাজে সাহিত্যে শিল্পে সকল বিষয়েই আমরা ইহার প্রমাণ পাই। মানুষের ইতিহাসে যত কিছু ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার মূলেই রূপের এই অসাধু চেষ্টা আছে। রূপ যখনই একান্ত হইয়া উঠিতে চায় তখনই তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার অত্যাচার হইতে মনুষ্যত্বকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমাপূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্তিকে উপাসক কখনোই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি— দেবমূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা কল্পনাকে তখনই কল্পনা বলিয়া জানি যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না ; তখনই কল্পনা আপনার সত্য কাজ করে। সে কাজটি কী, না, সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করা। কল্পনা যখন থামিয়া গিয়া কেবলমাত্র একটি রূপের মধ্যে একান্তভাবে দেহধারণ করে তখন সে আপনার সেই রূপকেই দেখায়, রূপের অতীতকে অনন্ত সত্যকে আর দেখায় না। সেইজন্য বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চিরপরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্তিমান দেখিতে পাই। জগতের রূপ কারাপ্রাচীরের মতো অটল অচল হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে কখনোই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যখনই আমরা বিশেষ দেবমূর্তিকে পূজা করি তখনই সেই রূপের প্রতি আমরা চরমসত্যতা আরোপ করি। রূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল ধর্মকে লোপ করিয়া দিই। রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার দ্বারা কখনোই সত্যের পূজা হইতে পারে না।

তবে কেন কোনো কোনো বিদেশী ভাবুকের মুখে আমরা প্রতিমা-পূজার সম্বন্ধে ভাবের কথা শুনিতে পাই ? তাহার কারণ তাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা পূজক নহেন। তাঁহারা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোনো মূর্তিকে দেখিতেছেন ততক্ষণ তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন না। একজন খৃস্টানও তাঁহার কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করিতে পারেন ; কারণ সরস্বতী তাঁহার কাছে ভাবের প্রকাশমাত্র— গ্রীসের এথেনীও তাঁহার কাছে যেমন, সরস্বতীও তেমনি। কিন্তু সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন— তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।

এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনো-একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন— কেননা 'সিংহ মায়ের বাহন'। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই— কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি— যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।

যাহা স্বভাবতই প্রবহমান তাহাকে কোনো-এক জায়গায় রুদ্ধ করিবামাত্র তাহা যে মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আচার জিনিসটা অনেক স্থলেই সেই বন্ধন-আকার ধারণ করে। তাহার সময় উত্তীর্ণ হইলেও অভ্যাসের আসক্তিবশত আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাই না। যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য চলা এবং চালানো, একসময় তাহাকেই আমরা খোঁটার মতো ব্যবহার করি, অথচ মনে করি যেন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে।

একটা উদাহরণ দিই। জগতে বৈষম্য আছে। বস্তুত বৈষম্য সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। কিন্তু সেই বৈষম্য ধ্রুব নহে। পৃথিবীতে ধনমান বিদ্যাক্ষমতা একজায়গায় স্থির নাই, তাহা আবর্তিত হইতেছে। আজ যে ছোটো কাল সে

বড়ো, আজ যে ধনী কাল সে দরিদ্র। বৈষম্যের এই চলাচল আছে বলিয়াই মানবসমাজে স্বাস্থ্য আছে। কেননা বৈষম্য না থাকিলে গতিই থাকে না— উঁচু নিচু না থাকিলে নদী চলে না, বাতাসে তাপের পার্থক্য না থাকিলে বাতাস বহে না। যাহা চলে না এবং যাহা সচল পদার্থের সঙ্গে যোগ রাখে না তাহা দূষিত হইতে থাকে। অতএব, মানবসমাজে উচ্চ নীচ আছেই, থাকিবেই এবং থাকিলেই ভালো, এ কথা মানিতে হইবে।

কিন্তু এই বৈষম্যের চলাচলকে যদি বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া ফেলি, যদি একশ্রেণীর লোককে পুরুষানুক্রমে মাথায় করিয়া রাখিব এবং আর-এক শ্রেণীকে পায়ের তলায় ফেলিব এই বাঁধা নিয়ম একেবারে পাকা করিয়া দিই তবে বৈষম্যের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যই একেবারে মাটি করিয়া ফেলি। যে বৈষম্য চাকার মতো আবর্তিত হয় না সে বৈষম্য নিদারুণভারে মানুষকে চাপিয়া রাখে, তাহা মানুষকে অগ্রসর করে না। জগতে বৈষম্য ততক্ষণ সত্য যতক্ষণ তাহা চলে, ততক্ষণ তাহা মুক্ত— জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চলা ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িনী। লক্ষ্মীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষ্মী হইয়া উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারাই লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন। দুঃখী চিরদিন দুঃখী নয়, সুখী চিরদিন সুখী নয়— এইখানেই সুখীতে দুঃখীতে সাম্য আছে। সুখ দুঃখের এই চলাচল আছে বলিয়াই সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে মানুষের মঙ্গল ঘটে।

তাই বলিতেছি, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে, যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বদ্ধরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান এবং তাহা বহু। এই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের প্রকাশকে যখনই আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করিতে চাই তখনই তাহা সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি আনয়ন করে। রূপমাত্রের মধ্যেই যে একটি মায়া আছে, অর্থাৎ যে চঞ্চলতা অনিত্যতা আছে, যে অনিত্যতাই সেই রূপকে সত্য ও সৌন্দর্য দান করে, যে অনিত্যতাই তাহার প্রাণ, সেই কল্যাণময়ী অনিত্যতাকে কী সংসারে, কী ধর্মসমাজে, কী শিল্পসাহিত্যে, প্রথার পিঞ্জরে অচল করিয়া বাঁধিতে গেলে আমরা কেবল বন্ধনকেই লাভ করি, গতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলি। এই গতিকে যদি হারাই তবে শিকলে বাঁধা পাখি যেমন আকাশকে হারায় তেমনি আমরা অনন্তের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হই সুতরাং সত্যের চিরমুক্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং চারি দিক হইতে নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রমাদ আমাদিগকে মায়াবী নিশাচরের মতো আক্রমণ করিতে থাকে। স্তব্ধ হইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া আমাদিগকে তাহা সহ্য করিতে হয়।

১৩১৮

নামকরণ[১]

এই আনন্দরূপিণী কন্যাটি একদিন কোথা হইতে তাহার মায়ের কোলে আসিয়া চক্ষু মেলিল। তখন তাহার গায়ে কাপড় ছিল না, দেহে বল ছিল না, মুখে কথা ছিল না, কিন্তু সে পৃথিবীতে পা দিয়াই এক মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আপনার প্রবল দাবি জানাইয়া দিল। সে বলিল আমার এই জল, আমার এই মাটি আমার এই চন্দ্র সূর্য গ্রহতারকা। এত বড়ো জগৎচরাচরের মধ্যে এই অতি ক্ষুদ্র মাণবিকাটি নূতন আসিয়াছে বলিয়া কোনো দ্বিধা সংকোচ সে দেখাইল না। এখানে যেন তাহার চিরকালের অধিকার আছে, যেন চিরকালের পরিচয়।

বড়োলোকের কাছ হইতে ভালোরকমের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে নূতন জায়গায় রাজপ্রাসাদে আদর অভ্যর্থনা পাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই মেয়েটিও যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে

১ ১৮৩৩ শক ৩ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যার নামকরণ উপলক্ষে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

আসিল উহার ছোটো মুঠির মধ্যে একখানি অদৃশ্য পরিচয়পত্র ছিল। সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তিনিই নিজের নাম সই করা একখানি চিঠি ইহার হাতে দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, এই লোকটি আমার নিতান্ত পরিচিত, তোমরা যদি ইহাকে যত্ন কর তবে আমি খুশি হইব।

তাহার পরে কাহার সাধ্য ইহার দ্বার রোধ করে। সমস্ত পৃথিবী তখনই বলিয়া উঠিল, এসো, এসো, আমি তোমাকে বুকে করিয়া রাখিব— দূর আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত ইহাকে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল— বলিল, তুমি আমাদেরই একজন। বসন্তের ফুল বলিল, আমি তোমার জন্য ফলের আয়োজন করিতেছি; বর্ষার মেঘ বলিল, তোমার জন্য অভিষেকের জল নির্মল করিয়া রাখিলাম।

এমনি করিয়া জন্মের আরম্ভেই প্রকৃতির বিশ্বদরবারের দরজা খুলিয়া গেল। মা-বাপের যে স্নেহ সেও প্রকৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। শিশুর কান্না যেমনি আপনাকে ঘোষণা করিল অমনি সেই মুহূর্তেই জলস্থল আকাশ সেই মুহূর্তেই মা-বাপের প্রাণ সাড়া দিল, তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না।

কিন্তু আরো একটি জন্ম ইহার বাকি আছে, এবার ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে জন্ম লইতে হইবে। নামকরণের দিনই সেই জন্মের দিন। একদিন রূপের দেহ ধরিয়া এই কন্যা প্রকৃতির ক্ষেত্রে আসিয়াছিল, আজ নামের দেহ ধরিয়া এই কন্যা সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিল। জন্মমাত্রে পিতামাতা এই শিশুকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এ যদি কেবলই ইহার পিতামাতারই হইত তবে ইহার আর নামের দরকার হইত না, তবে ইহাকে নিত্য নূতন নূতন নামে ডাকিলেও কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটি নাকি শুধু পিতামাতার নহে, এ নাকি সমস্ত মানবসমাজের, সমস্ত মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্মের বিপুল ভাণ্ডার নাকি ইহার জন্য প্রস্তুত আছে, সেইজন্য মানবসমাজ ইহাকে একটি নামদেহ দিয়া আপনার করিয়া লইতে চায়।

মানুষের যে শ্রেষ্ঠরূপ যে মঙ্গলরূপ তাহা এই নামদেহটির দ্বারাই আপনাকে চিহ্নিত করে। এই নামকরণের মধ্যে সমস্ত মানবসমাজের একটি আশা আছে, একটি আশীর্বাদ আছে— এই নামটি যেন নষ্ট না হয়, ম্লান না হয়, এই নামটি যেন ধন্য হয়, এই নামটি যেন মাধুর্যে ও পবিত্রতায় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা লাভ করে। যখন ইহার রূপের দেহটি একদিন বিদায় লইবে তখনো ইহার নামের দেহটি মানবসমাজের মর্মস্থানটিতে যেন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে।

আমরা সকলে মিলিয়া এই কন্যাটির নাম দিয়াছি, অমিতা। অমিতা বলিতে বুঝায় এই যে, যাহার সীমা নাই। এই নামটি তো ব্যর্থ নহে। আমরা যেখানে মানুষের সীমা দেখিতেছি সেইখানেই তো তাহার সীমা নাই। এই যে কলভাষিণী কন্যাটি জানে না যে আমরা ইহাকে লইয়াই আনন্দ করিতেছি, জানে না বাহিরে কী ঘটিতেছে, জানে না ইহার নিজের মধ্যে কী আছে— এই অপরিস্ফুটতার মধ্যেই তো ইহার সীমা নহে। এই কন্যাটি যখন একদিন রমণীরূপে বিকশিত হইয়া উঠিবে তখনই কি এ আপনার চরমকে লাভ করিবে? তখনো এই মেয়েটি নিজেকে যাহা বলিয়া জানিবে এ কি তাহার চেয়েও অনেক বড়ো নহে! মানুষের মধ্যে এই যে একটি অপরিমেয়তা আছে যাহা তাহার সীমাকে কেবলই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাই কি তাহার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? মানুষ যেদিন নিজের মধ্যে আপনার এই সত্য পরিচয়টি জানিতে পারে সেই দিনই সে ক্ষুদ্রতার জাল ছেদন করিবার শক্তি পায়, সেই দিনই সে উপস্থিত স্বার্থকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে না, সেই দিনই সে চিরন্তন মঙ্গলকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়। যে মহাপুরুষেরা মানুষকে সত্য করিয়া চিনিয়াছেন তাঁহারা তো আমাদের মত বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আমাদের ডাক দিয়া বলেন, তোমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

আমরা অমিতা নামে সেই অমৃতের পুত্রীকেই আমাদের সমাজে আহ্বান করিলাম। এই নামটি ইহাকে আপন মানবজন্মের মহত্ত্ব চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিক আমরা ইহাকে এই আশীর্বাদ করি।

আমাদের দেশে নামকরণের সঙ্গে আর-একটি কাজ আছে সেটি অন্নপ্রাশন। দুটির মধ্যে গভীর একটি যোগ রহিয়াছে। শিশু যেদিন একমাত্র মায়ের কোল অধিকার করিয়া ছিল সেদিন তাহার অন্ন ছিল মাতৃস্তন্য। সে অন্ন কাহাকেও প্রস্তুত করিতে হয় নাই— সে একেবারে তাহার একলার জিনিস, তাহাতে আর কাহারও অংশ ছিল না। আজ সে নামদেহ ধরিয়া মানুষের সমাজে আসিল তাই আজ তাহার মুখে মানবসাধারণের অন্নকণাটি উঠিল। সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের পাতে পাতে যে অন্নের পরিবেশন

চলিতেছে তাহারই প্রথম অংশ এই কন্যাটি আজ লাভ করিল। এই অন্ন সমস্ত সমাজে মিলিয়া প্রস্তুত করিয়াছে— কোন্ দেশে কোন্ চাষা রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া চাষ করিয়াছে, কোন্ বাহক ইহা বহন করিয়াছে, কোন্ মহাজন ইহাকে হাটে আনিয়াছে, কোন্ ক্রেতা ইহা ক্রয় করিয়াছে, কোন্ পাচক ইহা রন্ধন করিয়াছে, তবে এই কন্যার মুখে ইহা উঠিল। এই মেয়েটি আজ মানবসমাজে প্রথম আতিথ্য লইতে আসিয়াছে, এইজন্য সমাজ আপনার অন্ন ইহার মুখে তুলিয়া দিয়া অতিথিসংকার করিল। এই অন্নটি ইহার মুখে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে মস্ত একটি কথা আছে। মানুষ ইহার দ্বারাই জানাইল আমার যাহা-কিছু আছে তাঁহাতে তোমার অংশ আমি স্বীকার করিলাম। আমার জ্ঞানীরা যাহা জানিয়াছেন তুমি তাহা জানিবে, আমার মহাপুরুষেরা যে তপস্যা করিয়াছেন তুমি তাহার ফল পাইবে, আমার বীরেরা যে জীবন দিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমার কর্মীরা যে পথ নির্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবনযাত্রা অব্যাহত হইবে। এই শিশু কিছুই না জানিয়া আজ একটি মহৎ অধিকার লাভ করিল— অদ্যকার এই শুভদিনটি তাহার সমস্ত জীবনে চিরদিন সার্থক হইয়া উঠিতে থাক্।

অদ্য আমরা ইহাই অনুভব করিতেছি মানুষের জন্মক্ষেত্র কেবল একটিমাত্র নহে, তাহা কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র নহে, তাহা মঙ্গলের ক্ষেত্র। তাহা কেবল জীবলোক নহে তাহা স্নেহলোক, তাহা আনন্দলোক। প্রকৃতির ক্ষেত্রটিকে চোখে দেখিতে পাই, তাহা জলেস্থলে ফলেফুলে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ— অথচ তাহাই মানুষের সর্বাপেক্ষা সত্য আশ্রয় নহে। যে জ্ঞান, যে প্রেম, যে কল্যাণ অদৃশ্য হইয়া আপনার বিপুল সৃষ্টিকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে— সেই জ্ঞানপ্রেম-কল্যাণের চিন্ময় আনন্দময় জগৎই মানুষের যথার্থ জগৎ। এই জগতের মধ্যেই মানুষ যথার্থ জন্মলাভ করে বলিয়াই সে একটি আশ্চর্য সত্তাকে আপনার পিতা বলিয়া অনুভব করিয়াছে, যে সত্তা অনির্বচনীয়। এমন একটি সত্যকেই পরম সত্য বলিয়াছে যাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া মন ফিরিয়া আসে। এইজন্যই এই শিশুর জন্মদিনে মানুষ জলস্থলঅগ্নিবায়ুর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নাই, জলস্থলঅগ্নিবায়ুর অন্তরে শক্তিরূপে যিনি অদৃশ্য বিরাজমান, তাঁহাকেই প্রণাম করিয়াছে। সেইজন্যই আজ এই শিশুর নামকরণের দিনে মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্য সাজাইয়া পূজা করে নাই কিন্তু যিনি মানবসমাজের অন্তরে প্রীতিরূপে কল্যাণরূপে অধিষ্ঠিত তাঁহারই আশীর্বাদ সে প্রার্থনা করিতেছে। বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই উপলব্ধি, এই পূজা, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই অধ্যাত্মলোকে জন্ম, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই দৃশ্য জগতের অন্তর্বর্তী অদৃশ্য নিকেতন। মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা আশ্চর্য নহে, মানুষের ধনমান লইয়া কাড়াকাড়ি আশ্চর্য নহে, কিন্তু বড়ো আশ্চর্য— জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের পর্বে পর্বে মানুষের সেই অদৃশ্যকে পূজ্য বলিয়া প্রণাম, সেই অনন্তকে আপন বলিয়া আহ্বান। অদ্য এই শিশুটিকে নাম দিবার বেলায় মানুষ সকল নামরূপের আধার ও সকল নামরূপের অতীতকে আপনার এই নিতান্ত ঘরের কাজে এমন করিয়া আমন্ত্রণ করিতে ভরসা পাইল ইহাতেই মানুষ সমস্ত জীবসমাজের মধ্যে কৃতকৃতার্থ হইল— ধন্য হইল এই কন্যাটি, এবং ধন্য হইলাম আমরা।

১৩১৮

ধর্মের নবযুগ

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থা মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সংকীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্য অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এইজন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হই যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডেই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃ স্বঃ আমার বিরাট আশ্রয় অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আম

চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিসের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্‌ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলই তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি-না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম, আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ হইয়া পড়ে ; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে ; এবং আমরা নিজের ধর্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায়, হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এইসমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্মের উপরেই আমাদের নিজের সংকীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এইজন্যই আমাদের ধর্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে ; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা— বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটি খুব বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিতেছে— তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় এ কথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি— অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একটা মস্ত ভুল সে আমাদের একে একে ঘুচাইতে লাগিল যে, জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনই দেখি-না কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্য-জালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণু-পরমাণুর সহিত নাড়ির বাঁধনে বাঁধা। এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানা সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনই ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড়ো কুলীন বলিয়াই মনে করুন-না কেন গোত্র সকলেরই এক। এইজন্য বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটেই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস। তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্যায়ে যেমনই হোক-না কেন, জীবপর্যায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ত্ব খাটে না : পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন বংশ ; এবং মানুষ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত, সকল জীব হইতে একেবারেই পৃথক। কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকুকেও বজায় রাখিতে দিল না ; জীবের সঙ্গে জীবের কোথাও বা নিকট কোথাও বা দূর কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে এ সংবাদটিও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে মানবসমাজে যাহারা পরস্পরকে একেবারে নিঃসম্পর্ক বলিয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়া ছিল, ভাষাতত্ত্বের স্তরে স্তরে তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধ উদ্‌ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের

ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের নানা শাখা-প্রশাখায় উজান বাহিয়া মানুষের সন্ধান অবশেষে এক দূর গঙ্গোত্রীতে এক মূল প্রস্রবণের কাছে উপনীত হইতে লাগিল।

এইরূপে জড়ে জীবে সর্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ এমনি সুদূরবিস্তৃত এমনি বিচিত্র করিয়া প্রত্যহ প্রকাশ হইতেছে ; যেখানেই সেই যোগের সীমা আমরা স্থাপন করিতেছি সেইখানেই সেই সীমা এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সকল জ্ঞানকেই আজ পরস্পর তুলনার দ্বারা তৌল করিয়া দেখিবার উদ্‌যোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, ধর্মের তুলনা— সমস্তই তুলনা। সত্যের বিচারসভায় আজ জগৎ জুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে ; আজ একের সংবাদ আরের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে ; নিজের পক্ষের কথা একমাত্র যে নিজের জবানিতেই বলে, যে বলে আমার শাস্ত্র আমার মধ্যেই, আমার তত্ত্ব আমাতেই পরিসমাপ্ত, আমি আর কারও ধার ধারি না— তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে কেহ মুহূর্তকাল দ্বিধা করে না।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ যেদিকটাতে অতি দীর্ঘকাল বাঁধা ছিল আজ যেন একেবারে তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত যে, সে খাঁচার পাখি, আজ জানিতে পারিয়াছে সে আকাশের পাখি। এতকাল তাহার চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাই ঐ খাঁচার লৌহশলাকাগুলার প্রতি লক্ষ করিয়াই রচিত হইয়াছিল। আজ তাহা লইয়া আর কাজ চলে না। সেই আগেকার মতো ভাবিতে গেলে সেই রকম করিয়া কাজ করিতে বসিলে সে আর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। অথচ অনেক দিনের অভ্যাস অস্থিমজ্জায় গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই মানুষের মনকে ও ব্যবহারকে আজ বহুতর অসংগতি অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। পুরাতনের আসবাবগুলা আজ তাহার পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এত দিন তাহাকে এত মূল্য দিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে ফেলিতে মন সরিতেছে না ; সেগুলা যে অনাবশ্যক নহে, তাহারা যে চিরকালই সমান মূল্যবান এই কথাই প্রাণপণে নানাপ্রকার সুযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে ; আর কোনোপ্রকার বাসা একেবারে হইতে পারে না, নিজের শক্তিতে তো নহেই— সে জানিত তাহার প্রতি দিনের খাদ্য-পানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনোপ্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষত নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মতো নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দিষ্ট খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় এবং সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ।

আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে ; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই ; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক, যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।

আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে— সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবল উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই, অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলই সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য নিত্যবহমান প্রকাশব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে— সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলই আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া

অগ্রসর হইয়াছে ; কেবলই "শঙ্খের বদলে মুক্তা", কূলের বদলে সুদূরটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই। এইজন্য যাত্রার গানই আজ তাহার গান, এইজন্য সমুদ্রের আনন্দই আজ তাহার মনকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। এ কথা আজ সে কোনোমতেই মনে করিতে পারিতেছে না যে, নোঙরের শিকলে মরিচা পড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চুপ করিয়া কূলে পড়িয়া থাকাই তাহার সনাতন সত্যধর্ম! বাতাস আজ তাহাকে উতলা করিতেছে, বলিতেছে, ওরে মহাকালের যাত্রী, সবকটা পাল তুলিয়া দে— ধ্রুব নক্ষত্র আজ তাহার চোখের সম্মুখে জ্যোতির্ময় তর্জনী তুলিয়াছে, বলিতেছে, ওরে দ্বিধাকাতর, ভয় নাই অগ্রসর হইতে থাক। আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কর্ণধারকেই ডাকিতেছে— যিনি তাঁহার পুরাতন গুরুভার নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা— যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে— যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল ; যখন সে বলে আমার এই-সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং প্রবেশ করিতে দিবই না। "তবে বাহিরের লোকের কী গতি হইবে" এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মানুষ উত্তর দেয় পুরাকাল ধরিয়া সেই বাহিরের লোকের যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই অচলভাবে আবদ্ধ থাকিলেই তাহার পক্ষে শ্রেয় ; অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের মনের এইরূপ বিশ্বাস যে, বিদ্যায় মানুষের সর্বত্র অধিকার, বাণিজ্যে মানুষের সর্বত্র অধিকার, কেবলমাত্র ধর্মেই মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই ; সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় পৃথক, মানুষের মুক্তির পথ পৃথক, পূজার মন্ত্র পৃথক ; আর সর্বত্রই স্বভাবের আকর্ষণেই হউক আর প্রবলের শাসনের দ্বারাই হউক মানুষের এক হইয়া মিলিবার আশা আছে, উপায় আছে ; এমন-কি, নানাজাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিদেশ স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরস্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না। বস্তুত মূর্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা— যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোনো বিশেষ রূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া প্রবেশের অন্য কোনো উপায় রাখা হয় নাই ; মূর্তিপূজা সেই সময়েরই— যখন পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী— এক কথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কার যতই সংকীর্ণ হয় তাহা মানুষকে ততই আঁট করিয়া ধরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ততই অত্যন্ত কঠিন হয়— যাহারা অলংকারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের এই অলংকার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্মের মধ্যে

একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে— মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর-একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়াছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশে সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্যের মতো অত্যুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্‌ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? আজ মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে, সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহার অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না। তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সংকোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না।

কিন্তু এই ব্রহ্ম তো কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন— রসো বৈ সঃ— তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং— এষোস্য পরম আনন্দঃ— ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না— ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না, ভক্তি ছাড়া তো আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর-এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না— মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে, পূজা-অর্চনা ক্রিয়া-কর্মের মহাসমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতি-বিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণতলে তাঁহার মস্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকালপর্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দকুঞ্জচ্ছায়ায় বুলবুলের মতো প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।

এমনি করিয়াই তো আমাদের নবযুগের ধর্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য করিয়া দেখিতেছি। কোনো বাহ্যমূর্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে— একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই

সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুত পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য; সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচারবিচার-অনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে— সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।

সেইজন্যই আজ উৎসবের দিনে সেই রসস্বরূপের নিকট আমাদের যে প্রার্থনা তাহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, তাহা আমাদের আত্মার প্রার্থনা, অর্থাৎ তাহা একই কালে সমস্ত মানবাত্মার প্রার্থনা। হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের বিধাতা, এ কথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বাহিরের, আমার গোচর অগোচর যত-কিছু পাপ যত-কিছু অপরাধ এই কারণেই অসহ্য যে আমি তাহার দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছি, আমার সে সকল বন্ধন সমস্ত মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড়ো মহত্ত্ব আমার উপর তুমি অর্পণ করিয়াছ আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করিতেছে; এইজন্যই পাপ এত নিদারুণ, এত ঘৃণ্য; তাহাকে আমরা যত গোপনই করি তাহা গোপনের নহে, কোন্ একটি সুগভীর যোগের ভিতর দিয়া তাহা সমস্ত মানুষকে গিয়া আঘাত করিতেছে, সমস্ত মানুষের তপস্যাকেই ম্লান করিয়া দিতেছে। হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্বমানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে। মানবের অন্তরাত্মার অন্তর্গূঢ় এই চিরসংকল্পটিকে তুমি বীর্যের দ্বারা প্রবল করো, পুণ্যের দ্বারা নির্মল করো, তাহার চারি দিক হইতে সমস্ত ভয়সংকোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া, যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না। অনেকদিন মানুষের ধর্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশ দিকে তোমার আহ্বানভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেকদিন বাতাস এমনি স্তব্ধ হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মূর্ছিত; গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্যন্ত কাঁপে নাই— আজ ঝড় আসিয়া পড়িল; আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক। ঘরের, সমাজের, দেশের যে-সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহংকার করিয়া আসিয়াছি সে-সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড়কুটার মতো শূন্যে বিসর্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক! সত্যের ছদ্মবেশপরা প্রবল অসত্যের সঙ্গে, ধর্মের উপাধিধারী প্রাচীন অমঙ্গলের সঙ্গে আজ লড়াই করিতে হইবে, সেজন্য মনের সমস্ত শক্তি পূর্ণবেগে জাগ্রত হউক। আজ বেদনার দিন আসিল, কেননা আজ চেতনার দিন— সেজন্য আজ কাপুরুষের মতো নিরানন্দ হইলে চলিবে না; আজ ত্যাগের দিন আসিল, কেননা আজ চলিবার দিন, আজ কেবলই পিছনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে দিন বহিয়া যাইবে, আজ কৃপণের মতো রুদ্ধ সঞ্চয়ের উপর বুক দিয়া পড়িয়া থাকিলে ঐশ্বর্যের অধিকার হারাইতে থাকিব। ভীরু, আজ লোকভয়কেই ধর্মভয়ের স্থানে যদি বরণ কর তবে এমন মহাদিন ব্যর্থ হইবে— আজ নিন্দাকেই ভূষণ, আজ অপ্রিয়কেই প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আজ অনেক খসিবে, ঝরিবে, ভাঙিবে, ক্ষয় হইয়া যাইবে,— নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে পর্দা সেদিকে হঠাৎ আলোক প্রকাশ হইবে; নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে প্রাচীর সেদিকে হঠাৎ পথ বাহির হইয়া পড়িবে। হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়লীলায় ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্যবান আনন্দের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব— মানুষের চিত্তসাগরের অতলস্পর্শ রহস্য আজ উন্মথিত হইয়া জ্ঞানে কর্মে ত্যাগে ধর্মে কত কত অত্যাশ্চর্য অজেয় শক্তি

প্রকাশমান হইয়া উঠিবে, তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বারবাতায়ন অসংকোচে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব। হে অনন্তশক্তি, আমাদের হিসাব তোমাদের হিসাব নহে— তুমি অক্ষমকে সক্ষম কর, অচলকে সচল কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর এবং মোহমুগ্ধকে যখন তুমি উদ্‌বোধিত কর তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি যে কোন্ অমৃতলোকের তোরণ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দাও তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না— এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে অমর হইয়া উঠি, এবং আমাদের যাহা-কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয়বিশ্বেশ্বর,
মানবভাগ্যবিধাতা!

১৩১৮

ধর্মের অর্থ

মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসাভার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়োর দিক আছে, একটা ছোটোর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদ আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোটো থাকিয়াও তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানারকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে। কখনো সে ছোটোটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়োটাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

প্রথমে ধরা যাক আমাদের এই শরীরটাকে। এটি একটি ছোটো পদার্থ। ইহার বাহিরে একটি প্রকাণ্ড বড়ো পদার্থ আছে, সেটি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া এই শরীরটাকে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করি। যেন এ শরীর আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু তেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে এ শরীরের কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাই না। আপনাকে লইয়া এ শরীর করিবে কী? থাকিবে কোথায়? আপনার মধ্যে এই শরীরের প্রয়োজন নাই সমাপ্তি নাই।

বস্তুত আমাদের এই শরীরে যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে, সে আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। বৃহৎ বিশ্বশরীরের সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার মিল হয় সেই পরিমাণে তাহার অর্থ পাওয়া যায়। গর্ভের ভ্রূণ যে নাক কান হাত পা লইয়া আছে গর্ভের বাহিরেই তাহার সার্থকতা। এইজন্য জন্মগ্রহণের পর হইতেই চোখের সঙ্গে আকাশব্যাপী আলোর, কানের সঙ্গে বাতাসব্যাপী শব্দের, হাত-পায়ের সঙ্গে চারি দিকের নানাবিধ বিষয়ের, সকলের চেয়ে যেটি ভালো যোগ সেইটি সাধন করিবার জন্য মানুষের কেবলই চেষ্টা চলিতেছে। এই বড়ো শরীরটির সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিবে ইহাই ছোটো শরীরের একান্ত সাধনা— অথচ আপনার ভেদটুকু যদি না রাখে তাহা হইলে সে মিলনের কোনো অর্থই থাকে না। আমার চোখ আলো হইবে না, চোখরূপে থাকিয়া আলো পাইবে, দেহ পৃথিবী হইবে না, দেহরূপে থাকিয়া পৃথিবীকে উপলব্ধি করিবে, ইহাই তাহার সমস্যা।

বিরাট বিশ্বদেহের সঙ্গে আমাদের ছোটো শরীরটি সকল দিক দিয়া এই যে আপনার যোগ অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছে এ কি তাহার প্রয়োজনের চেষ্টা? পাছে অন্ধকারে কোথাও খোঁচা লাগে এইজন্যই কি চোখ দেখিতে চেষ্টা করে? পাছে বিপদের পদধ্বনি না জানিতে পারিয়া দুঃখ ঘটে এইজন্যই কি কান উৎসুক হইয়া থাকে?

অবশ্য প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস একটা আছে— প্রয়োজন তাহার অন্তর্ভূত। সেটা আর কিছু নহে, পূর্ণতার আনন্দ। চোখ আলোর মধ্যেই পূর্ণ হয়, কান শব্দের অনুভূতিতেই সার্থক হয়। যখন আমাদের শরীরে চোখ-কান ফোটেও নাই তখনো সেই পূর্ণতার নিগূঢ় ইচ্ছাই এই চোখ-কানকে বিকশিত করিবার জন্য অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছে। মায়ের কোলে শুইয়া শুইয়া যে শিশু কথা

কহিবার চেষ্টায় কলস্বরে আকাশকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে, কথা কহিবার প্রয়োজন যে কী তাহা সে কিছুই জানে না। কিন্তু কথা কহার মধ্যে যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতা দূর হইতেই তাহাকে আনন্দআহ্বান পাঠাইতেছে, সেই আনন্দে সে বার বার নানা শব্দ উচ্চারণ করিয়া কিছুতেই ক্লান্ত হইতেছে না।

তেমনি করিয়াই আমাদের এই ছোটো শরীরটির দিকে বিরাট বিশ্ব-শরীরের একটি আনন্দের টান কাজ করিতেছে। ইহা পূর্ণতার আকর্ষণ, সেইজন্য যেখানে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই সেখানেও আমাদের শক্তি ছুটিয়া যাইতে চায়। গ্রহে চন্দ্রে তারায় কী আছে তাহা দেখিবার জন্য মানুষ রাত্রির পর রাত্রি জাগিতে শ্রান্ত হয় না। যেখানে তাহার প্রয়োজনক্ষেত্র সেখান হইতে অনেক দূরে মানুষ আপনাব ইন্দ্রিয়বোধকে দূত পাঠাইতেছে। যাহাকে সহজে দেখা যায় না তাহাকে দেখিবার জন্য দুরবীন অণুবীক্ষণের শক্তি কেবলই সে বাড়াইয়া চলিয়াছে— এমনি করিয়া মানুষ নিজের চক্ষুকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতেছে; যেখানে সহজে যাওয়া যায় না সেখানে যাইবার জন্য নব নব যানবাহনের কেবলই সে সৃষ্টি করিতেছে; এমনি করিয়া মানুষ আপনার হাত-পা'কে বিশ্বে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জলস্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ অবারিত করিবার উদ্‌যোগ কত কাল হইতে চলিয়াছে। জলস্থল আকাশের পথ দিয়া সমস্ত জগৎ মানুষের চোখ কান হাত-পা'কে কেবলই যে ডাক দিতেছে। বিরাটের এই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণের পরমুহূর্ত হইতেই আজ পর্যন্ত কেবলই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর, প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিয়া পথ তৈরি করিতে লাগিয়াছে। বিরাটের সেই নিমন্ত্রণ প্রয়োজনের নিমন্ত্রণ নহে, তাহা মিলনের নিমন্ত্রণ, আনন্দের নিমন্ত্রণ; তাহা ক্ষুদ্র শরীরের সহিত বৃহৎ শরীরের পরিণয়ের নিমন্ত্রণ; এই পরিণয়ে প্রেমও আছে সংসারযাত্রাও আছে, আনন্দও আছে প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এই মিলনের মূলমন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।

শুধু চোখ কান হাত পা লইয়া মানুষ নয়। তাহার একটা মানসিক কলেবর আছে। নানাপ্রকারের বৃত্তি প্রবৃত্তি সেই কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই-সব মনের বৃত্তি লইয়া আপনার মনটিকে যে নিতান্তই কেবল আপনার করিয়া সকল হইতে তফাত করিয়া রাখিব তাহার জো নাই। ঐ বৃত্তিগুলাই আপনার বাহিরে ছুটিবার জন্য মনকে লইয়া কেবলই টানাটানি করিতেছে। মন একটি বৃহৎ মনোলোকের সঙ্গে যতদূর পারে পূর্ণরূপে মিলিতে চাহিতেছে। নহিলে তাহার স্নেহপ্রেম দয়ামায়া, এমন-কি, ক্রোধ দ্বেষ লোভ হিংসারও কোনো অর্থই থাকে না। সকল মানুষের মন বলিয়া একটি খুব বড়ো মনের সঙ্গে সে আপনার ভালোরকম মিল করিতে চায়। সেইজন্য কত কাল হইতে সে যে কত রকমের পরিবারতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। যেখানে বাধিয়া যায় সেখানে তাহাকে আবার ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, গড়িয়া তুলিতে হয়, এইজন্যই কত বিপ্লব কত রক্তপাতের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ চলিতে হইয়াছে। বৃহৎ মনঃশরীরের সঙ্গে আপনার মনটিকে বেশ ভালোরকম করিয়া মিলাইয়া লইতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। যে পরিমাণে তাহার ভালোরকম করিয়া মিল ঘটে সেই পরিমাণেই তাহার পূর্ণতা। যে ব্যবস্থায় তাহার মিল অসম্পূর্ণ হয় ও কেবলই ভেদ ঘটিতে থাকে সেই ব্যবস্থায় তাহার দুর্গতি। এখানেও প্রয়োজনের প্রেরণা মূল প্রেরণা এবং সর্বোচ্চ প্রেরণা নহে। মানুষ পরিবারের বাহিরে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর বাহিরে দেশ, দেশের বাহিরে বিশ্বমানবসমাজের দিকে আপন চিত্তবিস্তারের যে চেষ্টা করিতেছে এ তাহার প্রয়োজনের আপিসযাত্রা নহে, এ তাহার অভিসারযাত্রা। ছোটো হৃদয়টির প্রতি বড়ো হৃদয়ের একটি ডাক আছে। সে ডাক এক মুহূর্ত থামিয়া নাই। সেই ডাক শুনিয়া আমাদের হৃদয় বাহির হইয়াছে সে খবরও আমরা সকল সময়ে জানিতে পারি না। রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসে, ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠে, বার বার পথ হারাইয়া যায়, পা কাটিয়া গিয়া মাটির উপর রক্তচিহ্ন পড়িতে থাকে তবু সে চলে; পথের মাঝে মাঝে সে বসিয়া পড়ে বটে কিন্তু সেখানেই চিরকাল বসিয়া থাকিতে পারে না, আবার উঠিয়া আবার তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়।

এই যে মানুষের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নানা ইন্দ্রিয়বোধ, তাহার নানা বৃত্তিপ্রবৃত্তি, এ সমস্তই মানুষকে কেবলই বিচিত্রের মধ্যে বিস্তারের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রের শেষ কোথায়? এই বিস্তারের অন্ত কল্পনা করিব কোন্‌খানে? শুনিয়াছি সেকেন্দর শা একদিন জয়োৎসাহে উন্মত্ত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন জিতিয়া লইবার জন্য দ্বিতীয় আর-একটা পৃথিবী তিনি পাইবেন কোথায়? কিন্তু মানুষের চিত্তকে কোনোদিন এমন বিষম দুশ্চিন্তায় আসিয়া ঠেকিতে হইবে না যে, তাহার অধিকার বিস্তারের স্থান আর নাই। কোনোদিন সে

বিমর্ষ হইয়া বলিবে না যে, সে তাহার ব্যাপ্তির শেষ সীমায় আসিয়া বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মানুষের পক্ষে কেবলই কি এই গণনাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরামহীন ব্যাপ্তিই আছে? কোনোখানেই তাহার পৌঁছানো নাই? অন্তহীন বহু কেবলই কি তাহাকে এক হইতে দুই, দুই হইতে তিনের সিঁড়ি বাহিয়া লইয়া চলিবে— সে সিঁড়ি কোথাও যাইবার নাম করিবে না?

এ কখনো হইতেই পারে না। আমরা জগতে এই একটি কাণ্ড দেখি— গম্যস্থানকে আমরা পদে পদেই পাইতেছি। বস্তুত আমরা গম্যস্থানেই আসিয়া রহিয়াছি— আমরা গম্যস্থানের মধ্যেই চলিতেছি। অর্থাৎ যা আমরা পাইবার তা আমরা পাইয়া বসিয়াছি, এখন সেই পাওয়ারই পরিচয় চলিতেছে। যেন আমরা রাজবাড়িতে আসিয়াছি— কিন্তু কেবল আসিলেই তো হইল না— তাহার কত মহল কত ঐশ্বর্য কে তাহার গণনা করিতে পারে? এখন তাই দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি। এইজন্য একটু করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতেই সমস্ত রাজপ্রাসাদের পরিচয় পাইতেছি। ইহাকে তো পথে চলা বলে না। পথে কেবল আশা থাকে, আস্বাদন থাকে না। আবার যে পথ অনন্ত সেখানে আশাই বা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই আমি বলিতেছি আমাদের কেহ পথে বাহির করে নাই— আমরা ঘরেই আছি। সে ঘর এমন ঘর যে, তাহার বারাণ্ডায় ছাতে দালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আর শেষ করিতে পারি না অথচ সর্বত্রই তাহার শেষ; সর্বত্রই তাহা ঘর, কোথাও তাহা পথ নহে।

এ রাজবাড়ির এই তো কাণ্ড, ইহার কোথাও শেষ নাই অথচ ইহার সর্বত্রই শেষ। ইহার মধ্যে সমাপ্তি এবং ব্যাপ্তি একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। এইজন্য এখানে কোনোখানে আমরা বসিয়া থাকি না অথচ প্রত্যেক পদেই আমরা আশ্রয় পাই। মাটি ফুঁড়িয়া যখন অঙ্কুর বাহির হইল তখন সেইখানেই আমাদের চোখ বিশ্রাম করিতে পারে। অঙ্কুর যখন বড়ো গাছ হইল তখন সেখানেও আমাদের মন দাঁড়াইয়া দেখে। গাছে যখন ফুল ধরে তখন ফুলেও আমাদের তৃপ্তি। ফুল হইতে যখন ফল জন্মে তখন তাহাতেও আমাদের লাভ। কোনো জিনিস সম্পূর্ণ শেষ হইলে তবেই তাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ণতাকে পাইব আমাদের এমন দুরদৃষ্ট নহে— পূর্ণতাকে আমরা পর্বে পর্বে পাইয়াই চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরিসমাপ্তির স্বাদ পাইতে থাকি সেইজন্যই ব্যাপ্তি আনন্দময়— নহিলে তাহার মতো দুঃখকর আর কিছুই হইতে পারে না।

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি তত্ত্ব সর্বত্র একসঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌঁছিবার দুরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। এ কথা বলিতেছি না যে, এখনো যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে এক দিকে চলা, এবং আর-এক দিকে পৌঁছানো, এক দিকে বহু, আর-এক দিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর-এক দিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই যেখানে মানুষের আপনার আনন্দ— এইখানেই মানুষের পর্যাপ্তি, এইখানেই মানুষ বড়ো। এইখান হইতেই গতি লইয়া মানুষের সমস্ত শক্তি বাহিরে চলিয়াছে এবং বাহির হইতে পুনরায় তাহারা এইখানেই অর্ঘ্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

বাহির হইতে যখন দেখি তখন বলি মানুষ নিশ্বাস লইয়া বাঁচিতেছে, মানুষ আহার করিয়া বাঁচিতেছে, রক্ত চলাচলে মানুষ বাঁচিয়া আছে। এমন করিয়া কত আর বলিব? বলিতে গিয়া তালিকা শেষ হয় না। তখন দেখি শরীরের অণুতে অণুতে রসে রক্তে অস্থিমজ্জাস্নায়ুপেশীতে ফর্দ কেবল বাড়িয়া চলিতেই থাকে। তাহার পরে যখন প্রাণের হিসাব শেষ পর্যন্ত মিলাইতে গিয়া আলোকে উত্তাপে বাতাসে জলে মাটিতে আসিয়া পৌঁছাই, যখন প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক শক্তিরহস্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

এমন করিয়া অন্তহীনতার খাতায় কেবলই পাতা উলটাইয়া শ্রান্ত হইয়া মরিতে হয়। কিন্তু বাহির হইতে প্রাণের ভিতর-বাড়িতে গিয়া যখন প্রবেশ করি তখন কেবল একটি কথা বলি, প্রাণের আনন্দে মানুষ বাঁচিয়া

আছে, আর কিছু বলিবার দরকার হয় না। এই প্রাণের আনন্দেই আমরা নিশ্বাস লইতেছি, খাইতেছি, দেহ রচনা করিতেছি, বাড়িতেছি। বাঁচিয়া থাকিব এই প্রবল আনন্দময় ইচ্ছাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি সচেষ্ট হইয়া বিশ্বময় ছুটিয়া চলিতেছে। প্রাণের আনন্দেই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে ; প্রাণের নিগূঢ় আনন্দে প্রাণীরা জগতের নানা স্পর্শের তানে আপনার স্নায়ুর তারগুলিকে কেবলই বিচিত্রতর করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। বাঁচিয়া থাকিতে চাই এই ইচ্ছা সন্তানসন্ততিকে জন্ম দিতেছে, রক্ষা করিতেছে, চারি দিকের পরিবেষ্টনের সঙ্গে উত্তরোত্তর আপনার সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য সাধন করিতেছে।

এমন-কি, বাঁচিয়া থাকিব এই আনন্দেই জীব মৃত্যুকেও স্বীকার করিতেছে। সে লড়াই করিয়া প্রাণের আনন্দেই প্রাণ দিতেছে। কর্মী মউমাছিরা আপনাকে অঙ্গহীন করিতেছে কেন ? সমস্ত মউচাকের প্রজাদের প্রাণের সমগ্রতার আনন্দ তাহাদিগকে ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করিতেছে। দেশের জন্য মানুষ যে অকাতরে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে তাহার মূলে এই প্রাণেরই আনন্দ। সমস্ত দেশের প্রাণকে সে বড়ো করিয়া জানিতে চায়— সেই ইচ্ছার জোরেই সেই আনন্দের শক্তিতেই সে আপনাকেও বিসর্জন করিতে পারে।

তাই আমি বলিতেছিলাম মূলে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে দেখা যায় প্রাণের আনন্দই বাঁচিয়া থাকিবার নানা শক্তিকে নানা দিকে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, সেই নানা শক্তি নানা দিক হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই আনন্দেই ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহারই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণের এই শক্তি যেমন প্রাণের ব্যাপ্তির দিক, প্রাণের এই আনন্দ তেমনি প্রাণের সমাপ্তির দিক।

যেমন গানের তান। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিসটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে ; তাহার মধ্যে তালমানলয় রহিয়াছে ; তাহার মধ্যে স্বরবিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে ; সেই নিয়মের মূলে স্বরতত্ত্বের গণিতশাস্ত্রসম্মত একটা দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে ; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই ; সেই নিয়মগুলি কার্যকারণের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি অন্তহীন নিয়মশৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে একরকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়। মূলের কথাটি এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটো কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহার মূল হইতে বাহির হইতে থাকে কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

কিন্তু যদি এই আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উলটাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক-না কেন গানকে সে কিছুই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।

যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। তখন তাহার গলায় যে তান খেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহা দুঃসাধ্য তাহা আপনি ঘটিতে থাকে। তাহাকে আর নিয়মের অনুসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি তাহার অনুগত হইয়া চলে। তানসেন আপনার মধ্যে সেই গানের আনন্দলোকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাই ঐশ্বর্যলোক ; এখানে অভাব পূরণ হইতেছে, ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে। তানসেন এই জায়গায় আসিয়া গান সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিতে এ কথা বুঝায় না যে, তাঁহার গানে তাহার পর হইতে নিয়মের বন্ধন আর ছিল না ; তাহা সম্পূর্ণই ছিল, তাহার লেশমাত্র ত্রুটি ছিল না— কিন্তু তিনি সমস্ত নিয়মের মূলে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া নিয়মের প্রভু হইয়া বসিয়াছিলেন— তিনি এককে পাইয়াছিলেন বলিয়াই অসংখ্য বহু আপনি তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছিল। এই আনন্দলোকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য সম্বন্ধে কবি,

কর্ম সম্বন্ধে কর্মী মুক্তিলাভ করে। কবির কাব্য কর্মীর কর্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়।

যাহা আপনার ভাব হইতে উঠে তাহাই স্বাভাবিক— তাহার মধ্যে অন্যের তাড়না নাই, তাহাতে নিজেরই প্রেরণা। যে কর্ম আমার স্বাভাবিক সেই কর্মেই আমি আপনার সত্য পরিচয় দিই।

কিন্তু এখানে আমরা যথেষ্ট ভুল করিয়া থাকি। এই ঠিক আপনটিকে পাওয়া যে কাহাকে বলে তাহা বুঝা শক্ত। যখন মনে করিতেছি অমুক কাজটা আমি আপনি করিতেছি অন্তর্যামী দেখিতেছেন তাহা অন্যের নকল করিয়া করিতেছি— কিংবা কোনো বাহিরের বিষয়ের প্রবল আকর্ষণে একঝোঁকা প্রবৃত্তির জোরে করিতেছি।

এই যে বাহিরের টানে প্রবৃত্তির জোরে কাজ করা ইহাও মানুষের সত্যতম স্বভাব নহে। বস্তুত ইহা জড়ের ধর্ম। যেমন নীচের টানে পাথর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে প্রবল বেগে গড়াইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ। এই জড়ধর্মকে খাটাইয়া প্রকৃতি আপনার কাজ চালাইয়া লইতেছে। এই জড়ধর্মের জোরে অগ্নি জ্বলিতেছে, সূর্য তাপ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, কোথাও তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। ইহা শাসনের কাজ। এইজন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

অগ্নিকে জ্বলিতেই হইবে, মেঘকে বর্ষণ করিতেই হইবে, বায়ুকে বহিতেই হইবে এবং মৃত্যুকে পৃথিবীসুদ্ধ লোকে মিলিয়া গালি দিলেও তাহার কাজ তাহাকে শেষ করিতেই হইবে।

মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এইরূপ জড়ধর্ম আছে। মানুষকে সে কানে ধরিয়া কাজ করাইয়া লয়। মানুষকে প্রকৃতি এইখানে তাহার অন্যান্য জড়বস্তুর শামিল করিয়া লইয়া জোর করিয়া আপন প্রয়োজন আদায় করিয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ যদি সম্পূর্ণই জড় হইত তাহা হইলে কোথাও তাহার বাধিত না, সে পাথরের মতো অগত্যা গড়াইত, জলের মতো অগত্যা বহিয়া যাইত— এ সম্বন্ধে কোনো নালিশটিও করিত না।

মানুষ কিন্তু নালিশ করে। প্রবৃত্তি যে তাহাকে কানে ধরিয়া সংসারক্ষেত্রে খাটাইয়া লয় ইহার বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি আজও থামিল না। সে আজও কাঁদিতেছে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল্!

সে ভিতরে ভিতরে এই কথাটা অনুভব করিতেছে যে, আমি যে কাজ করিতেছি সে গারদের মধ্যে কয়েদির কাজ— প্রবৃত্তিপেয়াদার তাড়নায় খাটিয়া মরিতেছি।

কিন্তু সে ভিতরে জানে এমন করিয়া অভাবের তাড়নায় প্রবৃত্তির প্রেরণায় কাজ করাই তাহার চরম ধর্ম নহে। তাহার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যাহা মুক্ত, যাহা আপনার আনন্দেই আপনাতে পর্যাপ্ত, দেশকালের দ্বারা যাহার পরিমাপ হয় না, জরামৃত্যুর দ্বারা যাহা অভিভূত হয় না। আপনার সেই সত্য পরিচয় সেই নিত্য পরিচয়টি লাভ করিবার জন্যই তাহার চরম বেদনা।

পূর্বেই আমি বলিয়াছি, কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্মী আপন কর্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত আপনাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভিতরকার আপনাকে যতই সে লাভ করে ততই কবির কাব্য অমর হইয়া উঠে; সে তখন বাহিরের অনুকরণা কাব্য হয় না; ততই কর্মীর কর্ম অমর হইয়া উঠে, সে তখন যন্ত্রচালিতবৎ কর্ম হয় না। কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময়— এইখানেই স্বত-উৎসারিত আনন্দের প্রস্রবণ।

এইজন্যই শাস্ত্রে বলে—

সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখম্।
যাহা-কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা-কিছু আত্মবশ তাহাই সুখ।

অর্থাৎ মানুষের সুখ তাহার আপনের মধ্যে— আর দুঃখ তাহার আপন হইতে ভ্রষ্টতায়।

এতবড়ো কথাটাকে ভুল বুঝিলে চলিবে না। যখন বলিতেছি সুখ মানুষের আপনের মধ্যে তখন ইহা বলিতেছি না যে, সুখ তাহার স্বার্থসাধনের মধ্যে। স্বার্থপরতার দ্বারা মানুষ ইহাই প্রমাণ করে যে, সে যথার্থ আপনার স্বাদটি পায় নাই, তাই সে অর্থকেই এমন চরম করিয়া এমন একান্ত করিয়া দেখে। অর্থকেই যখন সে আপনার চেয়ে বড়ো বলিয়া জানে তখন অর্থই তাহাকে ঘুরাইয়া মারে, তাহাকে দুঃখ হইতে দুঃখে লইয়া যায়— তখনই সে পরবশতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইয়া উঠে।

প্রতিদিনই আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া থকি। যে ব্যক্তি স্বার্থপর তাহাকে আপনার অর্থ ত্যাগ করিতে হয়— কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দায়ে পড়িয়া অর্থেরই জন্য সে অর্থ ত্যাগ করে— সেই তাহার প্রয়োজনের ত্যাগ দুঃখের ত্যাগ। কেননা, সেই ত্যাগের মূলে একটা তাড়না আছে, অর্থাৎ পরবশতা আছে। অভাবের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহাকে ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এক-একটা সময় উপস্থিত হয় যখন সে খুশি হইয়া খরচ করিয়া ফেলে। তাহার পুত্র জন্মিয়াছে খবর পাইয়া সে তাহার গায়ের দামি শালখানা তখনই দিয়া ফেলে। ইহা একপ্রকার অকারণ দেওয়া, কেননা কোনো প্রয়োজনই তাহাকে দিতে বাধ্য করিতেছে না। এই যে দান ইহা কেবল আপনার আনন্দের প্রাচুর্যকে প্রকাশ করিবার দান। আমার আপন আনন্দই আমার আপনার পক্ষে যথেষ্ট এই কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য ঐ শালখানা দিয়া ফেলিতে হয়। এই আনন্দের জোরে মানুষ একেবারে গভীরতম এমন একটি আপনাকে গিয়া স্পর্শ করে যাহাকে পাওয়া তাহার অত্যন্ত বড়ো পাওয়া। সেই তাহার আপনটি কাহারও তাঁবেদার নহে, সে জগতের সমস্ত শাল-দোশালার চেয়ে অনেক বড়ো, এইজন্য চকিতের মতো মানুষ তাহার দেখা যেই পায় অমনি বাহিরের ঐ শালটার দাম একেবারে কমিয়া যায়। যখন মানুষের আনন্দ না থাকে, যখন মানুষ আপনাকে না দেখে, তখন ঐ শালটা একেবারে হাজার টাকা ওজনের বোঝা হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় চর্মের মতো সর্বাঙ্গে চাপিয়া ধরে— তাহাকে সরাইয়া দেওয়া শক্ত হইয়া উঠে। তখন ঐ শালটার কাছে পরবশতা স্বীকার করিতে হয়।

এমনি করিয়া মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া আপনাকে দেখিতে পায়। মাঝে মাঝে এমন এক-একটা আনন্দের হাওয়া দেয় যখন তাহার বাহিরের ভারী ভারী পর্দাগুলাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য উড়াইয়া ফেলে। তখন বিপরীত কাণ্ড ঘটে— কৃপণ যে সেও ব্যয় করে, বিলাসী যে সেও দুঃখ স্বীকার করে, ভীরু যে সেও প্রাণ বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন যে নিয়মে সংসার চলিতেছে সেই নিয়মকে মানুষ এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে। সেইরূপ অবস্থায় মানুষের ইতিহাসে হঠাৎ এমন একটা যুগান্তর উপস্থিত হয়— পূর্বেকার সমস্ত খাতা মিলাইয়া যাহার কোনোপ্রকার হিসাব পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া পাইবে? স্বার্থের প্রয়োজনের হিসাবের সঙ্গে আত্মার আনন্দের হিসাব কোনোমতেই মেলানো যায় না— কেননা সেই যথার্থ আপনার মধ্যে গিয়া পৌঁছিলে মানুষ হঠাৎ দেখিতে পায়, খরচই সেখানে জমা, দুঃখই সেখানে সুখ।

এমনি করিয়া মাঝে মাঝে মানুষ এমন একটি আপনাকে দেখিতে পায়, বাহিরের সমস্তের চেয়ে যে বড়ো। কেন বড়ো? কেননা সে আপনার মধ্যেই আপনি সমাপ্ত। তাহাতে গুনিতে হয় না, মাপিতে হয় না— সমস্ত গনা এবং মাপা তাহা হইতেই আরম্ভ এবং তাহাতে আসিয়াই শেষ হয়। ক্ষতি তাহার কাছে ক্ষতি নহে, মৃত্যু তাহার কাছে মৃত্যু নহে, ভয় তাহার বাহিরে এবং দুঃখের আঘাত তাহার তারে আনন্দের সুর বাজাইয়া তোলে।

এই যাহাকে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া পায়— যাহাকে কখনো কখনো কোনো-একটা দিক দিয়া সে পায়—'যাহাকে পাইবামাত্র তাহার শক্তি স্বাভাবিক হয়, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়, তাহার কর্ম আনন্দের কর্ম হইয়া উঠে; যাহাকে পাইলে তাহার উপর হইতে বাহিরের সমস্ত চাপ যেন সরিয়া যায়, সে আপনার মধ্যেই আপনার একটি পর্যাপ্তি দেখিতে পায়— তাহার মধ্যেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলব্ধি করে। সেই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে অন্তরতমভাবে আছে বলিয়াই প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় সে যে-সকল কাজ করে সে কাজকে সে গারদের কাজ বলে। অথচ প্রকৃতি যে নিতান্তই জবরদস্তি করিয়া বেগার খাটাইয়া লয় তাহা নহে— সে আপনার কাজ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বেতনটিও শোধ করে, প্রত্যেক চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সুখও বাঁটিয়া দেয়। সেই সুখের বেতনটির প্রলোভনে আমরা অনেক সময় ছুটির পরেও খাটিয়া থাকি, পেট ভরিলেও খাইতে ছাড়ি না। কিন্তু হাজার হইলে তবু মাহিনা খাইয়া

খাটুনিকেও আমরা দাসত্ব বলি— আমরা এ চাকরি ছাড়িতেও পারি না তবু বলি হাড় মাটি হইল, ছাড়িতে পারিলে বাঁচি। সংসারে এই যে আমরা খাটি— সকল দুঃখ সত্ত্বেও ইহার মাহিনা পাই— ইহাতে সুখ আছে, লোভ আছে। তবু মানুষের প্রাণ রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং বলে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল্।

এমন কথা সে যে বলে, বেতন খাইয়াও তাহার যে পুরা সুখ নাই তাহার কারণ এই যে, সে জানে তাহার মধ্যে প্রভুত্বের একটি স্বাধীন সম্পদ আছে— সে জন্মদাস নহে— সমস্ত প্রলোভনসত্ত্বেও দাসত্ব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়— প্রকৃতির দাসত্বে তাহার অভাবটাই প্রকাশ পায় স্বভাবটা নহে। স্বভাবতই সে প্রভু ; সে বলে আমি নিজের আনন্দে চলিব, আমার নিজের কাজের বেতন আমার নিজেরই মধ্যে— বাহিরের স্তুতি বা লাভ, বা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার মধ্যে নহে। যেখানে সে প্রভু, যেখানে সে আপনার আনন্দে আপনি বিরাজমান, সেইখানেই সে আপনাকে দেখিতে চায় ; সেজন্য সে দুঃখ কষ্ট ত্যাগ মৃত্যুকেও স্বীকার করিতে পারে না। সেজন্য রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়— পণ্ডিত আপনার ন্যায়শাস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া দিয়া শিশুর মতো সরল হইয়া পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এইজন্যই মানুষ এই একটি আশ্চর্য কথা বলে, আমি মুক্তি চাই। কী হইতে সে মুক্তি চায় ? না, যাহা-কিছু সে চাহিতেছে তাহা হইতেই সে মুক্তি চায়। সে বলে আমাকে বাসনা হইতে মুক্ত করো— আমি দাসপুত্র নই অতএব আমাকে ঐ বেতন চাওয়া হইতে নিষ্কৃতি দাও। যদি সে নিশ্চয় না জানিত যে বেতন না চাহিলেও তাহার চলে, নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সম্পদ আছে এ বিশ্বাস যদি তাহার অন্তরতম বিশ্বাস না হইত তবে সে চাকরির গারদকে গারদ বলিয়াই জানিত না— তবে এ প্রার্থনা তাহার মুখে নিতান্তই পাগলামির মতো শুনাইত যে আমি মুক্তি চাই। বস্তুত আমাদের বেতন যখন বাহিরে তখনই আমরা চাকরি করি কিন্তু আমাদের বেতন যখন আমাদের নিজেদেরই মধ্যে, অর্থাৎ যখন আমরা ধনী তখন আমরা চাকরিতে ইস্তফা দিয়া আসি।

চাকরি করি না বটে কিন্তু কর্ম করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। কর্ম বরঞ্চ বাড়িয়া যায়। যে চিত্রকর চিত্ররচনাশক্তির মধ্যে আপনাকে পাইয়াছে— যাহাকে আর নকল করিয়া ছবি আঁকিতে হয় না, পুঁথির নিয়ম মিলাইয়া যাহাকে তুলি টানিতে হয় না, নিয়ম যাহার স্বাধীন আনন্দের অনুগত— ছবি আঁকার দুঃখ তাহার নাই, তাই বলিয়া ছবি আঁকাই তাহার বন্ধ এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বরঞ্চ উলটা। ছবি আঁকার কাজে আপনাকে সে আর বিশ্রাম দিতে চায় না। বেতন দিয়া এত খাটুনি কাহাকেও খাটানো যায় না।

ইহার কারণ এই যে, এখানে চিত্রকর কর্মের একেবারে মূলে তাহার পর্যাপ্তির দিকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতন কর্মের মূল নহে, আনন্দই কর্মের মূল— বেতনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আমরা সেই আনন্দকেই আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। গঙ্গা হইতে যেমন আমরা পাইপে করিয়া কলের জল আনি, বেতন তেমনি করিয়াই আনন্দকেই ঠেলা দিয়া তাহার একাংশ হইতে শক্তির সম্বল সঞ্চয় করিয়া আনে। কিন্তু কলের জলে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি না, তাহার হাওয়া খাইতে পারি না, তাহার তরঙ্গলীলা দেখিতে পাই না— তা ছাড়া কেবল কাজের সময়টিতেই সে খোলা থাকে— অপব্যয়ের ভয়ে কৃপণের মতো প্রয়োজনের পরেই তাহাকে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহার পরে কল বিগড়াইতেও আটক নাই।

কিন্তু আনন্দের মূল গঙ্গায় গিয়া পৌঁছিলে দেখিতে পাই সেখানে কর্মের অবিরাম স্রোত বিপুল তরঙ্গে আপনি বহিয়া যাইতেছে, লোহার কল অগ্নিচক্ষু রাঙা করিয়া তাহাকে তাড়না করিতেছে না। সেই জলের ধারা পাইপের ধারার চেয়ে অনেক প্রবল, অনেক প্রশস্ত, অনেক গভীর। শুধু তাই নয়— কলের পাইপ-নিঃসৃত কাজে কাজই আছে কিন্তু সৌন্দর্য নাই, আরাম নাই— আনন্দের গঙ্গায় কাজের অফুরান প্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সৌন্দর্য ও আরাম অনায়াসে বিকীর্ণ হইতেছে।

তাই বলিতেছিলাম চিত্রকর যখন সত্য আপনার মধ্যে সকল কর্মের মূলে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, আনন্দে গিয়া পৌঁছে, তখন তাহার চিত্র আঁকার কর্মের আর অবধি থাকে না। বস্তুত তখন তাহার কর্মের দ্বারাই আনন্দের

পরিমাণ হইতে থাকে, দুঃখের দ্বারাই তাহার সুখের গভীরতা বুঝিতে পারি। এইজন্যই কার্লাইল বলিয়াছেন— অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকে বলে প্রতিভা। প্রতিভা সেই শক্তিকেই বলে, যে শক্তির মূল আপনারই আনন্দের মধ্যে ; বাহিরের নিয়ম বা তাড়না বা প্রলোভনের মধ্যে নহে। প্রতিভার দ্বারা মানুষ সেই আপনাকেই পায় বলিয়া কর্মের মূল আনন্দপ্রস্রবণটিকে পায় ; সেই আনন্দকেই পায় বলিয়া কোনো দুঃখ তাহাকে আর দুঃখ দিতে পারে না। কারণ প্রাণ যেমন আপনিই খাদ্যকে প্রাণ করিয়া লয়, আনন্দ তেমনি আপনিই দুঃখকে আনন্দ করিয়া তোলে।

এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা কথাটা এই যে, যেখানে আপনার সমাপ্তি সেই আপনাকে মানুষ পাইতে চাহিতেছে, আপনার মধ্যে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, কারণ সেইখানেই তাহার স্থিতি, সেইখানেই তাহার আনন্দ। সেই তাহার স্বাধীন আপনার সঙ্গেই তাহার সংসারকে তাহার সমস্ত কর্মকে যোজনা করিতে চাহিতেছে। সেখান হইতে যে পরিমাণে সে বিচ্ছিন্ন হয় সেই পরিমাণেই কর্ম তাহার বন্ধন, সংসার তাহার কারাগার। সেখানকার সঙ্গে পূর্ণযোগে কর্মই মানুষের মুক্তি, সংসারই মানুষের অমৃতধাম।

এইবার আর-একবার গোড়ার কথায় যাইতে হইবে। আমরা বলিয়াছিলাম, মানুষের সমস্যা এই যে, ছোটোকে বড়োর সঙ্গে মিলাইবার ভার তাহার উপর। আমরা দেখিয়াছি তাহার ছোটো শরীরের সার্থকতা বিশ্বশরীরের মধ্যে, তাহার ছোটো মনের সার্থকতা বিশ্বমানবের মধ্যে। এই শরীর মনের দিক মানুষের ব্যাপ্তির দিক। আমরা ইহাও দেখিয়াছি শুদ্ধমাত্র এই আমাদের ব্যাপ্তির দিকে আমরা প্রকৃতির অধীন, আমরা বিশ্বব্যাপী অনন্ত নিয়মপরম্পরার দ্বারা চালিত— এখানে আমাদের পূর্ণ সুখ নাই, এখানে বাহিরের তাড়নাই আমাদিগকে কাজ করায়। আমাদের মধ্যে যেখানে একটি সমাপ্তির দিক আছে, যে পরিমাণে সেইখানকার সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপ্তির যোগসাধন হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তখন আমার শরীর আমারই বশীভূত শরীর, আমার মন আমারই বশীভূত মন হইয়া উঠিবে। তখন সর্বমাত্মবশং সুখম্। তখন আমার শরীর মনের বহু বিচিত্র নিয়ম আমার এক আনন্দের অনুগত হইয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাহার বহুত্বের দুঃসহ ভার একের মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া সহজ হইয়া যাইবে।

কিন্তু যেখানে তাহার সমাপ্তির দিক, যেখানে তাহার সমগ্র একের দিক সেখানেও কি তাহার সমস্যাটি নাই ?

আছে বৈকি। সেখানেও মানুষের আপন, আপনার চেয়ে বড়ো আপনার সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে। মানুষ যখনই আত্মবশ হইয়া আপনার আনন্দকে পায় তখনই বড়ো আনন্দকে সর্বত্র দেখিতে পায়। সেই বড়ো আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব, সেই বড়ো আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের সহজ প্রকৃতি। মানুষের শরীর বড়ো শরীরকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের মন বড়ো মনকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের আত্মা বড়ো আত্মাকে সহজে দেখে।

এইখানে পৌঁছানো, এইখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে চেষ্টা তাহাকেই আমরা ধর্ম বলি। বস্তুত ইহাই মানবের ধর্ম ; মানুষের ইহাই স্বভাব, ইহাই তাহার সত্যতম চেষ্টা। বীরের ধর্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম রাজত্ব— মানুষের ধর্ম ধর্মই— তাহাকে আর-কোনো নাম দিবার দরকার করে না। মানুষের সকল কর্মের মধ্যে সকল সৃষ্টির মধ্যে এই ধর্ম কাজ করিতেছে। অন্য সকল কাজের উদ্দেশ্য হাতে হাতে বোঝা যায়— ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাই, শীত নিবারণের জন্য পরি কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্যকে তেমন করিয়া চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিবার জো নাই। কেননা, তাহা কোনো সাময়িক অভাবের জন্য নহে, তাহা মানুষের যাহা-কিছু সমস্তের গভীরতম মূলগত। এইজন্য কোনো বিশেষ মানুষ তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিতে পারে, কোনো বিশেষ বুদ্ধিমান তর্কের দিক হইতে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে— কিন্তু সমস্ত মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে মানুষের সকল প্রয়োজনের মধ্যে, তাহার সমস্ত কাড়াকাড়ি মারামারি তাহার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে এই ধর্ম রহিয়াই গিয়াছে— তাহা অন্নপান নহে, বসনভূষণ নহে, খ্যাতিপ্রতিপত্তি নহে, তাহা এমন কিছুই নহে যাহাকে বাদ দিলে মানুষের আবশ্যকের হিসাবে একটু কিছু গরমিল হয় ; তাহাকে বাদ দিলেও শস্য ফলে, বৃষ্টি পড়ে, আগুন জ্বলে, নদী বহে ; তাহাকে বাদ দিয়া পশুপক্ষীর কোনো অসুবিধাই ঘটে না ; কিন্তু মানুষ তাহাকে বাদ দিতে পারিল না। কেননা, ধর্মকে কেমন

করিয়া ছাড়িবে? প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্ অগ্নি তাহার তাপধর্মকে ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহাই তাহার স্বভাব। বাহির হইতে দেখিলে বলা যায় অগ্নি কাষ্ঠকে চাহিতেছে কিন্তু ভিতরের সত্য কথা এই যে, অগ্নি আপন স্বভাবকে সার্থক করিতে চাহিতেছে— সে জ্বলিতে চায় ইহাই তার স্বভাব— এইজন্য কখনো কাঠ, কখনো খড়, কখনো আর-কিছুকে সে আত্মসাৎ করিতেছে; সে দিক দিয়া তাহার উপকরণের তালিকার অন্ত পাওয়া যায় না কিন্তু মূল কথাটি এই যে, সে আপনার স্বভাবকেই পূর্ণ করিতে চাহিতেছে। যখন তাহার উজ্জ্বল শিখাটি দেখা যায় না কেবল কৃষ্ণবর্ণ ধূমই উঠিতে থাকে, তখন সেই চাওয়া তাহার মধ্যে আছে; যখন সে ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে তখনো সেই চাওয়া তাহার মধ্যে নির্বাপিত হয় না। কারণ তাহাই তাহার ধর্ম। মানুষেরও সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাহার ধর্ম। ইহাই তাহার আপনাকে পরম আপনের মধ্যে চাওয়া। অন্য সকল চাওয়ার হিসাব দেওয়া যায়, কারণ তাহার হিসাব বাহিরে, কিন্তু এ চাওয়াটির হিসাব দেওয়া যায় না, কারণ ইহার হিসাব তাহার আপনারই মধ্যে। এইজন্য তর্কে ইহাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু মূলে ইহাকে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই, এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মূলে নিহিত। সেইজন্য আমাদের তর্কবিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নির্ভর নহে। ইহা আছেই। মানুষের একটা প্রয়োজন আজ মিটিতেছে, আর-একটা প্রয়োজন কাল মিটিতেছে, যেটা মিটিতেছে সেটা চুকিয়া যাইতেছে— কিন্তু তাহার স্বভাবের চরম চেষ্টা রহিয়াছেই। অবশ্য এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয় যে, ইহাই যদি মানুষের স্বভাব হয় তবে ইহার বিপরীত আমরা মনুষ্যসমাজে দেখি কেন? চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তো দেখি শিশু চলিতে পারে না। সে বারংবার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি যে, শিশু যে বার বার করিয়া পড়িতেছে আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তাহার স্বভাব— সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যে তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে গড়াইতেছে, যখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলই তাহাকে নীচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনো তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে— সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়— টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না; ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য প্রকৃতি যখন তাহাকে ধুলায় টানিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহার স্বভাব তাহাকে উপরে টানিয়া রাখিতে চাহে। সমস্ত টলিয়া পড়ার মধ্যে এই স্বভাব তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

আমাদের ধর্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব। প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবলই চেষ্টা করিতেছে— যখন ধুলায় লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনো অন্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলেই গতিকে পাইবে— দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অনুগত হইবে। তখনই তোমার ধর্ম সার্থক হইবে— তখনই তুমি তোমার চরিতার্থতাকে পাইবে।

এই চরিতার্থতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ বাহির হইতে যাহা-কিছু পাইতেছে তাহাতেই তাহার অন্তরতম ইচ্ছা মাথা নাড়িয়া বলিতেছে— যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই চরিতার্থতা হইতে, এই পরিসমাপ্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যাহা-কিছু দেখিতেছে তাহার মধ্যে সে মৃত্যুকেই দেখিতেছে— কেবল বিচ্ছেদ, কেবল অবসান; প্রয়োজন আছে তাহার আয়োজন পাই না, আয়োজন আছে তাহার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এ যে মৃত্যুকে দেখা, ইহার অর্থ নিরর্থকতাকে দেখা। মানুষ ইচ্ছা করিল, কাজ করিল, সুখ দুঃখ ভোগ করিল, তাহার পর মরিয়া গেল। সেইখানে মৃত্যুকে যখন দেখি তখন মানুষের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কাজের অর্থকে আর দেখিতে পাই না। তাহার দীর্ঘকালের জীবন মুহূর্তকালে মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ মিথ্যা হইয়া গেল।

পদে পদে এই মৃত্যুকে দেখা, এই অর্থহীনতাকে দেখা তো কখনোই সত্য দেখা নহে। অর্থাৎ ইহা কেবল বাহিরের দেখা; ভিতরের দেখা নহে; ইহাই যদি সত্য হইত তবে মিথ্যাই সত্য হইত— তাহা কখনোই

সম্ভব হইতে পারে না। জীবনের কার্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। মুখে যতই বলি-না কেন, কোনো অর্থ নাই ; যতই বলি-না কাজ কেবল কাজকে জন্ম দিয়াই চলিয়াছে তাহার কোনো পরিণাম নাই, ব্যাপ্তি কেবলই দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে দেশকালাতীত সুগভীর পরিসমাপ্তির কোনোই যোগ নাই, মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিতে পারে না।

দ্বারী দরজার কাছে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতেছে। আমি তাহার ভাষা বুঝি না। আমার কেবলই মনে হয়, একটার পর আর-একটা শব্দ চলিয়া চলিয়া যাইতেছে ; তাহাদের কোনো সম্বন্ধ জানি না। ইহাই মৃত্যুর রূপ ; ইহাই অর্থহীনতা। ইহাতে কেবল পীড়া দেয়। যখন ভাষা বুঝি, যখন অর্থ পাই, তখন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে আর শুনি না— তখন অর্থের অনবচ্ছিন্ন ঐক্যধারাকে দেখি, তখন অখণ্ড অমৃতকে পাই, তখন দুঃখ চলিয়া যায়। তুলসীদাসের রামায়ণে অর্থের অমৃত শব্দের খণ্ডতাকে পূর্ণ করিয়া দেখাইতেছে। সেই পূর্ণটিকে দেখাই তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িবার চরম উদ্দেশ্য— যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে ততক্ষণ প্রত্যেক শব্দই কেবল আমাদিগকে দুঃখ দিবে। ততক্ষণ পাঠকের মন কেবলই বলিতে থাকিবে, অবিশ্রাম শব্দের পর শব্দ লইয়া আমি কী করিব— অমৃত যদি না পাই তবে ইহাতে আমার কিসের প্রয়োজন।

আমাদেরও সেই কান্না। আমরা যখন কেবলই অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হইয়া আমাদিগকে কষ্ট দেয়— একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগ করিয়া যখন তাহাকে দেখি তখনই তাহার সমস্ত ব্যর্থতা দূর হইয়া যায়। তখন প্রতি পদেই আমাদিগকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন মৃত্যুই আমাদের কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। তখন এক অখণ্ড অমৃতে জগৎকে এবং জীবনকে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদের সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান হয়। তখন সা রি গা মা-র অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মরি না— রাগিণীর পরিপূর্ণ রসের সমগ্রতায় নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় লাভ করি।

পৃথিবী জুড়িয়া নানা দেশে নানা কালে নানা জাতির নানা ইতিহাসে মানুষ এই রাগিণী শিখিতেছে। যে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে বিশ্বজগৎ নব নব তানের মতো কেবলই আকাশ হইতে আকাশে বিস্তীর্ণ হইতেছে— সেই আনন্দ-রাগিণী মানুষ সাধিতেছে। ওস্তাদের ঘরে তাহার জন্ম, পিতার কাছে তাহার শিক্ষা। পিতার অনাদি বীণাযন্ত্রের সঙ্গে সে সুর মিলাইতেছে। সেই একের সুরে যতই তাহার সুর মিলিতে থাকে, সেই একের আনন্দে যতই তাহার আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে, বহুর তানমানের মধ্যে ততই তাহার বিঘ্ন কাটিয়া যায়, দুঃখ দূর হয়— বহুকে ততই সে আনন্দের লীলা বলিয়া দেখে ; বহুর মধ্যে তাহার ক্লান্তি আর থাকে না, সমস্তের সামঞ্জস্যকে সে একের মধ্যে লাভ করিয়া বিক্ষেপের হাত হইতে রক্ষা পায়। ধর্ম সেই সংগীতশালা যেখানে পিতা তাঁহার পুত্রকে গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মার সুর সঞ্চারিত হইতেছে। এই সংগীতশালায় যে সর্বত্রই সংগীত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে। সুর মিলিতেছে না, তাল কাটিয়া যাইতেছে ; এই বেসুর বেতালকে সুরে তালে সংশোধন করিয়া লইবার দুঃখ অত্যন্ত কঠোর ; সেই কঠোর দুঃখে কতবার তার ছিঁড়িয়া যায়, আবার তার সারিয়া লইতে হয়। সকলের একরকমের ভুল নহে, সকলের একজাতীয় বাধা নহে, কাহারও-বা সুরে দোষ আছে, কাহারও-বা তালে, কেহ-বা সুর তাল উভয়েই কাঁচা ; এইজন্য সাধনা স্বতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য একই। সকলকেই সেই এক বিশুদ্ধ সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া, এক বিশুদ্ধ রাগিণী আলাপ করিয়া, এক বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, যেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গিয়া যোগের সার্থকতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

ধর্মশিক্ষা

বালকবালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এ তর্ক আজকাল খৃস্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্মশিক্ষার কিরূপ আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্মসম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে, ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয় অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই— সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্‌বৃত্তটুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করি।

সস্তা জিনিস পৃথিবীতে অনেক আছে তাহাদিগকে অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায় কিন্তু মূল্যবান জিনিস কী করিয়া বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি সিঁধ কাটিবার বা জাল করিবার পরামর্শ চাহে ; সে জানে উপার্জনের বড়ো রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড়ো রাস্তাটা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহাজনি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তায় চলিবার মতো সময় দিতে বা পাথেয় খরচ করিতে সে রাজি নহে।

তাই ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে আমরা সত্যই কিরূপ পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একটু ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ গীতায় বলিয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কী ? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন যাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে তাহাকে বেশি কিছু নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে-সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন ধর্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাসগ্রহণের মতোই সহজ। তবে কিনা যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনই মানুষ বলে আমার নিশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজে যখন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জ্বল হয়, তখন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্মের জন্য সকলের চেয়ে বড়ো ত্যাগ করিতে থাকে— তখন ধর্মের জন্য মানুষের চেষ্টা চারি দিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে— তখন দেশের ধর্মমন্দির ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে— তখন ধর্ম যে কত বড়ো জিনিস তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্য কোনোপ্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্মসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এরূপ সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবনযাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বসিয়া যতই মন্ত্রণা করুক-না কেন ধর্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কী নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না— বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মত্ততা দিনরাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন-কি, আমাদের ধর্মসমাজসম্বন্ধীয় চেষ্টাগুলিও নিরন্তর ব্যস্ততাময় উত্তেজনা-পরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকাবিস্তীর্ণ নদীর মতো— সেখানে অগভীর ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিতান্ত একপাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে ; তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আম

নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবনযাত্রায় সরলতা নাই ; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও অত্যন্ত প্রবল ; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন-কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এইরূপে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এককোণে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা কী করিয়া অল্পমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠি তবে সেই উদ্‌বেগ অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল। তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না ; তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ, শিক্ষার্থীও ছিল অল্প এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে, সেইসঙ্গে বিদ্যার শাখাপ্রশাখাও চারি দিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্মযাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সমস্ত য়ুরোপখণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদসাধনের জন্য তুমুল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে, পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারি দিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাস-সম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে ; উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে, কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার সীলমোহরের স্বাক্ষর আছে এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে— উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম কিছুদিন মারিয়া কাটিয়া বাঁধিয়া পুড়াইয়া একঘরে করিয়া বিদ্যার দলকে চিরকেলে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার পুরাতন বুলি বলাইবার জন্য ধর্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কিন্তু বিদ্যার পক্ষ যতই

প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে বর্তমান কালে য়ুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চাত্যদেশে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সন্তানদিগকে বিনা ধর্মশিক্ষায় মানুষ করিয়া তোলা ভালো কি মন্দ সে তর্ক কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। কেননা বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ আমাদের দেশেও সৃষ্টিতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিদ্যাই পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনই আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনই তাঁহারা বিপদকে উপস্থিতমত ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন। কারণ বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে চিরদিন মকদ্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ-অবতার যে সত্যসত্যই বরাহবিশেষ নহে তাহা ভূকম্পশক্তির রূপকমাত্র এ কথা বলাও যা আর ধর্মবিশ্বাসের শাস্ত্রীয় ভিত্তিকে কোনো প্রকারে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে, শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনোমতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতেছেই। এইজন্য এ দেশে হিন্দুবিদ্যালয়সম্বন্ধীয় নূতন যে-সকল উদ্‌যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিন্তা এই যে, বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করিয়া।

আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শের সহিত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই, যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে সুদৃঢ় করিয়া তোলা মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয় তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে এইরূপ বাঁধা ধর্মশাস্ত্রের একটা সুবিধা আছে। ধর্মসম্বন্ধে বালকদিগকে কী শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব তাহা লইয়া বেশি কিছু ভাবিতে হয় না, তাহাদের বুদ্ধিবিচারকে উদ্‌বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন-কি, না করারই প্রয়োজন হয়; কতকগুলি নির্দিষ্ট মত কাহিনী ও আচারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা এইখানেই। আমরা মানুষের মনকে বাঁধিব কী দিয়া? তাহাকে ব্যাপৃত করিব কিরূপে, তাহাকে আকর্ষণ করিব কী উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টি বর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই তেমনি কেবলমাত্র ধর্মবক্তৃতায় যদি-বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একটু ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়, মধ্যাহ্নের পিপাসায়, গৃহদাহের দুর্বিপাকে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। তা ছাড়া মন জিনিসটা কতকটা জলের মতো, তাহাকে কেবল একদিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি ছেলেদের মন যে আলগা হইয়া খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। তথাপি এইপ্রকার অনির্দিষ্টতার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক

অতি-নির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব একটি বিশেষ ফিলজফি বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু দ্বৈত, কতটুকু অদ্বৈত, কতটুকু দ্বৈতাদ্বৈত ; ইহার মধ্যে শংকরের প্রভাব কতটা, কতটা কান্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মতো ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে উহা ধর্মই নহে উহা একটা ফিলজফি মাত্র ; ইহারা সেই কলঙ্ককেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মেরই ন্যায় ভক্তের জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্‌স্টবুক-কমিটির সংকলিত সামগ্রী নহে এবং ইহা গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো দপ্তরির হাতে মজবুত করিয়া বাঁধাই হইয়া যায় নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা বাড়িবে, তাহা চলিবে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনই কিন্তু একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই রহস্যকে যদি অনির্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর, তবে ইহাকে জাঁতায় ফেলিয়া পেষো— ইহার জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলো। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন ব্রাহ্মধর্ম কোনো একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবন-উৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ডোবা নহে, বাঁধানো সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী— তাহার রূপ প্রবহমান রূপ, তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে— নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে, কিন্তু সে-সকল ঘাটকেও তাহা বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিবে— কোনো স্পর্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দর্শনতত্ত্ব এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী ? তাহা একটা মোটা কথা, তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অন্ত পাওয়া যাইবে না ; কিন্তু আসল কথা এই যে রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে, তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোটো করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব মোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মানুষ যত বারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার সুবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অদ্ভুত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলেটিকে সর্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সুবিধা করিতে গিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বপ্ন বটে কিন্তু মানুষ এমন কাজ করিয়া থাকে। আইডিয়াকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া লয়, ইহাতে মুণ্ডটাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করা যায় বটে কিন্তু প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়ে। এক দল আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিদ্ধি মনে করে— আর-এক

দল ইহাদের খেলার বিঘ্ন না করিয়া অতিদূরে নিভৃতে গিয়া আপনার সাধনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়া কখনোই চিরদিন চলে না। যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠে। এ দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল, মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম ; বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম ; উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম ; এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল— সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা এক মুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার এই জড়তা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত ; আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত ; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে ; কোথাও বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে— ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন ; সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল ; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে, আরম্ভে এবং আজ পর্যন্ত এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতন্ত্র বা পূজাপদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি— ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলোচনার পূর্বে আমরা কাহাকে ধর্ম বলি তাহা পরিষ্কার

করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা স্থির জানিতে হইবে যে, বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নহে। অতএব ইহার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মে অন্য প্রণালীতে কতকগুলি সহজ সুযোগ আছে এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে যে ধুলা সহজ!

যাহা হউক এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র-প্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকাপয়সার মতো হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আনুকূল্যের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মানুষের প্রকৃতি-নিহিত এই অনন্তের বোধকে তাহার এই ধর্ম-প্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মতো ইস্কুল-কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না, ইনস্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরিমাণ ধরা পড়ে না, এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্কা দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" অর্থাৎ এটা কোনোমতেই পঠন-পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, বেদাহমেতম্, আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে, তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরূপ তর্কই থাকিত না।

অথচ ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া পূর্ণভাবে উদ্‌বোধিত করা যাইতে পারে এরূপ প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাঁধা প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। একদিকে যেমন একদল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, চিত্তকে শুদ্ধ করো, পাপকে দমন করো, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী, অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেষ্টায় উদ্‌বোধিত করিয়া তোলো, অপর দিকে তেমনি আর-এক দল বিশেষ বিশেষ বাহ্যপ্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহ-বা বলেন যজ্ঞ করো, কেহ-বা বলেন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মূর্তিকে ধ্যান করো, এমন-কি, কেহ-বা বলেন মাদক পদার্থের দ্বারা অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে তাড়না করিয়া দ্রুতবেগে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

এমনি করিয়া যখনই চেষ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনই প্রমাদের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, কল্পনাকে সংযত করা অসাধ্য হয়, তখনই মানুষের বিশ্বাসমুগ্ধতা লুব্ধ হইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মানুষ আপনাকে ভোলায়, অন্যকে ভোলায়; সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া ধর্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মূঢ়তায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

অথচ যাঁহারা এইরূপ উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিস, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর-এক জিনিস।

মনে করো আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য; আমাকে যদি কোনো বেচারা অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রশ্ন করে তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনাদুঃখে হজম করিতে পার তবে আমি হয়তো সরল বিশ্বাসে তাহাকে বলিয়া দিতে পারি যে, আহারের পর আমি দুই খণ্ড কাঁচা সুপারি মুখে দিয়া বর্মাদেশজাত একটা করিয়া আস্ত চুরুট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি, ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া যায়। আসলে আমি যে এতৎসত্ত্বেও হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না; এমন-কি, যে

অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি কোনো দিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, আজ বুঝি পাকযন্ত্রটা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।

শুনা যায় কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জর্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয়তো একটা উত্তেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত আপনি কী করিয়া এমন ভালো কবিতা লেখেন তবে তিনি আর-কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ঐ পচা আপেলটাকেই হয়তো উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড়ো কবি হউন-না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিত্বচর্চার উপায় সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এমন কথা নাই। এরূপ স্থলে তাঁহাকে যদি মুখের সামনে বলি তুমি কবিতাই লিখিতে পার তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কী জান, তবে তাঁহাকে কবি হিসাবে অশ্রদ্ধা করা হয় না। বস্তুত স্বাভাবিক প্রতিভাবশতই যাহারা কোনো একটা জিনিস পায়, পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই-সকল অভ্যাসমাত্রেই যে শক্তির সঞ্চার করে তাহা নহে; এমন-কি, তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদুর্বল করিয়া রাখে। অনেক মহাপুরুষ এইরূপ দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আঘাত করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগুণে এই-সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা সকল-সময়ে নিজেরাও বুঝেন না, এবং কখনো বা মনে করেন এখন আমার পক্ষে এই-সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহুল্য হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহার ফল হয় এই, যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগুলিকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে আমরা সার্থকতালাভ করিয়াছি; তাহারা অহংকৃত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না, কারণ তাহাদের কাছে এই-সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে-সকল জিনিসের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে, অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিক আনুকূল্য আছে। ধর্মবোধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাশান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; অর্থাৎ চারি দিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাৎ সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকলপ্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া, ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথ বলিলেই বা চলিবে কেন? এ-সব দুর্লভ জিনিস তো আবশ্যক বুঝিয়া ফরমাশ দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশ্যকতা যদি থাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি আমরা চেষ্টা করিতেছি। আমরা যাহা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

আমরা যখনই বলিতেছি ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দ্র একটা যথার্থ আশ্রয় যথার্থভাবে পাইতেছে না তখনই জিনিসটা যে কেমনতরো হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান চাই না, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন-কি কোনো-একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকলপ্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি যাঁহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাঙ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালোবাসেন তাঁহারা বলিবেন, এটা তো এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যযুগের monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, ইহাতে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।

অন্য কোনো এককালে যে জিনিসটা ছিল এবং যাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে, তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্বরদের ধনুর্বাণ যতই মনোহর হউক তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভ্যযুগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভ্যযুগে যদি-বা অনাদৃত হয় কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রবৃত্তিটা তো আছে। তাহা যতক্ষণ লুপ্ত নাহয় ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুদ্ধ-ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব যুদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উলটা রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এখনো সেকালেরই মতো সৈন্য লইয়া দল বাঁধিতে এবং দুইপক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।

মানুষের মনের যে ইচ্ছা পূর্বে একদিন ধর্মসাধন উপলক্ষে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও অনেকটা সেই পূর্ব আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশ-চেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।

অথচ আমরা অনুকরণচ্ছলে অনেক জিনিস গ্রহণ করি যাহার সংগতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্তমানকালীন তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্তমান তাহা যে আমার বর্তমান নহে সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এইজন্যই যদি বলা যায় আমরা যথাসম্ভব গির্জার মতো একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব তবে আমাদের মনে মস্ত এই একটা সান্ত্বনা আসে যে আমরা বর্তমানের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতেছি— অথচ গির্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে-সকল ব্যবস্থা আমাদের স্বদেশীয়, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি— "না, ইহা চলিবে না। ইহা মডার্ন নহে।" মনের এমন অবস্থা মানুষের যখন জন্মায় তখন সে আধুনিকতা নামক অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলা বাঁধা মন্ত্রকে কানে লয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতেছি না। আপনারা সকলেই জানেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়াতলে যেখানে

একদিন তাঁহার নিভৃত সাধনার বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি ছিল তাহা নহে, ইহার প্রতি তাঁহার একটি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই স্থান প্রায় শূন্যই পড়িয়া ছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা তিনি চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর। কারণ, মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর-এক দিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইস্কুলের বিদ্যা নহে— তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস একটি অমৃতরস অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষধের মতো কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না আমি এখানে কোনো অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনো নিযুক্ত আছে তাহা এখানকার সর্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানাবিধ প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড়ো সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে যতদিন পর্যন্ত মনে করিয়াছিলাম, আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব আমরাই তাহাদের উপকার করিব, ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিয়াছি। ততদিন যত যন্ত্রই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যন্ত্রই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনো যন্ত্র গড়িবার উৎসাহ আমাদের একেবারে যায় নাই, কেননা এখনো ভিতরের জিনিসটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে হইবে; আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি; এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন; এখানে গুরুশিষ্য সকলেই একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভরতি হইয়াছি; তখন হইতে ফল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃঙ্খলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনো আমাদের যাহা-কিছু নিষ্ফলতা সে এখানেই— যেখানেই আমরা মনে করি আমরা দিব অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহার চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না, সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি।

নিজেদের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ করিয়া এ কথা আমাকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো; তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে— যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্‌বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিসটিকে, এই সাধকদের

জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানব-সমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল, সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে তবে পূর্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্মজীবনের শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া থাকি অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা, তাহা আমাদের মনে খুবই উচ্চ হইয়া আছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব সেই আশ্রমের যে আহ্বান তাহা সেই শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি-না কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গল-শঙ্খধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না— তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগম্ভীর স্বরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে, এবং সেখানকার নির্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গেরুয়া পরিয়া মাথায় তিলক কাটিয়া আসিবেন না— তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমন-বার্তা জানিতেও পারিব না। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। এই ভূমার আহ্বানের একেবারেই মাঝখানে আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে। সেই একাগ্র ধ্বনি তাহাদের বিমুখ কর্ণের বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে। সে তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা একহিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত জনতাসমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক-একটি রবিনসন ক্রুসোর মতো আপনার ফ্রাইডেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এতবড়ো জনময় নির্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু একশো দুশো মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জন বাস বলা চলে না। এ যে একশো দুশো মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে; ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম এমনটি হইবার জো নাই; এই একশো দুশো মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে; ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে— ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা?

আমার সেই বন্ধু হয়তো বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও— কিন্তু সংসারে যেখানে চারি দিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই উঠা-পড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ— আর বার বার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।

হায়, সাধুতার এই নিষ্কণ্টক আতরটি কোন্ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। কাব্যে পুরাণে সর্বত্রই তপোবনের আদর্শটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণনায় বিরাজ করে কিন্তু তবু সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহুতর মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ঘন ঘন উঁকি মারিতেছে। মানুষের আদর্শ যেমন সত্য, সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনি সত্য— যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে, চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি, সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না— সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং-পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না— কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপস করিয়া মিলিয়া-মিশিয়াই থাকে— এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কী? বন্ধুরা বলিবেন, যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালয়ের চেয়ে কম না হইয়া বরঞ্চ বেশিই হয় এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলিবার আশা না করিতে পার এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মতো মাঝারি রকমেরই মানুষ হন তবে সেইপ্রকার স্থানই যে বালকবালিকাদের ধর্মশিক্ষার অনুকূল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই— কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে— কারণ আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো-একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নসুলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাঁহার স্থূল দেহের ঐক্য আছে এ কথা আমি বারংবার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম জায়গাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই, যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ— তাহা বাসনার দিকে নয়, সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে, সে আপনাকে যদি-বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইতে চাহিতেছে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের ঊর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু কেনই বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব? কেনই বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে যে ভাবটি ভরিয়া উঠে তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ, শুদ্ধমাত্র এ নহে যে তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি— তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারি একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমালিপ্ত আকাশের নীচে জন্মগ্রহণ করি

নাই, শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে তো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বদ্ধ করে নাই ; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে ; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না ; সূর্যোদয় যে ভক্তির পূজাঞ্জলির মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয় ; কী উদার নদীর ধারা, কী নির্জন গম্ভীর তাহার প্রসারিত তট ; অবারিত মাঠ রুদ্রের যোগাসনের মতো স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মতো তাহার দিগন্তজোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না ; এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্তবায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে ; আমাদের দেশে এ-সমস্তই যে সত্য, চিরকালের সত্য ; পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই-সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল— তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না ? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে ? আমরাই তো জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে— সেইজন্যই অনন্তের বাঁশির সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্নানে আহারে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে— আমাদের কাব্যপুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে— সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। নাহয় আজ যে কালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিতেছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন ? নাহয় আমরা কয়জন এই শহরের পোষ্যপুত্র হইয়া তাহার পথের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন ? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশ বর্ষ জড়িত হইয়াছে অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম ; কারণ আনুমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনোপ্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে, সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন-সকল আশ্রমের প্রয়োজন, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্বাভাবিক ; যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না ; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে ; কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে ; যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের

আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত্ত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না, এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে ; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে, তাহারা নানা প্রকারে কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

১৩১৮

ধর্মের অধিকার

যে-সকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়ো— অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেইখানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এইজন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন-সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্মের মধ্যে যাহা শুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠে, বলিয়া বসে এ-সব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড়ো বড়ো কাজের কথা কালের স্রোতে বুদ্‌বুদের মতো ফেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে ফাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অভাবনীয়ই সত্য হইল, বুদ্ধিমানের মন্ত্রণা নহে কিন্তু পাগলের পাগলামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে, বাহিরে, তাহার চিন্তায় কর্মে, তাহার দর্শনে সাহিত্যে কত নব নব সৃষ্টিবিকাশ করিয়া চলিল তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেই-সকল অদ্ভুত কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরো অমর হইয়া উঠে, তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলে সে অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে সবলে বাধা দিতে গিয়াই আরো নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হয়— এবং যেন মন্ত্রের বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের অগোচরে, এমন-কি, নিজের অনিচ্ছায়, সেই-সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রঙ বদল হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর ফিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটি কোনো বাধায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহাই তাহার চরম আশ্রয়, এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রকে প্রথাকে একেবারে নিশ্ছিদ্ররূপে পাকা করিয়া সনাতন বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে— সেইখানেই মহাপুরুষেরা আসিয়া গণ্ডি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন— বলিয়াছেন, পথ এখনো বাকি, পাথেয় এখনো শেষ হয় নাই, যে অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমার চরমলোক সে তোমাদের এই মিস্ত্রির হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্মিত হয় না— বিকশিত হয়, সঞ্চিত হয় না— সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কারুকার্য নহে— তাহা অক্ষয় জীবনের অক্লান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে— সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য, কেননা আমি দুর্বল আমি শ্রান্ত ; তাঁহারা বলেন— এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, ভূমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্তোষ নাই।

যে ব্যক্তি ছোটো সে বিশ্বসংসারকে অসংখ্যবাধার রাজ্য বলিয়াই জানে, বাধামাত্রই তাহার দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে ও তাহার আশাকে প্রতিহত করে দেয় ; এইজন্য সে সত্যকে জানে না, বাধাকেই সত্য বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি বড়ো তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারেই সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটোর সঙ্গে বড়োর কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে, আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনো তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সমস্ত অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতেছি যিনি মহান্ পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ময়। এইজন্য যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, অধর্মই আমাকে বাঁচাইতে পারে এই মনে করিয়া হাজার হাজার লোক জালজালিয়াতি মারামারি কাড়াকাড়ির দিকে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে তখনো তাঁহারা অসংকোচে এমন কথা বলেন যে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ— অতি অল্পমাত্র ধর্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে ; যখন দেখা যাইতেছে সৎকর্ম পদে পদে বাধাগ্রস্ত, তাহা মূঢ়তার জড়ত্বপুঞ্জে প্রতিহত, প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত, বাহিরে তাহার দারিদ্র্য সর্বপ্রকারেই প্রত্যক্ষ, তখনো তাঁহারা অসংশয়ে বলেন, সর্ষপপরিমাণ বিশ্বাস পর্বতপরিমাণ বাধাকে জয় করিতে পারে। তাঁহারা কিছুমাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না, মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো করিয়া ধরেন না ; তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে— এবং সংসারকেই যে-সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন— সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি, সত্যকে তাহার চেয়েও তাঁহারাই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাঁহারা বড়ো হইয়া জন্মিয়াছেন।

তাঁহাদের যাহা অনুশাসন তাহাও শুনিতে অত্যন্ত অসম্ভব। সংসারে যে লোকটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখো এ পরামর্শটি নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু এখানেই তাঁহারা দাঁড়ি টানেন নাই ; তাঁহারা বলিয়াছেন, আপনার মতো করিয়াই সকলকে দেখো। তাহার কারণ এই আত্মপরের ভেদ যেখানে সেখানেই তাঁহাদের দৃষ্টি ঠেকিয়া যায় নাই, আত্মপরের মিল যেখানে সেইখানেই তাঁহারা বিহার করিতেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করিবে এ কথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল, কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন, শত্রুকেও প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ— এই প্রেমের মধ্যেই তাঁহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, এইজন্য স্বভাবতই সে-পর্যন্ত না গিয়া তাঁহারা থামিতে পারেন না। তুমি বড়ো হও, ভালো হও, এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—

শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যায় তেমনি করিয়া তন্ময় হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করো।

ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম নহে— তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্য তদ্‌ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়— তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয় স কৃপণঃ— সে কৃপাপাত্র।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকলের বড়ো তাঁহারা সেইখানকার কথাই বলিতেছেন যাহা সকলের চরম। কোনো প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সে সত্যকে তাঁহারা ছোটো করেন না। সেই চরম লক্ষ্যকেই অসংশয়ে সুস্পষ্টরূপে সকল সত্যের পরম সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মানুষকে আত্ম-অবিশ্বাসী ও ভীরু করিয়া রাখা হয় ; বাধার ওপারে যে সত্য আছে তাহার কথাই তাহাকে বড়ো করিয়া না শুনাইয়া বাধাটার উপরেই যদি ঝোঁক দেওয়া হয় তবে সে অবস্থায় মানুষ সেই বাধার সঙ্গেই আপস করিয়াই বাসা বাঁধে এবং সত্যকেই আয়ত্তের অতীত বলিয়া ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু মানবগুরুগণ যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম বলিয়া

থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাই মানুষের সত্য। যেমনি লোভ হইবে অমনি কাড়িয়া খাইবে মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি আছে সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তবু ইহাকে আমরা মানুষের ধর্ম অর্থাৎ মানুষের সত্যকার স্বভাব বলি না। লোভ হইলেও লোভ দমন করিবে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে না, এ কথা বলিলেও কম বলা হয় না— কিন্তু তবু এখানেও মানুষ থামিতে পারে না। সে বলিয়াছে, ক্ষুধিতকে নিজের অন্ন দান করিবে, ইহাই মানুষের ধর্ম, ইহাই মানুষের পুণ্য, অর্থাৎ তাহার পূর্ণতা। অথচ লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজনদরে মানুষের ধর্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন পরকে দান করা মানুষের ধর্ম নহে; কেননা অনেক লোকই পরের অন্ন কাড়িবার বাধাহীন সুযোগ পাইলে নিজেকে সার্থক মনে করে। তবু আজ পর্যন্ত মানুষ এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে দয়াই ধর্ম, দানই পুণ্য।

কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা সত্য মানুষের পক্ষে তাহাই যে সহজ তাহা নহে। তবেই দেখা যাইতেছে সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ আরাম পাইতে চায় না, এবং যে-কোনো দুর্বলচিত্ত সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়াছে এবং ধর্মকে আপনার সুবিধামত সহজ করিয়া লইয়াছে তাহার আর দুর্গতির অন্ত থাকে না। আপন ধর্মের পথকে মানুষ বলিয়াছে— ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। দুঃখকে মানুষ মনুষ্যত্বের বাহন বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং সুখকেই সে সুখ বলে নাই, বলিয়াছে— ভূমৈব সুখম্।

এইজন্যই এই বড়ো একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় যে, যাঁহারা মানুষকে অসাধ্যসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মতো নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তাহার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম; সে মুখে যাহাই বলুক শেষকালে দেখা যায় সে বড়োকেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্যসাধনকেই সে সত্য-সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।

যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন-না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে— তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এইজন্য তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখে ভয় তাহাকে ভয় দেখাইতেছে না, দুঃখ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না, বাধা তাহাকে পরাভূত করিতেছে না, এমন-কি, নিষ্ফলতাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। তখন সে হঠাৎ দেখিতে পায় ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, ক্লেশ তাহার পক্ষে আনন্দময়, এবং মৃত্যু তাহার পক্ষে অমৃতের সোপান।

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার কালে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মানুষের মনে কামনা অত্যন্ত বেশি প্রবল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার চেয়েও প্রবল পদার্থ আমাদের আছে; সত্যের পিপাসা যদি আমাদের রিপুর চেয়ে প্রবলতর না হইত তবে আমাদের মধ্যে কেই-বা ধর্মের পথে চলিতে পারিত।

মানুষের প্রতি এত বড়ো শ্রদ্ধার কথা এত বড়ো আশার কথা সকলে বলিতে পারে না। কামনার আঘাতে মানুষ বার বার স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কেবল ইহাই বড়ো করিয়া তাহার চোখে পড়ে যে ছোটো; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যের আকর্ষণে মানুষ যে পাশবতার দিক হইতে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে এইটেই বড়ো করিয়া দেখিতে পান তিনিই যিনি বড়ো। এইজন্য তিনিই মানুষকে বারংবার নির্ভয়ে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই মানুষের জন্য আশা করিতে পারেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটি শুনাইতে আসেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি কৃপণের ন্যায় মানুষকে ওজন করিয়া অনুগ্রহ দান করেন না, এবং বলেন না তাহাই তাহার বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে যথেষ্ট— প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তিনি আপন চিরজীবনের সর্বোচ্চ সাধনের ধন তাহার নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ করেন,

জানেন সে তাহার যোগ্য। সে যে কত বড়ো যোগ্য তাহা সে নিজে তেমন করিয়া জানে না, তিনি যেমন করিয়া জানেন।

মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না— মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার। মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম খাড়া করো ; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের সাধ্য। মানুষের সমস্ত শক্তির উপরে তাঁহারা দাবি করেন— কেননা সমস্ত অশক্তির পরিচয়কে অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাহার শক্তি আছে।

অতএব ধর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে। কোনো লোক রাজার ছেলে হইয়াও হয়তো আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে তবুও দেশের লোকের দিক হইতে একটা তাগিদ থাকা চাই। তাহার পৈতৃক গৌরব তাহাকে স্মরণ করাইতেই হইবে, তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে, এমন-কি, তাহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে চাষা বলিয়া মিথ্যা ভুলাইয়া সমস্যাকে দিব্য সহজ করিয়া দিলে চলিবে না ; সে চাষার মতো প্রত্যহ ব্যবহার করিলেও সত্য তাহার সম্মুখে স্থির রাখিতে হইবে। তেমনি ধর্ম কেবলই মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য ; ব্যবহারত মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে ; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না ; ইহাই তাহার সর্বপ্রধান কাজ।

ব্যাধি মানুষের শরীরের স্বভাব নহে তবু ব্যাধি মানুষকে ধরে। কিন্তু তখন মানুষের শরীরের প্রকৃতির ভিতরের দিক হইতে ব্যাধিকে তাড়াইবার নানাপ্রকার উপায় করিতে থাকে। যতক্ষণ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ এই সংগ্রামে ভয় বেশি নাই কিন্তু যখন মস্তিষ্ককেই ব্যাধিশত্রু পরাভূত করে তখনই ব্যাধি সকলের চেয়ে নিদারুণ হইয়া উঠে কারণ তখন বাহিরের দিক হইতে চিকিৎসকের চেষ্টা যতই প্রবল হউক ভিতরের দিকের শ্রেষ্ঠ সহায়টি দুর্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক যেমন শরীরে, ধর্ম তেমনি মানবসমাজে। এই ধর্মের আদর্শই নিয়ত ভিতরে ভিতরে মানবপ্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে কিন্তু যে পরম দুর্দিনে এই ধর্মের আদর্শকেই বিকৃতি আক্রমণ করে সেদিন বাহিরের নিয়ম সংযম আচার অনুষ্ঠান পুলিস ও রাষ্ট্রবিধি যতই প্রবল হউক না কেন সমাজপ্রকৃতিকে দুর্গতি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? এইজন্য দুর্বলতার দোহাই দিয়া ইচ্ছাপূর্বক ধর্মকে দুর্বল করার মতো আত্মঘাতকতা আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ দুর্বলতার দিনেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় ধর্মের বল।

আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামত খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসংকোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্য ধর্মকে ছাঁটিয়া ছোটো করিতে দোষ নাই, এমন-কি, তাহাই কর্তব্য।

ধর্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এমন কথা কি বলা যায়? প্রয়োজন অনুসারে আমরা তাহাকে ছোটো বড়ো করিব! ধর্ম তো জীবনহীন জড় পদার্থ নহে ; তাহার উপরে ফরমাশমত অনায়াসে দরজির কাঁচি বা ছুতারের করাত তো চলে না। এ কথা তো কেহ বলে না যে, শিশুটি ক্ষুদ্র বলিয়া মাকেও চারি দিক হইতে কাটিয়া কম করিয়া ফেলো। মা তো শিশুর গায়ের জামার সঙ্গে তুলনীয় নহেন। প্রথমত মাকে কাটিতে গেলেই মারিয়া ফেলা হইবে, দ্বিতীয়ত অখণ্ড সমগ্র মাতাই বড়ো সন্তানের পক্ষে যেমন আবশ্যক ছোটো সন্তানটির পক্ষেও তেমনি আবশ্যক— তাঁহাকে কম করিলে বড়োও যেমন বঞ্চিত হইবে, ছোটোও তেমনি বঞ্চিত হইবে। ধর্ম কি মানুষের মাতার মতোই নহে?

আমি জানি আমাকে এই প্রশ্ন করা হইবে সকল মানুষেরই কি বুদ্ধি ও প্রকৃতি একই রকমের? সকলেই কি ধর্মকে একই ভাবে বোঝে? না, সকলের এক নহে ; ছোটো বড়ো উঁচু নিচু জগতে আছে। অতএব সত্যকে আমরা সকলেই সমান দূর পর্যন্ত পাইয়াছি এ কথা বলিতে পারি না। আমাদের শক্তি পরিমিত ; কিন্তু যতদূর বড়ো করিয়া সত্যকে পাইয়াছি তাহার চেয়েও সে ছোটো এ মিথ্যা কথা তো ক্ষণকালের জন্যও আমরা কাহারও খাতিরে বলিতে পারি না। গ্যালিলিও যে জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা

তখনকার কালের প্রচলিত খৃস্টানধর্মের সঙ্গে খাপ খায় নাই— তাই বলিয়া এ কথা বলা কি শোভা পাইত যে, খৃস্টান-বেচারার পক্ষে মিথ্যা জ্যোতির্বিদ্যাই সত্য ? তাহাকে কি এই উপদেশ দেওয়া চলিত যে, তুমি খৃস্টান অতএব তোমার উচিত তোমার উপযোগী একটা বিশেষ জ্যোতিষকেই একান্ত শ্রদ্ধার সহিত বরণ করা ?

কিন্তু তাই বলিয়া গ্যালিলিওই কি জ্যোতিষের চরমে গিয়াছেন ? তাহা নহে। তবুও তাহা সত্যের দিকে যাওয়া। সেখান হইতেও অগ্রসর হও কিন্তু কোনো কারণেই পিছু হঠা আর চলিবে না ; যদি হঠিতে থাকি তবে সত্যের উলটা দিকে চলা হইবে সুতরাং তাহার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে একটিমাত্র লোকের বোধও যদি দেশের সকল লোকের বোধকে ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে তাহাই সমস্ত দেশের লোকের ধর্ম, কারণ তাহাই দেশের সর্বোচ্চ সত্য। অন্য লোকে তাহা গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব করিবে ; কিন্তু তুমি যদি বুঝিয়া থাক তবে তোমাকে সকল লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে, ইহাই সত্য এবং ইহা সকল লোকেরই সত্য, কেবল একলা আমার সত্য নহে। কেহ যদি জড়ভাবে বলিতে থাকে ইহা আমি বুঝিতে পারিব না তবে তোমাকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কারণ ইহা সত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করাই মানুষের ধর্ম।

ইতিহাসে আমরা কী দেখিলাম ? আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব যখন সত্যকে পাইয়াছি বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন আমার ভিতর দিয়া সমস্ত মানুষ এই সত্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তির পরিমাপ করিয়া সত্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিথ্যার খাদ মিশাইতে লাগিলেন না। তাঁহার মতো অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় এ কথা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই। অথচ সকল মানুষ তাহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, অনেকে তাহা বুদ্ধির দোষে বিকৃতও করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুদ্র করা কোনোমতেই চলে না— যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুক আর না মানুক, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সামনে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। বাপকে সকল ছেলে সমান শ্রদ্ধা করে না এবং অনেক ছেলে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াও থাকে, তাই বলিয়া ছেলেদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া এমন কথা বলা চলে না যে, তোমার বাপ বারো-আনা, তোমার বাপ সিকি, এবং তোমার বাপ বাপই নহে, তুমি একটা গাছের ডালকে বাপ বলিয়া গ্রহণ করো— এবং এইরূপে অধিকার-ভেদে তোমরা বাপের সঙ্গে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে থাকো ; তাহা হইলেই তোমাদের সন্তানধর্ম পালন করা হইবে। বস্তুত পিতার তারতম্য নাই ; তাঁহার সম্বন্ধে সন্তানদের হৃদয়ের ও ব্যবহারের যদি তারতম্য থাকে তবে সেই অনুসারে তাহাদিগকে ভালো বলিব বা মন্দ বলিব, এ কথা কখনোই বলিব না তুমি যখন এইটুকু মাত্র পার তখন এইটুকুই তোমার পক্ষে ভালো।

সকলেই জানেন যিশু যখন বাহ্য-অনুষ্ঠান-প্রধান ধর্মকে নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিক ধর্মের বার্তা ঘোষণা করিলেন তখন য়িহুদিরা তাহা গ্রহণ করে নাই। তবু তিনি নিজের গুটিকয়েক অনুবর্তীমাত্রকেই লইয়া সত্যধর্মকে নিখিল মানবের ধর্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি এ কথা বলেন নাই, এ ধর্ম যাহারা বুঝিতে পারিতেছে তাহাদেরই, যাহারা পারিতেছে না তাহাদের নহে। মহম্মদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়েরা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম, তোমরা বাপ দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমাদের সত্য। তিনি এমন অদ্ভুত অসত্য বলেন নাই যে, যাহাকে দশজনে মিলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, যাহাকে দশজনে মিলিয়া পালন করা যায় তাহাই ধর্ম। এ কথা বলিলে উপস্থিত আপদ মিটিত কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।

এ কথা বলাই বাহুল্য উপস্থিতমত মানুষ যাহা পারে সেইখানেই তাহার সীমা নহে। তাহা যদি হইত তবে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ মউমাছির মতো একই রকম মউচাক তৈরি করিয়া চলিত। বস্তুত অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ নহে। আরো বেশি বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে ধুলামাটিপাথর। মানুষ কোনো-একটা জায়গায় আসিয়া হাল ছাড়িয়া চোখ

বুজিয়া সীমাকে মানিতে চায় না বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের এই যে কেবলই আরোর দিকে গতি, ভূমার দিকে টান, এইখানেই তাহার শ্রেয়। এই শ্রেয়কে রক্ষা করিবার, ইহাকে কেবলই স্মরণ করাইবার ভার তাহার ধর্মের প্রতি। এইজন্যই মানুষের চিত্ত তাহার কল্যাণকে যত সুদূর পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারে তত সুদূরেই আপনার ধর্মকে প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখিয়াছে— সেই মানবচেতনার একেবারে দিগন্তে দাঁড়াইয়া ধর্ম মানুষকে অনন্তের দিকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে।

মানুষের শক্তির মধ্যে দুটা দিক আছে, একটা দিকের নাম 'পারে' এবং আর-একটা দিকের নাম 'পারিবে'। 'পারে'র দিকটাই মানুষের সহজ, আর 'পারিবে'র দিকটাতেই তাহার তপস্যা। ধর্ম মানুষের এই 'পারিবে'র সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত 'পারে'কে নিয়ত টান দিতেছে, তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না, তাহাকে কোনো-একটা উপস্থিত সামান্য লাভের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না। এইরূপে মানুষের সমস্ত 'পারে' যখন সেই 'পারিবে'র দ্বারা অধিকৃত হইয়া সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে তখনই মানুষ বীর— তখনই সে সত্যভাবে আত্মাকে লাভ করে। কিন্তু 'পারিবে'র দিকে এই আকর্ষণ যাহারা সহিতে পারে না, যাহারা নিজেকে মূঢ় ও অক্ষম বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা ধর্মকে বলে আমি যেখানে আছি সেইখানে তুমিও নামিয়া এসো। তাহার পরে ধর্মকে একবার সেই সহজসাধ্যের সমতলক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারিলে তখন তাহাকে বড়ো বড়ো পাথর চাপা দিয়া অত্যন্ত সনাতনভাবে জীবিত সমাধি দিয়া রাখিতে চায় এবং মনে করে ফাঁকি দিয়া ধর্মকে পাইলাম এবং তাহাকে একেবারে ঘরের দরজার কাছে চিরকালের মতো বাঁধিয়া রাখিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিলাম। তাহারা ধর্মকে বন্দী করিয়া নিজেরাই অচল হইয়া বসে, ধর্মকে দুর্বল করিয়া নিজেরা হীনবীর্য হইয়া পড়ে, এবং ধর্মকে প্রাণহীন করিয়া নিজেরা পলে পলে মরিতে থাকে ; তাহাদের সমাজ কেবলই বাহ্য আচারে অনুষ্ঠানে অন্ধসংস্কারে এবং কাল্পনিক বিভীষিকার কুজ্ঝটিকায় দশ দিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুত ধর্ম যখন মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে বলে তখনই তাহা মানুষের শিরোধার্য হইয়া উঠে, আর যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনোমতে বন্ধুত্ব রাখিবার জন্য কানে কানে পরামর্শ দেয় যে তুমি যাহা পার তাহাই তোমার শ্রেয়, অথবা দশজনে যাহা করিয়া আসিতেছে তাহাতেই নির্বিচারে যোগ দেওয়াই তোমার পুণ্য, ধর্ম তখন আমাদের প্রবৃত্তির চেয়েও নীচে নামিয়া যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে এবং লোকাচারের সঙ্গে আপস করিয়া গলাগলি করিতে আসিলেই ধর্ম আপনার উপরের জায়গাটি আর রাখিতে পারে না ; একেবারেই তাহার জাতি নষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে পুণ্যকে সস্তা করিবার জন্য বলিয়াছে, কোনো বিশেষ তিথিনক্ষত্রে কোনো বিশেষ জলের ধারায় স্নান করিলে কেবল নিজের নহে, বহুসহস্র পূর্বপুরুষের সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়। পাপ দূর করিবার এতবড়ো সহজ উপায়ের কথাটা বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত লোভ হয় সন্দেহ নাই, সুতরাং মানুষ তাহার ধর্মশাস্ত্রের এই কথায় আপনাকে কিছু-পরিমাণে ভুলায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলানো তাহার পক্ষেও অসাধ্য। একজন বিধবা রমণী একবার মধ্যরাত্রে চন্দ্রগ্রহণের পরে পীড়িত শরীর লইয়া যখন গঙ্গাস্নানে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আপনি কি এ কথা সত্যই বিশ্বাস করিতে পারেন যে পাপ জিনিসটাকে ধুলামাটির মতো জল দিয়া ধুইয়া ফেলা সম্ভব ? অথচ অকারণে আপনার শরীর-ধর্মের বিরুদ্ধে এই যে পাপ করিতে যাইতেছেন ইহার ফল কি আপনাকে পাইতে হইবে না ?" তিনি বলিলেন, "বাবা, এ তো সহজ কথা, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বেশ বুঝি কিন্তু তবু ধর্মে যাহা বলে তাহা পালন না করিতে যে ভরসা পাই না।" এ কথার অর্থ এই যে, সেই রমণীর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের উপরে উঠিয়া আছে।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দেখো। একাদশীর দিনে বিধবাকে নির্জল উপবাস করিতে হইবে ইহা আমাদের দেশে লোকাচারসম্মত অথবা শাস্ত্রানুগত ধর্মানুশাসন। ইহার মধ্যে যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আছে স্বভাবত আমাদের প্রকৃতিতে তাহা বর্তমান নাই। এ কথা কখনোই সত্য নহে স্ত্রীলোককে ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িত করিতে আমরা সহজে দুঃখ পাই না। তবে কেন হতভাগিনীদিগকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দুঃখ দিই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আর-কোনো যুক্তিসংগত উত্তর খুঁজিয়া পাই না, কেবল এই কথাই বলিতে হয় আমাদের ধর্মে বলে

বিধবাদিগকে একাদশীর দিনে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিবে না, এমন-কি, মরিবার মুখে রোগের ঔষধ পর্যন্ত সেবন করানো নিষেধ। এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম আমাদের সহজবুদ্ধির চেয়ে অনেক নীচে নামিয়া গেছে।

ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ছেলেরা স্বভাবতই তাহাদের সহপাঠী বন্ধুদিগকে জাতিবর্ণ লইয়া ঘৃণা করে না— কখনোই তাহারা আপনাকে হীনবর্ণ বন্ধু অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না, কারণ অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠতা জাতিবর্ণের অপেক্ষা রাখে না তাহা তাহারা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে, তথাপি আহারকালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল— সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতি-অসহ্য মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান ? এতটা মানবঘৃণা আমাদের জাতির মনে স্বভাবতই আছে এ কথা আমি তো স্বীকার করিতে পারি না। বস্তুত এখানে স্পষ্টই আমাদের ধর্ম আমাদের হৃদয়ের চেয়ে অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপে মানুষ ধর্মকে যখন আপনার চেয়েও নীচে নামাইয়া দেয় তখন সে নিজের সহজ মনুষ্যত্বও যে কতদূর পর্যন্ত বিস্মৃত হয় তাহার একটি নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত আমার মনে যেন আগুন দিয়া চিরকালের মতো দাগিয়া রহিয়া গিয়াছে। আমি জানি একজন বিদেশী রোগী পথিক পল্লীগ্রামের পথের ধারে তিন দিন ধরিয়া অনাশ্রয়ে পড়িয়া তিল তিল করিয়া মরিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই মস্ত একটা পুণ্যস্নানের তিথি পড়িয়াছিল— হাজার হাজার নরনারী কয় দিন ধরিয়া পুণ্যকামনায় সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনও বলে নাই এই মুমূর্ষুকে ঘরে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি এবং তাহাতেই আমার পুণ্য। সকলেই মনে মনে বলিয়াছে, জানি না ও কোথাকার লোক, ওর কী জাত— শেষকালে কি ঘরে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তের দায়ে পড়িব ? মানুষের স্বাভাবিক দয়া যদি আপনার কাজ করিতে যায় তবে ধর্মের রক্ষকস্বরূপে সমাজ তাহাকে দণ্ড দিবে। এখানে ধর্ম যে মানুষের হৃদয়প্রকৃতির চেয়েও অনেক নীচে নামিয়া বসিয়াছে।

আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না— অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে ; বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ? আমরা নিজে যাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সেবা ও সাহায্য লইতে দ্বিধা করি না তাহাদিগকে সকল প্রকার সহায়তা হইতে বঞ্চিত করাকেই আমাদের ন্যায়বুদ্ধি কি সত্যই সংগত বলিতে পারে ? কখনোই না। কিন্তু মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়। আমাদের হৃদয় দুর্বল বলিয়াই যে আমরা এইরূপ অবিচার করি তাহা নহে, ইহাই আমাদের কর্তব্য এবং ইহাই না করা আমাদের স্খলন বলিয়া করিয়া থাকি। আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নীচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে— শুভবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নরনারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মতো পীড়ন করিয়া চলিয়াছে !

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ তো য়ুরোপেও আছে ; সেখানেও তো অভিজাতবংশের লোক সহজে নীচবংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে চান না। ইহাদের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে ইহা সত্য— কিন্তু ধর্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপস করিয়া তাহার সঙ্গে একাসনে আসিয়া বসিবে ? ধর্ম কি আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না ? চোর তো সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিস্ট্রেটসুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে

তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস পরাইয়া দিতেছে ! কোনোকালে বিচার পাইব কোথায়, কোনোমতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে ?

একরূপ অদ্ভুত তর্ক আমাদের মুখেই শোনা যায় যে, যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, মদমাংস যাহারা খাইবেই এবং পাশবতা যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, ধর্মের সম্মতি-দ্বারা যদি তাহাদের পাশবতাকে নির্দিষ্টপরিমাণে স্বীকার করা যায়— যদি বলা যায় এইরূপ বিশেষ ভাবে মদমাংস খাওয়া ও চরিত্রকে কলুষিত করা তোমাদের পক্ষে ধর্ম, তবে তাহাতে দোষ নাই, বরং ভালোই। এরূপ তর্কের সীমা যে কোন্‌খানে তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমনতরো স্বভাবপাপিষ্ঠ অমানুষ দেখা যায় নরহত্যায় যাহারা আনন্দ বোধ করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য ঠগিধর্মকেই ধর্ম বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত এ কথাও বোধ হয় আমাদের মুখে বাধিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক নিজের গলাটা তাহাদের ফাঁসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত না হয়।

ধর্ম সম্বন্ধে সত্য সম্বন্ধে মানুষের উচ্চাধিকার নিম্নাধিকার একবার কোথাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেই মানুষ যে-মহাতরী লইয়া জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ছোটো ছোটো ভেলা তৈরি করা হয়— তাহাতে মহাসমুদ্রের যাত্রা আর চলে না, তীরের কাছে থাকিয়া হাঁটুজলে খেলা করা চলে মাত্র। কিন্তু যাহারা কেবল খেলিবেই, কোনোদিন যাত্রা করিবেই না, তাহারা খড়কুটা যাহা খুশি লইয়া আপনার খেলনা তৈরি করুক-না— তাহাদের জড়তার খাতিরে অমূল্য ধর্মতরীকে টুকরা করিয়াই কি চিরদিনের মতো সর্বনাশ ঘটাইতে হইবে ?

এ কথা আবার বলিতেছি, ধর্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই। সে মানুষকে মূঢ় বলিয়া স্বীকার করে না, দুর্বল বলিয়া অবজ্ঞা করে না। সেই তো মানুষকে ডাক দিয়া বলিতেছে, তুমি অজয়, তুমি অশোক, তুমি অভয়, তুমি অমৃত। সেই ধর্মের বলেই মানুষ যাহা পারে নাই তাহা পারিতেছে, যাহা হইয়া উঠিবে বলিয়া কোনোদিন স্বপ্নেও মনে করে নাই একদিন তাহাই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ধর্মের মুখ দিয়াই মানুষ যদি মানুষকে এমন কথা কেবলই বলাইতে থাকে যে, 'তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না', তবে তাহার মূঢ়তা ঘুচাইবে কে, যদি বলায় 'তুমি অক্ষম, তুমি পারিবে না', তবে তাহাকে শক্তি দান করে জগতে এমন সাধ্য আর কাহার আছে ?

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই ; অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকো। কতশত লোক পিতা পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে— মন্ত্রে তোমাদের দরকার নাই, পূজায় তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই ; তোমাদের কাছে ধর্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। তোমরা স্থূলকে লইয়াই থাকো, চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ঐখানেই নীচে পড়িয়া থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্মের ফললাভ করিতে পারিবে।

অথচ হীনতম মানুষেরও একটিমাত্র সম্মানের স্থান আছে ধর্মের দিকে— তাহার জানা উচিত সেইখানেই তাহার অধিকারের কোনো সংকোচ নাই। রাজা বল, পণ্ডিত বল, অভিজাত বল, সংসারের ক্ষেত্রেই তাহাদের যত-কিছু প্রতাপ প্রভুত্ব— ধর্মের ক্ষেত্রে দীনহীন মূর্খেরও অধিকার কোনো কৃত্রিম শাসনের দ্বারা সংকীর্ণ করিবার ভার কোনো মানুষের উপর নাই। ধর্মই মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো আশা— সেইখানেই তাহার মুক্তি, কেননা সেইখানেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সেইখানেই তাহার অন্তহীন সম্ভাব্যতা, ক্ষুদ্র বর্তমানের সমস্ত সংকোচ সেইখানেই ঘুচিতে পারে। অতএব সংসারের দিকে, জন্ম বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মানুষের স্বত্বকে যতই খণ্ডিত কর না, ধর্মের দিকে কোনো মানুষের জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এতবড়ো স্পর্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্তী সম্রাটের নাই।

ধর্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে পার— তুমি কে যে তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে ! তুমি কি অন্তর্যামী ? মানুষের মুক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহংকার রাখ ? তুমি লোকসমাজ, তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন— তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্মের নামে গিল্টি করিয়া

ধর্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও ! তাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এতবড়ো একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্মে মর্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ— তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই । যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশকালপাত্র অনুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসংগত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ংকর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ ! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড নিষ্পেষিতপৌরুষ নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই— কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে ; চারি দিক হইতেই আকাশে তর্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেননা তুমি মূঢ় তুমি বুঝিবে না ; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেননা তুমি অক্ষম ; সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তীকালের সহিত তোমাকে আপাদমস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কেননা নূতন করিয়া নিজের কল্যাণচিন্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই । নিষেধজর্জরিত চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবার এত বড়ো সর্বদেশব্যাপী ভয়ংকর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে— এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে ?

দুর্গতি তো প্রত্যক্ষ, আর তো কোনো যুক্তির প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, চোখ বুজিয়া কি কেবল তর্কই করিব ? আমাদের দেশে ব্রহ্মের ধ্যানে পূজার্চনায় যে বহুবিচিত্র স্থূলতার প্রচার হইয়াছে তর্ককালে তাহাকে আমরা চরম বলিয়া মানি না । আমরা বলিয়া থাকি, যে মানুষ আধ্যাত্মিকতার যে অবস্থায় আছে এ দেশে তাহার জন্য সেইপ্রকার আশ্রয় গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমশ স্বতই উচ্চতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু জানিতে চাই অনন্ত কালের অসংখ্য মানুষের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য সেরূপ উপযুক্ত আশ্রয় গড়িতে পারে এমন সাধ্য কাহার ! সমস্ত বিচিত্রতাকেই স্থান দিবে, বাধা দিবে না, এতবড়ো বিশ্বকর্মা মানবসমাজে কে আছে ?

বস্তুত মানুষের অসীম বৈচিত্র্যকে যাহারা সত্যই মানে তাহারা মানুষের জন্য অসীম স্থানকেই ছাড়িয়া রাখে । ক্ষেত্র যেখানে মুক্ত, বৈচিত্র্য সেখানে আপনি অবাধে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে । এইজন্যই যে-সমাজে জাগ্রত ও নিদ্রিত কালের সমস্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাঁধা সেখানে মানুষের চরিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই একছাঁচে গড়া নির্জীব ভালোমানুষটি হইয়া থাকে । আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে । মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কল্পনাকে পর্যন্ত যদি অবিচলিত স্থূল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায় অসীমকে তুমি কেবল এই একটিমাত্র বা কয়টিমাত্র বিশেষ রূপেই চিন্তা করিতে থাক, তবে সেই উপায়ে সত্যই কি মানুষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চিরধাবমান পরিণতিপ্রবাহকে সাহায্য করা হয় ? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বন্ধ করাই হয় না, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয় না ?

এই যে এক সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাজাতির নানালোক শিশুকাল হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চিন্তা করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, কর্ম করিতেছে ইহারা যদি একই জগতের মধ্যে সকলে ছাড়া না পাইত, যদি একদল প্রবলপ্রতাপশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া বলিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া ছোটো ছোটো জগৎ একেবারে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে তবে কি সেই হতভাগ্যদের উপকার করা হইত ? মানবচিত্তের চিরবিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো কোনো কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে চিরদিনের মতো আটক করা যাইতে পারে এ কথা যিনি কল্পনাও করিতে পারেন তিনি বিশ্বের অমিত্র । ছোটো হইতে বড়ো, অবোধ হইতে সুবোধ পর্যন্ত সকলেই এই একই অসীম জগতে বাস করিতেছে বলিয়াই প্রত্যেকেই আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে ইহার মধ্য হইতে আপন শক্তির পরিমাণ পুরা প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে । সেইজন্যই শিশু যখন কিশোর বয়সে পৌঁছিতেছে তখন তাহাকে তাহার শৈশবজগৎটা বলপূর্বক ভাঙিয়া ফেলিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে হইতেছে না । তাহার বুদ্ধি বাড়িল, শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল তবু তাহাকে নূতন জগতের সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া

মরিতে হইল না। নিতান্ত অর্বাচীন মূঢ় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সকলেরই পক্ষে এই একই সুবৃহৎ জগৎ। কিন্তু নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মূঢ়তাবশত মানুষ যেখানেই মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেইখানেই হয় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নয়, ভয়ংকর বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কোনোমতেই কোনো বুদ্ধিমানই মানুষের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মতো সনাতন বন্ধনে বাঁধিতে পারেই না। মানুষকে না মারিয়া তাহাকে গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মানুষের বুদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও তবে তাহার বুদ্ধিকে বিনষ্ট করো, তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটা সুদূর অতীতের সুগভীর কূপের তলদেশে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চাও তবে তাহাকে নির্জীব করিয়া ফেলো। নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অবিবেকী হইয়া উঠিলে মানুষ তো মানুষকে এইরূপ নির্মমভাবে পঙ্গু করিতেই চায় ; সেইজন্যই তো মানুষ নির্লজ্জ ভাষায় এমন কথা বলে যে, আপামর সকলকেই যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে আমরা আর চাকর পাইব না ; স্ত্রীলোককে যদি বিদ্যাদান করা যায় তবে তাহাকে দিয়া আর বাটনা বাটানো চলিবে না ; প্রজাদিগকে যদি অবাধে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তাহারা নিজের সংকীর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। বস্তুত এ কথা নিশ্চিত সত্য, মানুষকে কৃত্রিমশাসনে বাঁধিয়া খর্ব করিতে না পারিলে কোনোমতেই তাহাকে একই স্থানে চিরকালের মতো স্থির রাখিতে পারিবে না। অতএব যদি কেহ মনে করেন ধর্মকেও মানুষের অন্যান্য শত শত নাগপাশবন্ধনের মতো অন্যতম বন্ধন করিয়া তাহার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিকে, বিশ্বাসকে, আচরণকে চিরদিনের মতো একই জায়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে তাঁহার কর্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে শতসহস্র নিষেধের দ্বারা বিভীষিকা-দ্বারা প্রলোভনের দ্বারা এবং অসংযত কাল্পনিকতার দ্বারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মানুষকে জ্ঞানে কর্মে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ না দেওয়া হয় ; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার রুচি যেন বন্দী থাকে, সামান্য ব্যাপারেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঙ্গলচিন্তায় সে যেন নিজের বুদ্ধিবিচারকে খাটাইতে না পারে এবং বাহ্যিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমুদ্রপার হইবার কোনো সুযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃঙ্খলে অবিচলিত হইয়া একই পাথরে বাঁধানো ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে।[১]

কিন্তু তার্কিকের সহিত তর্ক করিতে গিয়া আমি হয়তো নিজের দেশের প্রতি অবিচার করিতেছি। এই যে দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্মচিন্তায় স্থূলতা এবং আমাদের ধর্মেকর্মে মূঢ়তা নানা রূপ ধরিয়া আজ সমস্ত দেশকে পর্দার উপর পর্দা ফেলিয়া বহুস্তরের অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহা কোনো একদল বিশেষ বুদ্ধিমানে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঘটায় নাই। যদিও আমরা অহংকার করিয়া বলি ইহা আমাদের বহুদূরদর্শী পূর্বপুরুষদের জ্ঞানকৃত কিন্তু তাহা সত্য হইতেই পারে না— বস্তুত ইহা আমাদের অজ্ঞানকৃত। আমাদের দেশের ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে বিপাকে পড়িয়া এইরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এ কথা কখনোই সত্য নহে যে, আমরা অধিকারভেদ চিন্তা করিয়া মানুষের বুদ্ধির ওজনমত ভিন্ন অবস্থার উপযোগী পূজার্চনা ও আচারপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের ঘাড়ে আসিয়া যাহা চাপিয়া পড়িয়াছে তাহাই আমরা বহন করিয়া লইয়াছি। ভারতবর্ষে আর্যেরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহারা আপনার ধর্মকে সভ্যতাকে চিরদিন

১ এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অধিকারভেদ চিরন্তন নহে, তাহা সাধনার অবস্থাভেদ মাত্র। কিন্তু আমাদের যে সমাজে বর্ণবিশেষের পক্ষে ধর্মের উচ্চতম অধিকার মুক্ত ও অন্যান্য বর্ণের পক্ষে তাহা রুদ্ধ সেখানে কি এমন কথা বলা চলে ? একে তো প্রত্যেক মানুষের অধিকার কোনো কৃত্রিম নিয়মে কেহই স্থির করিয়া দিতেই পারে না, তৎসত্ত্বে যদি-বা দেখিতাম সমাজে সেই চেষ্টা সজীব হইয়া আছে, যদি দেখিতাম কখনো বা ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যাইতেছে ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলেও অন্তত ইহা বুঝিতে পারিতাম এখানে মানুষের অধিকারলাভ তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে সমাজের এবং ধর্মের অধিকারভেদ হয়তো এককালে সচল ও সজীবভাবে ছিল— কিন্তু যখনই তাহা সচলতা হারাইয়াছে তখনই তাহা আমাদের পথের বাধা হইয়াছে, যখনই তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে না তখনই তাহা আমাদের জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক পুরাকালে আর্যসমাজ কী নিয়মে চলিত তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

অবিমিশ্রভাবে নিজেদের প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। পদে পদেই নানা অনুন্নত জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে করিতেও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিতেছিল, পুরাণে ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনি করিয়া একদিন ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির ঐক্যধারা বিভক্ত ও বিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। নানা নিকৃষ্ট জাতির নানাপূজাপদ্ধতি আচারসংস্কার কথাকাহিনী তাঁহাদের সমাজের ক্ষেত্রে জোর করিয়াই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অত্যন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর অনার্য ও কুৎসিত সামগ্রীকেও ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। এই-সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্যশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা অসাধ্য। যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায় না। সমাজের মধ্যে যাহা-কিছু স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে, সমাজ যদি তাহাকেই সম্মতি দিতে বাধ্য হয় তবে সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার আর স্থান থাকে না। কাঁটাগাছকে পালন করিবার ভার যদি কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে শস্যকে রক্ষা করা অসাধ্য হয়। কাঁটাগাছের সঙ্গে শস্যের যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে তাহার সমন্বয় সাধন করিতে পারে এমন কৃষক কোথায়! তাই আজ আমরা যেখানকার যত আগাছাকেই স্বীকার করিয়াছি; জঙ্গলে সমস্ত খেত একেবারে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে; সেই-সমস্ত আগাছার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ঠেলাঠেলি চাপাচাপি চলিতেছে, আজ যাহা প্রবল, কাল তাহা দুর্বল হইতেছে, আজ যাহা স্থান পাইতেছে কাল তাহা স্থান পাইতেছে না, আবার এই ভিড়ের মধ্যে কোথা হইতে বাতাসে বাহিরের বীজ উড়িয়া আসিয়া ক্ষেত্রের কোন্ এক কোণে রাতারাতি আর-একটা অদ্ভুত উদ্ভিদ্‌কে ভুঁই ফুড়িয়া তুলিতেছে। এখানে আর সমস্ত জঞ্জালই অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, একমাত্র নিষেধ কেবল কৃষকের নিড়ানির বেলাতেই; যাহা-কিছু হইতেছে সমস্তই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে হইতেছে— পিতামহেরা এককালে সত্যের যে বীজ ছড়াইয়াছিলেন তাহার শস্য কোথায় চাপা পড়িয়াছে সে আর দেখা যায় না। কেহ যদি সেই শস্যের দিকে তাকাইয়া জঙ্গলে হাত দিতে যায় তবে ক্ষেত্রপাল একেবারে লাঠি হাতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে, বলে, এই অর্বাচীনটা আমার সনাতন খেত নষ্ট করিতে আসিয়াছে। এই-সমস্ত নানা জাতির বোঝা ও নানা কালের আবর্জনাকে লইয়া নির্বিচারে আমরা কেবলই একটা প্রকাণ্ড মোট বাঁধিতে বাঁধিতেই চলিয়াছি এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য ও অনার্য অসম্বদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি; ইহার ভয়ংকর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলিলুণ্ঠিত, কোনোমতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; এই বিমিশ্রিত বিপুল বোঝাটাই তাহার জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; এই বোঝাকে কোনো দিকে কিছুমাত্র হ্রাস করিতে গেলেই সেটাকে সে অধর্ম বলিয়া প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে; এবং দুর্গতির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতেও আজ সেই জাতির শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা গর্ব করিতে থাকেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই, অন্ধসংস্কারের এরূপ বাধাহীন একাধিপত্য আর কোনো সমাজে দেখা যায় না, সকল-প্রকার মুগ্ধ বিশ্বাসের এরূপ প্রশস্ত ক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও প্রস্তুত হয় নাই, এবং পরস্পরের মধ্যে এত ভেদ এত পার্থক্যকে আর কোথাও এমন করিয়া চিরদিন বিভক্ত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে— অতএব বিশ্বসংসারে একমাত্র হিন্দুসমাজেই উচ্চ নীচ সমান নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে রাখিতে পারিবে না— সেরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না। স্থূলতম তামসিকতাই বলে যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাক্, যাহা বিনাশের যোগ্য তাহাকেও এই তামসিকতাই সনাতন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকিতে চায় এবং যাহা তাহাকে একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে বলে তাহাকেই সে আপনার ধর্ম বলিয়া সম্মান করে।

মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য। যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্মই তাহাকে দান করে। এই কারণে মানুষ আপন ধর্মের

আদর্শকে আপন তপস্যার সর্বশেষে, আপন শ্রেষ্ঠতার চরমেই স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্মের মতো সর্বনেশে ভার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নীচে রাখিলে সে নীচেই টানিয়া লয়। অতএব ধর্মকে কোনো জাতি যদি নীতির দিকে না বসাইয়া রীতির দিকে বসায়, বুদ্ধির দিকে না বসাইয়া সংস্কারের দিকেই বসায়, অন্তরের দিকে আসন না দিয়া যদি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহাকে বদ্ধ করে এবং ধর্মের উপরেই দেশকালপাত্রের ভার না দিয়া দেশকালপাত্রের হাতেই ধর্মকে হাত-পা বাঁধিয়া নির্মমভাবে সমর্পণ করিয়া বসে ; ধর্মেরই দোহাই দিয়া কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক করিতে থাকে, এক শ্রেণীর অভিমানকে আর-এক শ্রেণীর মাথার উপরে চাপাইয়া দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সংকুচিত ও শতখণ্ড করিয়া ফেলে ; তবে সে-জাতিকে হীনতার অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন কোনো সভা-সমিতি, কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স, এমন কোনো বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি, এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল বিশ্বজগতে নাই। সে জাতি এক সংকট হইতে উদ্ধার পাইলে আর-এক সংকটে আসিয়া পড়িবে এবং এক প্রবলপক্ষ তাহাকে অনুগ্রহপূর্বক সম্মানদান করিলে আর-এক প্রবলপক্ষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনোই উচ্চাসন পাইবে না। ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই। এবং ইহাতেও কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, যদি উদ্ধার ইচ্ছা করি তবে কোনো বাহিরের দিকে তাকাইয়া কোনো ফল নাই, কোনো উপস্থিত বাহ্য সুবিধার সুযোগ করিয়া কোনো লাভ নাই ; রক্ষার উপায়কে কেবলই বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্বল আত্মার মূঢ়তা— ইহাই ধ্রুব সত্য যে, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

১৩১৮

আমার জগৎ

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ঐ তারাগুলির মধ্যে যে-খুশি সেই আপন শাড়ির একটি খুঁট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগবে তা অতি বড়ো নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

এ যেন আলোক মায়ের কোলের কালো শিশু, সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেষে তার এই ধরণী-দোলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। তারা একটু নড়ে না পাছে এর ঘুম ভেঙে যায়।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বললেন, তুমি কোন্‌ সাবেককালের ওয়েটিং ‑রুমের আরাম-কেদারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ, ওদিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা। একেবারে নিছক কবিত্ব !

আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব। কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতোই শোনাবে।

আমার কবিত্বকলঙ্কটুকু স্বীকার করেই নেওয়া গেল। এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রিটুকুরই মতো। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ ক'রে বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক।

আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তারাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে তো তর্ক চলে না।

বিজ্ঞান বলে, তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ বলেই দেখছ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারছ বলেই বলছ ওরা চলছে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা ?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছের পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পার তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন ?

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উলটো কথা বলে তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

আমি বলি, তুমি তা তো মান না। পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়। তখন বল, কাছে আছি বলেই পৃথিবীটাকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে, কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটায় সায় দিতে রাজি আছি। এইজন্যই তো আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহংকার। কেননা আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, আপনাকে যে লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে— অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

দূরকে যদি এতটা খাতিরই কর তবে কোন্ মুখে বলবে, তারাগুলো ছুটোছুটি ক'রে মরছে ? মধ্যাহ্নসূর্যকে চোখে দেখতে গেলে কালো কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় দুর্দর্শরূপকে আমরা সমগ্রভাবে দেখব বলেই পৃথিবী এই কালো রাত্রিটাকে আমাদের চোখের উপর ধরেছেন। তার মধ্যে দিয়ে কী দেখি ? সমস্ত শান্ত, নীরব। এত শান্ত, এত নীরব যে আমাদের হাউই, তুবড়ি, তারাবাজিগুলো তাদের মুখের সামনে উপহাস করে আসতে ভয় করে না।

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি তারা অবিচলিত স্থির। তখন তারা যেন গজমুক্তার সাতনলী হার। জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কোনো তারাকে দেখে তখন দেখতে পায় সে চলছে— তখন হার-ছেঁড়া মুক্তা টলটল করে গড়িয়ে বেড়ায়।

এখন মুশকিল এই, বিশ্বাস করি কাকে ? বিশ্বতারা অন্ধকার সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ভাষা নিতান্ত সরল— একবার কেবল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেই হয়, আর কিছুই করতে হয় না। আবার যখন দু-একটা তারা তদের বিশ্বাসন থেকে নীচে নেমে এসে গণিতশাস্ত্রের গুহার মধ্যে ঢুকে কানে কানে কী সব বলে যায় তখন দেখি সে আবার আর-এক কথা। যারা স্বদলের সম্বন্ধ ছেড়ে এসে পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাইভেট কামরায় ঢুকে সমস্ত দলের একজোট সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার ভান করে সেই-সমস্ত অ্যাপ্রুভারদেই যে পরম সত্যবাদী বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা নেই।

কিন্তু এই-সমস্ত অ্যাপ্রুভাররা বিস্তারিত খবর দিয়ে থাকে। বিস্তারিত খবরের জোর বড়ো বেশি। সমস্ত পৃথিবী বলছে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বলছে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যেটুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর, বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

আমার কথাটা এই যে কোনোটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত কিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারও প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমাদের দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়োচ্ছে তাতে দোষ কী ? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা ভয়ংকর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয় ?

সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই একসঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি ; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরো ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা ব'লে জানা ব'লে পদার্থটা থাকতই না— অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর-এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাকবে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র, যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্বেই ব্যবহার করেছি, এখনো ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।

যদি এই পাতাটিকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে একে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ঐ পাতার আকার আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাবে। ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বললেই হয়।

এই তো গেল দেশ। তার পরে কাল। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনই থাকত অথচ গাছের ঐ পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম তবে পাতা হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখতে পেতুম না। জগতের যে-সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চলছে তারা আমাদের চার দিকে থাকলেও তাদের দেখতেই পাচ্ছি নে এমন হওয়া অসম্ভব নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আর-একটু স্পষ্ট হবে। গণিত সম্বন্ধে এমন অসামান্য শক্তিশালী লোকের কথা শোনা গেছে যাঁরা বহুসময়সাধ্য দুরূহ অঙ্ক এক মুহূর্তে গণনা করে দিতে পারেন। গণনা সম্বন্ধে তাঁদের চিত্ত যে কালকে আশ্রয় ক'রে আছে আমাদের চেয়ে সেটা বহু দ্রুত কাল— সেইজন্যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়ে তাঁরা অঙ্কফলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন সেটা আমরা দেখতেই পাই নে, এমন-কি, তাঁরা নিজেরাই দেখতে পান না।

আমার মনে আছে, একদিন দিনের বেলা আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্ন দেখেছিলেম। আমার ভ্রম হল আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমোই নি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল। আমি যদি একই সময়ে এই দুই কাল সম্বন্ধে সচেতন থাকতুম তা হলে হয় স্বপ্ন এত দ্রুতবেগে মনের মধ্যে চলে যেত যে, তাকে চেনা শক্ত হত, নয়তো সেই স্বপ্নবর্তীকালের রেলগাড়িতে করে চলে যাওয়ার দরুন স্বপ্নের বাইরের জগৎটা রেলগাড়ির বাইরের দৃশ্যের মতো বেগে পিছিয়ে যেতে থাকত; তার কোনো একটা জিনিসের উপর চোখ রাখা যেত না। অর্থাৎ স্বভাবত যার গতি নেই সেও গতি প্রাপ্ত হত।

যে-ঘোড়া দৌড়োচ্ছে তার সম্বন্ধে এক মিনিটকে যদি দশঘণ্টা করতে পারি তা হলে দেখব তার পা উঠছেই না। ঘাস প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে অথচ আমরা তা দেখতেই পাচ্ছি নে। ব্যাপক কালের মধ্যে ঘাসের হিসাব নিয়ে তবে আমরা জানতে পারি ঘাস বাড়ছে। সেই ব্যাপক কাল যদি আমাদের আয়ত্তের চেয়ে বেশি হত তা হলে ঘাস আমাদের পক্ষে পাহাড়-পর্বতের মতোই অচল হত।

অতএব আমাদের মন যে কালের তালে চলছে তারই বেগ অনুসারে আমরা দেখছি বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীটা চলছে। কালের পরিবর্তন হলে হয়তো দেখতুম বটগাছটা চলছে কিংবা নদীটা নিস্তব্ধ।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, আমরা যাকে জগৎ বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না।

যখন আমরা পাহাড় পর্বত সূর্য চন্দ্র দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখছি। যেন আমার মন আয়নামাত্র। কিন্তু আমার মন আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্তে দেখছি সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি। অন্য কোনো অবস্থায় মনের প্রকৃতি যদি অন্য রকম হয় তবে সৃষ্টিও অন্য রকম হবে।

আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘন দেশের জিনিসকে একরকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিসকে অন্যরকম দেখে, দ্রুতকালের গতিতে একরকম দেখে, মন্দকালের গতিতে অন্যরকম দেখে— এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা। আকাশে লক্ষকোটি ক্রোশ পরিমাণ দেশকে যখন সে এক হাত আধ হাতের মধ্যে দেখে তখন দেখে তারাগুলি কাছকাছি এবং স্থির। আমার মন কেবল যে আকাশের তারাগুলিকে দেখছে তা নয়, লোহার পরমাণুকে নিবিড় এবং স্থির দেখছে— যদি লোহাকে সে ব্যাপ্ত আকাশে দেখত তা হলে দেখত তার পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। এই বিচিত্র দেশকালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা দেখা। সেইজন্যেই লোহা হচ্ছে লোহা, জল হচ্ছে জল, মেঘ হচ্ছে মেঘ।

কিন্তু বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে সমস্তকে দেখতে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে। কিন্তু এই এক আদর্শ সৃষ্টির আদর্শই নয়। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলে। অবশেষে অণু-পরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোয় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি তো অণু-পরমাণু নয়— দেশকালের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি। ঈথর পদার্থের কম্পনমাত্র সৃষ্টি নয়, আলোকের অনুভূতিই সৃষ্টি। আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি-দ্বারা যা দেখছি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি তাই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন ব'লে। তিনি বলবেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি— কারণ আমার বোধ এক কথা বলে, তোমার বোধ আর-এক কথা বলে। আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন আর-এক কথা বলে।

আমি বলি, ঐ তো হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি তো কলের সৃষ্টি নয়, সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক বলবেন— এক-এক মন এক-এক রকমের সৃষ্টি যদি ক'রে বসে তা হলে সেটা যে অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি, তা তো হয় নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও তো দেখি সেই বৈচিত্র্যসত্ত্বেও তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তাই তো তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হচ্ছে, আমার এক-টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হত তা হলে মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্‌ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেইজন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না, মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাকত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করছেন, এই মন পদার্থটা কী শুনি।

আমি উত্তর করি যে, তোমার ঈথর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল ; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এ-সব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না ?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। খ্যাপার বংশ সনাতনকাল থেকে চলে আসছে। তাই পুরাতন ঋষি বলছেন—

> অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরো বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে? আবার যদি বিরোধ থাকে তা হলেই বা সৃষ্টি হয় কী করে? সেইজন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সংকুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তাঁর বহুত্ব— কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।

নিজের অস্তিত্বটার কথা চিন্তা করলে এ কথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করছি— সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম করে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত আর-এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে। সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলছেন, অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন— তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে এ কথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেইজন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, সর্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাকতে পারে না। আপনাকে সেই জানে না যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অন্যকেও যে আপন বলে জানে না।

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই— আমি সে দিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য গতিও সত্য। অণু-পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয় থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হতে হতে ক্রমে আকার-আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয়সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায়, সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয়— সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে— তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, চিত্রকরের চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে— তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে

আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না ; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাকত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত। কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিয়ো-চাঞ্চল্য-মাত্র নয়। তত্ত্বজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, বিজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, কিন্তু কবি বলছে, আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্ছেন সেই তো এই বিশ্বসংগীত নইলে কিছুই বাজত না। বীণার তার একটি নয়— লক্ষ তারে লক্ষ সুর— কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই। এই হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়, এ যে প্রাণবান— এইজন্য এ যে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে, তা নয় ; এর সুর এগিয়ে চলছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে, একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই ; কোথাও গিয়ে সে থামবে না ; মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন। আমি ধন্য যে, আমি পান্থশালায় বাস করছি নে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয় নি। এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি ; সেইজন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

১৩২১

পরিচয়

পরিচয়

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের পালা আছে; একবার ভিতরের দিকে একবার বাহিরের দিকে নামা-উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে। থামা এবং চলার অবিরত যোগেই বিশ্বের গতিক্রিয়া সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলে, বস্তুমাত্রই সচ্ছিদ্র, অর্থাৎ 'আছে' এবং 'নাই' এই দুইয়ের সমষ্টিতেই তাহার অস্তিত্ব। এই আলোক ও অন্ধকার, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এমনি ছন্দে ছন্দে যতি রাখিয়া চলিতেছে যে, তাহাতে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে না, তাহাকে তালে তালে অগ্রসর করিতেছে।

ঘড়ির ফলকটার উপরে মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহা অবাধে একটানা চলিয়াছে কিংবা চলিতেছেই না। কিন্তু সেকেন্ডের কাঁটা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহা টিকটিক করিয়া লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছে। দোলনদণ্ডটা যে একবার বামে থামিয়া দক্ষিণে যায়, আবার দক্ষিণে থামিয়া বামে আসে তাহা ঐ সেকেন্ডের তালে লয়েই ধরা পড়ে। বিশ্বব্যাপারে আমরা ঐ মিনিটের কাঁটা ঘড়ির কাঁটাটাকেই দেখি কিন্তু যদি তাহার অণুপরিমাণ কালের সেকেন্ডের কাঁটাটাকে দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম বিশ্ব নিমেষে নিমেষে থামিতেছে ও চলিতেছে— তাহার একটানা তানের মধ্যে পলকে পলকে লয় পড়িতেছে। সৃষ্টির দ্বন্দ্বদোলকটির এক প্রান্তে হাঁ অন্য প্রান্তে না, এক প্রান্তে এক অন্য প্রান্তে দুই, এক প্রান্তে আকর্ষণ অন্য প্রান্তে বিকর্ষণ, এক প্রান্তে কেন্দ্রের অভিমুখী ও অন্য প্রান্তে কেন্দ্রের প্রতিমুখী শক্তি। তর্কশাস্ত্রে এই বিরোধকে মিলাইবার জন্য আমরা কত মতবাদের অসাধ্য ব্যায়ামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সৃষ্টিশাস্ত্রে ইহারা সহজেই মিলিত হইয়া বিশ্বরহস্যকে অনির্বচনীয় করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিসটা যদি একলা থাকে তবে সে নিজের একঝোঁকা জোরে কেবল একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভীষণ উদ্ধতবেগে সোজা চলিতে থাকে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না; কিন্তু শক্তিকে জগতে একাধিপত্য দেওয়া হয় নাই বলিয়াই, বরাবর তাহাকে জুড়িতে জোড়া হইয়াছে বলিয়াই, দুইয়ের উলটাটানে বিশ্বের সকল জিনিসই নম্র হইয়া গোল হইয়া সুসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। সোজা লাইনের সমাপ্তিহীনতা, সোজা লাইনের অতি তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তিই বিশ্বের স্বভাবগত। এই এক শক্তির একাগ্র সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না— তাহা কেবল ভেদ করিতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুতেই ধরিতে পারে না, বেড়িতে পারে না, তাহা একেবারে রিক্ত, তাহা প্রলয়েরই রেখা; রুদ্রের প্রলয়পিনাকের মতো তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সংগীত নাই; এইজন্য শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির যোগেই বিশ্বের যত কিছু ছন্দ। আমাদের এই জগৎকাব্য মিত্রাক্ষর— পদে পদে তাহার জুড়িজুড়ি মিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছন্দটি যত স্পষ্ট এবং বাধাহীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নহে। সেখানেও এই সংকোচন ও প্রসারণের তত্ত্বটি আছে— কিন্তু তাহার সামঞ্জস্যটিকে আমরা সহজে রাখিতে পারি না। বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সময়ে দ্বন্দ্বের এক প্রান্তে আসিয়া এমনি ঝুঁকিয়া পড়ি যে অন্য প্রান্তে ফিরিতে বিলম্ব হয় তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ত্রুটি সারিয়া লইতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতে হয়। এক দিকে আত্ম এক দিকে পর, এক দিকে অর্জন এক দিকে বর্জন, এক দিকে সংযম এক দিকে স্বাধীনতা, এক দিকে আচার এক দিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই

দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা ; এই তাল-অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনার ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।

গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্যেরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্য-উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা-প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না। আপনাদের সামান্য বাহ্য ভেদগুলিকেই বড়ো করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াই আর্যেরা আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

বিশ্বের সকল পদার্থের মতো সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে— তাহার এক প্রান্তে বিচ্ছেদ, আর-এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্ববর্ণের ভেদরক্ষার দিকে আর্যদের যে আত্মসংকোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থামিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দ-তত্ত্বের নিয়মে আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহাসকে একদিন ফিরিতে হইয়াছিল।

অনার্যদের সহিত বিরোধের দিনে আর্যসমাজে যাঁহারা বীর ছিলেন, জানি না তাঁহারা কে। তাঁহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া তো বর্ণিত হয় নাই। হয়তো জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য সর্প-উপাসক অনার্য নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জনমেজয় নিদারুণ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণ-কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বটে তবু এই রাজা ইতিহাসে তো কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।

কিন্তু অনার্যদের সহিত আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর্য-অনার্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটি মহা উদ্‌যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্‌যোগের নেতারূপে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিনজনের মধ্যে কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে একটা এক-অভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি, রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা— এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো-বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়— তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া নক্ষত্র আছে, কালের ব্যবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ঐক্য হারাইয়া যায়— কিন্তু আভ্যন্তরিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হইয়া মিলিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য নহে।

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণ-কথায় যেমন রাজা আর্থার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সেইরূপ আর্য-ইতিহাসগত একটি বিশেষ ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা আর্থার মধ্যযুগের য়ুরোপীয়

ক্ষত্রিয়দের একটি বিশেষ খৃস্টীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত লড়াই করিতেছেন এই যেমন দেখি, তেমনি ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধিদলের সহিত দীর্ঘকাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।

তখনকার কালের নবক্ষত্রিয়দলের এই ভাবটা কী, তাহার পুরাপুরি সমস্তটা জানা এখন অসম্ভব, কেননা বিপ্লবের জয়-পরাজয়ের পরে আবার যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল তখন সমাজের মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি আর পৃথক হইয়া রহিল না এবং ক্ষতচিহ্নগুলি যত শীঘ্র জোড়া লাগিতে পারে তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন নূতন দলের আদর্শকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় আপন স্থান গ্রহণ করিলেন।

তথাপি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদর্শের প্রভেদ কোন্ পথ দিয়া কী আকারে ঘটিয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞবিধিগুলি কৌলিকবিদ্যা। এক-এক কুলের আর্যদলের মধ্যে এক-একটি কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ স্তবমন্ত্র ও দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিধিবিধান রক্ষিত ছিল। যাঁহারা এই-সমস্ত ভালো করিয়া জানিতেন পৌরোহিত্যে তাঁহাদেরই বিশেষ যশ ও ধন -লাভের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই ধর্মকার্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল এবং কৃপণের ধনের মতো ইহা সকলের পক্ষে সুগম ছিল না। এই-সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র বিধি বিশেষরূপে আয়ত্ত ও তাহা প্রয়োগ করিবার ভার স্বভাবতই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর ছিল। আত্মরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকারে যাঁহাদিগকে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাঁহারা এই কাজের ভার লইতে পারেন না, কারণ ইহা দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। কোনো এক শ্রেণী এই সমস্তকে রক্ষা করিবার ভার যদি না লন তবে কৌলিকসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং পিতৃপিতামহদের সহিত যোগধারা নষ্ট হইয়া সমাজ শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণে যখন সমাজের একশ্রেণী যুদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে নব নব অধ্যবসায়ে নিযুক্ত তখন আর-এক শ্রেণী বংশের প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত স্মরণীয় ব্যাপারকে বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু যখনই বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখনই সমস্ত জাতির চিত্তবিকাশের সঙ্গে তাহার ধর্মবিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পড়িয়া যায়। কারণ সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্মবিধিগুলিকে বাঁধের মতো এক জায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন, সুতরাং সমস্ত জাতির মনের অগ্রসরগতির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামঞ্জস্য এতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় যে, অবশেষে একটা বিপ্লব ব্যতীত সমন্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। এইরূপে একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগলাইয়া বসিয়াছিলেন, যখন সেই-সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন। এইজন্যই তখন আর্যদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয়সমাজ। শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মতো এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। মৃত্যুর সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্যের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের বন্ধুরদুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথামূলক বাহ্যানুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ-বিস্তারের উপলক্ষে সমস্ত আর্যদলের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে সত্যপদার্থ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ-কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।

সমাজে যখন একটা বড়ো ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয় তখন তাহা একান্তভাবে কোনো গণ্ডিকে মানে না। আর্যজাতির নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ যতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ততই সমাজের সর্বত্রই এই অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে, দেবতারা নামে নানা কিন্তু সত্যে এক ; অতএব বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব ও বিশেষ বিধিতে সন্তুষ্ট করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় এই ধারণা সমাজের সর্বত্রই ক্ষয় হইয়া দলভেদে উপাসনাভেদ স্বভাবতই ঘুচিবার চেষ্টা করিল। তথাপি ইহা সত্য যে, বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রভেদটি সামান্য নহে। ইহা একেবারে বাহিরের দিক ও অন্তরের দিকের ভেদ। বাহিরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি রাখি তখনই আমরা কেবলই বহুকে ও বিচিত্রকে দেখিতে পাই, অন্তরে যখন দেখি তখনই একের দেখা পাওয়া যায়। যখন আমরা বাহ্যশক্তিকেই দেবতা বলিয়া জানিয়াছি তখন মন্ত্রতন্ত্র ও নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহির হইতে বিশেষভাবে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য বাহিরের বহু শক্তিই যখন দেবতা তখন বাহিরের নানা অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্মকার্য এবং এই অনুষ্ঠানের প্রভেদ ও তাহারই গূঢ়শক্তি-অনুসারেই ফলের তারতম্য কল্পনা।

এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল, সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরিগ্রহস্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদ— তাহা চিরকালের মতো ধ্যানরত স্থির ; আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়াশীল হস্ত কেবলই নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্যকে বিকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয় তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই, গো চাই, আয়ু চাই, শত্রুপরাভব চাই ; যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ত্রুটি-অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়— সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই একককে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে একককে না মানিলে ভক্তি হয় না। দ্বৈতবাদী য়িহুদিদের দূরবর্তী দেবতা ভয়ের দেবতা, শাসনের দেবতা, নিয়মের দেবতা। সেই দেবতা নূতন টেস্টামেন্টে যখন মানবের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন তখনই তিনি প্রেমের দেবতা ভক্তির দেবতা হইলেন। বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনই সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু।

বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণবধর্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন কিন্তু গোড়ায় যে তাহা করেন নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনো অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন— বহুপল্লবিত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তিধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড়ো ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাঁহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।

এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত ধর্ম, তাহার একটি প্রমাণ একদা ক্ষত্রিয়

শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই— এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই— প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়— একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর-একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তিধর্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল।

বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উচ্ছ্বাস উদ্‌গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে আশ্রয় করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পরের বিরুদ্ধদলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছিল, হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরো আছে। প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে-একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। সেই জরাসন্ধ রাজা তখনকার ক্ষত্রিয়দলের শত্রুপক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন। ভীমার্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করিয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ— কৃপ ও অশ্বত্থামাও বড়ো সামান্য ছিলেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম, বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিতবংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে এই কাব্য যখন জাতীয়সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো-এক রাজবংশের পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া ঘটাইয়াছে।

রামচন্দ্র যে নব্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার আর-এক প্রমাণ আছে। একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্ভব পরশুরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধনব্রত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্বেই কতক বীর্যবলে কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্যেই এই উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই-সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মূল কথা এই, জনক ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছিল। এ বিদ্যা কেবলমাত্র তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল না ; এ বিদ্যা তাঁহার সমস্ত জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ; তিনি তাঁহার রাজ্যসংসারের বিচিত্র কর্মের কেন্দ্রস্থলে এই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবিচলিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। চরমতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের আশ্চর্য যোগসাধন ইহাই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের সর্বোচ্চ কীর্তি। আমাদের দেশে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা ত্যাগকেই ভোগের পরিণাম করিয়া কর্মকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জনক এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, আর-এক দিকে স্বহস্তে হলচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জানিতে পারি কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আর্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই ধেনুই অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বনভূমিতে গোচারণ সহজ ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকা তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের স্থলে কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন তখন যেমন মৃগয়াজীবী আরণ্যকগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল— ভারতবর্ষেও সেরূপ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষিব্যাপার কেবলই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে যাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন— ইহা হইতে জানা যায় আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ আপনার সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তখন দুর্গম বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল এবং দ্রাবিড়সভ্যতা সেই দিকেই প্রবল হইয়া আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ বীরপরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি বেদের দেবতাকে পরাস্ত করিয়া আর্যদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে স্বকীয় দলের দেবতার প্রভাব প্রকাশ পায় পৃথিবীতে সকল সমাজেরই বিশেষ অবস্থায় এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে— কোনো পক্ষের পরাভবে সে পক্ষের দেবতারই পরাভব গণ্য হয়। রাবণ আর্যদেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এই যে লোকশ্রুতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ইহার অর্থই এই-যে, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি বৈদিক দেবতার উপাসকদিগকে বারংবার পরাভূত করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিবে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আর্যসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনু-ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনরেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। তখনকার অনেক বীর রাজাই এই সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা হরধনু ভাঙিতে পারেন নাই, এইজন্য রাজর্ষি জনকের কন্যাকে লাভ করিবার গৌরব হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্রতের অধিকারী কে হইবেন, ক্ষত্রিয় তপস্বিগণ সেই সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। একদা বিশ্বামিত্রের সেই সন্ধান রামচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া সার্থক হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ

করিয়াছিলেন ; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন ;[১] তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল— এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এইজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই নির্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাঁহার সেই ব্রত। এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও রাক্ষসদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

আর্য-অনার্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা নিধনের দ্বারা তাহার সমাধানের প্রয়াস অন্তহীন দুশ্চেষ্টা। প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে ইহার মীমাংসা হইলেই এত বড়ো বৃহৎ ব্যাপারও সহজ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিসটা তো ইচ্ছা করিলেই হয় না। ধর্ম যখন বাহিরের জিনিস হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয়সম্পত্তির মতো অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। জ্যু-দের সঙ্গে জেন্টাইলদের মিলনের কোনো সেতু ছিল না। কেননা জ্যু-রা জিহোভাকে বিশেষভাবে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই জানিত এবং এই জিহোভার সমস্ত অনুশাসন, তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে জ্যু-জাতিরই পালনীয় এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল। তেমনি আর্য-দেবতা ও আর্য-বিধিবিধান যখন বিশেষ জাতিগতভাবে সংকীর্ণ ছিল তখন আর্য-অনার্যের পরস্পর সংঘাত, এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ছাড়া, কিছুতেই মিটিতে পারিত না। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণা যখন বিশ্বজনীন হইয়া উঠিল— বাহিরের ভেদ-বিভেদ একান্ত সত্য নহে এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্পনা হইতে দৈব বিভীষিকাসকল যখন চলিয়া গেল তখনই আর্য-অনার্যের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইল। তখনই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের দেবতা অন্তরের ভক্তির দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শাস্ত্র ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে ; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী সৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার-রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিতকে

১ অল্পদিন হইল 'রাক্ষস-রহস্য' নামক একটি স্বাধীনচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাণ্ডুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই 'অহল্যা' শব্দটির এই তাৎপর্যব্যাখ্যা আমি দেখিলাম। লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই— তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মতো বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন আর-একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

তৎসত্ত্বেও এ কথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ; তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে এক-একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্যদলকে বশ করিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তো বানর নহে রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র এই যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, যে-কোনো মহাত্মাই বাহ্যধর্মের স্থলে ভক্তিধর্মকে জাগাইয়াছেন তিনি স্বয়ং পূজা লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, খৃস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিখ, সুফি, কবীরপন্থী প্রভৃতি সর্বত্রই দেখিতে পাই, ভক্তি যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অনুবর্তীদের কাছে তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ভগবানের সহিত ভক্তের অন্তরতম যোগ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া তাঁহারাও যেন দেবত্বের সহিত মনুষ্যত্বের ভেদসীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সেই যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এই দাক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্মও ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দাক্ষিণাত্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার এক ধারায় ভক্তিস্রোত ও আর-এক ধারায় অদ্বৈতজ্ঞান উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিল।

আমরা আর্যদের ইতিহাসে সংকোচ ও প্রসারণের এই একটি রূপ দেখিলাম। মানুষের এক দিকে তাহার বিশেষত্ব আর-এক দিকে তাহার বিশ্বত্ব এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আত্মরক্ষণ শক্তির দিকে ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণ শক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাঁধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাঁধিয়া লইয়াছে। য়ুরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষে চিরদিন ব্রাহ্মণদের এই কাজটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাবে করিয়াছেন যেন এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ নামক একটি বিশেষ ব্যবসায়ী দলের চাতুরী। তাঁহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যথার্থ জাতিগত ভেদ নাই, তাহারা একই জাতির

দুই স্বাভাবিক শক্তি। ইংলণ্ডে সমস্ত ইংরেজ জাতি লিবারাল ও কন্সারভেটিভ এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে— ক্ষমতা লাভের জন্য এই দুই শাখার প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবাদও আছে, কৌশলও আছে, এমন-কি, ঘুষ এবং অন্যায়ও আছে, তথাপি এই দুই সম্প্রদায়কে যেমন দুই স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের মতো করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হয়— বস্তুত তাহারা প্রকৃতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ -শক্তির মতো বাহিরে দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু অন্তরে একই সৃজনশক্তির এ-পিঠ ও-পিঠ, তেমনি ভারতবর্ষে সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতি -শক্তি দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়াছে— কোনো পক্ষেই তাহা কৃত্রিম নহে।

তবে দেখা গিয়াছে বটে ভারতবর্ষে এই স্থিতি ও গতি -শক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই— সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই এখানকার সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্যই তাহার কারণ এমন অদ্ভুত কথা ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে জাতিসংঘাত ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংঘাত। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এতই গুরুতর যে এই প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষণীশক্তিই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আত্মপ্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতাবৃত্তি পদে পদে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

তুষারাবৃত আল্‌প্‌স্ গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া অগ্রসর হয়— তাহারা চলিতে চলিতে আপনাকে বাঁধে, বাঁধিতে বাঁধিতে চলে— সেখানে চলিবার উপায় স্বভাবতই এই প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা চালকদের কৌশল নহে। বন্দিশালায় যে বন্ধনে স্থির করিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির সহায়। ভারতবর্ষেও সমাজ কেবলই দড়িদড়া লইয়া আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়াছে কেননা নিজের পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া অন্যের পথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এইজন্যই ভারতবর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণীশক্তি আত্মপ্রসারণীশক্তির অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

রামচন্দ্রের জীবন-আলোচনায় আমরা ইহাই দেখিলাম যে ক্ষত্রিয়েরা একদিন ধর্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে পাইয়াছিলেন যাহাতে অনার্যদের সহিত বিরুদ্ধতাকে তাঁহারা মিলননীতির দ্বারাই সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোনো সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না— হয় এক পক্ষকে মারিতে, নয় দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে এই ধর্ম ও এই মিলননীতি বাধা পাইয়াছিল কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

আর্যে অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগস্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্য-উপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্যেরা কখনো অনার্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ-অসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন— এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, সেই উপলক্ষে শিবের অনার্য অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য-অনার্যের এই ধর্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে— সেই সংগ্রামে রুদ্র বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মরক্ষণীশক্তি বারংবার সীমানির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে। মনুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে

এবং তাহাতে মূর্তি-পূজা-ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস কোনোদিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্তেই সংকোচন আপনাকে বারংবার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহারই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ডশক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে— সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের দ্বারা নহে, এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গুরুর প্রভাব ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সেটা সম্পূর্ণ ভালো হইয়াছিল এমন কথা কোনোমতেই বলিতে পারি না। এইরূপ একপক্ষের ঐকান্তিকতায় জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণেই বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনোকালেই করে নাই। এতদিন ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংযম ছিল— মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া প্রলয়স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল। আর্যজাতি অনার্যের কাছ হইতে যাহা-কিছু গ্রহণ করিতেছিল তাহাকে আর্য করিয়া লইয়া আপন প্রকৃতির অনুগত করিয়া লইতেছিল— এমনি করিয়া ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়িয়া আর্যে অনার্যে একটি আন্তরিক সংস্রব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই মিলনব্যাপারের মাঝখানে কোনো-এক সময়ে বাঁধাবাঁধি ও বাহ্যিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছিল, নহিলে এত বড়ো বিপ্লব উৎপন্ন হইতেই পারিত না এবং সে বিপ্লব কোনো সৈন্যবল আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র ধর্মবলে সমস্ত দেশকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই তৎপূর্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হইয়া একেবারে সমাজের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। রোগের আক্রমণও যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি সাংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা যখন সরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল— যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।

তাহার প্রধান কারণ এই, একদিন ভারতসমাজে কখনো ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষত্রিয় যখন প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন তখনো উভয়ের ভিতরকার একটা জাতিগত ঐক্য ছিল। এইজন্য তখনকার জাতি-রচনাকার্য আর্যদের হাতেই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের সময় কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনার্যেরা নহে ভারতবর্ষের বাহির হইতেও অনার্যদের সমাগম হইয়া তাহারা এমন একটি প্রবলতা লাভ করিল যে আর্যদের সহিত তাহাদের সুবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। যতদিন বৌদ্ধধর্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য অস্বাস্থ্য আকারে প্রকাশ পায় নাই কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন তাহা নানা অদ্ভুত অসংগতিরূপে অবাধে সমস্ত দেশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

অনার্যেরা এখন সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া একেবারে সমাজের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে সুতরাং এখন তাহাদের সহিত ভেদ ও মিলন বাহিরের নহে তাহা একেবারে সমাজের ভিতরের কথা হইয়া পড়িল।

এই বৌদ্ধপ্লাবনে আর্যসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিল কারণ আর্যজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভার চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন তখনো ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনার্যের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রায় কোনো বাধা ছিল না তাহা পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। এইজন্য দেখা যায় বৌদ্ধযুগের পরবর্তী অধিকাংশ রাজবংশ ক্ষত্রিয়বংশ নহে।

এ দিকে শক হূন প্রভৃতি বিদেশীয় অনার্যগণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবাধে মিশিয়া যাইতে লাগিল— বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই-সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল। কারণ, বাধা দিবার ব্যবস্থাটা তখন সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে দুর্বল। এইরূপে ধর্মেকর্মে অনার্যসংমিশ্রণ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্বপ্রকার অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যখন কোনো সংগতির সূত্র রহিল না তখনই সমাজের অন্তরস্থিত আর্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। আর্যপ্রকৃতি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই নিজেকে সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার একটা চেষ্টা উদ্যত হইয়া উঠিল।

আমরা কী এবং কোন্ জিনিসটা আমাদের— চারি দিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধসমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেছিল না। এইজন্য আর্য জনশ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্যসীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে, সামাজিক প্রলয়ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহকর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। যথার্থ বৈদিককালে মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালীগুলিকে সমাজ যত্ন করিয়া শিখিয়াছে ও রাখিয়াছে, তবু তখন তাহা শিক্ষণীয় বিদ্যামাত্র ছিল এবং সে বিদ্যাকেও সকলে পরাবিদ্যা বলিয়া মানিত না।

কিন্তু একদিন বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার দরকার হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে নানা লোক নানাপ্রকার তর্ক করিতে পারিবে না— যাহা আর্যসমাজের সর্বপুরাতন বাণী; যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিরুদ্ধসম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এইজন্য বেদ যদিচ প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে তখন অনেক দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি দূরের জিনিস বলিয়াই তাহাকে দূর হইতে মান্য করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হইল।

যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন, তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিসূত্রও তো চাই— সেই পরিধিসূত্রই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর-এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এইসঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এই-সমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আর্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু-বা স্পষ্ট কিছু-বা লুপ্ত, কিছু-বা সুসংগত কিছু-বা পরস্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতস-কাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর-এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি— সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে— নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন-কি, পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোন্‌খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজিকগত অসংগতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার— অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার পরবর্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা। হইতেও পারে মূল ভগবদ্‌গীতা ভারতবর্ষের সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারত-সংকলনের যুগে সেই মূলের বিশুদ্ধতা-রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না— সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্তব্যপথ নির্দেশ করা হইয়াছে সে গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাঁহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হউক যোগই হউক বেদান্তই হউক সকল তত্ত্বেরই কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন, তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ মানবজীবনের পরমাগতি, তাঁহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না; অতএব ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য, অতএব এক জায়গায় মিল আছেই। এমন-কি, গীতায় যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞব্যাপার এমন একটি বড়ো ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে-সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ— এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন— একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছে।

এইরূপে ইতিহাসের নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে তখনকার কালের প্রতিভা যেমন একটি মূলসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল তেমনি বেদের মধ্য হইতেও তাহা একটি সূত্র উদ্ধার করিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মসূত্র। তখনকার ব্যাসের এও একটি কীর্তি। তিনি যেমন এক দিকে ব্যষ্টিকে রাখিয়াছেন আর-এক দিকে তেমনি সমষ্টিকেও প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন; তাঁহার সংকলন কেবল আয়োজনমাত্র নহে তাহা সংযোজন, শুধু সঞ্চয় নহে তাহা পরিচয়। সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও একটি লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়— তাহাই বেদান্ত। তাহার মধ্যে একটি দ্বৈতেরও দিক আছে একটি অদ্বৈতেরও

দিক আছে কারণ এই দুইটি দিক ব্যতীত কোনো একটি দিকও সত্য হইতে পারে না। লজিক ইহার কোনো সমন্বয় পায় না, এইজন্য যেখানে ইহার সমন্বয় সেখানে ইহাকে অনির্বচনীয় বলা হয়। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈত অদ্বৈত দুই দিককেই রক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য পরবর্তীকালে এই একই ব্রহ্মসূত্রকে লজিক নানা বাদ-বিবাদে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত ব্রহ্মসূত্রে আর্যধর্মের মূলতত্ত্বটি-দ্বারা সমস্ত আর্যধর্মশাস্ত্রকে এক আলোকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেবল আর্যধর্ম কেন সমস্ত মানবের ধর্মের ইহাই এক আলোক।

এইরূপে নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা পীড়িত আর্যপ্রকৃতি একদিন আপনার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনার মূল ঐক্যটি লাভ করিবার জন্য একান্ত যত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, আর্য জাতির বিধিনিষেধগুলি যাহা কেবল স্মৃতিরূপে নানাস্থানে ছড়াইয়া ছিল এই সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন— ইহা ভাবগত যুগ— অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না। বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব— শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারাপরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগও তেমনি কবে আরম্ভ তাহা স্থির করিয়া বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের মধ্যে ছড়ানো ও কুড়ানো একসঙ্গেই চলিতেছে। যেমন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। ইহা যে পুরাতন পক্ষ ও নূতন পক্ষের বোঝাপড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। এক পক্ষ বলিতেছেন যে-সকল মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনাদি, তাহার বিশেষ গুণবশতই তাহার দ্বারাই চরমসিদ্ধি লাভ করা যায়। অপর পক্ষ বলিতেছেন জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুক্তি নাই। যে দুই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া এই দুই মত বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার রচনাকাল যখনই হউক এই মতদ্বৈধ যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আর্যসমাজের যে উদ্যম আপনার সামগ্রীগুলিকে বিশেষভাবে সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সংকলন করিয়া স্বজাতির প্রাচীন পথটিকে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। আর্য-অনার্যের চিরন্তন সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি চিরকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে; ইহাই আমাদের বক্তব্য।

এ কথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনার্যেরা আমাদিগকে দিবার মতো কোনো জিনিস দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দুসভ্যতা, রূপে বিচিত্র ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ দেবতার বধূ ছিল কলাবধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয়প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে না মেলে সেখানে মূঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারের আর অন্ত থাকে না; যেখানে মেলে সেখানে অনন্তের অন্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন একটি জিনিস পাইয়াছে যাহাকে ঠিকমত ব্যবহার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মূঢ়তার ভারে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া দেয়। আর্য ও দ্রাবিড়ের এই চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধতার সম্মিলন যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে সেখানে সৌন্দর্য জাগিয়াছে, যেখানে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কদর্যতার সীমা দেখি না। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে শুধু দ্রাবিড় নহে, বর্বর অনার্যদের সামগ্রীও একদিন দ্বার খোলা পাইয়া অসংকোচে আর্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই অনধিকার-প্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে সুতীব্র হইয়া ছিল।

যুদ্ধ এখন বাহিরে নহে যুদ্ধ এখন দেহের মধ্যে— কেননা অস্ত্র এখন শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে, শত্রু এখন ঘরের ভিতরে। আর্য-সভ্যতার পক্ষে ব্রাহ্মণ এখন একমাত্র। এইজন্য এই সময়ে বেদ যেমন অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপ সমাজে সর্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনকার পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এই চেষ্টা এমনি প্রবল আকারে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতেছে যে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহা একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রয়াস, তাহা উজানস্রোতে গুণটানা, এইজন্য গুণবন্ধন অনেকগুলি এবং কঠিন টানের বিরামমাত্র নাই। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোনো একটি সাম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সংকীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেখা হয়। এ চেষ্টা তখনকার সংকটগ্রস্ত আর্যজাতির অন্তরের চেষ্টা। ইহা আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রযত্ন। তখন সমস্ত সমাজের লোকের মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল। এক, পূর্বধারাকে রক্ষা করা, আর এক, নূতনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনীপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অনার্য-দেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্য-দেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।

শিব যদিচ রুদ্রনামে আর্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী, গঞ্জিকা ও ভাঙ ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন; অন্য দিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। এক দিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অন্য দিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

এইরূপে আর্য-অনার্যের ধারা গঙ্গাযমুনার মতো একত্র হইল তবু তাহার দুই রঙ পাশাপাশি রহিয়া গেল। এইরূপে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেও কৃষ্ণের নামকে আশ্রয় করিয়া যে-সমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পাণ্ডবসখা ভাগবতধর্মপ্রবর্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে। বৈষ্ণবধর্মের এক দিকে ভগবদ্‌গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর-এক দিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল। শৈবধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিসগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শান্তি এবং তাহার মত্ততা তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়— ইহাই আর্য-সভ্যতার অদ্বৈতসূত্র। ইহাই নেতি নেতির দিক— ত্যাগ ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্যের এবং যৌবনের লীলা; প্রলয়পিনাকের স্থলে সেখানে বাঁশির ধ্বনি; ভূতপ্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস; সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলোকধামের চির-ঐশ্বর্য; এইখানে আর্যসভ্যতার দ্বৈতসূত্র।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই যে আভীরসম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণ, এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার একটি সত্যপথ ছিল। নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধকে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপক ভাবে পৃথিবীর নানা স্থানেই মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আর্যবৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে অনার্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেই-সমস্ত কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে

উত্তীর্ণ করিয়া লইল। অনার্যের চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতারূপে ছিল আর্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল— তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণকথারূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল। আর্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতায় সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে— এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতম সংযোগ ঘটিয়াছে।

আর্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতন্ত্র, অনার্যসমাজের মূলে মাতৃশাসনতন্ত্র। এইজন্য বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। আর্যসমাজে অনার্যপ্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও এক দিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্যমূর্তি, অন্য দিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্যমূর্তি।

কিন্তু সমস্ত অনার্যঅনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনাকাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আর্যভাবের ঐক্যসূত্রে আদ্যোপান্ত মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না— তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার মধ্যে শত সহস্র অসংগতি থাকিয়া যায়। এই-সমস্ত অসংগতির কোনোপ্রকার সমন্বয় হয় না— কেবল কালক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে অসংগতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে, যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাক্। ইহা একপ্রকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া নীতি। যখন বিরুদ্ধগুলিকে পাশে রাখিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই মিলাইতে পারা যাইবে না তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই পারে না।

এইরূপে বৌদ্ধযুগের প্রলয়াবসানে বিপর্যস্ত সমাজের নূতন পুরাতন সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ লইয়া ব্রাহ্মণ যেমন করিয়া পারে সেগুলিকে সাজাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বসিল। এমন অবস্থায় স্বভাবতই শৃঙ্খল অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। যাহারা স্বতই স্বতন্ত্র, যাহারা নানা জাতির নানা কালের সামগ্রী, তাহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিতে গেলে বাঁধন অত্যন্ত আঁট করিয়া রাখিতে হয়— তাহারা জীবনধর্মের নিয়ম-অনুসারে আপনার যোগ আপনিই সাধন করে না।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ভযুগে যখন আর্য-অনার্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিরোধ ছিল। এইপ্রকার বিরোধের মধ্যেও এক প্রকারের সমকক্ষতা থাকে। মানুষ যাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে তীব্রভাবে দ্বেষ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এইজন্য ক্ষত্রিয়েরা অনার্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ ধরিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী যুগে যখন আর-এক দিন অনার্য-বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল অনার্যেরা তখন আর বাহিরে নাই তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তখন যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এইজন্য সেই অবস্থায় বিদ্বেষ একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দূরে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, যাহাকে সকল প্রকারে ঘৃণা করা যায় তাহারও মন আপনি খাটো হইয়া আসে ; সেও আপনার হীনতার সংকোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে ; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনোরূপ অধিকার দাবি করে না। এইরূপ যখন সমাজের এক ভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর-এক ভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধাই পায় না— তখন নীচে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে আত্মপ্রসারণের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ ছিল এবং আত্মসংকোচনের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ জাগিল উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রথম বিদ্বেষের সমতলটানে মনুষ্যত্ব খাড়া থাকে, দ্বিতীয় বিদ্বেষের নীচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি। বেদে অনার্যদের প্রতি যে বিদ্বেষপ্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই

লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে, সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তুত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, য়ুরোপীয় ও এসিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো, যেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্বনাশকে ঘনাইয়া আনে। বরং শত্রুতা শ্রেয়, কিন্তু ঘৃণা ভয়ংকর।

ব্রাহ্মণ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের একেশ্বর হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সকলকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া বাঁধিল। ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সংকোচনের যুগ স্বভাবতই ঘটিল।

বিপদ হইল এই যে, পূর্বে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার যোগে সমাজের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, এখন সমাজে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি আর কাজ করিল না। সমাজের অনার্যশক্তি ব্রাহ্মণশক্তির প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না— ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আপন পরাভবের উপরেও জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিল।

এ দিকে বাহির হইতে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নামে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সিংহাসনগুলিই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য অনার্যদের ন্যায় তাহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইয়া একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। এই ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রকৃতিতে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ নহে। ইহারা প্রাচীন আর্য ক্ষত্রিয়দের ন্যায় সমাজের সৃষ্টিকার্যে আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিতে পারে নাই, ইহারা সাহস ও বাহুবল লইয়া ব্রাহ্মণশক্তির সহায় ও অনুবর্তী হইয়া বন্ধনকে দৃঢ় করিবার দিকেই সম্পূর্ণ যোগ দিল।

এরূপ অবস্থায় কখনোই সমাজের ওজন ঠিক থাকিতে পারে না। আত্মপ্রসারের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আত্মরক্ষণীশক্তি সংকোচের দিকেই যখন পাকের পর পাক জড়াইয়া চলে তখন জাতির প্রতিভা স্ফূর্তি পাইতে পারে না। কারণ সমাজের এই বন্ধন একটা কৃত্রিম পদার্থ ; এইরূপ শিকল দিয়া বাঁধার দ্বারা কখনো কলেবর গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশানুক্রমে জাতির মধ্যে কালের ধর্মই জাগে ও জীবনের ধর্মই হ্রাস পায় ; এরূপ জাতি চিন্তায় ও কর্মে কর্তৃত্বভাবের অযোগ্য হইয়া পরাধীনতার জন্যই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আর্য-ইতিহাসের প্রথম যুগে যখন সমাজের অভ্যাস-প্রবণতা বিস্তর বাহিরের জিনিস জমাইয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল তখন সমাজের চিত্তবৃত্তি তাহার মধ্যে দিয়া ঐক্যের পথ সন্ধান করিয়া এই বহুর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিল। আজও সমাজে তেমনি আর-এক দিন আসিয়াছে। আজ বাহিরের জিনিস আরো অনেক বেশি এবং আরো অনেক অসংগত। তাহা আমাদের জাতির চিত্তকে ভারগ্রস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে একমাত্র শক্তি আধিপত্য করিতেছে তাহা রক্ষণীশক্তি। তাহা যা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিয়াছে, যাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। জাতির জীবনের গতিকে এই-সকল অভ্যাসের জড়সঞ্চয় পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না ; ইহা মানুষের চিন্তাকে সংকীর্ণ ও কর্মকে সংরুদ্ধ করিবেই— সেই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার জন্য এইকালেই সকলের চেয়ে সেই চিত্তশক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছে যাহা জটিলতার মধ্য হইতে সরলকে, বাহ্যিকতার মধ্য হইতে অন্তরকে এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে এককে বাধামুক্ত করিয়া বাহির করিবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিত্তশক্তিকেই অপরাধী করিয়া তাহাকে সমাজ হাজার শিকলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু এই বন্ধনজর্জর চিত্ত একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্যযুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবীর প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য

আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্যযুগে পরে পরে বার বার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয় হইয়াছে— তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইঁহারাই লোকাচার, শাস্ত্রবিধি ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য-ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই যুগের এখনো অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনো চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে; ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক; আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনোই তাহার প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা। ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভারতকে এই-সমস্ত নিরর্থক বাহুল্যের ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই। তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধ্যরূপে বাধাসংকুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্বতপ্রমাণ বিঘ্নব্যূহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে— যত বড়ো সমস্যা তত বড়োই তাহার তপস্যা হইবে। যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মতো হার মানিবে না। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। যাহা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা যদি শুদ্ধমাত্র সেখানে পড়িয়াই থাকিত তবে সে অসুবিধা কোনোমতে সহ্য করা যাইত— কিন্তু তাহাকে যে খোরাক দিতে হয়। জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত— সে এমন কথা যদি বলে যে, যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুষিব তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তি ক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকৃষ্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্বলের জন্য দুর্বলতা, অনার্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য জোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল ও বীর্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্রয় উচ্চের প্রতি তাহাই বঞ্চনা; কখনোই তাহাকে ঔদার্য বলা যাইতে পারে না; ইহাই তামসিকতা— এবং এই তামসিকতা কখনোই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।

ঘোরতর দুর্যোগের নিশীথ অন্ধকারেও এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই। যে-সমস্ত অদ্ভুত দুঃস্বপ্নভার তাহার বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার জন্য তাহার অভিভূত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না; তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের উপর বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে— তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার-ভাটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্‌যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে

চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বই হারানো হয় সর্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়— এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে, আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

১৩১৮

আত্মপরিচয়

আমাদের পরিচয়ের একটা ভাগ আছে, যাহা একেবারে পাকা— আমার ইচ্ছা অনুসারে যাহার কোনো নড়চড় হইবার জো নাই। তাহার আর-একটা ভাগ আছে যাহা আমার স্বোপার্জিত— আমার বিদ্যা ব্যবহার ব্যবসায় বিশ্বাস অনুসারে যাহা আমি বিশেষ করিয়া লাভ করি এবং যাহার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে। যেমন মানুষের প্রকৃতি ; তাহার একটা দিক আছে যাহা মানুষের চিরন্তন, সেইটেই তাহার ভিত্তি— সেইখানে সে উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার প্রকৃতির আর-একটা দিক আছে যেখানে সে আপনাকে আপনি বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে— সেইখানেই একজন মানুষের সঙ্গে আর-একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্য।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সবই যদি চিরন্তন হয়, কিছুই যদি তাহার নিজে গড়িয়া লইবার না থাকে, আপনার মধ্যে কোথাও যদি সে আপনার ইচ্ছা খাটাইবার জায়গা না পায় তবে তো সে মাটির ঢেলা। আবার যদি তাহার অতীতকালের কোনো একটা চিরন্তন ধারা না থাকে তাহার সমস্তই যদি আকস্মিক হয় কিংবা নিজের ইচ্ছা অনুসারেই আগাগোড়া আপনাকে যদি তাহার রচনা করিতে হয় তবে সে একটা পাগলামি, একটা আকাশকুসুম।

মানুষের এই প্রকৃতি অনুসারেই মানুষের পরিচয়। তাহার খানিকটা পাকা খানিকটা কাঁচা, তাহার এক জায়গায় ইচ্ছা খাটে না আর-এক জায়গায় ইচ্ছারই সৃজনশালা। মানুষের সমস্ত পরিচয়ই যদি পাকা হয় অথবা তাহার সমস্তই যদি কাঁচা হয় তবে দুইই তাহার পক্ষে বিপদ।

আমি যে আমারই পরিবারের মানুষ সে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার পরিবারের কেহ-বা মাতাল, কেহ-বা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া ঠেকিয়া গেল এবং লোকসমাজেও উচ্চশ্রেণীতে গণ্য হইল না। এই কারণেই আমি আমার পারিবারিক পরিচয়টাকে একেবারে চাপিয়া যাইতে পারি কিন্তু তাহা হইলে সত্যকে চাপা দেওয়া হইবে।

কিংবা হয়তো আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেহ কখনো হাবড়ার পুল পার হয় নাই কিংবা দুইদিন অন্তর গরম জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাই বলিয়া আমিও যে পুল পার হইব না কিংবা স্নান-সম্বন্ধে আমাকে কার্পণ্য করিতেই হইবে এ কথা মানা যায় না।

অবশ্য, আমার সাত পুরুষে যাহা ঘটে নাই অষ্টম পুরুষে আমি যদি তাহাই করিয়া বসি, যদি হাবড়ার পুল পার হইয়া যাই তবে আমার বংশের সমস্ত মাসিপিসি ও খুড়োজেঠার দল নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চক্ষুতারকা ললাটের দিকে তুলিয়া বলিবে, 'তুই অমুক গোষ্ঠীতে জন্মিয়াও পুল পারাপারি করিতে শুরু করিয়াছিস! ইহাও আমাদিগকে চক্ষে দেখিতে হইল!' চাই কি লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহাদের এমন ইচ্ছাও হইতে পারে আমি পুলের অপর পারেই বরাবর থাকিয়া যাই। কিন্তু তবু আমি যে সেই গোষ্ঠীরই ছেলে সে পরিচয়টা পাকা। মা-মাসিরা রাগ করিয়া তাহা স্বীকার না করিলেও পাকা, আমি নিজে অভিমান করিয়া তাহা অস্বীকার করিলেও পাকা। বস্তুত পূর্ব-পুরুষগত যোগটা নিত্য, কিন্তু চলাফেরা সম্বন্ধে অভ্যাসটা নিত্য নহে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এ দিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন ; সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে, এমন-কি, যদি কোনো নিরাপদ সুযোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না— কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনোদিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোক পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা যে কী, সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা বলিতেছি আমরা আর কিছু নই, আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটা তো একটা নূতন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশি দূর যায় না। আমি হয়তো কেবলমাত্র গতকল্য ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই ? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত কোনো-একটা নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই ?

এরূপ কখনো সম্ভবই হইতে পারে না। অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই ; সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।

কথা এই, সেই আমার অতীতের পরিচয়ে আমি হয়তো গৌরব বোধ করিতে না পারি। সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু এইরূপ যে-সকল গৌরব পৈতৃক তাহার ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বিধাতা আমাদের সম্মতি লন না, এই-সকল সৃষ্টিকার্যে কোনোরূপ ভোটের প্রথাও নাই। আমরা কেহ-বা জর্মনির সম্রাটবংশে জন্মিয়াছি আবার কাহারও-বা এমন বংশে জন্ম— ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে বা কালো অক্ষরে যাহার কোনো উল্লেখমাত্র নাই। ইহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়াও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতে পারি অথবা এ সম্বন্ধে কোনো গভীর তত্ত্বালোচনার চেষ্টা না করিয়া ইহাকে সহজে স্বীকার করিয়া গেলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নাই।

অতএব, আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ, বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আপিল-আদালতের জজ পাইব কোথায় ?

ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে, হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে মুসলমানের সঙ্গে আমার যোগ অস্বীকার করা হয়, তাহাতে ঔদার্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

বস্তুত পরিচয়মাত্রেরই এই অসুবিধা আছে। এমন-কি, যদি আমি বলি আমি কিছুই না, তবে যে বলে আমি কিছুই, তাহার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে ; হয়তো সেই সূত্রেই তাহার সঙ্গে আমার মারামারি লাঠালাঠি বাধিয়া যাইতে পারে। আমি যাহা এবং আমি যাহা নই এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আছে— পরিচয়মাত্রই সেই বিচ্ছেদেরই পরিচয়।

এই বিচ্ছেদের মধ্যে হয়তো কোনো একপক্ষের অপ্রিয়তার কারণ আছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াই হয়তো কোনো একজন বা একদল লোক আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে। এটা যদি আমি বাঞ্ছনীয় না মনে করি তবে আমার সাধ্যমত আমার তরফ হইতে অপ্রিয়তার কারণ দূর করিতে চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য— যদি এটা কোনো সংগত ও উচিত কারণের উপর নির্ভর না করে, যদি অন্ধসংস্কারমাত্র হয়, তবে আমার নামের সঙ্গে সঙ্গে এই অহেতুক বিদ্বেষটুকুকেও আমার বহন করিতে হইবে। আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলিয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াসকে কেহই প্রশংসা করিতে পারিবে না।

ইহার উত্তরে তর্ক উঠিবে, ওটা তুমি ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিলে। নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অসুবিধা স্বতন্ত্র কথা— কিন্তু একটা বড়ো জাতির বা সম্প্রদায়ের সমস্ত দায় আমার স্বকৃত নহে সুতরাং যদি তাহা

অপ্রিয় হয় তবে তাহা আমি নিঃসংকোচে বর্জন করিতে পারি।

আচ্ছা বেশ, মনে করা যাক, ইংরেজ এবং আইরিশ ; ইংরেজের বিরুদ্ধে আইরিশের হয়তো একটা বিদ্বেষের ভাব আছে এবং তাহার কারণটার জন্য কোনো একজন বিশেষ ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে দায়ী নহে ; তাহার পূর্বপিতামহেরা আইরিশের প্রতি অন্যায় করিয়াছে এবং সম্ভবত এখনো অধিকাংশ ইংরেজ সেই অন্যায়ের সম্পূর্ণ প্রতিকার করিতে অনিচ্ছুক। এমন স্থলে যে ইংরেজ আইরিশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আইরিশকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার জন্য বলেন না আমি ইংরেজ নই ; তিনি বাক্যে ও ব্যবহারে জানাইতে থাকেন তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুত এরূপ স্থলে স্বজাতির অধিকাংশের বিরুদ্ধে আইরিশের পক্ষ লওয়াতে স্বজাতির নিকট হইতে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে সকলে গালি দিবে, তাঁহাকে Little Englander-এর দলভুক্ত ও স্বজাতির গৌরবনাশক বলিয়া সকলে নিন্দা করিবে, কিন্তু তবু এ কথা তাঁহাকে বলা সাজিবে না, আমি ইংরেজ নহি।

তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এইজন্যই সে পরামর্শে সত্য ফল পাওয়া যায় না। কারণ, আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই একলা তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি।

এ স্থলে অপর পক্ষে বলিবেন, আমাদের আসল বাধা ধর্ম লইয়া। হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলে আমরা তাহাকে আপনার ধর্ম বলিতে পারি না। অতএব আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায় ; তাহার দ্বারা দুই কাজই হয়। এক, হিন্দুর যে ধর্ম আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ তাহাকে অস্বীকার করা হয় এবং যে ধর্মকে আমি জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া জানি তাহাকেও স্বীকার করিতে পারি।

এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, ব্রাহ্ম বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অনুরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর-একটির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, 'তুমি কি চৌধুরীবংশীয়', আর সে, যদি তাহার উত্তর দেয়, 'না আমি দপ্তরির কাজ করি,' তবে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় না। হইতে পারে চৌধুরীবংশের কেহ আজ পর্যন্ত দপ্তরির কাজ করে নাই, তাই বলিয়া তুমি দপ্তরি হইলেই যে চৌধুরী হইতে পারিবেই না এমন কথা হইতে পারে না।

তেমনি, অদ্যকার দিনে হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাই যে তাহার নিত্য লক্ষণ তাহা কখনোই সত্য নহে। এ সম্বন্ধে বৈদিককাল হইতে অদ্য পর্যন্তের ইতিহাস হইতে নজির সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিতে ইচ্ছাই করি না। আমি একটা সাধারণতত্ত্বস্বরূপেই বলিতে চাই, কোনো বিশেষ ধর্মমত ও কোনো বিশেষ আচার কোনো জাতির নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। হাঁসের পক্ষে জলে সাঁতার যেমন, মানুষের পক্ষে বিশেষ ধর্মমত কখনোই সেরূপ নহে। ধর্মমত জড় পদার্থ নহে— মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে— এইজন্য ধর্ম কোনো জাতির অবিচলিত নিত্য পরিচয় হইতেই পারে না। এইজন্য যদিচ সাধারণত সমস্ত ইংরেজের ধর্ম খৃস্টানধর্ম, এবং সেই ধর্মমতের উপরেই তাহার সমাজবিধি প্রধানত প্রতিষ্ঠিত তথাপি একজন ইংরেজ বৌদ্ধ হইয়া গেলে তাহার যত অসুবিধাই হউক তবু সে ইংরেজই থাকে।

তেমনি ব্রাহ্মধর্ম আপাতত আমার ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু কাল আমি প্রটেস্টান্ট পরশু রোম্যানক্যাথলিক এবং তাহার পর দিনে আমি বৈষ্ণব হইতে পারি, তাহাতে কোনো বাধা নাই, অতএব সে পরিচয় আমার সাময়িক পরিচয়— কিন্তু জাতির দিক দিয়া আমি অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় বাঁধা পড়িয়াছি, সেই সুবৃহৎকালব্যাপী সত্যকে নড়াইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই।

হিন্দুরা এ কথা বলে বটে আমার ধর্মটা অটল ; এবং অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহারা আমাকে অহিন্দু বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তাহাদের এই আচরণ আমার হিন্দু পরিচয়কে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত হিন্দুমাত্রই বৈদ্যমতে ও মুসলমান হাকিমিমতে আপনাদের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে। এমন-কি, এমন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা থাকিতে পারেন যিনি ডাক্তারি ঔষধ স্পর্শ করেন না। তথাপি অভিজ্ঞতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির চিকিৎসা-প্রণালী বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজও ইহা

লইয়া অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন যে, বিদেশী চিকিৎসা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক এবং ইহাতে আমাদের শরীর জীর্ণ হইয়া গেল, দেশ উজাড় হইবার জো হইল কিন্তু তবু কুইনিনমিক্‌শ্চার যে অহিন্দু এমন কথা কোনো তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা আজও প্রমাণের চেষ্টা হয় নাই। ডাক্তারের ভিজিটে এবং ঔষধের উগ্র উপদ্রবে যদি আমি ধনেপ্রাণে মরি তবু আমি হিন্দু এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না। অথচ হিন্দু আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত খুঁজিতে ঔষধতালিকার মধ্যে কুইনিনের নাম পাওয়া যাইবে না।

এই যেমন শরীরের কথা বলিলাম, তেমনি শরীরের চেয়ে বড়ো জিনিসেরও কথা বলা যায়। কারণ, শরীর রক্ষাই তো মানুষের একমাত্র নহে, তাহার যে প্রকৃতি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে তাহাকেও বাঁচাইয়া চলিতেই হইবে। সমাজের অধিকাংশ লোকের এমন মত হইতে পারে যে, তাহাকে বাঁচাইয়া চলিবার উপযোগী ধর্ম আয়ুর্বেদ আমাদের দেশে এমনই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো কথা চলিতে পারে না। এটা তো একটা বিশ্বাসমাত্র, এরূপ বিশ্বাস সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, অতএব যে লোকের প্রাণ লইয়া কথা সে যদি নিজের বিশ্বাস লইয়া অন্য কোনো একটা পন্থা অবলম্বন করে তবে গায়ের জোরে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি কিন্তু সত্যের জোরে পারি না। গায়ের জোরের তো যুক্তি নাই। পুলিস দারোগা যদি ঘুষ লইয়া বলপূর্বক অন্যায় করে তবে দুর্বল বলিয়া আমি সেটাকে হয়তো মানিতে বাধ্য হইতে পারি কিন্তু সেইটেকেই রাজ্যশাসনতন্ত্রের চরম সত্য বলিয়া কেন স্বীকার করিব? তেমনি হিন্দুসমাজ যদি ধোবানাপিত বন্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া আমাকে বলে অমুক বিশেষ ধর্মটাকেই তোমার মানিতে হইবে কারণ এইটেই হিন্দুধর্ম— তবে যদি ভয় পাই তবে ব্যবহারে মানিয়া যাইব কিন্তু সেইটেই যে হিন্দুসমাজের চরম সত্য ইহা কোনোক্রমেই বলা চলিবে না। যাহা কোনো সভ্য সমাজেরই চরম সত্য নহে তাহা হিন্দুসমাজেরও নহে, ইহা কোটি কোটি বিরুদ্ধবাদীর মুখের উপরেই বলা যায়— কারণ, ইহাই সত্য।

হিন্দুসমাজের ইতিহাসেও ধর্মবিশ্বাসের অচলতা আমরা দেখি নাই। এখানে পরে পরে যত ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে এমন আর কোথাও ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল দেবতা ও পূজা আর্যসমাজের নহে তাহাও হিন্দুসমাজে চলিয়া গিয়াছে— সংখ্যাহিসাবে তাহারাই সব চেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষে উপাসকসম্প্রদায়সম্বন্ধে যে-কোনো বই পড়িলেই আমরা দেখিতে পাইব হিন্দুসমাজে ধর্মাচরণের কেবল যে বৈচিত্র্য আছে তাহা নহে, তাহারা পাশাপাশি আছে, ইহা ছাড়া তাহাদের পরস্পরের আর কোনো ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ধর্ম হিন্দুর ধর্ম, যেটা না মানিলে তুমি আমাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিবে না? তখন এই উত্তর পাওয়া যায়, যে-কোনো ধর্মই কিছুকাল ধরিয়া যে-কোনো সম্প্রদায়ে হিন্দুধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ধর্মের এমনতরো জড়সংজ্ঞা আর হইতেই পারে না। যাহা শ্রেয় বা যাহার আন্তরিক কোনো সৌন্দর্য বা পবিত্রতা আছে তাহাই ধর্ম, এমন কোনো কথা নাই; স্তূপের মধ্যে কিছুকাল যাহা পড়িয়া আছে তাহাই ধর্ম— তাহা যদি বীভৎস হয়, যদি তাহাতে সাধারণ ধর্মনীতির সংযম নষ্ট হইতে থাকে তথাপি তাহাও ধর্ম। এমন উত্তর যতগুলি লোকে মিলিয়াই দিক-না কেন তথাপি তাহাকে আমি আমার সমাজের পক্ষের সত্য উত্তর বলিয়া কোনোমতেই গ্রহণ করিব না। কেননা, লোক গণনা করিয়া ওজন দরে বা গজের মাপে সত্যের মূল্যনির্ণয় হয় না।

নানাপ্রকার অনার্য ও বীভৎস ধর্ম কেবলমাত্র কালক্রমে আমাদের সমাজে যদি স্থান পাইয়া থাকে তবে যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও ভক্তির সাধনায় আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্মদীক্ষার দ্বারা আমি হিন্দুসমাজের মধ্যে আমার সত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব এতবড়ো অন্যায় আমরা কখনোই মানিতে পারিব না। ইহা অন্যায়, সুতরাং ইহা হিন্দুসমাজের অথবা কোনো সমাজেরই নহে।

প্রশ্ন এই, হিন্দুসমাজ যদি জড়ভাবে ভালোমন্দ সকলপ্রকার ধর্মকেই পিণ্ডাকার করিয়া রাখে এবং যদি কোনো নূতন উচ্চ আদর্শকে প্রবেশে বাধা দেয় তবে এই সমাজকে তোমার সমাজ বলিয়া স্বীকার করিবার দরকার কী? ইহার একটা উত্তর পূর্বেই দিয়াছি— তাহা এই যে, ঐতিহাসিক দিক দিয়া আমি যে হিন্দু এ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো তর্কই নাই।

এ সম্বন্ধে আরো একটা বলিবার আছে। তোমার পিতা যেখানে অন্যায় করেন সেখানে তাহার প্রতিকার

ও প্রায়শ্চিত্তের ভার তোমারই উপরে। তোমাকে পিতৃঋণ শোধ করিতেই হইবে— পিতাকে আমার পিতা নয় বলিয়া তোমার ভাইদের উপর সমস্ত বোঝা চাপাইয়া পর হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্যাকে সোজা করিয়া তোলা সত্যাচরণ নহে। তুমি বলিবে, প্রতিকারের চেষ্টা বাহির হইতে পররূপেই করিব— পুত্ররূপে নয়। কেন? কেন বলিবে না, যে পাপ আমাদেরই সে পাপ আমরা প্রত্যেকে ক্ষালন করিব?

জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুসমাজকে অস্বীকার করিয়া আমরা যে-কোনো সম্প্রদায়কেই তাহার স্থলে বরণ করি-না কেন সে সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত দায় কি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই গ্রহণ করিতে হয় না? যদি কখনো দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজে বিলাসিতার প্রচার ও ধনের পূজা অত্যন্ত বেশি চলিতেছে, যদি দেখি সেখানে ধর্মনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তবে এ কথা কখনোই বলি না যে যাহারা ধনের উপাসক ও ধর্মে উদাসীন তাহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম, কারণ সংখ্যায় তাহারাই অধিক, অতএব আমাকে অন্য নাম লইয়া অন্য আর-একটা সমাজ স্থাপন করিতে হইবে। তখন এই কথাই আমরা বলি এবং ইহা বলাই সাজে যে, যাঁহারা সত্যধর্ম বাক্যে ও ব্যবহারে পালন করিয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ আমাদের সমাজের লোক; তাঁহাদের যদি কর্তৃত্ব না-ও থাকে ভোটসংখ্যা গণনায় তাঁহারা যদি নগণ্য হন তথাপি তাঁহাদেরই উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই সমাজের উদ্ধার হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য ওজনদরে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না— তাহা ছোটো হইলেও তাহা বড়ো। পর্বতপরিমাণ খড়বিচালি স্ফুলিঙ্গপরিমাণ আগুনের চেয়ে দেখিতেই বড়ো কিন্তু আসলে বড়ো নহে। সমস্ত শেজের মধ্যে যেখানে সলিতার সূচ্যগ্র পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে সেইখানেই সমস্ত শেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে তাহার পরিমাণ যতই হউক সেইটেকে আসল জিনিস বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজেই সমস্ত সমাজপ্রদীপের আলোটুকু যাঁহারা জ্বালাইয়া আছেন তাঁহারা সংখ্যাহিসাবে নহে সত্যহিসাবে সে সমাজে অগ্রগণ্য। তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন, আপনাকে তাঁহারা নিমেষে নিমেষে ত্যাগই করিতেছেন তবু তাঁহাদের শিখা সমাজে সকলের চেয়ে উচ্চে— সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান।

অতএব, যদি এমন কথা সত্যই আমার মনে হয় যে, আমি যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছি তাহাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে এই কথা আমাকে নিশ্চয় বলিতে হইবে এই ধর্মই আমার সমাজের ধর্ম। সমাজের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়েই সত্যকে পায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজ সিদ্ধিলাভ করে। ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নয়জন যদি পাস করে তবে সেই নয়জনের মধ্যেই ইস্কুল সার্থক। একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠক উপহাস-পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধকাব্য বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠকাব্য। এইরূপ সকল বিষয়েই। রামমোহন রায় তাঁহার চারি দিকে বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। এ কথা কোনোমতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নীচে ছিল, এবং নীচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা একথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন— অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না— হিন্দু-সমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্‌স্‌পীয়র নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দুসমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবল মাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে— তবে অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অরুণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার হইতে অরুণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্‌বোধিত

হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।

আমি জানি এ কথায় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিবেন— না, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলিতে পারিব না, তাহা বিশ্বের সামগ্রী। বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কী? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশকুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না— তাহা তো দেশকালকে আশ্রয় করে, তাহার তো বিশেষ নামরূপ আছে। গোলাপ ফুল তো বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল তো বিশেষভাবে গোলাপগাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী তাহা তো অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া উঠিত, নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর-একজাতির কোনোপ্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। ইংরেজের ইতিহাসে লড়াই কাটাকাটি মারামারি কী হইয়াছে, তাহার কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে এবং সে রাজাকে কে কবে সিংহাসনচ্যুত করিল এ-সমস্ত তাহারই ইতিহাসের বিশেষ কাঠখড়— কিন্তু এই-সমস্ত কাঠখড় দিয়া সে যদি এমন কিছুই গড়িয়া না থাকে যাহা মানবচিত্তের মধ্যে দেবসিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে তবে ইংরেজের ইতিহাস একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুত বিশ্বের চিত্তশক্তির কোনো একটা দিব্যরূপ ইংরেজের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আপনাকেই অপূর্ব করিয়া ব্যক্ত করিতেছে।

হিন্দুর ইতিহাসেও সে চেষ্টার বিরাম নাই। বিশ্বসত্যের প্রকাশশক্তি হিন্দুর ইতিহাসেও ব্যর্থ হয় নাই; সমস্ত বাধা-বিরোধও এই শক্তিরই লীলা। সেই হিন্দু-ইতিহাসের অন্তরে যে বিশ্বচিত্ত আপন সৃজনকার্যে নিযুক্ত আছেন ব্রাহ্মসমাজ কি বর্তমানযুগে তাহারই সৃষ্টিবিকাশ নহে? ইহা কি রামমোহন রায় বা আর দুই-একজন মানুষ আপন খেয়ালমত ঘরে বসিয়া গড়িয়াছেন? ব্রাহ্মসমাজ এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে হিন্দুসমাজের মাঝখানে মাথা তুলিয়া বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল ইহার কি একেবারে কোনো মানেই নাই— ইহা কি বিশ্ববিধাতার দ্যূতক্রীড়াঘরে পাশাখেলার দান পড়া? মানুষের ইতিহাসকে আমি তো এমন খামখেয়ালির সৃষ্টিরূপে সৃষ্টিছাড়া করিয়া দেখিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। এই বিকাশ হিন্দুসমাজের একটি বিশ্বজনীন বিকাশ। হিন্দুসমাজের এই বিকাশটিকে আমরা কয়জনে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া লইয়া ইহাকে আমাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া চারি দিক হইতে তাহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিব এবং মুখে বলিব এইরূপেই আমরা তাহার প্রতি পরম ঔদার্য আরোপ করিতেছি— এ কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

অন্যপক্ষে আমাকে বলিবেন ভাবের দিক হইতে এ-সমস্ত কথা শুনিতে বেশ লাগে কিন্তু কাজের বেলা কী করা যায়? ব্রাহ্মসমাজ তো কেবলমাত্র একটা ভাবের ক্ষেত্র নহে— তাহাকে জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগাইতে হইবে, তখন হিন্দুসমাজের সহিত তাহার মিল করিব কেমন করিয়া?

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুসমাজ বলিতে যদি এমন একটা পাষাণখণ্ড কল্পনা কর যাহা আজ যে অবস্থায় আছে তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিসমাপ্ত তবে তাহার সঙ্গে কোনো সজীব মানুষের কোনোপ্রকার কারবারই চলিতে পারে না— তবে সেই পাথর দিয়া কেবলমাত্র মৃত মানবচিত্তের গোর দেওয়াই চলিতে পারে। আমাদের বর্তমান সমাজ যে কারণে যত নিশ্চল হইয়াই পড়ুক-না, তথাপি তাহা সেরূপ পাথরের স্তূপ নহে। আজ, যে বিষয়ে তাহার যাহা-কিছু মত ও আচরণ নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহাই তাহার চরম সম্পূর্ণতা নহে— অর্থাৎ সে মরে নাই। অতএব বর্তমান হিন্দুসমাজের সমস্ত বাঁধা মত ও আচারের সঙ্গে নিজের সমস্ত মত ও আচারকে নিঃশেষে মিলাইতে পারিলে তবেই নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব এ কথা সত্য নহে। আমাদেরই মত ও আচারের পরিণতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরিণতি ও

পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। আমাদের মধ্যে কোনো বদল হইলেই আমরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তখনই নিজেকে সমাজের বহির্ভূক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তবে সমাজের বদল হইবে কী করিয়া ?

এ কথা স্বীকার করি, সমাজ একটা বিরাট কলেবর। ব্যক্তিবিশেষের পরিণতির সমান তালে সে তখনই-তখনই অগ্রসর হইয়া চলে না। তাহার নড়িতে বিলম্ব হয় এবং সেরূপ বিলম্ব হওয়াই কল্যাণকর। অতএব সেই সমাজের সঙ্গে যখন ব্যক্তিবিশেষের অমিল শুরু হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সুখকর নহে। সেই কারণে তখন তাড়াতাড়ি সমাজকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক আসিতেও পারে। কিন্তু যেখানে মানুষ অনেকের সঙ্গে সত্যসম্বন্ধে যুক্ত সেখানে সেই অনেকের মুক্তিতেই তাহার মুক্তি। একলা হইয়া প্রথমটা একটু আরাম বোধ হয় কিন্তু তাহার পরেই দেখা যায় যে, যে-অনেককে ছাড়িয়া দূরে আসিয়াছি, দূরে আসিয়াছি বলিয়াই তাহার টান ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। যে আমারই, তাহাকে, সঙ্গে থাকিয়া উদ্ধার করিলেই যথার্থ নিজে উদ্ধার পাওয়া যায়— তাহাকে যদি স্বতন্ত্র নীচে ফেলিয়া রাখি তবে একদিন সেও আমাকে সেই নীচেই মিলাইয়া লইবে ; কারণ, আমি যতই অস্বীকার করি না কেন তাহার সঙ্গে আমার নানা দিকে নানা মিলনের যোগসূত্র আছে— সেগুলি বহুকালের সত্য পদার্থ। অতএব সমস্ত বাধা সমস্ত অসুবিধা স্বীকার করিয়াই আমার সমস্ত পরিবেষ্টনের মধ্যে আমার সাধনাকে প্রবর্তিত ও সিদ্ধিকে স্থাপিত করিতেই হইবে। না করিলে কখনোই তাহার সর্বাঙ্গীণতা হইবে না— সে দিনেদিনে নিঃসন্দেহই কৃশ ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে, তাহার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস সে কখনোই লাভ করিতে পারিবে না।

অতএব আমি যাহা উচিত মনে করিতেছি তাহাই করিব, কিন্তু এ কথা কখনোই বলিব না যে, সমাজের মধ্যে থাকিয়া কর্তব্যপালন চলিবে না। এ কথা জোর করিয়াই বলিব যাহা কর্তব্য তাহা সমস্ত সমাজেরই কর্তব্য। এই কথাই বলিব, হিন্দুসমাজের কর্তব্য আমিই পালন করিতেছি।

হিন্দুসমাজের কর্তব্য কী ? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের মঙ্গল তাহারই অনুষ্ঠান করা। কেমন করিয়া জানিব কিসে সকলের মঙ্গল ? বিচার ও পরীক্ষা ছাড়া তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায়ই নাই। বিচারবুদ্ধিটা মানুষের আছে এইজন্যই। সমাজের মঙ্গলসাধনে, মানুষের কর্তব্যনিরূপণে সেই বুদ্ধি একেবারেই খাটাইতে দিব না এমন পণ যদি করি তবে সমাজের সর্বনাশের পথ করা হয়। কেননা সর্বদা হিতসাধনের চিন্তা ও চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিলেই তবে সেই বিচারবুদ্ধি নিজের শক্তিপ্রয়োগ করিয়া সবল হইয়া উঠিতে পারে এবং তবেই, কালে কালে সমাজে স্বভাবতই যে-সমস্ত আবর্জনা জমে, যে-সমস্ত অভ্যাস ক্রমশই জড়ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথরোধ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে কাটাইয়া তুলিবার শক্তি সমাজের মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রম ও বিপদের আশঙ্কা করিয়া সমাজকে চিরকাল চিন্তাহীন চেষ্টাহীন শিশু করিয়া রাখিলে কিছুতেই তাহার কল্যাণ হইতে পারে না।

এ কথা যখন নিশ্চিত তখন নিজের দৃষ্টান্ত ও শক্তিদ্বারাই সমাজের মধ্যে এই মঙ্গলচেষ্টাকে সজীব রাখা নিতান্তই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। যাহা ভালো মনে করি তাহা করিবার জন্য কখনোই সমাজ ত্যাগ করিব না।

আমি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেছি, জাতিভেদ। যদি জাতিভেদকে অন্যায় মনে করি তবে তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত হিন্দুসমাজের পক্ষে অন্যায়— অতএব তাহাই যথার্থ অহিন্দু। কোনো অন্যায় কোনো সমাজেরই পক্ষে নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। যাহা অন্যায় তাহা ভ্রম, তাহা স্খলন, সুতরাং তাহাকে কোনো সমাজেরই চিরপরিণাম বলিয়া গণ্য করা একপ্রকার নাস্তিকতা। আগুনের ধর্মই যেমন দাহ, অন্যায় কোনো সমাজেরই সেরূপ ধর্ম হইতেই পারে না। অতএব হিন্দু থাকিতে গেলে আমাকে অন্যায় করিতে হইবে অধর্ম করিতে হইবে এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ করিতে চাই না। সকল সমাজেই বিশেষ কালে কতকগুলি মনুষ্যত্বের বিশেষ বাধা প্রকাশ পায়। যে-সকল ইংরেজ মহাত্মারা জাতিনির্বিচারে সকল মানুষের প্রতিই ন্যায়াচরণের পক্ষপাতী, যাঁহারা সকল জাতিরই নিজের বিশেষ শক্তিকে নিজ নিজ পন্থায় স্বাধীনতার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন— তাঁহারা অনেকে আক্ষেপ করিতেছেন বর্তমান ইংরেজজাতির মধ্যে সেই উদার ন্যায়পরতার, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার, সেই মানবপ্রেমের খর্বতা ঘটিয়াছে— কিন্তু তাই বলিয়াই এই দুর্গতিকে

তাঁহারা নিত্য বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তাই তাঁহারা ইহারই মাঝখানে থাকিয়া নিজের উদার আদর্শকে সমস্ত বিদ্রূপ ও বিরোধের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন— তাঁহারা স্বজাতির বাহিরে নূতন একটা জাতির সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন নাই।

তেমনি, জাতিভেদকে যদি হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া জানি তবে তাহাকেই আমি অহিন্দু বলিয়া জানিব এবং হিন্দুসমাজের মাঝখানে থাকিয়াই তাহার সঙ্গে লড়াই করিব। ছেলেমেয়ের অসবর্ণ বিবাহ দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না এবং তাহাকেই আমি নিজে হইতে অহিন্দুবিবাহ বলিব না— কারণ বস্তুত আমার মতানুসারে তাহাই হিন্দুবিবাহনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যদি এমন হয় যে, হিন্দুসমাজের পক্ষে জাতিভেদ ভালোই, কেবলমাত্র আমাদের কয়েকজনের পক্ষেই তাহার অসুবিধা বা অনিষ্ট আছে তবেই এই ক্ষেত্রে আমার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়া শোভা পায় নতুবা কদাচ নহে।

হিন্দুসমাজে কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ ছিল না এ কথা সত্য নহে, কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না ইহাও সত্য নহে— হিন্দুসমাজের সমস্ত অতীত-ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়া যে সমাজ, সেই বর্তমান সমাজকেই একমাত্র সত্য বলিয়া তাহার আশা ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়াকে আমি ধর্মসংগত বলিয়া কখনোই মনে করি না।

অপর পক্ষ বলিবেন আচ্ছা বেশ, বর্তমানের কথাই ধরা যাক, আমি যদি জাতিভেদ না মানিতেই চাই তবে এ সমাজে কাজকর্ম করিব কাহার সঙ্গে? উত্তর, এখনো যাহাদের সঙ্গে করিতেছ। অর্থাৎ যাহারা জাতিভেদ মানে না।

তবেই তো সেই সূত্রে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া উঠিল। না, ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে ইহা সম্প্রদায় মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি— ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া?

তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দুখ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দুখ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুখ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রঙ, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে, এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ— কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা— তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি— এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাত পরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীস্টান হইয়াছিলেন বলিয়াই এই সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কী করিয়া? জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক অন্তরতর; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোনো একটা পৌরাণিক মতকে যখন আমি বিশ্বাস করিতাম তখনো আমি যে জাতি ছিলাম, তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত যখন বিশ্বাস করি তখনো আমি সেই জাতি। যদিচ আজ

ব্রহ্মাণ্ডকে আমি কোনো অণ্ডবিশেষ বলিয়া মনে করি না ইহা জানিতে পারিলে এবং সুযোগ পাইলে আমার প্রপিতামহ এই প্রকার অদ্ভুত নব্যতায় নিঃসন্দেহ আমার কান মলিয়া দিতেন।

কিন্তু চীনের মুসলমানও মুসলমান, পারস্যেরও তাই, আফ্রিকারও তদ্রূপ। যদিচ চীনের মুসলমানসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না তথাপি এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের ধর্মমতের অনেকটা হয়তো মেলে কিন্তু অন্য অসংখ্য বিষয়েই মেলে না। এমন-কি, ধর্মমতেরও মোটামুটি বিষয়ে মেলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে মেলে না। অথচ হাজার হাজার বিষয়ে তাহার স্বজাতি কন্‌ফুসীয় অথবা বৌদ্ধের সঙ্গে তাহার মিল আছে। পারস্যে চীনের মতো কোনো প্রাচীনতর ধর্মমত নাই বলিলেই হয়। মুসলমান বিজেতার প্রভাবে সমস্ত দেশে এক মুসলমানধর্মই স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি পারস্যে মুসলমানধর্ম সেখানকার পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে— আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এখানেও আমার জাতিপ্রকৃতি আমার মতবিশেষের চেয়ে অনেক ব্যাপক। হিন্দুসমাজের মধ্যেই তাহার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। যে-সকল আচার আমাদের শাস্ত্রে এবং প্রথায় অহিন্দু বলিয়া গণ্য ছিল আজ কত হিন্দু তাহা প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে ; কত লোককে আমরা জানি যাঁহারা সভায় বক্তৃতা দিবার ও কাগজে প্রবন্ধ লিখিবার বেলায় আচারের স্খলন লেশমাত্র সহ্য করিতে পারেন না অথচ যাঁহাদের পানাহারের তালিকা দেখিলে মনু ও পরাশর নিশ্চয়ই উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিবেন এবং রঘুনন্দন আনন্দিত হইবেন না। তাঁহাদের প্রবন্ধের মত অথবা তাঁহাদের ব্যাবহারিক মত, কোনো মতের ভিত্তিতেই তাঁহাদের হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার ভিত্তি আরো গভীর। সেইজন্যই হিন্দুসমাজে আজ যাঁহারা আচার মানেন না, নিমন্ত্রণরক্ষায় যাঁহারা ভাটপাড়ার বিধান রক্ষা করেন না, এবং গুরু বাড়ি আসিলে গুরুতর কাজের ভিড়ে যাঁহাদের অনবসর ঘটে, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন। তাহার একমাত্র কারণ এ নয় যে হিন্দুসমাজ দুর্বল— তাহার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যেও হিন্দুসমাজ একপ্রকার অর্ধচেতন ভাবে অনুভব করিতে পারে যে, বাহিরের এই-সমস্ত পরিবর্তন হাজার হইলেও তবু বাহিরের— যথার্থ হিন্দুত্বের সীমা এইটুকুর মধ্যে কখনোই বদ্ধ নহে।

যে কথাটা সংকীর্ণ বর্তমানের উপস্থিত অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া বৃহৎভাবে সত্য, অনেক পাকা লোকেরা তাহার উপরে কোনো আস্থাই রাখেন না। তাঁহারা মনে করেন এ-সমস্ত নিছক আইডিয়া। মনে করেন করুন কিন্তু আমাদের সমাজে আজ এই আইডিয়ার প্রয়োজনই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন। এখানে জড়ত্বের আয়োজন যথেষ্ট আছে যাহা পড়িয়া থাকে, বিচার করে না, যাহা অভ্যাসমাত্র, যাহা নড়িতে চায় না তাহা এখানে যথেষ্ট আছে, এখানে কেবল সেই তত্ত্বেরই অভাব দেখিতেছি, যাহা সৃষ্টি করে, পরিবর্তন করে, অগ্রসর করে, যাহা বিচিত্রকে অন্তরের দিক হইতে মিলাইয়া এক করিয়া দেয়। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সেই আইডিয়াকেই জন্ম দিয়াছে, যাহা তাহাকে উদ্‌বোধিত করিবে, যাহা তাহাকে চিন্তা করাইবে, চেষ্টা করাইবে, সন্ধান করাইবে ; যাহা তাহার নিজের ভিতরকার সমস্ত অনৈক্যকে সত্যের বন্ধনে এক করিয়া বাঁধিয়া তুলিবার সাধনা করিবে, যাহা জগতের সমস্ত প্রাণশক্তির সঙ্গে তাহার প্রাণক্রিয়ার যোগসাধন করিয়া দিবে। এই যে আইডিয়া, এই যে সৃজনশক্তি, চিত্তশক্তি, সত্যগ্রহণের সাধনা, এই যে প্রাণচেষ্টার প্রবল বিকাশ, যাহা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আকার গ্রহণ করিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজের বলিয়া অস্বীকার করিব? যেন আমরাই তাহার মালেক, আমরাই তাহার জন্মদাতা। হিন্দুসমাজের এই নিজেরই ইতিহাসগত প্রাণগত সৃষ্টি হইতে আমরা হিন্দুসমাজকেই বঞ্চিত করিতে চাহিব ? আমরা হঠাৎ এত বড়ো অন্যায় কথা বলিয়া বসিব যে, যাহা নিশ্চল, যাহা বাধা, যাহা প্রাণহীন তাহাই হিন্দুসমাজের, আর যাহা তাহার আইডিয়া, তাহার মানসরূপ, তাহার মুক্তির সাধনা, তাহাই হিন্দুসমাজের নহে, তাহাই বিশ্বের সরকারি জিনিস। এমন করিয়া হিন্দুসমাজের সত্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টাই কি ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা ?

এতদূর পর্যন্ত আসিয়াও আমার শ্রোতা বা পাঠক যদি একজনও বাকি থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় আমাকে শেষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন— যদি জাতিভেদ না মানিয়াও হিন্দুত্ব থাকে, যদি মুসলমান খ্রীস্টান হইয়াও

হিন্দুত্ব না যায় তবে হিন্দুত্বটা কী? কী দেখিলে হিন্দুকে চিনিতে পারি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আমি বাধ্য হই তবে নিশ্চয়ই তিনিও বাধ্য। হিন্দুত্ব কী— ইহার যে-কোনো উত্তরই তিনি দিন-না, বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাহার প্রতিবাদ আছে। শেষকালে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইবে, যে সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম। এই কারণে যাহাতে বাংলার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দুত্ব দূষিত হয় না, যাহা দ্রাবিড়ের হিন্দুর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে তাহা কান্যকুব্জের হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক।

বাহিরের দিক হইতে হিন্দুকে বিচার করিতে গেলেই এত বড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিতে হয়। কিন্তু বাহিরের দিক হইতেই এইরূপ বিচার করাটাই অবিচার— সেই অবিচারটা হিন্দুসমাজ স্বয়ং নিজের প্রতি নিজে প্রয়োগ করিয়া থাকে বলিয়াই যে সেটা তাহার যথার্থ প্রাপ্য এ কথা আমি স্বীকার করি না। আমি নিজেকে নিজে যাহা বলিয়া জানি তাহা যে প্রায়ই সত্য হয় না এ কথা কাহারও অগোচর নাই।

মানুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোনো সংজ্ঞা পৌঁছিতে পারে না— কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও আছে। কেবলমাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে— কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না, সেখানে সে পা রাখিবার জায়গাই পায় না।

এইজন্যই জীবনের দ্বারা আমরা জীবনকে জানিতে পারি কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে পারি না। ইংরেজের লক্ষণ কী, যদি সংজ্ঞা নির্দেশের দ্বারা বলিতে হয় তবে বলিতেই পারিব না— এক ইংরেজের সঙ্গে আর-এক ইংরেজের বাধিবে— এক যুগের ইংরেজের সঙ্গে আর-এক যুগের ইংরেজের মিল পাইব না। তখন কেবলমাত্র এই একটা মোটা কথা বলিতে পারিব যে, এক বিশেষ ভূখণ্ড ও বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে এই যে জাতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষ হইয়াছে এই জাতি আপন ব্যক্তিগত কালগত সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়াও এক ইংরেজজাতি। ইহাদের মধ্যে যে খ্রীস্টান সেও ইংরেজ, যে কালীকে মানিতে চায় সেও ইংরেজ; যে পরজাতির উপরে নিজের আধিপত্যকে প্রবল করিয়া তোলাকেই দেশহিতৈষিতা বলে সেও ইংরেজ এবং যে এইরূপে অন্য জাতির প্রতি প্রভুত্বচেষ্টা দ্বারা স্বজাতির চরিত্রনাশ হয় বলিয়া উৎকণ্ঠিত হয় সেও ইংরেজ— যে ইংরেজ নিজেদের মধ্যে কাহাকেও বিধর্মী বলিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে সেও ইংরেজ এবং যে লোক সেই বিধর্মকেই সত্যধর্ম বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে সেও ইংরেজ। তুমি বলিবে ইহারা সকলেই আপনাকে ইংরেজ বলিয়া মনে করে সেইখানেই ইহাদের যোগ; কিন্তু শুধু তাই নয়, মনে করিবার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে; ইহারা যে যোগসম্বন্ধে প্রত্যেকে সচেতন তাহারই একটি যোগের জাল আছে। সেই জালটিতে সকল বৈচিত্র্য বাঁধা পড়িয়াছে। এই ঐক্যজালের সূত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করাই যায় না অথচ তাহা স্থূলবন্ধনের চেয়ে দৃঢ়।

আমাদের মধ্যেও তেমনি একটি ঐক্যজাল আছে। জানিয়া এবং না জানিয়াও তাহা আমাদের সকলকে বাঁধিয়াছে। আমার জানা ও স্বীকার করার উপরেই তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। কিন্তু তথাপি আমি যদি তাহাকে জানি ও স্বীকার করি তবে তাহাতে আমারও জোর বাড়ে তাহারও জোর বাড়ে। এই বৃহৎ ঐক্যজালের মহত্ত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে যদি মূঢ়তার ফাঁদ করিয়া তুলি তবে সত্যকে খর্ব করার যে শাস্তি তাহাই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যদি বলি, যে লোক দক্ষিণ শিয়রে মাথা করিয়া শোয় সেই হিন্দু, যে অমুকটা খায় না এবং অমুককে ছোঁয় না সেই হিন্দু, যে লোক আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দেয় এবং সবর্ণে বিবাহ করে সেই হিন্দু তবে বড়ো সত্যকে ছোটো করিয়া আমরা দুর্বল হইব, ব্যর্থ হইব, নষ্ট হইব।

এইজন্যই, যে আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি সেই আমার এ কথা নিশ্চয়রূপে জানা কর্তব্য, জ্ঞানে ভাবে কর্মে যাহা-কিছু আমার শ্রেষ্ঠ তাহা একলা আমার নহে, তাহা একলা আমার সম্প্রদায়েরও নহে তাহা আমার সমস্ত সমাজের। আমার মধ্য দিয়া আমার সমস্ত সমাজ তপস্যা করিতেছে— সেই তপস্যার ফলকে আমি সেই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মানুষকে বাদ দিয়া কোনো সমাজ নাই, এবং যাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ তাহারাই মানুষের প্রতিনিধি, তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানুষের বিচার হয়। আজ আমাদের সম্প্রদায়ই

যদি জ্ঞানে ও আচরণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে তবে আমাদের সম্প্রদায়ের দ্বারাই ইতিহাসে সমস্ত হিন্দুসমাজের বিচার হইবে এবং সে বিচার সত্য বিচারই হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের দশজন যদি আমাকে হিন্দু না বলে এবং সেইসঙ্গে আমিও যদি আমাকে হিন্দু না বলি তবে সে বলামাত্রের দ্বারা তাহা কখনোই সত্য হইবে না। সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো ইষ্ট নাই। আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই— এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশতবৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়, আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়াই সত্যের এই রূপটিকে— এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের সাধনাকে আমরা অন্ধ অহংকারে নূতন বলিতেছি কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি সত্য অহংকারে বলিব ইহা আমাদেরই ভিতরকার চিরন্তন— নবযুগে নববসন্তে সেই আমাদের চিরপুরাতনেরই নূতন বিকাশ হইয়াছে। য়ুরোপে খ্রীস্টান ধর্ম সেখানকার মানুষের কর্মশক্তি হইতে একটি বিশ্বসত্যের বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য খ্রীস্টানধর্ম নিউটেস্টামেন্টের শাস্ত্রলিখিত ধর্ম নহে, ইহা য়ুরোপীয় জাতির সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট জীবনের ধর্ম ; এক দিকে তাহা য়ুরোপের অন্তরতম চিরন্তন, অন্য দিকে তাহা সকলের হিন্দুসমাজের মধ্যেও আজ যদি কোনো সত্যের জন্ম ও প্রচার হয় তবে তাহা কোনোক্রমেই হিন্দুসমাজের বাহিরের জিনিস হইতেই পারে না— যদি তাহা আমাদের চিরদিনের জীবন হইতে জীবন না পাইয়া থাকে, যদি সেইখান হইতেই তাহার স্তন্যরস না জুটিয়া থাকে, আমাদের বৃহৎ সমাজের চিত্তবৃত্তি যদি ধাত্রীর মতো তাহার সেবা না করিয়া থাকে তবে কেবল আমাদের হিন্দুসমাজে নহে পৃথিবীর কোনো সমাজেই এই পথের ধারের কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস শ্রদ্ধার যোগ্য হয় নাই— তবে ইহা কৃত্রিম, ইহা অস্বাভাবিক, তবে সত্যের চিরঅধিকার সম্বন্ধে এই দরিদ্রের কোনো নিজের বিশেষ দলিল দেখাইবার নাই, তবে ইহা কেবল ক্ষণকালের সম্প্রদায়ের, ইহা চিরকালের মানবসমাজের নহে।

আমি জানি কোনো কোনো ব্রাহ্ম এমন বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুর কাছে যাহা পাইয়াছি, খ্রীস্টানের কাছে তাহার চেয়ে কম পাই নাই— এমন-কি, হয়তো তাঁহারা মনে করেন তাহার চেয়ে বেশি পাইয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, বাহির হইতে যাহা পাই তাহাকেই আমরা পাওয়া বলিয়া জানিতে পারি— কেননা, তাহাকে চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় এবং তাহার প্রত্যেক অংশকে অনুভব করিয়া করিয়া পাই। এইজন্য বেতনের চেয়ে মানুষ সামান্য উপরি-পাওনায় বেশি খুশি হইয়া উঠে। আমরা হিন্দু বলিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা আমাদের রক্তে মাংসে অস্থিমজ্জায়, তাহা আমাদের মানসপ্রকৃতির তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পাই না, তাহাকে লাভ বলিয়া মনেই করি না— এইজন্য ইংরেজি পাঠশালার পড়া মুখস্থ করিয়া যাহা অগভীরভাবে অল্পপরিমাণে ও ক্ষণস্থায়ীরূপেও পাই তাহাকেও আমরা বেশি না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। মাথার ভারকে আমরা ভারী বলিয়া জানি না, কিন্তু মাথার উপরকার পাগড়িটাকে একটা কিছু বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়, তাই বলিয়া এ কথা বলা সাজে না যে, মাথা বলিয়া জিনিসটা নাই পাগড়িটা আছে ; সে পাগড়ি বহুমূল্য রত্নমাণিক্যজড়িত হইলেও এমন কথা বলা সাজে না। সেইজন্য আমরা বিদেশ হইতে যাহা পাইয়াছি দিনরাত্রি তাহাকে লইয়া ধ্যান করিলে এবং প্রচার করিলেও, তাহাকে আমরা সকলের উচ্চে চড়াইয়া রাখিয়া দিলেও, আমার অগোচরে আমার প্রকৃতির গভীরতার মধ্যে নিঃশব্দে আমার চিরন্তন সামগ্রীগুলি আপন নিত্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। উর্দুভাষায় যতই পারসি এবং আরবি শব্দ থাক্‌-না তবু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন তাহা ভারতবর্ষীয় গৌড়ীয় ভাষারই এক শ্রেণী ;— ভাষার প্রকৃতিগত যে কাঠামোটাই তাহার নিত্যসামগ্রী, যে কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির কাজ চলে সেটা বিদেশী সামগ্রীতে আদ্যোপান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া তবুও গৌড়ীয়। আমাদের দেশের ঘোরতর বিদেশীভাবাপন্নও যদি উপযুক্ত তত্ত্ববিদের হাতে পড়েন তবে তাঁহার চিরকালের স্বজাতীয় কাঠামোটা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রচুর আবরণ আচ্ছাদনের ভিতর হইতে ধরা পড়িয়া যায়।

যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না ; নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় এ কথা কখনোই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

১৩১৯

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে এ কথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরো প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে কিন্তু এখন মিলিবার বাধা-সকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।

য়ুরোপের যে-সকল রাজ্যে খণ্ড খণ্ড জাতিরা একপ্রকার মিলিয়া ছিল এখন তাহারা প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। নরোয়ে সুইডেনে ভাগ হইয়া গিয়াছে। আয়র্লন্ড আপনার স্বতন্ত্র অধিকার লাভের জন্য বহুদিন হইতে অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। এমন-কি, আপনার বিশেষ ভাষা, বিশেষ সাহিত্যকে আইরিশরা জাগাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছে। ওয়েলস্‌বাসীদের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়মে এতদিন একমাত্র ফরাসি ভাষার প্রাধান্য প্রবল ছিল ; আজ ফ্লেমিশরা নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জয়ী করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে ; অস্ট্রীয়া রাজ্যে বহুবিধ ছোটো ছোটো জাতি একসঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে— তাহাদিগকে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আজ স্পষ্টই দূরপরাহত হইয়াছে। রুশিয়া আজ ফিনদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বিপুল বল প্রয়োগ করিতেছে বটে কিন্তু দেখিতেছে গেলা যত সহজ পরিপাক করা তত সহজ নহে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।

ইংলন্ডে হঠাৎ একটা ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের ঢেউ উঠিয়াছিল। সমুদ্রপারের সমুদয় উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলন্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এবারে উপনিবেশগুলির কর্তৃপক্ষেরা মিলিয়া ইংলন্ডে যে এক মহাসমিতি বসিয়াছিল তাহাতে যতগুলি বন্ধনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কোনোটাই টিকিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য হানি হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেইখানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে।

একান্ত মিলনেই যে সবলতা এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় এ কথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোনো-না-কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলনরক্ষার সদুপায়।

আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনই সে বড়ো হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না— জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই।

কুঁড়ির মধ্যের সমস্ত পাপড়ি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে— যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনই ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনই ফুল সার্থক হয়। আজ পরস্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্য নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড়ো হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড়ো হওয়া মনে করিতেই পারে না। যে ছোটো সেও যখনই আপনার সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনই সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে— ইহাই প্রাণের ধর্ম। বস্তুত সে ছোটো হইয়াও বাঁচিতে চায়, বড়ো হইয়া মরিতে চায় না।

ফিনরা যদি কোনোক্রমে রুশ হইয়া যাইতে পারে তবে অনেক উৎপাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পায়— তবে একটি বড়ো জাতির শামিল হইয়া গিয়া ছোটোত্বর সমস্ত দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়। কোনো-একটা নেশনের মধ্যে কোনোপ্রকার দ্বিধা থাকিলেই তাহাতে বলক্ষয় করে এই আশঙ্কায় ফিনল্যান্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে বলপূর্বক অভিন্ন করিয়া দেওয়াই রুশের অভিপ্রায়। কিন্তু ফিনল্যান্ডের ভিন্নতা যে একটা সত্য পদার্থ; রাশিয়ার সুবিধার কাছে সে আপনাকে বলি দিতে চায় না। এই ভিন্নতাকে যথোচিত উপায়ে বশ করিতে চেষ্টা করা চলে, এক করিতে চেষ্টা করা হত্যা করার মতো অন্যায়। আয়র্লন্ডকে লইয়াও ইংলন্ডের সেই সংকট। সেখানে সুবিধার সঙ্গে সত্যের লড়াই চলিতেছে। আজ পৃথিবীর নানা স্থানেই যে এই সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই একটা প্রাণের বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে ছোটোখাটো একটি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহারও মূল কথাটি সেই একই। ইতিপূর্বে এ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই মোটা ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল উপরে, আর সকলেই ছিল তলায় পড়িয়া।

কিন্তু যখনই নানা কারণে আমাদের দেশের মধ্যে একটা উদ্‌বোধন উপস্থিত হইল তখনই অব্রাহ্মণ জাতিরা শূদ্র শ্রেণীর এক-সমতল হীনতার মধ্যে একাকার হইয়া থাকিতে রাজি হইল না। কায়স্থ আপনার যে একটি বিশেষত্ব অনুভব করিতেছে তাহাতে সে আপনাকে শূদ্রত্বের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার হীনতা সত্য নহে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবন্ধনের অতি প্রাচীন সুবিধাকে সে চিরকাল মানিবে কেমন করিয়া? ইহাতে দেশাচার যদি বিরুদ্ধ হয় তবে দেশাচারকে পরাভূত হইতেই হইবে। আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই বিপ্লব ব্যাপ্ত হইবে। কেননা, মূর্ছাবস্থা ঘুচিলেই মানুষ সত্যকে অনুভব করে; সত্যকে অনুভব করিবামাত্র সে কোনো কৃত্রিম সুবিধার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করিতে পারে না, বরঞ্চ সে অসুবিধা ও অশান্তিকেও বরণ করিয়া লইতে রাজি হয়।

ইহার ফল কী? ইহার ফল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের গৌরববোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড়ো হইয়া উঠিলে তখনই পরস্পরের মিলন সত্যকার সামগ্রী হইবে। দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন, এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজামিলন মাত্র।

মনে আছে আমারই কোনো ব্যাকরণঘটিত প্রবন্ধ লইয়া একবার সাহিত্যপরিষৎ সভায় এমন একটি আলোচনা উঠিয়াছিল যে, বাংলাভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মতো করিয়া তোলা উচিত— কারণ, তাহা হইলে গুজরাটি মারাঠা সকলেরই পক্ষে বাংলা ভাষা সুগম হইবে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজত্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটেই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষার যাহা-কিছু শক্তি যাহা-কিছু সৌন্দর্য সমস্তই তাহার সেই নিজত্ব লইয়া। আজ ভারতের পশ্চিমতমপ্রান্তবাসী গুজরাটি বাংলা পড়িয়া বাংলা সাহিত্য নিজের ভাষায় অনুবাদ করিতেছে। ইহার কারণ এ নয় যে, বাংলা ভাষাটা সংস্কৃতের কৃত্রিম ছাঁচেঢালা সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জিত সহজ ভাষা। সাঁওতাল যদি বাঙালি পাঠকের কাছে তাহার লেখা চলিত হইবে আশা করিয়া নিজের ভাষা হইতে সমস্ত সাঁওতালিত্ব বর্জন করে তবেই কি তাহার সাহিত্য আমাদের কাছে আদর পাইবে? কেবল ঐ বাধাটুকু দূর করার পথ চাহিয়াই কি আমাদের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে?

অতএব, বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই

হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়োরকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না— এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলাসাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।' সকল-প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকারপদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি— বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনই প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুইপক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়— সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাঁটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে, ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে— আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব— কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা

করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন— কারণ, সেখানে কোনোপ্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু, যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর; মানুষ যখন আপনাকে বড়ো করে তখনই আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যতদিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারও সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে— সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটো বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড়ো হইয়া আত্ম বিসর্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।

বস্তুত বাহির হইতে যেটুকু পাওয়া যাইতে পারে, যাহা অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় তাহার একটা সীমা আছেই। সে সীমা হিন্দু-মুসলমানের কাছে প্রায় সমান। সেই সীমায় যতদিন পর্যন্ত না পৌঁছানো যায় ততদিন মনে একটা আশা থাকে বুঝি সীমা নাই, বুঝি এই পথেই পরমার্থ লাভ করা যায়। তখনই সেই পথের পাথেয় কার একটু বেশি জুটিয়াছে কার একটু কম, তাই লইয়া পরস্পর ঘোরতর ঈর্ষা বিরোধ ঘটিতে থাকে।

কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের গুণে ও শক্তিতেই আমরা নিজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারি। যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই। এই কথাটা বুঝিবার সময় যত অবিলম্বে ঘটে ততই শ্রেয়। অতএব অন্যের আনুকূল্যলাভের যদি কোনো স্বতন্ত্র সিধা রাস্তা মুসলমান আবিষ্কার করিয়া থাকে তবে সে পথে তাহাদের গতি অব্যাহত হউক। সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশি হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদ-মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত— সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্নমনে কামনা করি।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার পরে আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না— ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্‌যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক-এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড়ো কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে

একঝোঁকা রকম ঝাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে। কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অন্তত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে ; বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে— সে সমস্ত মানুষের চিত্তসম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পুরাপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এ দেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল ! আজ পর্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাঁহার পূর্ব-মহলের সন্তানেরা পশ্চিম-মহলের দিকের জানলা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম-মহলের সন্তানেরা পুবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাসেই কান পর্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বত্রই প্রাচ্য বিদ্যার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্বের মতোই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দুমুসলমান-শাস্ত্র অধ্যয়নে একজন জর্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্মবশত ; আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখি হইয়া শেখা বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্‌যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভালো করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিকমত পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছি না।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, এ কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আহ্নিকতর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর-একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড়ো আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসংগত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বার বার করিয়া কেবলই আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বপ্পের

আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন, তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনোই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামত যিনি যতবড়ো খুশি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেইসঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে।

এ পর্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে-প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে, কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই— এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন— কোনো দেবতার মুখ-হস্ত-পদ হইতে একেবারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে— সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারও কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেইজন্যেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জা বোধ হয় না— শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই— কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসংগত। কেননা কার্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না— সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এইজন্য সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ, শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমশায় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ— কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায় এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসংগত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্যশাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্যশাস্ত্র আমরা স্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এইজন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়— অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে— অন্য জায়গায় বড়ো জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজেই এই ভাবটা বাড়িয়া উঠিতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। শিক্ষা পাইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে বলিয়াই যে এমনটা ঘটে তাহা আমি মনে করি না। আমি পূর্বেই ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড়ো একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষত এতদিন আমরা আমাদের যাহা-কিছু সমস্তকেই নির্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি— আজ তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান করি, কিন্তু তাহা নির্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কখনোই চিরদিন টিকিতে পারে না— এই প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাত শান্ত হইয়া আসিবেই— তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। সুতরাং হিন্দু কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্বল ও অস্পষ্ট। এখন আমরা যেটাকে চোখে দেখিতেছি সেইটেই আমাদের কাছে প্রবল। তাহা যে নানারূপে হিন্দুর যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেছে এ কথা মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত-কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার-ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ— যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল; যাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মতো একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না; বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খ্রীস্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত; যে সমাজের এক মহাপুরুষ একদা অনার্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর-এক মহাপুরুষ কর্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়া ছিলেন এবং ধর্মকে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পথে সর্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না— যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি; প্রাণের ধর্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ-বর্জনের ধর্ম।

এইজন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্‌যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত? কিন্তু সেই আশঙ্কামাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না। কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে তো আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড়ো করিয়া তুলিতে চাই। তাহাকে চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড়ো হইবার দিকে যাইবেই— তাহাকে গর্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য। বিশ্ববিদ্যালয় সেই চালনার ক্ষেত্র— কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিত্তকে সচেতন করারই আয়োজন। সেই চেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সংকীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রশস্ত করিয়া তুলিবেই। মানুষের মনের উপর আমি পুরা বিশ্বাস রাখি; ভুল লইয়াও যদি আরম্ভ করিতে হয় সেও ভালো, কিন্তু আরম্ভ করিতেই হইবে, নতুবা ভুল কাটিবে না। ছাড়া পাইলে সে চলিবেই। এইজন্য যে-সমাজ অচলতাকেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে সে-সমাজ অচেতনতাকেই আপনার সহায় জানে এবং সর্বাগ্রে মানুষের মন-জিনিসকেই অহিফেন খাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া রাখে। সে এমন-সকল ব্যবস্থা করে যাহাতে মন কোথাও বাহির হইতে পায় না, বাধা-নিয়মে একেবারে বদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিতে ভয় করে, চিন্তা করিতেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যেমনই হোক মনকে তো সে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে না, কারণ, মনকে চলিতে দেওয়াই তাহার কাজ। অতএব যদি হিন্দু সত্যই মনে করে শাস্ত্রশ্লোকের দ্বারা চিরকালের মতো দৃঢ়বদ্ধ জড়নিশ্চলতাই হিন্দুর প্রকৃত বিশেষত্ব— তবে সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে দূরে পরিহার করাই তাহার পক্ষে কর্তব্য হইবে। বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করেন, হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো গতিবিধি নাই— তাহা স্থাবর পদার্থ— বর্তমানকালের প্রবল আঘাতে পাছে সে লেশমাত্র বিচলিত হয়, পাছে তাহার স্থাবরধর্মের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য

হয় এইজন্য তাহাকে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া রাখাই হিন্দুসন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য— তাঁহারা মানুষের চিত্তকে প্রাচীর ঘেরিয়া বন্দিশালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব না করিয়া বিশ্ববিদ্যার হাওয়া বহিবার জন্য তাহার চারি দিকে বড়ো বড়ো দরজা ফুটাইবার উদ্‌যোগ যে করিতেছেন ইহা ভ্রমক্রমে অবিবেচনাবশতই করিতেছেন, তাহা সত্য নহে। আসল কথা, মানুষ মুখে যাহা বলে তাহাই যে তাহার সত্য বিশ্বাস তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। তাহার অন্তরতম সহজবোধের মধ্যে অনেক সময় এই বাহ্যবিশ্বাসের একটা প্রতিবাদ বাস করে। বিশেষত যে সময়ে দেশে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই ঋতুপরিবর্তনের সন্ধিকালে আমরা মুখে যাহা বলি সেটাকেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ফাল্গুন মাসে মাঝে মাঝে বসন্তের চেহারা বদল হইয়া গিয়া হঠাৎ উত্তরে হাওয়া বহিতে থাকে, তখন পৌষ মাস ফিরিয়া আসিল বলিয়া ভ্রম হয়, তবু এ কথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে উত্তরে হাওয়া ফাল্গুনের অন্তরের হাওয়া নহে। আমের যে বোল ধরিয়াছে, নব কিশলয়ে যে চিক্কণ তরুণতা দেখিতেছি, তাহাতেই ভিতরকার সত্য সংবাদটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদেরও দেশের মধ্যে প্রাণের হাওয়াই বহিয়াছে— এই হাওয়া বহিয়াছে বলিয়াই আমাদের জড়তা ভাঙিয়াছে এবং গলা ছাড়িয়া বলিতেছি যাহা আছে তাহাকে রাখিয়া দিব। এ কথা ভুলিতেছি যাহা যেখানে যেমন আছে তাহাকে সেখানে তেমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে যদি চাই তবে কোনো চেষ্টা না করাই তাহার পন্থা। খেতের মধ্যে আগাছাকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য কেহ চাষ করিয়া মই চালাইবার কথা বলে না। চেষ্টা করিতে গেলেই সেই নাড়াচাড়াতেই ক্ষয়ের কার্য পরিবর্তনের কার্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই। নিজের মধ্যে যে সঞ্জীবনীশক্তি অনুভব করিতেছি, মনে করিতেছি সেই সঞ্জীবনীশক্তি প্রয়োগ করিয়াই মৃতকে রক্ষা করিব। কিন্তু জীবনীশক্তির ধর্মই এই, তাহা মৃতকে প্রবলবেগে মারিতে থাকে এবং যেখানে জীবনের কোনো আভাস আছে সেইখানেই আপনাকে প্রয়োগ করে। কোনো জিনিসকে স্থির করিয়া রাখা তাহার কাজ নহে— যে জিনিস বাড়িতে পারে তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিবে, আর যাহার বাড় ফুরাইয়াছে তাহাকে সে ধ্বংস করিয়া অপসারিত করিয়া দিবে। কিছুকেই সে স্থির রাখিবে না। তাই বলিতেছিলাম আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইয়া আমাদিগকে নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিতেছে— এই কথাই এখনকার দিনের সকলের চেয়ে বড়ো সত্য— তাহা মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই বড়ো কথা নহে— ইহা তাহার একটা ক্ষণিক লীলা মাত্র।

শ্রীযুক্ত গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্য প্রবর্তনের বিল সম্বন্ধে কোনো কোনো শিক্ষিত লোক এমন কথা বলিতেছেন যে, আধুনিক শিক্ষায় আমাদের তো মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে আবার দেশের জনসাধারণেরও কি বিপদ ঘটাইব ? যাঁহারা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজের ছেলেকে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি ? ইহা যে কপটাচার তাহা নহে ! ইহা আর কিছু নয়, অন্তরে নব বিশ্বাসের বসন্ত আসিয়াছে, মুখে পুরাতন সংস্কারের হাওয়া মরে নাই। সেইজন্য আমরা যাহা করিবার তাহা করিতে বসিয়াছি অথচ বলিতেছি আর-এক কালের কথা। আধুনিক শিক্ষায় যে চঞ্চলতা আনিয়াছে সেই চঞ্চলতা সত্ত্বেও তাহার মঙ্গলকে আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহাতে যে বিপদ আছে সেই বিপদকেও আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। নিরাপদ মৃত্যুকে আর আমরা বরণ করিতে রাজি নই, সেইজন্য জীবনের সমস্ত দায় সমস্ত পীড়াকেও মাথায় করিয়া লইবার জন্য আজ আমরা বীরের মতো প্রস্তুত হইতেছি। জানি উলটপালট হইবে, জানি বিস্তর ভুল করিব, জানি কোনো পুরাতন ব্যবস্থাকে নাড়া দিতে গেলেই প্রথমে দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলতার নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে— চিরসঞ্চিত ধুলার হাত হইতে ঘরকে মুক্ত করিবার জন্য ঝাঁট দিতে গেলে প্রথমটা সেই ধুলাই খুব প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে— এই-সমস্ত অসুবিধা ও দুঃখ-বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয় জানি তথাপি আমাদের অন্তরের ভিতরকার নূতন প্রাণের আবেগ আমাদিগকে তো স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমরা বাঁচিব, আমরা অচল হইয়া পড়িয়া থাকিব না, এই ভিতরের কথাটাই আমাদের মুখের সমস্ত কথাকে বারংবার সবেগে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারি দিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্‌বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই— সেই জাগরণই চারি দিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত

করিয়া তুলিবে। আমরা নিজেকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব।

আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনোমতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে। সেই অনুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেদের সেই-সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জন দিতেছে— যাহা অসংগত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের— যাহা সমস্ত মানুষের বুদ্ধিকে রুচিকে ধর্মকে আঘাত করে— যাহা কারাগারের প্রাচীরের মতো, বিশ্বের দিকে যাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনোপ্রকার পথই নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে যাচাই করিবার জন্য আনিতেছে। তাহার নিজত্বকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড়ো করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই, তাহার নিজত্বকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই— তাহার নিজত্বকে সমস্ত জগতের অলংকার করিয়া তুলিবে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে, আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহংকার করিতে পারিব না। আমাদের যে-সকল আচার ব্যবহার সংস্কার আমাদিগকে ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়াছে, যে-সকল থাকাতে কেবলই আমাদের সকল দিকে বাধাই বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভ্রমণে বাধা, গ্রহণে বাধা, দানে বাধা, চিন্তায় বাধা, কর্মে বাধা— সেই-সমস্ত কৃত্রিম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে দূর করিতেই হইবে— নহিলে মানবের রাজধানীতে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। এ কথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিসকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি, যাহা বিশ্বের আদরের ধন যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার-অনুষ্ঠান নহে। সেইটেকেই লাভ করিলেই আমরা যথার্থভাবে রক্ষা পাইব— কারণ, তখন সমস্ত জগৎ নিজের গরজে আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই ইচ্ছা আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা আর কোণে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমরা যে-সকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতেছি তাহার মধ্যে একই কালে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিশ্ববোধ দুই প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনাও আমাদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইত। এখনো একদল লোক আছেন যাঁহাদের কাছে ইহার অসংগতি পীড়াজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহারা এই মনে করিয়া গৌরব বোধ করেন যে হিন্দু এবং বিশ্বের মধ্যে বিরোধ আছে— তাই হিন্দু নানাপ্রকারে আটঘাট বাঁধিয়া অহোরাত্র বিশ্বের সংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতেই চায় ; অতএব হিন্দু টোল হইতে পারে, হিন্দু চতুষ্পাঠী হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পারে না— তাহা সোনার পাথরবাটি। কিন্তু এই দল যে কেবল কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে, ইঁহাদেরও নিজেদের ঘরের আচরণ দেখিলে বোঝা যায় ইঁহারা যে কথাকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, গভীরভাবে, এমন-কি, নিজের অগোচরে তাহাকে বিশ্বাস করেন না।

যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের মর্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা চিরকাল মন্দিরের অন্ধকার কোণে বসাইয়া রাখিতে পারিব না। আজ রথযাত্রার দিন আসিয়াছে— বিশ্বের রাজপথে, মানুষের সুখদুঃখ ও আদান-প্রদানের পণ্যবীথিকায় তিনি বাহির হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার রথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে যে যেমন করিয়াই তৈরি করি-না— কেহ বা বেশি মূল্যের উপাদান দিয়া, কেহ বা অল্প মূল্যের— চলিতে চলিতে কাহারও বা রথ পথের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে, কাহারও বা বৎসরের পর বৎসর টিকিয়া থাকে— কিন্তু আসল কথাটা এই যে শুভলগ্নে রথের সময় আসিয়াছে। কোন্ রথ কোন্ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে তাহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলিতে পারি না— কিন্তু আমাদের বড়োদিন আসিয়াছে— আমাদের সকলের চেয়ে যাহা মূল্যবান পদার্থ তাহা আজ আর কেবলমাত্র পুরোহিতের বিধি-নিষেধের আড়ালে ধূপ-দীপের ঘনঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না— আজ বিশ্বের আলোকে আমাদের যিনি বরেণ্য তিনি বিশ্বের বরেণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন। তাহারই একটি রথ নির্মাণের কথা আজ আলোচনা করিয়াছি ; ইহার পরিণাম কী তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এই রথ বিশ্বের পথে চলিয়াছে, প্রকাশের পথে বাহির হইয়াছে, সেই আনন্দের আবেগেই আমরা সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া ইহার দড়ি ধরিতে ছুটিয়াছি।

কিন্তু আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা এই-সমস্ত ভাবের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিসটা তৈরি হইয়া উঠিতেছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখো। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারি দিকে বিশ্ববিদ্যার ফোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনো আমাদের যতটা আছে তখনো তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এ পর্যন্ত তাহার তো কোনো প্রমাণ দেখি না ; তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাঁধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কুম্ভকার মূর্তি গড়িবার আরম্ভে কাদা লইয়া যে তালটা পাকায় সেটাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলে চলিবে না। একেবারেই এক মুহূর্তেই আমাদের মনের মতো কিছুই হইবে না। এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, মনের মতো কিছু যে হয় না, তাহার প্রধান দোষ মনেরই, উপকরণের নহে। যে অক্ষম সে মনে করে সুযোগ পায় না বলিয়াই সে অক্ষম। কিন্তু বাহিরের সুযোগ যখন জোটে তখন সে দেখিতে পায় পূর্ণ শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না বলিয়াই সে অক্ষম। যাহার ইচ্ছার জোর আছে সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে। আমাদের হতভাগ্য দেশেই আমরা প্রতিদিন এই কথা শুনিতে পাই, এই জায়গাটাতে আমার মতের সঙ্গে মিলিল না অতএব আমি ইহাকে ত্যাগ করিব— এইখানটাতে আমার মনের মতো হয় নাই অতএব আমি ইহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। বিধাতার আদুরে ছেলে হইয়া আমরা একেবারেই ষোলো-আনা সুবিধা এবং রেখায় রেখায় মনের মিল দাবি করিয়া থাকি— তাহার কিছু ব্যত্যয় হইলেই অভিমানের অন্ত থাকে না। ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারই দুর্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া মনের মতো করিয়া তুলিব— একদিনে না হয় বহুদিনে, একলা না হয় দল বাঁধিয়া, জীবনে না হয় জীবনের অন্তে— এই কথা বলিবার জোর নাই বলিয়াই আমরা সকল উদ্‌যোগের আরম্ভেই কেবল খুঁতখুঁত করিতে বসিয়া যাই, নিজের অন্তরের দুর্বলতার পাপকে বাহিরের ঘাড়ে চাপাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারি একটা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করিয়া থাকি। যেটুকু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, বাকি সমস্তই আমার নিজের হাতে, ইহাই পুরুষের কথা। যদি ইহাই নিশ্চয় জানি যে আমার মতই সত্য মত— তবে সেই মত গোড়াতেই গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া তখনই গোঁসাঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিয়া বসিব না— সেই মতকে জয়ী করিয়া তুলিবই বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। এ কথা নিশ্চয় সত্য, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিব না— কেননা কলে মানুষ তৈরি হয় না। আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোরথ সিদ্ধি হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে যদি আমরা স্পষ্ট করিয়া না বুঝি তবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বুঝিব তাহা নহে— যদি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি তবে বাহিরে তাহার প্রতিকূলতা যত প্রবলই থাক্ সমস্ত ভেদ করিয়া আমাদের সেই উপলব্ধি আমাদের কাজের মধ্যে আকার ধারণ করিবেই। এইজন্যই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কী ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে মনে কোনোপ্রকার সংশয় রাখিতে চাহি না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে ; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত ফল লাভ করিব বলিয়াও আশা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি— সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের সেই জাগ্রৎ চিত্ত যে-কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের যথার্থ কাজ— চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই-সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী— আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে— তাহাদের সংশোধন হইবে, তাহাদের বিস্তার হইবে ; বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সংকোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফূর্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়— তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারি ভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ, আপনার নিজের প্রণালীমতই কাজ করিবেন, আমি কোনোপ্রকার ফরমাশ করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন— সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো-একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক দিয়া তাঁহার পরিচয়-লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেইসঙ্গে তাঁহার আর-একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন— মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর-এক দিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর-কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনোপ্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয়

অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা-কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন ; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই— প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন— নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না— নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না— ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড়ো আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনো আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সে দিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড়ো করিয়া লইতেছি। তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে— অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন এ কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন— তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষের অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই— কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়— সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এইজন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া

থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড়ো জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়ো হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড়ো আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এইজন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনোদিন ইহার জন্য তিনি অর্থসাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্‌বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

তাহার পর এ দেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন— তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই— তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না— কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু— তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভালো মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই

করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এ দেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল— তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারি করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত— এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্য-বুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপ্‌ল'কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন-কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই— তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ঐরূপ কোনো-একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে— কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয়, আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা-কিছু ভালো, যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতই তিনি এই ভালোটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনো তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তাহার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভালো শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলাধুলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি

শিশুত্ব আছে। এইজন্য জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানাপ্রকার সহজ উপায় উদ্‌ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষি যেমন নিরর্থক নহে— তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে— তাহা আপনাকে নানাপ্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা— তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এই-সমস্ত আচার-ব্যবহারকে সেই দিক হইতে দেখিতেন। এইজন্য সেই-সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানব-প্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা এক দিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর-এক দিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না— অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছে হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসংগত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই-সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার 'পীপ্‌ল'দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা-কিছু ভালো তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে, সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে তো এই-সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই— এইজন্যই তিনি এই-সকল বিদেশীয় দিঙ্‌নাগদের 'স্থূলহস্তাবলেপ' হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যে-সকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জানাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন য়ুরোপীয়ের কথা শোনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিঁকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে— তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এইজন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্‌বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমত বুঝিতেই পারি না, এইজন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণই অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোটো ছোটো রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড়ো বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোটো ছোটো কাঁটার বাধা বড়ো কম নহে। অতএব এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালিপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন, তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার

ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। একপ্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না— তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল ; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে ; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল-প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল— তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন— ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই-সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে ?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বী, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য ? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারই মধ্যে আমার সমস্ত মন 'ভাবৈকরস' হইয়া স্থির রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন ? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এইজন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়— যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত— এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা-কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন।[১] তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।

১৩১৮

১ তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়— সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা-বিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে ; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন, তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলার বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিস, তার খোসার কাছে তলতল করে, তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবু-সম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যাটাকে যে প্রণালীতে জাগ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে-বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্যালোকের তা লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল পূর্বদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণ-সূত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিদ্যা। এ কথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পঙ্গু এবং কুনো ; পশ্চিমেও পেডাণ্ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু এ কথা মানিতে হইবে তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়িতে নাড়িতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কী গ্রামের নিরক্ষর চাষি, কী অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেচ পাইত। সুতরাং এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্ ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে ; সে কী চিন্তায়, কী কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা

সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয় এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই— তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উলটো দিকে গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম সেদিন বেহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা, ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বৈ কম দরকারি নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো ঘরে মানুষ, এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জলহাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে-খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয় দেবতার 'পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা একরকম দাঁড়াইয়া গেছে— শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো— অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ— অবশ্য ইনস্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান, এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে— এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়— উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান-বাজনা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন-আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে; এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক— এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না, এইজন্য বর্তমান সভ্যতাকে যে-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো, তার হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে; সে জানেও না এত বেশি হাঁসফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে, দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত-পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানি পাখা, চীনাবাসন, হরিণের শিং, বাঘের চামড়া— তার এ কোণ ও কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা দুঃস্বপ্নের মতো ছুটিয়া যাইবে; মেয়েদের মাথার টুপিগুলা হইতে মরা পাখি, পাখির পালক ও নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে; তাদের সাজসজ্জার অমিতাচার বর্বরতার পুরাতত্ত্বে স্থান পাইবে, যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুষি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে; শিক্ষা বলো, কর্ম বলো, ভোগ বলো, সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে; এবং মানুষের অন্তর প্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ঐটেই প্রাথমিক; ইঁটের কোটা যত বড়ো হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কলেজ জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। যতই বলি-না কেন, শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চেই রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও— সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কিনা, ঐ কায়দাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্যই ঐ কায়দাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব। কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অনুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা এ কথা জানি। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যটাকে য়ুরোপ এখনো বাহির করিতে পারে নাই; বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকেও সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও সমস্তটাকেও সাদাসিধা করিয়া তুলিব সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি কিন্তু মেজাজটাকে সুদ্ধ লইতে হইবে সে যে বিষম জুলুম।

পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার উপায় অনেক আছে। কেবল গরিব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা

টাকা লইয়া বেচা কেনা হইত না!

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ ইহা তো অন্যত্র দেখিয়াছি। এইজন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল— এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে এই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের, আর সংখ্যা যদি কমে তো বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সেজন্যে শিক্ষাবিভাগে উদ্‌বেগ নাই। এই উপলক্ষে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে, এই তো দেখি লেখাপড়ায় বাঙালির শখ আপনিই কমিয়াছে— যদি গোখলের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছুকের 'পরে জুলুম করাই হইত।

এ-সব কথা নির্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলন্ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার শখ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই-সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ— বাঙালির 'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও মনুষ্যপ্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবুদ্ধির বর্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য প্রতাপ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিস অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে কিন্তু এখনো এমন-কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টিসৎকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কিনা, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে একরকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনাবাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি; যে জিনিসের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে, নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতি করিবে, তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি, অনিষ্টকর। জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

২

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে দুটো-একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কনফারেন্স নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য

বাংলার অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ ফুটাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এইজন্যই দেশের পুরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে, দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না— তার কারণ এই যে, আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যাবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তার দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকারপ্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলোভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, ইস্কুল-কালেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলাভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি, সেইজন্যেই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়াল্, তার উপরে, দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্— সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই— শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি

জর্মান শিখিলে আরো ভালো। সেইসঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলোভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাসনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়— সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্যেমশায় ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না ? এতবড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে ?

আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না— একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলোয় যাক, লেশমাত্র আশা না করিয়া অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উসখুস করিয়া ওঠে তা হলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন-কি, লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন-পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাণ্ডটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্যেমশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আমদরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী ? আহূত যারা তারা ভিতর বাড়িতেই বসুক— আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী ? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে ? অভিশাপ লাগিবে না কি ?

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর-একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি-বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়— উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয় ; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য

স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়— কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন-কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আন্ডামানে চালান হইবার যোগ্য ? ইংলন্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মুলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত— কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয় ; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল ? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই ?

যাই হোক ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না।

কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই নাহয় দু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না ? স্টীমার না হয় তো পানসি ?

ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না ?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না ? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি ; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক— বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন ?

অনেকদিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়াছিলাম গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে শুরু করিয়াছিলাম আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারই এককোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল ; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি-বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে ; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশো পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুড় ঘরেই মরে। আর সংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই ? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে ? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের

গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে-বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হাওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দু-পাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হঁচট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার-ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায়শাস্ত্রী এবং আরো অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাতসমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে কেবল বাংলা দেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদের নাই!

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই, উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেইসঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজাউজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপূর্তি করে না।

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়োগোছের সীলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যাবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই— ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যাবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়— কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলাসাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল; তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলাসাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না— আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়— বাহিরে সেই-সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে, এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কালেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে— এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্‌গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের শামিল হইয়া থাক্‌-না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার

মাটির দিকেই নামিয়া আসি-না কেন ? গুরুর চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা— ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্‌-না কেন ?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র— 'আমরা চাই !' এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না ? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না ? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে ?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

১৩২২

ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল— আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরচিয়, যেখানে ভেদ। এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল। জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয় সংযম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাত করিয়া, আর সংযমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ এক দিকে আপনাকে মানিতেছে, আর-এক দিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন-আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু— কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় একতে দেখিতেছি ? যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে ; যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎসৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন এক দিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র আর-এক দিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, একতে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না— অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্মে মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে, এইজন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার একতে খুঁজিতেছে— নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন একতে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন একতে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন একতে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন একতে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে একতে পাইবার জন্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্পশাস্ত্র চিত্রকলা সম্বন্ধে কী বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

'রূপভেদাঃ'— ভেদ লইয়া শুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে— একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি সুষমাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা তো ভূতের কীর্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে ; আমাদের সৃষ্টিকার্যে যদি তার সেটা অন্যথা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো, তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত, তখনই একের সহিত অন্যের সুনিয়ত যোগ— তখনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একেই সংগীত প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুষমা যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে 'রূপভেদ' আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রমাণানি' অর্থাৎ পরিমাণ জিনিসটাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি ভেদ নইলে মিল হয় না এইজন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে ; সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এইজন্যই সীমা, নহিলে আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারি দিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানে না যে রূপ সেই কুরূপ, তা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল সেই তো মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া এককে মাপা। তাই দেখি সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম। এক দিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারি দিক হইতে পৃথক ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-এক দিকে তাহা প্রমাণের সুষমায় চারি দিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা তো হইল বহিরঙ্গ— একটা অন্তরঙ্গও তো আছে।

কেননা, মানুষ তো শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না— চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র 'রূপভেদাঃ প্রমাণানি'তে ষড়ঙ্গের বহিরঙ্গ সারিয়া অন্তরঙ্গের কথায় বলিতেছেন— 'ভাবলাবণ্য যোজনং'— চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে— চোখের কাজের উপরে মনের কাজ ফলাইতে হইবে ; কেননা শুধু কারু কাজটা সামান্য, চিত্র করা চাই— চিত্রের প্রধান কাজই চিৎকে দিয়া।

ভাব বলিতে কী বুঝায় তাহা আমাদের একরকম সহজে জানা আছে। এইজন্যই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। স্ফটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি 'ভাব' কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ-সকল কথার মুশকিল এই যে, ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকারমত ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে

idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরো কত কী আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব তোমার একটা ভাব ; সেইভাবে আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-রোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে অর্থাৎ আপনার চারি দিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিংবা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিসকেই মনের জিনিস করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কী ? অর্থাৎ ইহাতে তো হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্তের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে— ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে ? দেখিলাম একটা গাছ— কিন্তু গাছ তো ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কথাটা কী, অথবা যে আঁকিল গাছের মধ্য দিয়া তার অন্তরের কথাটা কী সেটা যদি না পাইলাম তবে গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের ? অবশ্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেখানে সেটা চিত্র নয় সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। 'আমাকে দেখো' 'আমাকে জানো' তাহাদের দাবি এই পর্যন্ত। কিন্তু 'আমাকে রাখো' এ দাবি করিতে হইলে আরো কিছু চাই। মনের আম-দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিস হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, 'বোসো', কাহাকেও বলে, 'আচ্ছা যাও।'

যাহারা আর্টিস্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে, তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ মনের দরবারে নিত্য আসন পাইবে। যে-সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদি, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিদ্যায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তানে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিস যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মতো একই বাঁধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অন্তরের জিনিস সে 'নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'র পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাঁধা রাস্তায় ঠিক এক লাইনে চলিয়া পোটো হইয়া কারিগর হইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এইজন্য নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মতো দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির ষড়ঙ্গের আমরা দুটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্গে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক। সেটার নাম 'সাদৃশ্যং'। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য মেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে শাস্ত্রবাক্য তাঁহার পক্ষে বৃথা হইল। ঘোড়াগোরুকে ঘোড়াগোরু করিয়া আঁকিবার জন্য রেখা প্রমাণ ভাব লাবণ্যের এতবড়ো উদ্‌যোগপর্ব কেন ? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জন্যই উদ্‌যোগ পর্ব, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্য নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে ; একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য ; আর-একটা ভাবের সঙ্গে রূপের

সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনই রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব লাবণ্যের কথা পাড়া হইয়াছে তখনই বোঝা গিয়াছে গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অন্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না; রেখা ভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণ্যের জোড় মিলিল না; হয়তো রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়তো ভাবের দিকে— পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, বাহিরের লোক হয়তো পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়ধ্বনি করিল কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে! চোখ-ভোলানো চাতুরীতেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কি না, সেই তো রসিক। বাতাস যেমন সূর্যের কিরণকে চারি দিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি গুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্যকে লোকালয়ের সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার এই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপুর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারে না— সে জানে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। সর্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে। ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্তা— এরা নানা দিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায়— সে টাকা বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নহে; সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই— এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পুরাপুরি মিল হইয়া গেল— এই তো সব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কী?

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনো যে ফুরাইল না! স্বয়ং দ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা বর্ণিকাভঙ্গং— রঙের ভঙ্গিমা।

এইখানে বিষম খটকা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী বসিয়া আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা ষড়ঙ্গের গোড়াতেই আছে, আর এই রঙের ভঙ্গি যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল, চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনায় কার কত?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বৈকি! দুটির 'পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।

রঙ আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিস। অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এইজন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া। আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উলটা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং সে শুধু অন্ধকার, দোয়াতের কালির মতো। সাদার উপর যেই সে দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির,

তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুভ্র ও নিস্তব্ধ অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালির পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালিরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্রকলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রঙগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণার আলাপের মীড়— এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্যায়ে পর্যায়ে ইশারায় দেখাইয়া দেয়— ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে সুর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গি দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে; রেখা যেন অরেখার দিকে আপন ইশারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট— আর রঙ জিনিসটা নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো রেখার তারটাকে সাদা যেন খুব তীব্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তা কড়ি হইতে অতি-কোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রঙ জিনিসটা রেখা এবং অরেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গি। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালির নৃত্য সেখানে এই রঙগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাত কম নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ রঙ জিনিসটা মধ্যস্থ— দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মতো সেই বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে— তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিস নহে। তাহা কবিতায় লক্ষ্য নহে উপলক্ষ মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে-কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

সৃষ্টিকর্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন তাঁর আর-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের সৃষ্টি মানুষের ভিতরের তারে ঘা দিয়া যখন একটা মানস-পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের সুর বাজায় তখনই সে আর থাকিতে পারে না, বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এইজন্যই মানুষের সৃষ্টিতে ভিতর-বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত। এইজন্য মানুষের সৃষ্টিতে বাহিরের জগতের আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিস্টের কাজ হয় তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য এক দিকে রসরক্তরূপে বাহ্য আকার, আর-এক দিকে শক্তিস্বাস্থ্য সৌন্দর্যরূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের সৃষ্টিকার্য। মনের সৃষ্টিকার্যও এমনিতরো। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস-পদার্থটা এক দিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্য দিকে সৌন্দর্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের সৃষ্টি— যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো সৃষ্টি নহে।

তার পরে ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গং কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (suggestiveness)। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা

কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর-একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই— অর্থাৎ একটা রূপ, আর-একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর-বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্য? সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য? না, ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে অনাবশ্যক হয় তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা— কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড়ো হইয়া ওঠে— তখন তাহা কতটা যে বলিতেছি তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না— তখন সৃষ্টকর্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।

১৩২২

সোনার কাঠি

রূপকথায় আছে, রাক্ষসের জাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনার পুরী, যে পালঙ্কে শুয়েছেন সে সোনার পালঙ্ক; সোনা মানিকের অলংকারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াক্কড় পাহারা, পাছে কোনো সুযোগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কী? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়ো। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাকবে, তার এক পা বাইরে যাবে না, তা হলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে তাতে দেহের প্রাণটা টিকে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এইরকম। সে মোহ-রাক্ষসের হাতে পড়ে বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালঙ্কটুকুর মধ্যে এই সুন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্যের সীমা নেই; চারি দিকে কারুকার্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র! সেই চেড়ির দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই; তারা শত শত বছর ধরে সমস্ত আসা-যাওয়ার পথ আগলে বসে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই যে, যে কালটা চলছে রাজকন্যা তার গলায় মালা দিতে পারে নি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য যত সৌন্দর্যই থাক্ তার গতিশক্তি যদি না থাকে তা হলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায়— তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে গান জিনিসটা চলছে না। ওস্তাদরা বলছেন, গান জিনিসটা তো চলবার জন্যে হয় নি, সে বৈঠকে বসে থাকবে তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে; কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা-কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাকতে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চলছি সে নদী চলছে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামি নৌকো হলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারে স্থাবর অস্থাবর দুই জাতের মানুষ আছে, অতএব বর্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কী ? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামি চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা শহরে আসত। ধনীদের ঘরে মজলিস বসত, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুনতিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের শহরে বক্তৃতাসভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকি গান পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারে এতবড়ো মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চা নেই বলে জবাব দিলে আমি শুনব না। মন নেই বলেই চর্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভালো রাজত্ব, কিন্তু কী করা যাবে— সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাকবে এ কথা বললে অন্যায় হবে। আমি বলছি নে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে— কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিকতে হবে— সে যে বর্তমান কালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন করে তুলবে তা হতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তা হলে কী হত ? পনেরো-আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা-কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত তা হলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছি নে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে বসে, তা হলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লামজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালা-বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে ?

যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড়ো করে মানে তারা বলবে ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী ! তারা এখনো বলে, এ সমস্তই ভুয়ো ; বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তা হলে এ কথা বলতেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়— সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নি। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট ও এশিয়া থেকে ধাক্কা খেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড়মনের সঙ্গে আর্যমনের সংঘাত ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস রোম পারস্য তাকে কেবলই নাড়া দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় যে-সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া

যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকার-বিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম— তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয়— কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁওয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করি নে, তখন অনুকরণটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতেই চলতে পারি। পথ নানা ; অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তা হলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না— তা হলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁচেছে। কিন্তু সংগীতে পৌঁছয় নি। সেইজন্যেই আজও সংগীত জাগতে দেরি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেইজন্যেই সংগীতের বেড়া টলমল করছে। এ কথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জন করেছে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করছে, যে গানে আনন্দ পাচ্ছে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই। কীর্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিস আজ তৈরি হয়ে উঠছে সে আচার-ভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করছে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড়ো গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মতো অনেক বিষ হজম করে ফেলে। লোকের ভালো লাগছে, সবাই শুনতে চাচ্ছে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না— এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচল, চলতে শুরু করল। প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্রী— কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চলতে শুরু করেছে— সে বাঁধন মানছে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখনকার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিঁদুসংগীত বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক ; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসংগীতের কোনো ভয় নেই— বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে— সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীরু করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীর্ণ কাঁথা আড়াল করে ঘিরে রাখলে তবেই সত্য টিকে থাকবে, আজকের দিনে সে যত আস্ফালনই করুক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পলতেয় করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না! চার দিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

কৃপণতা

দেশের কাজে যাঁরা টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁদের কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, টাকা কেহ সহজে দিতে চাহেন না, এমন-কি, যাঁদের আছে এবং যাঁরা দেশানুরাগের আড়ম্বর করিতে ছাড়েন না, তাঁরাও।

ঘটনা তো এই কিন্তু কারণটা কী খুঁজিয়া বাহির করা চাই। রেলগাড়ির পয়লা দোসরা শ্রেণীর কামরার

দরজা বাহিরের দিকে টানিয়া খুলিতে গিয়া যে ব্যক্তি হয়রান হইয়াছে তাকে এটা দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, দরজা হয় বাহিরের দিকে খোলে, নয় ভিতরের দিকে। দুই দিকেই সমান খোলে এমন দরজা বিরল।

আমাদের দেশে ধনের দরজাটা বহুকাল হইতে এমন করিয়া বানানো যে, সে ভিতরের দিকের ধাক্কাতেই খোলে। আজ তাকে বাহিরের দিকে টান দিবার দরকার হইয়াছে কিন্তু দরকারের খাতিরে কলকবজা তো একেবারে একদিনেই বদল করা যায় না। সামাজিক মিস্ত্রিটা বুড়ো, কানে কম শোনে, তাকে তাগিদ দিতে গেলেই গরম হইয়া ওঠে।

মানুষের শক্তির মধ্যে একটা বাড়তির ভাগ আছে। সেই শক্তি মানুষের নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। জন্তুর শক্তি পরিমিত বলিয়াই তারা কিছু সৃষ্টি করে না, মানুষের শক্তি পরিমিতের বেশি বলিয়াই তারা সেই বাড়তির ভাগ লইয়া আপনার সভ্যতা সৃষ্টি করিতে থাকে।

কোনো একটি দেশের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, সেখানে মানুষের আপন বাড়তি অংশ দিয়া কী সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ জাতির ঐশ্বর্য আপন বসতির জন্য কোন্ ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে?

ইংলন্ডে দেখিতে পাই সেখানকার মানুষ নিজের প্রয়োজনটুকু সারিয়া বহু যুগ হইতে ব্যয় করিয়া আসিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তুলিতে এবং তাকে জাগাইয়া রাখিতে।

আমাদের দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা খরচ করিয়া আসিতেছি রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য নয়, পরিবারতন্ত্রের জন্য। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্ম এই পরিবারতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছে।

আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়। উমেদারির দুঃখে ও অপমানে আমাদের তরুণ যুবকদের চোখের গোড়ায় কালি পড়িল, মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কিসের জন্য? নিজের প্রয়োজনটুকুর জন্য তো নয়। বাপ মা বৃদ্ধ, ভাইকটিকে পড়াইতে হইবে, দুটি বোনের বিবাহ বাকি, বিধবা বোন তার মেয়ে লইয়া তাদের বাড়িতেই থাকে, আর আর যত অনাথ অপোগণ্ডের দল আছে অন্য কোথাও তাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করেই না।

এ দিকে জীবনযাত্রার চাল বাড়িয়া গেছে, জিনিসপত্রের দাম বেশি, চাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, ব্যাবসাবুদ্ধির কোনো চর্চাই হয় নাই। কাঁধের জোর কমিল, বোঝার ভার বাড়িল, এই বোঝা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। চাপ এত বেশি যে, নিজের ঘাড়ের কথাটা ছাড়া আর-কোনো কথায় পুরা মন দিতে পারা যায় না। উঞ্ছবৃত্তি করি, লাথিঝাঁটা খাই, কন্যার পিতার গলায় ছুরি দিই, নিজেকে সকল রকমে হীন করিয়া সংসারের দাবি মেটাই।

রেলে ইস্টিমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ ছিল আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙিয়াছে, বিধি ভাঙে নাই।

সমাজের দাবি তখন ফলাও ছিল। সে দাবি যে কেবল পরিবারের বৃহৎ পরিধির দ্বারা প্রকাশ পাইত তাহা নহে— পরিবারের ক্রিয়াকর্মেও তার দাবি কম ছিল না। সেই-সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পালপার্বণ আত্মীয় প্রতিবেশী অনাহূত রবাহূত সকলকে লইয়া। তখন জিনিসপত্র সস্তা, চালচলন সাদা, এইজন্য ওজন যেখানে কম আয়তন সেখানে বেশি হইলে অসহ্য হইত না।

এ দিকে সময় বদলাইয়াছে কিন্তু সমাজের দাবি আজও খাটো হয় নাই। তাই জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রভৃতি সকল রকম পারিবারিক ঘটনাই সমাজের লোকের পক্ষে বিষম দুর্ভাবনার কারণ হইল। এর উপর নিত্যনৈমিত্তিকের নানাপ্রকার বোঝা চাপানোই রহিয়াছে।

এমন উপদেশ দিয়া থাকি পূর্বের মতো সাদাচালে চলিতেই বা দোষ কী? কিন্তু মানবচরিত্র শুধু উপদেশে চলে না— এ তো ব্যোমযান নয় যে উপদেশের গ্যাসে তার পেট ভরিয়া দিলেই সে উধাও হইয়া চলিবে। দেশকালের টান বিষম টান। যখন দেশে কালে অসন্তোষের উপাদান অল্প ছিল, তখন সন্তোষ মানুষের সহজ

ছিল। আজকাল আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত অনেক বেশি বড়ো হইয়াছে। ঠিক যেন এমন একটা জমিতে আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আমাদের পায়ের জোরের চেয়ে জমির ঢাল অনেক বেশি— সেখানে স্থির দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত, অথচ চলিতে গেলে সুস্থভাবে চলার চেয়ে পড়িয়া মরার সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য ছাতা জুতা থেকে আরম্ভ করিয়া গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত নানা জিনিসে নানা মূর্তিতে আমাদের চোখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে— দেশের ছেলেবুড়ো সকলের মনে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিমুহূর্তে বাড়াইয়া তুলিতেছে। সকলেই আপন সাধ্যমত সেই আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী আয়োজন করিতেছে। ক্রিয়াকর্ম যা-কিছু করি-না কেন সেই সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখিয়া করিতে হইবে। লোক ডাকিয়া খাওয়াইব কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেকার রসনাটা এখন নাই এ কথা ভুলিবার জো কী।

বিলাতে প্রত্যেক মানুষের উপর এই চাপ নাই। যতক্ষণ বিবাহ না করে ততক্ষণ সে স্বাধীন, বিবাহ করিলেও তার ভার আমাদের চেয়ে অনেক কম। কাজেই তার শক্তির উদ্‌বৃত্ত অংশ অনেকখানি নিজের হাতে থাকে। সেটা অনেকে নিজের ভোগে লাগায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যেহেতুক মানুষ এইজন্য সে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিঃশেষ করিতে পারে না। পরের জন্য খরচ করা তার ধর্ম। নিজের বাড়তি শক্তি যে অন্যকে না দেয়, সেই শক্তি দিয়া সে নিজেকে নষ্ট করে, সে পেটুকের মতো আহারের দ্বারাই আপনাকে সংহার করে। এমনতর আত্মঘাতকগুলো পয়মাল হইয়া বাকি যারা থাকে তাদের লইয়াই সমাজ। বিলাতে সেই সমাজে সাধারণের দায় বহন করে, আমাদের দেশে পরিবারের দায়।

এ দিকে নূতন শিক্ষায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিতেছে যেটা একালের জিনিস। লোকহিতের ক্ষেত্র আমাদের মনের কাছে আজ দূরব্যাপী— দেশবোধ বলিয়া একটা বড়োরকমের বোধ আমাদের মনে জাগিয়াছে। কাজেই বন্যা কিংবা দুর্ভিক্ষে লোকসাধারণ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন খালিহাতে তাকে বিদায় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কুল রাখাই আমাদের বরাবরের অভ্যাস, শ্যাম রাখিতে গেলে বাধে। নিজের সংসারের জন্য টাকা আনা, টাকা জমানো, টাকা খরচ করা আমাদের মজ্জাগত ; সেটাকে বজায় রাখিয়া বাহিরের বড়ো দাবিকে মানা দুঃসাধ্য। মোমবাতির দুই মুখেই শিখা জ্বালানো চলে না। বাছুর যে গাভীর দুধ পেট ভরিয়া খাইয়া বসে সে গাভী গোয়ালার ভাঁড় ভরতি করিতে পারে না ; বিশেষত তার চরিয়া খাবার মাঠ যদি প্রায় লোপ পাইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে আমাদের ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত বড়ো হইয়াছে। তার ফল হইয়াছে জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সম্বলে ভদ্রতারক্ষা করিবার শক্তি অল্পলোকের আছে, অনেকে ভিক্ষা করে, অনেকে ধার করে, হাতে কিছু জমাইতে পারে এমন হাত তো প্রায় দেখি না। এইজন্য এখনকার কালের ভোগের আদর্শ আমাদের পক্ষে দুঃখভোগের আদর্শ।

ঠিক এই কারণেই নূতনকালের ত্যাগের আদর্শটা আমাদের শক্তিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেছে। কেননা, আমাদের ব্যবস্থাটা পারিবারিক, আমাদের আদর্শটা সর্বজনীন। ক্রমাগতই ধার করিয়া ভিক্ষা করিয়া এই আদর্শটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যেটাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছি সেটাকে ভালো করিয়া পালন করিতে অক্ষম হওয়াই চারিত্রনৈতিক হিসাবে দেউলে হওয়া। তাই, ভোগের দিক দিয়া যেমন আমাদের দেউলে অবস্থা, ত্যাগের দিক দিয়াও তাই। এইজন্যই চাঁদা তুলিতে, বড়োলোকের স্মৃতি রক্ষা করিতে, বড়ো ব্যাবসা খুলিতে, লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে গিয়া নিজেকে ধিক্‌কার দিতেছি ও বাহিরের লোকের কাছে নিন্দা সহিতেছি।

আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে কষ্ট নাই। এইজন্যই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবারবৃদ্ধিকে লোকবলবৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু এমনতরো বৃহৎ পরিবারকে একত্র রাখিতে হইলে তাহার বিধিবিধানের বাঁধন পাকা হওয়া চাই, এবং কর্তাকে নির্বিচারে না মানিয়া চলিলে চলে না। এই কারণে এমন সমাজ জন্মিবামাত্র বাঁধা নিয়মে জড়িত হইতে হয়। দানধ্যান পুণ্যকর্ম প্রভৃতি সমস্তই নিয়মে বদ্ধ ; যারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিবে তাদের মধ্যে যাতে কর্তব্যের আদর্শের বিরোধ না ঘটে, অর্থাৎ নিজে চিন্তা না করিয়া যাতে একজন ঠিক অন্যজনের মতোই চোখ বুজিয়া চলিতে পারে সেই ভাবের যত বিধিবিধান।

প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম, যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃদ্ধি করে না, ভারবৃদ্ধিই করে। চাষের উপলক্ষে মানুষকে যেখানে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে হয় সেইখানেই মানুষের ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ চারি দিকে অনেক ডালপালা ছড়াইবার জায়গা এবং সময় পায়। যারা লুঠপাট করে, পশু চরাইয়া বেড়ায়, দূর-দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাঁধা-নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে না ; তারা নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্‌ভাবিত করে। এই চিরকালের অভ্যাস ইহাদের রক্তমজ্জার মধ্যে আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যত কম খর্ব হয় ইহারা কেবলই তার চেষ্টা করিতে থাকে। রাজা থাক্ কিন্তু কিসে রাজার ভার না থাকে এই ইহাদের সাধনা, ধন আছে কিন্তু কিসে তাহা দরিদ্রের বুকের উপর চাপিয়া না বসে এই তপস্যায় তারা আজও নিবৃত্ত হয় নাই।

এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আয়ও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। সেখানে যদি কোনো জাতি দেশহিত বা লোকহিত ব্রত গ্রহণ করে তবে তার বাধা নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ আপনাদের ইতিহাসকে আপনাদের শক্তিতেই গড়িয়া তুলিতেছে, বাহিরের ঠেলা বা বিধাতার মারকে তারা শিরোধার্য করিয়া লইতেছে না। পুঁথি তাহাদের বুদ্ধিকে চাপা দিবার যত চেষ্টা করে তারা ততই তাহা কাটিয়া বাহির হইতে চায়। জ্ঞান ধর্ম ও শক্তিকে কেবলই স্বাধীন অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী করিবার প্রয়াসই তাদের ইতিহাস।

আর পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাঁধনের পর বাঁধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যতবারই মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় ততবারই নূতন শৃঙ্খলকে সৃষ্টি করা বা পুরাতন শৃঙ্খলকে আঁটিয়া দেওয়াই তার জাতীয় সাধনা। আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। নীতিধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কৃত্রিম ও সংকীর্ণ বাঁধন কাটিবার জন্য যেই একবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠি অমনি আমাদের অভিভাবক আমাদের বাপদাদার আফিমের কৌটা হইতে আফিমের বড়ি বাহির করিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দেয়, তার পরে আবার সনাতন স্বপ্নের পালা।

যাই হোক, ঘরের মধ্যে বাঁধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র-বাঁধন-দেবতাদের পূজা যথাসর্বস্ব দিয়া জোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলই নরবলি দিয়া আসিতেছি। এমন অবস্থায় দেশহিত সম্বন্ধে আমাদের কৃপণতাকে পশ্চিম দেশের আদর্শ-অনুসারে বিচার করিবার সময় আসে নাই। সর্বদেশের সঙ্গে অবাধ যোগবশত দেশে একটা আর্থিক পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং সেই যোগবশতই আমাদের আইডিয়ালেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। যতদিন পর্যন্ত এই পরিবর্তন পরিণতি লাভ করিয়া সমস্ত সমাজকে আপন মাপে গড়িয়া না লয় ততদিন দোটানায় পড়িয়া পদে পদে আমাদিগকে নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে হইবে। ততদিন এমন কথা প্রায়ই শুনিতে হইবে, আমরা মুখে বলি এক, কাজে করি আর, আমাদের যত-কিছু ত্যাগ সে কেবল বক্তৃতায় বচনত্যাগ। কিন্তু আমরা যে স্বভাবতই ত্যাগে কৃপণ এত বড়ো কলঙ্ক আমাদের প্রতি আরোপ করিবার বেলায় এই কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এই বৃহৎ দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রায় প্রত্যহ যে দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে জগতে কোথাও তার তুলনা নাই।

নূতন আদর্শ লইয়া আমরা যে কী পর্যন্ত টানাটানিতে পড়িয়াছি তার একটা প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন। গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে, হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্তমান কালের আদর্শ আমাদের যে-সব যুবকদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে তারা দেখিতে পাই সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দায়িত্ববন্ধন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া যারা মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে চলিয়াছে কোন্ পথে ? তারা দুঃখের সমুদ্রকে ব্লটিং কাগজ দিয়া শুষিয়া লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল 'সেবা' কথাটাকে খুব বড়ো অক্ষরে লিখিতেছি ও সেবকের তকমাটাকে খুব উজ্জ্বল করিয়া গিলটি করিলাম।

কিন্তু ফুটা কলস ক্রমাগতই কত ভরতি করিব ? কেবলমাত্র সেবা করিয়া চাঁদা দিয়া দেশের দুঃখ দূ

হইবে কেমন করিয়া ? দেশে বর্তমান দারিদ্র্যের মূল কোথায়, কোথায় এমন ছিদ্র যেখান দিয়া সমস্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায় সেই নিরুদ্যমের বিষ যাতে আমরা কোনোমতেই আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিতে উৎসাহ পাই না সেটা ভাবিয়া দেখা এবং সেইখানে প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।

অনেকে মনে করেন দারিদ্র্য জিনিসটা কোনো-একটা ব্যবস্থার দোষে বা অভাবে ঘটে। কেহ বলেন যৌথ কারবার চলিলে দেশে টাকা আপনিই গড়াইয়া আসিবে, কেহ বলেন ব্যবসায়ে সমবায়-প্রণালীই দেশে দুঃখ-নিবারণের একমাত্র উপায়। যেন এইরকমের কোনো-না-কোনো একটা প্যাঁচা আছে যা লক্ষ্মীকে আপনিই উড়াইয়া আনে।

য়ুরোপে আমাদের নজির আছে। সেখানে ধনী কেমন করিয়া ধনী হইল, নির্ধন কেমন করিয়া নির্ধনতার সঙ্গে দল বাঁধিয়া লড়াই করিতেছে সে আমরা জানি। সেই উপায়গুলিই যে আমাদেরও উপায় এই কথাটা সহজেই মনে আসে।

কিন্তু আসল কথাটাই আমরা ভুলি। ঐশ্বর্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে। হাতটা যদি তৈরি হয় তবে হাতিয়ারটা জোগানো শক্ত হয় না। যারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া মিলিতে পারে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যেও মেলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনের কাজেও মেলে। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে তাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে, যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না, কতকগুলো নিয়মকে চোখ বুজিয়া মানিয়া যাইতে হয় তারা কোনোদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনায় মিলিতে পারে না। যেখানে তাদের বাপদাদার শাসন নাই সেখানে তারা কেবলই ভুল করে, অন্যায় করে, বিবাদ করে— সেখানে তাদের ঈর্ষা, তাদের লোভ, তাদের অবিবেচনা। তাদের নিষ্ঠা পিতামহের প্রতি ; উদ্দেশ্যের প্রতি নয়। কেননা চিরদিন যারা মুক্ত তারা উদ্দেশ্যকে মানে, যারা মুক্ত নয় তারা অভ্যাসকে মানে।

এই কারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড়োরকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব। আমরা নদীতে গ্রামের ঘাটে ঘাটে যে নৌকা বাহিয়া এতদিন আরামে কাটাইয়া দিলাম, এখন সেই নৌকা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আজ এই নৌকাটাই আমাদের পরম বিপদ।

নৌকাটা যেখানে ঢেউয়ের ঘায়ে সর্বদাই টলমল করিতেছে সেখানে আমাদের স্বভাবের ভীরুতা ঘুচিবে কেমন করিয়া ? প্রতি কথায় প্রতি হাওয়ায় যে আমাদের বুক দুরদুর করিয়া ওঠে। আমরা নূতন নূতন পথে নূতন নূতন পরীক্ষায় চলিব কোন্ ভরসায় ?

সকলের চেয়ে সর্বনাশ এই যে, এই বহুযুগসঞ্চিত ভীরুতা আমাদিগকে মুক্তভাবে চিন্তা করিতে দিতেছে না। এই কথাই বলিতেছে তোমাদের বাপদাদা চিন্তা করেন নাই, মানিয়া চলিয়াছেন, দোহাই তোমাদের, তোমরাও চিন্তা করিয়ো না, মানিয়া চলো।

তার পরে সেই মানিয়া চলিতে চলিতে দুঃখে দারিদ্র্যে অজ্ঞানে অস্বাস্থ্যে যখন ঘর বোঝাই হইয়া উঠিল তখন সেবাধর্মই প্রচার কর আর চাঁদার খাতাই বাহির কর মরণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।

১৩২২

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসংকর দেখ দেয়— জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনা পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্মরাজ্যে এ-সমস্ত বিপর্যয় টেকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া তপস্যার আগু জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনো বা সে নিশ্বাস ধার করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না ; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবি কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে— মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তো নাই। দিগ্‌বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয় বসে। তমালতালীবনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁক তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এ দিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তর বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্‌ব পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়ি কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনের চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই য ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোম করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে ; আর ঘরে ঘ নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্‌যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর-একজন গ্রীষ্মে তল্পি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাত। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানে সৌন্দর্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সম আভরণ তাহারই। তাই তো শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কলকা, বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খা ফুলকাটা। ইহারা যে-পাদুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রঙ-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার ; ইহাদে অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহা জোড় মিলাইবার জন্য। তাহারা জানে না বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে দুই দি ভাগ করো— ৩৬ পর্যন্ত বেশ মেলে কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোট্ট পাঁচটি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এইজন্য কোথা হইতে একটা তি আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যতরকম সংগীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-শয়তান এই কাজ করিবার জন্যই আছে— সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না ; সেই যে নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়— সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভা তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমা বেশি। সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ঐ বৈশ্য। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সংবৎসরের প্রধান বিভা শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কি ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এইজন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এ অংশেই বাল্য যৌবন বার্ধক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহ

চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ-হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিস একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দি তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এইজন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল; ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল— বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা। ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণ গ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদ গ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না; গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারই সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই; কেননা বর্ষা ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে কোনো দিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল-ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে ঘাটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার-ভাণ্ডারের উদ্‌বৃত্ত।

এইজন্য বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার নাই; ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে; কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষা-ঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূল। এইজন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য কাজ-কর্মের আপিসে বা লাভ-লোকসানের বাজারে সে আপনার পালকির বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দানশিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না। বাদলার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত হইতে কৈলাস পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী-বিরহিণীর পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবি লইয়া সম্মুখে আসে। এ দিক-ও দিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাব্লিক ওআর্কস ডিপার্টমেন্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবি। সরকারি হিসাবপরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামকা এতবড়ো আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না— এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারও কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ-সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এইজন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর ভিড়

জমায়। বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবি করে ; সেইজন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একা সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সংগীতে তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে তাহা দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে তাহার গাম্ভীর্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋ ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি— কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড় ছিল। ঋতুগুলি তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতু অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা-না-একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কার তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেনন সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুর জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব— কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তে জন্য আছে বসন্ত আর বাহার— আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরো বিস্তর। সংগীতের পাড়া ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে হেমন্তে ভরা-মাঠ ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে ; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন ? তাহার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়ি বসে। বাস্তবের সভায় সংগীত মুজরা দিতে আসে না— যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলা করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনি নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডকে ঘেরিয়া বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সম লাবণ্য ঐ বায়ুমণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারী, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায় কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞ লোকের অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে ? পৃথিবী সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ঐ শূন্যে— যেখানে তাহার অপরিচ্ছি অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারি দিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙে খেয়াল ভাসিতেছে ; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে ; সেইখানেই ঝড়বৃ সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখি চায়— তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে কিন্তু বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষা সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না— কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষে আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ ; সেইজন্যে উহার মধ্যে এ রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শ নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত— সুর দিত না। কি বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারি দিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ুমণ্ডল আছে। তাহা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি— তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদে পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই-সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশবিহারী কবিদে কারবার। এই অবকাশের বায়ুমণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রঙ ফলাইবার সুযোগ— এই ফাঁকটাতে

ছন্দগুলি নানা ভঙ্গিতে হিল্লোলিত হয়।

এই-সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার ; এইজন্য অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য— একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য— বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারি দিকে অবকাশ চাই। এইজন্য হৃদয় অবকাশ দাবি করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেকদিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু অংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ— পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরেজিতে যতিকে বলে pause— কিন্তু pause শব্দে একটা অভাব সূচনা করে, যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে— কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না, নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইশারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনায় কেবলই যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণুপরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র— আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগসাধন হইতেছে— অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদমহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত-কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে— বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহাঅবকাশ— যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তুবাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই ; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই-সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-লোকেরা 'আষাঢ়ে' বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর মাসটি সকল কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে কথার পণ্য। অন্যায় মনে করে না। সকল কাজের বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এসো এসো জগতের যত অকর্মণ্য, এসো এসো ভাবের ভাবুক, রসের রসিক— আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এসো সমস্ত খ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহবেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এসো গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের

আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে— জাতীপুষ্পসুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল— কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা!

১৩২১

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ও দিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে; এখনো সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, 'তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির হওয়া! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্য শোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।'

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচিগায়ের গন্ধের মতো। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রঙ দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রঙ, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রঙ আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হলদে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রঙ নয়; তা কোমলতার রঙ। সেই রঙ দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রঙ ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই, সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রঙ-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরো-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রঙই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রঙ থাকে না।

শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই-হাসি, এই-কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকাভাবে আসে এবং যায় যে কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না, জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসি-কান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিসটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে— তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া-আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়াজলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে, বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশপ্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর-এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সে দিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ 'ড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলখেতের ঋতু। এই ফসলের খেত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি-দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো— ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়— বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই ; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই-সব ছোটোদের এই-সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নীচে হা হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবি-দাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ, তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্তমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখচুম্বন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই ; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া— তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই ; হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়— সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, 'বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!'— তিনি বলিতেছেন, 'ফাল্গুনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রসব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন-সভায় তোমার ঝ'ড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারই মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ!'

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়— তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, 'তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধুয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর ; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।'

১৩২২

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে ; তখন পরমাণুতত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল ; ও দিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মতো মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগবখরা লইয়া শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে, অ্যাটর্নি তার দিন গনিতেছেন ; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন এক বিপর্যয় লাফ মারিল যে পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনো এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

> কতকাল পরে পদচারি করে
> দুখসাগর সাঁতরি পার হবে ?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল আজও সেই একই গান— মেঘমল্লার-রাগেন, যতিতালাভ্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নীচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নীচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল ; বর্ষাও নামিয়াছে ট্র্যামলাইনের মেরামতও শুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্র্যামওয়ালাদের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন কাটার সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেকদিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন ?

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গি অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই শহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাতটা এই— আমাদের সয় ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গি রাস্তার পনেরো-আনার হিস্‌সা ট্র্যামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত আজ তবে ট্র্যাম কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, 'সে কী কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্র্যামের রাস্তা মেরামত হইবে না ?'

'হইবে বৈকি! কিন্তু এমন আশ্চর্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।'

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, 'সে কি সম্ভব ?'

যা হইতেছে তার চেয়ে আরো ভালো হইতে পারে এই ভরসা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ

চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমর সর্বাঙ্গে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাতরার মতো সেটাকে দেশের চার দিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোনো কর্তৃত্ব আছে এটা আমর কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে ; সে অনেক মাথা খুঁড়িয় অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাঁচ নয় ; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ঐ মাথা ঠুকিবার ভয়টা আমাদের হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমনু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাট নয় ; তার পর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন-কি, পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই ঠাহর হয় না, এমন-কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এইজন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের 'পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, 'তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।'

আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে নাহয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরো কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর-গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর-এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই স্টিমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, কখনো জমিদার কখনো-বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়ে পার্লামেন্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়র্লন্ড-আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ দেওয়া যায় ; ভারতবিভাগের ফর্দটাও নেহাত ছোটো নয়— কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্যাতন উপলক্ষে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই তো হাত দেখা যায়। এ-সকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ কথায় কারও মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্তে

ঘাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড়ো কথা আমাদের বলিবার আছে— সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটো ছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব— দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি নাছোড়বান্দা হইয়া কোনো একগুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সে দিক হইতে সে ইন্‌টার্নড্ হইতে পারে কিন্তু এ দিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি 'তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য করিবার জন্যই আমাদের নতশিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড়ো অপমানের কথা আমরা মানিব না,' তবে চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্তা তখনই সামাজিক ইন্‌টার্নমেন্ট-এর হুকুম জারি করেন। যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝট্‌পট্ করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিৎপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গির তফাত। চিৎপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিৎ হইয়া রহিল। চৌরঙ্গি বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত দুটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গি এই কথা মানে বলিয়াই জগৎটাকে হাত করিয়াছে, আর চিৎপুর তাহা মানে না বলিয়াই জগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুর তারা উল্টাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘরগড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ সমৃদ্ধিলাভ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ— এই নিশ্চিত বোধটাই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত। ব্যক্তিবিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে— এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এতবড়ো মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উলটাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি— কর্তার ইচ্ছা কর্ম। সেই কর্তাটিকে— ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু— প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজি পাঠক বলিবেন— আমরা তো এ-সব মানি না। আমরা তো বসন্তর টিকা লই; ওলাউঠা হইলে নুনের জলের পিচকিরি লইবার আয়োজন করি; এমন-কি মশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজও আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোনোটাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ঐ মানার বিষে আমাদের মনের

ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলই বলে, কী জানি কাজ কী। ভয় জিনিসটাই এইরকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনো-একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্মকেই ভুলিয়া যায়— যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায়রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেস্টিজরক্ষাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে— এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আন্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেই তো বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিংবা ছোটো লোভ, কিংবা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোটো চাতুরী। আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্মটাকে বিসর্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাস করি, 'কর্তার ইচ্ছা কর্ম' এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলই ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে দশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক-হাত ঘেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কী গুণ রুটিরই বা কী, ম্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কী আর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া জলেরই বা কী, কর্তার ইচ্ছার উপর বরাত দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মতো সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানি পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বাল্‌তিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য আর পানি মিঞা ফিলটার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা তো তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা তো কর্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসংকার নয়, অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবরদস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়াছোঁওয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সংকোচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন হইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে। চাঁদ সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ তাই যে-দেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদুঃখে তারই শক্তির কাছে তাকে হার মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায়ধর্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র যতই যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ংকর, ততই তার কাছে নতিস্তুতি। বিশ্বকর্তৃত্বের এই ধারণার সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকাতেই তার খবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেবচরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয়, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে

জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এতবড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে, ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে ; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে। নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এতবড়ো সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কী পরমাশ্চর্য ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এ দিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল ; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এ দেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে ; বিষয়বিভাগের মতো উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্মে কর্মে আচারে বিচারে যত সংকীর্ণতা যত স্থূলতা যত মূঢ়তাই থাক্‌ উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন-কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, 'যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে,' অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ও দিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, 'যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবানাপিত বন্ধ,' আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধুলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, 'বাবা বাঁচিয়া থাকো।' এইজন্যই এ দেশে কর্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার।

য়ুরোপে ঠিক ইহার উলটা। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে-কোনো খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়— তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে-য়ুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন হোক— উপর হইতে যেমন-খুশি নিয়ম হানিবে আর আমরা বিনা খুশিতে সে-নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া ওঠে, ওটাকে এমন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হোক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনায় আমরা যে যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্মে— না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্তাভজা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্তত একটা ফাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে, এটাও শুভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে আত্মাভিমানে আমাদের

শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মতো বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক্ ! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, 'খবরদার, ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমন-কি, ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না'— ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওপড়াও ঐ বেতবনটাকে।" ভুলিয়া গেছে বেতবনটা গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই বাঁশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই। অপরাধটা এই যে সত্যের জায়গায় আমরা কর্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো ঝোপে-ঝাড়ে বেতবন আমাদের জন্য অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন একসময়ে য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড়ো সুযোগ ছিল। কেননা য়ুরোপীয় ধর্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলন্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলন্ডে আজও তার কোনো চিহ্ন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু বড়োঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। একসময়ে যাদের কাছে সে নথ-নাড়া দিয়াছে, ন্যায়ে অন্যায়ে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোশের জন্য সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্বদস্তুরমতো বুড়িকে হপ্তায় হপ্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্য করে না। এই গৃহিণীর দাবরাব যদি পূর্বের মতো থাকিত তবে ছেলেমেয়েদের কারও আজ টুঁশব্দ করিবার জো থাকিত না।

ইংলন্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে কিন্তু স্পেন এখনো সম্পূর্ণ কাটায় নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে ঘাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বুড়ি বসিয়া ছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে একটা দৌড় দিল তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কী ? তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেকদিন আগেই সেদিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা যায় যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সেদিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাঁধা তার নৌযুদ্ধ-বিদ্যাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জলহাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বাঁধি নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি, তার কৌলীন্য যেমনি থাক্, সে ইংরেজ-যুদ্ধজাহাজের সর্দার হইতে পারিত কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারও অধিকার ছিল না।

আজ য়ুরোপের ছোটোবড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা নাই— যেমন রাশিয়ায়— সেখানকার সমাজ বেওয়ারিস ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালের পুঁথি পর্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অন্যায় খাজনা আদায় করে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধু ধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু

ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতবড়ো অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কালেজে পাস-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন, 'আপনার মুখে পান!' গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই 'সারথি যেই হোক মুখের পান ফেলা যায় কেন?' ধর্মবুদ্ধিতে বা কর্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জন করিতে প্রস্তুত সে দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টিসংকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এ দেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেইভাবেই দেখেন একজন আর্টিস্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে, তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশির ভাগ স্ত্রীলোক। স্টীমারের ঘাটে ঘাটে, রেলওয়ের স্টেশনে স্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানত-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে-সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অন্তরায়কে আকাশপরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কানা-বুদ্ধি কিংবা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড়ো যে-সম্পদ দিয়াছেন— ত্যাগ-স্বীকারের বীরত্ব— এই কষ্ট তারই বেহিসাবি বাজে খরচ। আজ তারই নিকাশ আমাদের চলিতেছে— ইহার ঋণের ফর্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়েপুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই তো ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্বনেশে। যে অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না— কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা, না আছে চরিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তবু তো সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না

মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিংবা নিজের জন্য করিত। সে কথা ঠিক, কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে কিংবা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধর্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না, এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অনুগত দাসের মতো যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এইজন্যই আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর উদ্ধার নাই— এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন লাগিল ; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই ; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া 'হায় হায়' করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, 'নিজের মজুরি' দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব।' তারা ভাবিল, পুণ্য হইবে ঐ সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরি জোগাইব আমরা, এটা ফাঁকি। সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিয়ন্ত্রণ।

এই যে অটল দুর্দশা, এর কারণ, গ্রামের যা-কিছু পূর্তকার্য তা এ পর্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাত হয় বিধাতার 'পরে, নয় কোনো আগন্তুকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনো সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্মকর্ম ভালোমন্দ শোওয়াবসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন-কি, কালেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইঁহাদের ভারি গর্ব ; বলেন, ওটা বড়ো উচ্চজায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না ; বলেন, ঐ কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ ; যমলোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচারবুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, 'ঐ অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই ? আমরাও সায়াল শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।' অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর ষোলো-আনা ঝোঁক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক হইলেই এত দুর্জয় কানমলা, সমস্ত গুরুপুরোহিত তাগাতাবিজ সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হোক, পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হোক বলিয়াই যখন আশীর্বাদ করা হইল তখন দয়ালু লোক এ কথাও বলিতে বাধ্য যে, মানুষদের কাঁধে করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও। যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করাইয়া আমাদের গৌরবের কথা হয় তবে সেইসঙ্গে এ কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্তু দুই বিপরীত কূলকে একসঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্তের ঘড়াঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না।

অনেকে বলেন, এ দেশে পদে পদে এত দুঃখদারিদ্র্য, তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বুকে শেল হানিয়াছে, এ কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারি বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগজামিন পাস করি। এ কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কন্‌গ্রেস বল, লীগ বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন য়ুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ-রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশোজন ইংরেজ বলিতে পারে, ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভালো, কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশো ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, 'এসো তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ করো।' তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজারজন ইংরেজ রাজসভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে যে, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, 'এসো তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক্ ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ করো।'

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না, এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধর্মে কর্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল— যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই ; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই, অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্য বোধ করি মনে মনে আপসোস করেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের দুটো-একটা জানলাদরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি, কিন্তু তবু এ কথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতোই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত— এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহা, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্য আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই— হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিংবা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মর্লি সাহেব ভারতসচিব হইলে হয়তো আমাদের সুদিন হইবে; নয়তো আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্যে, হয় আমাদের মাটির তলার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে ; হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না ; এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজরাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড়ো সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব ; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহংকার সমস্তরই লীলা চলিতেছে ; কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্র লোভে লুব্ধ, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়ো, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয় ; সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই. বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভিতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজগবর্মেন্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুই পক্ষ

লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্বলতার যোগে চরম দুর্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনই জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্তটা তখনই গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্বলের পক্ষে যতবড়ো শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড়ো শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা প্রায়ই বল, পুলিস তোমাদের 'পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমরা তো তার প্রমাণ দাও না।' বলা বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি করো, এ কথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই তো গায়ের জোরে নয়, সে তো তেজের লড়াই, সে তেজ কর্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য একদল লোকের তো বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেন্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালত-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারি স্টীমার, আর গরিব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, 'বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর।' এর পরে আর হাত-পা চলে না। প্রেস্টিজ! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ঐ তো কর্তা, ঐ তো আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঐ তো বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে। অতএব—

যা দেবী রাজ্যশাসনে
  প্রেস্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
  নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই তো অবিদ্যা, ইহাই তো মায়া। যেটা স্থূলচোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য, আমাকে লইয়াই গবর্মেন্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়ো। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী— সেই বল আমারও বল। ইংরেজগবর্মেন্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেস্টিজ দেবতা নরবলি দাবি করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ কথার উত্তরে শুনিব 'রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিকভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম-পন্থা— নয়তো প্রেস অ্যাক্টের মুখ-থাবার নীচে পরম-নিঃশব্দে নরম-পন্থা।'

'হাঁ, বিপদ আছে বৈকি, তবু জ্ঞানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।'

'কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে কিংবা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, বিরুদ্ধেই দিবে।'

'এ কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।'

'কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই প্রশংসা কিংবা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।'

'এ কথাও ঠিক। তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।'

'এতটা কি আশা করা যায়?'

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়। গবর্মেন্টের কাছ হইতেও আমরা বড়ো দাবিই করিব কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরো বড়ো দাবি করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবি টিকিবে না। এ কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্বল; কিন্তু সকল বড়ো দেশেই প্রত্যেকদিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যাঁরা সকল মানুষের প্রতিনিধি— যাঁরা সকলের দুঃখকে

আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যাঁরা সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্বপ্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন—

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'

অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতত্ত্বে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার— ভীতিকে নয়। ধর্ম আছে, অতএব মরা পর্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে করো ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড়ো কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মন্ত্র পড়িয়া মারিয়াধরিয়া ভূতের ওঝার মতো বিষম ঝাড়াঝুড়ি শুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব, 'দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।' তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, 'তুমি কে হে! আমি ডাক্তার যাই করি-না তাই ডাক্তারি।' ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাঁকে আমার এ কথা বলিবার অধিকার আছে 'যে ডাক্তারি-তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য।'

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড়ো জোর ঐ ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন-কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে— কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়িতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়ো। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে নিজেকে তার চেয়ে বেশি মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা নয় কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সায় না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়শো বছর ভারতে ইংরেজ শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেন্ট ভালোমন্দ যাই করুক. বাংলাদেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এতদিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্ব পারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? এ কথা কি নিশ্চয় জানি না যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস— এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো দলিল করিয়া চলিব, এ কথা তাকে কখনোই বলিতে দিব না যে, ভারতবর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া মাছকাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড়ো সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ শাসনের বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুই পক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে— 'জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে

একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।' এ কথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালির ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আগুনে কাৎলি চড়ানো হইতে শুরু করিয়া স্টীম-এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল জাপানে তাহা শিকড়সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও— সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে দু-পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক্ করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড়ো আশা টিকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্ত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেইসঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে— সে-সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না। যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই-সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে বীভৎসতা তো থাকিতই, আবার সেই পাপে স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে সে কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই এ কাজের কথা নয়। যে দিকের যে সলতে দিয়াই হোক আলো জ্বালাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জ্বালাইয়া উঠিতে পারে নাই— তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গেছে— তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদিগকে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিষেধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী যজমানকেই দেখিলে গদ্‌গদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা-অস্ট্রেলিয়ার নামে সে স্টেশন পর্যন্ত ছুটিয়া যায়— আর গরিবের বেলায় তার ব্যবহার উলটা— এটা তো সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জারূপে অন্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধরূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উঁহাদের মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম কখনোই চিরদিন ধারকরা বাধ্যর্কের মুখোশ পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ-ইতিহাসবৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মতো মানুষ চাই যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্কার সহিতে প্রস্তুত। যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি ; শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন। ওরে অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহংকার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহংকার কেবল আপনগৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু, সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে ; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে ; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নবনব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুজয়ী, যে চিরজাগরূক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় ? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি— সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এসো প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও। আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর, তুমি তাহারই প্রভু— ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে। দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চিরনির্বাসন গ্রহণ করুক।

১৩২৪

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনের পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল।

বিশ্বভারতী-প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ড বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বিচিত্রিতা

বিচিত্রিতা ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত একত্রিশখানি চিত্র অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের একত্রিশটি কবিতা রচিত। গ্রন্থে কবিতার সহিত চিত্রগুলিও মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে চিত্রগুলি সন্নিবিষ্ট করা সম্ভবপর হয় নাই। চিত্র ও চিত্রকর -সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

চিত্র	শিল্পী
পুষ্প	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বধূ	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অচেনা	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পসারিনী	নন্দলাল বসু
গোয়ালিনী	গৌরী দেবী
কুমার	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আরশি	সুরেন্দ্রনাথ কর
দান	সুনয়নী দেবী
হার	সুরেন্দ্রনাথ কর
মরীচিকা	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্যামলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
একাকিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাজ	সুরেন্দ্রনাথ কর
প্রকাশিতা	নিশিকান্ত রায়চৌধুরী
বরবধূ	রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ছায়াসঙ্গিনী	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রভেদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পুষ্পচয়িনী	ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার
ভীরু	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যুগল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেসুর	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্যাকরা	নন্দলাল বসু
নীহারিকা	প্রতিমা দেবী
কালো ঘোড়া	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনাগতা	মনীষী দে

চিত্র	শিল্পী
ঝাঁকড়াচুল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিধা	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যাত্রা	রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দ্বারে	সুরেন্দ্রনাথ কর
কন্যাবিদায়	নন্দলাল বসু
বিদায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বিচিত্রিতার বর্তমান সংস্করণে অধিকাংশ কবিতার রচনাকাল দেওয়া গেল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠ সংশোধিত হইল।

১৩৩৯ বৈশাখের 'প্রবাসী'তে "কুমার" কবিতার কেবলমাত্র প্রথম সাতটি ও শেষ স্তবকটি একত্রে "কুমার" নামে মুদ্রিত হয় এবং তৎপূর্বে ১৩৩৮ পৌষের 'বিচিত্রা'য় নিম্নমুদ্রিত স্তবকটি এবং উহার অনুবর্তনস্বরূপ বর্তমান কবিতার অষ্টম নবম ও দশম স্তবক কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে "নির্ভীক" নামে প্রকাশিত হয় :

নবজাগরণ-চঞ্চল তব পাখা
নিভৃত নীড়ের কোণে সে কি র'বে ঢাকা।
নিয়ে যাবে তার ওড়ার আবেগ সে যে,
বাতাসে উঠিবে হুংকার তার বেজে,
দিবে সে ঝলকি প্রভাতরবির তেজে
পালখে পালখে যে-বর্ণ তার আঁকা।

'বিচিত্রা' এবং 'বিচিত্রিতা' মিলাইয়া দেখিলে অন্য কতকগুলি পাঠভেদও লক্ষ্য করা যায় ; বিচিত্রায় মুদ্রিত অংশের রচনাকাল পাণ্ডুলিপি-অনুসারে— ১৬ কার্তিক ১৩৩৮।

"ছায়াসঙ্গিনী" কবিতাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে "ছায়া" নামে ১৩৩৮ ফাল্গুনের বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। উহার সূচনা ছিল এরূপ :

জীবনের প্রথম ফাল্গুনী
অকস্মাৎ এসেছিল, তুমি তারি পদধ্বনি শুনি
কম্পিত কৌতুকী
যেমনি খুলিয়া দ্বার দিলে উঁকি,
আম্রমঞ্জরীর গন্ধে ভরি গেল ঘর—
নিকুঞ্জের হিল্লোলমর্মর,
মিলে গেল তারি সাথে হৃদয়স্পন্দন।
প্রকাশক্রন্দন
নবোন্মুখ অশোকপল্লবে,
উৎসুক যৌবন তব রাঙাইল রক্তিম উৎসবে।

এ ক্ষেত্রেও কতকগুলি পাঠান্তর ছিল ; ২৪ পঙ্‌ক্তির পরে দুইটি নূতন ছত্র ছিল :

কালো চক্ষে ঘনাইল আপনা-বিস্মৃত সেই তারি
স্তিমিত স্তম্ভিত অশ্রুবারি।

"পুষ্প" কবিতার পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নাঙ্কিত দ্বিতীয় স্তবক নিম্নে মুদ্রিত হইল :

সুর তার গন্ধপথে তব চিত্ত করিছে সন্ধান,
শুনেছে কি কান।
তোমার চোখের পানে চেয়ে
নীরবে উঠেছে ফুল গেয়ে
কবির মতন স্তবগান।

ঐ কবিতার ষষ্ঠ স্তবকে প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্তমান পাঠের উপর পাণ্ডুলিপিতে এক জায়গায় কবিকৃত পরিবর্তন আছে : দেখেছি তোমার দেহে সে আদিম ছন্দ অনাবিল।

"শ্যামলা" কবিতার প্রথম স্তবকের অনুবৃত্তিস্বরূপ পাণ্ডুলিপিতে নিম্নমুদ্রিত পঙ্‌ক্তি কয়টি আছে :

করুণ কোমল তুমি, দৃঢ়ব্রত তবু,
ক্ষমা কর, প্রশ্রয় না দাও কভু
নিজেরে বা কাহারেও আর।
তোমার বিচার
ভয় করে সবে,
ব্যথিত ভর্ৎসনা তব নিভৃতে নীরবে।

পাণ্ডুলিপিতে "পুষ্পচয়িনী" কবিতার প্রথম চার পঙ্‌ক্তির পূর্বপাঠ ছিল :

ওগো পুষ্পলাবী
তুমি আসিয়াছ নাবি
পুরাতন শ্লোক হতে মালিনী
ছন্দের বন্ধ টুটে।

২৯ পৃষ্ঠার ১২ ছত্রের পর পাণ্ডুলিপিতে দুইটি নূতন পঙ্‌ক্তি আছে :

ওগো পুষ্পলাবী, তুমি যে-ফুল তুলিছ রাত্রি জাগি
সে যে কোন্ জন্মান্তরসৌহৃদের লাগি।

"বেসুর" কবিতাটির প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পাঠান্তর :

বিধির কাছে নালিশ করে, পায় না কিছুই জবাব—
ফুলদানিতে উঠল চাঁপা, টুটল যে তার স্বভাব।

"স্যাকরা" কবিতার পূর্বপাঠে সর্বশেষে এই দুইটি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি ছিল :

দেবতা যখন প্রসন্ন হন পূজার ফুলে,
সে ফুল তখন বিশ্বের জন নিক্-না তুলে।

"বেসুর" ও "দ্বারে" কবিতার পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত অনেকাংশে-পৃথক প্রথম (?) পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

অসংগতি (বেসুর)

একটা কোথাও ভুল হয়েছে ভাবছে মনে তাই
প্রাণের সুরে সুর মেলে না, বাইরে যেথায় চাই।
কোথায় ত্রুটি ঘটল কিসে আপনিও তা বোঝে নি সে
এটাই কি তার অভাব যে তার অভাব কিছু নাই।

আকাশকে কি নিরোধ করে আয়োজনের মোহ—
প্রাণের আরাম সরিয়ে দিল মানের সমারোহ ?
যা চাই তাহার অনেক বেশি ভিড় করেছে ঘেঁষাঘেঁষি—
চারি দিকের বিরুদ্ধে তার তাই কি এ বিদ্রোহ ?[১]

যখন কোনো লোক থাকে না, একলা ছাদের 'পরে
দূরের পানে চেয়ে চেয়ে মন যে কেমন করে।
নাম-না-জানা কিসের লাগি ধেয়ান তাহার হয় বিবাগী
কোন্ অকারণ বিচ্ছেদে তার নয়নে জল ভরে।[১]

আপন-ধারা যে স্রোত নিয়ে মিলত সবার সাথে
সেটাই কি কেউ ফিরিয়ে দিল আর-কোনো এক খাতে ?
আত্মদানের রুদ্ধবাণী বক্ষকপাট বেড়ায় হানি,
সঞ্চিত তার সুধা কি তাই ভরল বেদনাতে ?[১]

আপনি যেন আর কেহ সে, এই লাগে তার মনে—
চেনা ঘরের অচল ভিতে কাটায় নির্বাসনে।
বসন ভূষণ অঙ্গরাগে ছদ্মবেশের মতন লাগে,
তার আপনার ভাষা তারে কয় না আপন জনে।

সব চেয়ে যা সহজ তাহাই দুর্লভ তার কাছে—
সেই সহজের ছবি যে তার মনের মধ্যে আছে।
নীল গগনে শ্যামল বনে, ছুটি-পাওয়া আপন মনে
কলকথায় বিজন সাথীর সহজ আলাপ যাচে।[১]

সেইখানে তার ভুবনখানির মাটির ঘরে বাসা,
দিঘির আলোছায়ার মতো সরল কাঁদা হাসা।
সেইখানে তো হেসে খেলে সবাইকে তার কাছেই মেলে,
আপ্‌নি হওয়ার বেশি তারে কেউ করে না আশা।[১]

আজ তারে যে আপন হতে পর করেছে কা'রা,
কোন্ বিদেশীর মতো ওগো হল কেমন ধারা।
পরের খুশি দিয়ে সে যে তৈরি হল ঘষে-মেজে,
আপ্‌নাকে তাই খুঁজে বেড়ায় হায় সে আপন-হারা।

খড়্‌দা
২ মাঘ ১৩৩৮

[দ্বারে]

একা আছ নির্জন প্রভাতে,
দ্বার রুদ্ধ তোমার পশ্চাতে।
সেথা হল অবসান বসন্তের সব দান,
উৎসবের সব বাতি নিবে গেল রাতে।

১ এই স্তবকগুলি পাণ্ডুলিপিতে বর্জনচিহ্নাঙ্কিত।

সেতারের তার হল চুপ,
ছাই হয়ে গেল গন্ধধূপ।
কবরীর ফুলগুলা ধুলায় হইল ধুলা,
লজ্জিত সকল লজ্জা বিরস বিরূপ।

সম্মুখেতে শুভ্র বর্ণহীন
তোমার রজনী, তব দিন।
সম্মুখে আকাশ খোলা নিস্তব্ধ সকল-ভোলা,
মত্ততার কলরব দিগন্তে বিলীন।

আভরণহীন তব বেশ,
মালাহীন তব রুক্ষ কেশ।
শরতের আলো লেগে অমলিন দীপ্তি মেঘে,
তেমনি বিষাদে শুভ্র স্মৃতি-অবশেষ।

তবু কেন হয় যেন বোধ
কে তব করেছে পথরোধ।
ছুটি পেলে যার কাছে কিছু তার প্রাপ্য আছে,
সব কি হয় নি পরিশোধ।

সূক্ষ্মতম এই আচ্ছাদন
অশ্রুহারা মর্মের কাঁদন।
বাক্যহীন যেই মানা স্পষ্ট নাহি যায় জানা
কঠিন যে তাহার বাঁধন।

যদিও কেটেছে ঘুমঘোর,
পাখায় লাগে নি তবু জোর।
সুদূরে ডাক আসে অবারিত নীলাকাশে,
কোথা বাঁধা বারণের ডোর।

মুক্তিবন্ধনের সীমানায়
কিছুকাল দিন তব যায়।
রুদ্ধ দুয়ারের ছায়া শেষ করে তার মায়া,
তার পরে মন ছুটি পায়।

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তক ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শেষ সপ্তকের ১৫-সংখ্যক কবিতাবলীর সহিত পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থে প্রকাশিত রানী মহলানবিশকে লিখিত ২৬ ও ২৭ -সংখ্যক পত্র তুলনীয়; এই কবিতাগুলিকে ঐ চিঠি দুটিরই কাব্যরূপ বলা যাইতে পারে।

পথে ও পথের প্রান্তে ২৬ ।। তুলনীয় শেষ সপ্তক ১৫।১

আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সে কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোটো ঘর। এইরকম ছোটো ঘর আমি ভালোবাসি, তার কারণ তোমাকে বলি। ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড্ড বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোটো ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে টেবিল আছে চৌকি আছে ; সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত করে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাই নে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে ; পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে। দেয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানলার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া ; সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে—বেশ লাগছে। চেয়ে দেখি যতদূর দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই আমার ডেস্কের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতে দেরি হয় না। জানলার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি, দূর বলে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার স্থূল হস্ত নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না। সুন্দর আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দূর পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তা হলে আমাদের ছুটি নেই, তা হলে সমস্ত অসুন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট তাদের জীবনে নিকট আছে, দূর নেই। কেননা স্বার্থ জিনিসটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিস, তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালোবাসে, কেননা, দেয়াল আমারই, আর কারও নয়। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে, যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালোবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায়। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাসি, তাতে এমন মগ্ন হতে পারি। সেইসঙ্গে আজকাল আমার বিদ্যালয়ের কাজ যোগ দিয়েছে— এ রকম কাজে মনের মুক্তি। এ কাজের ক্ষেত্র নিকটের ক্ষেত্র নয়। দেশকালে বহুদূর বিস্তীর্ণ ; অব্যবহিত নিজের কাছে থেকে কতদূরে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই ; তাই এর জন্য ত্যাগ করা সহজ, এর জন্যে কাজ করতে ক্লান্তি নেই। সেইজন্য আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকি নে। আমার চোখের সামনে যেমন এই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এইরকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্যে ; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা ইন্‌টার্নড। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাই নে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাই নে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই— 'আমি সুদূরের পিয়াসী।' বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে কোনো ফল পাব এ কথা যখনি ভুলি তখনি দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে মুক্তি পাই নে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

পথে ও পথের প্রান্তে ২৭ ।। তুলনীয় শেষ সপ্তক ১৫।২।৩

অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখি নি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা-হয়-কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোটো বড়ো যে-সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐরকম। যা-হয়-কোনো-একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চার দিকের কোনো-কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক্ বা না থাক্। আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জোড়াতাড়া চলছেই ; কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে— তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছি নে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন— আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখায় সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি— মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম— তা সে যাকেই দেখি-না কেন, এক টুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটাগাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি। তাই ব'লে এ কথা ভুললে চলবে না যে তোমার চা খুব ভালো লেগেছে। ইতি ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

এই প্রসঙ্গে শেষ সপ্তকের তেইশ ও চৌত্রিশ -সংখ্যক কবিতার সহিত প্রান্তিক (১৩৪৪) গ্রন্থের পনেরো ও ষোলো -সংখ্যক কবিতা তুলনীয়। কবিতা দুইটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

প্রান্তিক ১৫ ।। তুলনীয় শেষ সপ্তক ২৩

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু ; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার ;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমিপানে
অবসাদে অবনত ক্ষীণশ্বাস চির প্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।
শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন-প্রাঙ্গণে ;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণী কঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।

যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন। অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্ব দেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি,
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি' এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচাল সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বন-নীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।
আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূসম।

প্রান্তিক ১৬ ॥ তুলনীয় শেষ সপ্তক ৩৪

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তি-নিঃস্ব আজি ; দেখছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অন্তর্হিত বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি ; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে সে ধুলায় প্রণত, যে ধুলার 'পরে মেলে
সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষু জীর্ণ কাঁথা, যে ধুলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনা-প্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু করি অনুভব বসি' এই অনিত্যের বুকে
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে॥

শেষ সপ্তকের সাতাশ-সংখ্যক কবিতার একটি পূর্বরূপ সংযোজন অংশে (ঘট ভরা, পৃ ১২৪) মুদ্রিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি হইতে অন্য একটি পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

আমার এই ছোটো কলস পেতে রাখি
ঝরনাধারার নীচে।
সকালবেলায় বসে থাকি
শেওলা-ঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।
ঘট ভরে যায় এক নিমেষে,
ফেনিয়ে ওঠে ছল্‌ছলিয়ে,
ছাপিয়ে পড়ে বারে বারে,
সেই খেলা ওর আমার মনের খেলা।
সবুজ দিয়ে মিনে-করা
পাহাড়তলির নীল আকাশে
ঝর্‌ঝরানি উছলে ওঠে দিনেরাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।

জলের ধ্বনি যায় পেরিয়ে
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা—
যেখানে ওই বুনো পাড়ার হাটের মানুষ
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াই পথে,
বলদের পিঠে বোঝাই
শুকনো কাঠের আঁঠি ;
রুনুঝুনু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলার
নতুন রোদের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে যায় পেরিয়ে পাহাড়
জলার দিকে।

বেলা হল, ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ করে কয়,
'দেরি করলি কেন।'
চুপ করে সব শুনি।
ঘট ভরতে হয় না দেরি,
সবাই জানে—
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো ওরা।

চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে লেখা 'বিয়াল্লিশ' -অঙ্কিত কবিতা প্রসঙ্গে ১৩৫৯ আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপা হয় : 'এই কবিতাটি ছাপাখানার কৃপায় খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভুল

রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে সংশোধন করিয়া পাঠান।'/ চারুচন্দ্র দত্তের পুত্র শ্রীঅরিন্দম দত্তের নিকট হইতে শ্রীঅমলকুমার বসুর সৌজন্যে ঐ অপ্রচারিত অংশের যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা কবিতার দ্বিতীয় স্তবক বলিয়াই মনে হয়।

শেষ স্তবকের যে দুই পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত তাহার একটি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে, অন্যটি রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন-সংশোধন-সংবলিত কিন্তু অন্যের লেখা প্রেস-কপি (শেষ সপ্তক গ্রন্থে হুবহু একটি ছাপা হয়)— দুটির কোনোটিতে বিয়াল্লিশ-সংখ্যক কবিতার পূর্বোক্ত অংশটি নাই। চারুচন্দ্র দত্ত -সংগ্রহ হইতে সম্পূর্ণ কবিতা বা তাহার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় নাই ; কাজেই ঐ অংশ সেই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সংযোজন কিনা তাহাও বলা যায় না। চারুচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্র-পত্রাবলীর যে-সকল নকল রবীন্দ্রসদনে রহিয়াছে, তাহাতেও এ প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ নাই। যাহা হউক, প্রাপ্ত কবিতাংশের পাঠ এ স্থলে সংকলন করা গেল :

কতবার মনে ভেবেছি
তোমার মন যেন সুবর্ণ-রেখা নদী।
তলায় সঞ্চিত নানা আকারের পাথর
নানা রঙের নুড়ি
তারা সারবান, তারা ভারবান।
বালির সঙ্গে লুকিয়ে আছে
সোনার কণা,
তারা মূল্যবান।
তাদের উপর দিয়ে বহে চলে যায়
কলমুখর ধারা
চপল ভঙ্গীতে,
ধরণীর প্রাণের স্রোতের সঙ্গে মেলে
তার ছন্দের গতি ;
সকালে বিকালে তার তরঙ্গে নাচে
লোকালয়ের ছায়া—
এই তোমার স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল
গল্পের প্রবাহ।

শেষ সপ্তক কাব্যের কয়েকটি লেখা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বলিয়া জানা যায়—

এক : মূল্যশোধ। রূপরেখা, ১৩৩৯, ১ম বর্ষ। পৃ· ১-২
নয় : অসমাপ্ত। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪২। পৃ· ১
দশ : অতীত বাণী, বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৪২। পৃ· ৪২১
তেত্রিশ : শিখ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২। পৃ· ১৫৩

সাময়িক পত্রে, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে মূল গ্রন্থের ও সংযোজন অংশের কয়েকটি কবিতা রচনার স্থান-কালও জানা যায়—

দশ। শান্তিনিকেতন, ৪ এপ্রিল ১৯৩৫। ২১ চৈত্র ১৩৪১
ষোলো : ১ ও ২। ৭ এপ্রিল ১৯৩৫ [১৯৩৪ নয়]। ২৪ চৈত্র ১৩৪১
বাতাবির চারা। ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৪। ৩০ পৌষ ১৩৪০
মর্মবাণী। ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৪। ২৯ পৌষ ১৩৪০
আমি। ১১ জানুয়ারি ১৯৩৪। ২৭ পৌষ ১৩৪০

শেষ সপ্তকের যে যে কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ সংকলন করিয়া দিয়াছেন শ্রীকানাই সামন্ত, সেগুলি সংযোজন অংশে (পৃ ১১৭-১২৯) মুদ্রিত। তন্মধ্যে কতকগুলি কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত— স্মৃতি-পাথেয় (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪০), বাতাবির চারা (বিচিত্রা, ফাল্গুন ১৩৪০), শেষ পর্ব (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪১), মর্মবাণী (পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪১), ঘট ভরা (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩), প্রশ্ন (প্রবাসী, মাঘ ১৩৪১), আমি (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪০), আষাঢ় (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪০), ও যক্ষ (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪১)। সংযোজনের সর্বশেষ সংকলনটি পাণ্ডুলিপি হইতে।

শোধবোধ

শোধবোধ ১৯২৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ১৩৩২ সালের 'বার্ষিক বসুমতী'তে সম্পূর্ণ নাটকটি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা 'কর্মফল' গল্পের (১৩১০) নাট্যরূপান্তর।

এই নাটকের পাঠপ্রস্তুত-কার্যে শ্রীযুক্ত সুকৃৎচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে 'শোধবোধ'-এর পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে।

গৃহপ্রবেশ

গৃহপ্রবেশ ১৩৩২ সালের [১৯২৫] আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩২ সালের আশ্বিনেই প্রবাসীতে নাটকটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা 'শেষের রাত্রি' গল্পের (১৩২১) নাট্যরূপান্তর।

কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপলক্ষে (১৯২৫) এই নাটকে অনেক সংযোজন বর্জন ও পরিবর্তন করা হয়। নাটকটির সেই অভিনব রূপ কোথাও মুদ্রিত নাই। অহীন্দ্র চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত রঙ্গমঞ্চে-ব্যবহৃত একখণ্ড গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রভবনে-রক্ষিত অনুরূপ আর-একটি গ্রন্থ পাঠ-প্রস্তুতির সময় ব্যবহারের জন্য পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে প্রথম গ্রন্থের পাঠের উপর স্থানে স্থানে পুনরায় পরিবর্তন করা হইয়াছে। নাটকটির যেখানে যেখানে 'টুকরি' ও 'বোষ্টমী' নামে নূতন দুইটি চরিত্রের অবতারণা হইয়াছে কেবলমাত্র সেই সংযোজনাংশগুলি অতঃপর মুদ্রিত হইল। পৃ ১৭৩, নাটকের আরম্ভেই বসিবে :

রোগীর ঘরে যতীন ইজি চেয়ারে উপবিষ্ট
পাশের ঘরে হিমি সেলাইয়ে রত

মণির প্রবেশ

মণি। ঠাকুরঝি।

হিমি। কী বৌদিদি।

মণি। এই দেখো, আমার মার্সেল্ নীল্ গোলাপ গাছে এই প্রথম গোলাপ ধরেছে, আমার এত আনন্দ হচ্ছে!

হিমি। সে আনন্দ কি একলা ভোগ করবে ভাই।

মণি। তাই তো এসেছি ঠাকুরঝি, এ গোলাপ তোমার খোঁপায় পরিয়ে দেব।

হিমি। না না, আমাকে না। দাদাকে দেবে চলো, তিনি কত খুশি হবেন।

মণি। না ঠাকুরঝি, এখন নয়। কী জানি, ও ঘরে রাতের বেলায় যেন কেমন—

হিমি। বৌদিদি, রাত পোয়াবে, হয়তো তখন দেখবি গোলাপ শুকিয়ে গেছে।

মণি। তুমি নিজে দিয়ে এসো-না ভাই।

হিমি। তা হলে বৌদিদি, তোর গোলাপের চেয়ে তোর গোলাপের কাঁটা তাঁর চোখে বেশি করে পড়বে।— আচ্ছা, জোর করতে চাই নে, কিন্তু একটা কথা রাখতে হবে— নিজের হাতে নিজের গাছের একটি ফুল দাদাকে দেবে এই সত্যটি আমায় করে যাও।

মণি। তা হলে আমার এই গোলাপটি মাথায় পরবে ?

হিমি। পরব।

মণি। আচ্ছা, আমার ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছে কুঁড়ি ধরেছে, আর-কিছুদিন বাদেই ফুটবে।

হিমি। তখন নিজে দিয়ে যাবে, দিনই হোক আর রাতই হোক ?

মণি। দেব।

হিমি। তিন সত্যি ?

মণি। হাঁ, তিন সত্যি, দেব, দেব, দেব। তা হলে এবার পরিয়ে দিই।

হিমি। তুমি তো দিলে একটি ফুল, তার বদলে আমি দেব একটি গান।

মণি। হাঁ ভাই, তোর গান আমার বড়ো ভালো লাগে।

হিমির গান

বল্ গোলাপ মোরে বল্
তুই ফুটবি, সখী, কবে।
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধাহাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদুশ্বাস,
পাখি গাহিছে মধুরবে।
প্রাতে পড়েছে শিশিরকণা,
সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়—
হেরো, ওগো সখী আনমনা,
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
হাসিটি দেখিতে চায়।
বায়ু আসে যায় নিতি নিতি,
অলি গাহে গুঞ্জনগীতি,
কচি কিশলয়গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি—
তারা শুধাইছে মিলি সবে
তুই ফুটিবি, সখী, কবে।

মণি। তোর গান শোনবার আগেই তো আমার গোলাপ ফুটেছে।

হিমি। ফোটে নি বৌদি, ফোটে নি। এ গান কার তা জানিস ? আমার দাদার। তাঁর আপন মুখে শুনলে বুঝতে পারতিস— কোন্ গোলাপটি তাঁর ফুটল না।

[উভয়ের প্রস্থান

রোগীর ঘরে

[মাসি গৃহকর্মে রত। যতীনের প্রবেশ][২]

[যতীন। মাসি—][৩]

মাসি। ওকি যতীন, উঠে দাঁড়িয়েছিস যে ! শুয়ে পড়্, শুয়ে পড়্— ডাক্তার যে—

২ রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে প্রাপ্ত। 'রোগীর ঘরে'র পরিবর্তে বসিবে। ৩ রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে সংযোজন।

যতীন। তোমরা বলছিলে, আমার বাড়ি তৈরি শেষ হয়ে গেছে, তাই এই দরজার কাছ থেকে দেখতে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু এখনো ভারা বাঁধা রয়েছে দেখছি।

মাসি। ভেতরটা সব শেষ হয়ে গেছে, বাইরেটা হয় নি— সে আর কতদিন লাগবে ? কিন্তু কেন তুই বিছানা ছেড়ে উঠে এলি। ভারি অন্যায় করেছিস।

যতীন। কিছু হবে না মাসি। মনে হচ্ছে আমার কোনো ব্যামো নেই। এত আনন্দ হচ্ছে— আমার বাড়ি তৈরি হল।

মাসি। যতীন, তুই যে ছেলেমানুষের মতো হলি।

যতীন। খেলার ডাক পড়লেই ভেতরকার ছেলেমানুষ আপনি [বেরিয়ে][৪] আসে। এই বাড়ি তৈরি যে আমার অনেক দিনের খেলা। (হাস্য)[৪] মাসি, যদি এই ছেলেমানুষ তোমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েই থাকে তা হলে এক কাজ করো-না— একটা ঠেলাগাড়ি আনিয়ে দাও-না। (হাস্য)

মাসি। কী করবি।

যতীন। আমাকে এই বাড়ির বারান্দায় [বারান্দায়][৪] ঘরে ঘরে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াবে। (হাস্য) একটা রিক্‌শ— শম্ভু, শম্ভু—

মাসি। কী হবে শম্ভুকে।

যতীন। একটা রিক্‌শ আনতে পাঠাই—

মাসি। পাগলামি করতে হবে না, একটু চুপ করে শো।

যতীন। আজকে পাড়ার লোকেরা আমার ছেলেমানুষি দেখে একবার হেসে নিক্। এতদিন তারা কত বারণ করেছে, গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলেছে— বাড়ি করতে করতে আমার সর্বনাশ হবে। বলে নি মাসি ?

মাসি। হাঁ, তা তো বলতই। তোকে ওরা ভালোবাসে, তাই ভয় পায়।

যতীন। সর্বনাশ পণ না করলে খেলার রস জমে না। আজ ওদের সবাইকে ডাকতে পাঠাও— আমাদের হরিশ হালদারকে, মোট্‌রিকে, মণ্টিকে, চক্রবর্তীমশাইকে—

মাসি। বড়ো বেশি তুই উতলা হয়ে উঠেছিস— অমন হলে—

যতীন। অমন গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ো না মাসি, ভয় নেই। এই দেখো-না কেন, যা অসম্ভব তাও হয়। আমার বাড়িও শেষ হল— বুদ্ধিমান লোকেরা সবাই সন্দেহ করেছিল। আমার ব্যামোও সারবে, তা ডাক্তার-বদ্দির দল যতই মাথাই নাড়ুক-না।

মাসি। কে বলেছে সারবে না ? কিন্তু তাই বলে অমন মাতামাতি করলে সহজ শরীরও যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। [আয়, এই ঘরেই তোকে শুইয়ে দি।][৪]

নেপথ্যে। যতীনদা, যতীনদা—

যতীন। ওকি, এ যে টুকরির গলা। কোলকাতায় এসেছে নাকি, ডাকো, ডাকো।

মাসি। ওর মা বোধ হয় গঙ্গাস্নানে এসেছে, তাই মেয়েকে সঙ্গে এনেছে। কিন্তু ও এলে তুমি আরো—

যতীন। না না মাসি, কিছু হবে না। আজ ছেলেমানুষ নইলে আমার মনের কথা কেউ বুঝবে না। ওকে ডাকো।

[মাসির প্রস্থান

টুকরির প্রবেশ

টুকরি। যতীনদা, যতীনদা—

যতীন। কী ঠানদি বুড়ি।

টুকরি। তুমি অমন করে মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন। কী হয়েছে তোমার।

যতীন। কিছু না, আমি জুজুবুড়ো সেজেছি।

৪ রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে সংযোজন।

টুকরি। তাই বৈকি। তুমি নাকি আমাকে ভয় দেখাতে পার যতীনদা ? (বুকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া) এই দেখো, তোমাকে ভয় করি নে। আজ কিন্তু খেলতে হবে।

যতীন। খেলব বলেই তো বসে আছি। আমার খেলাঘর তৈরি হয়ে গেছে।

টুকরি। কোথায়— কোথায়—

যতীন। দেখাব তোকে দেখাব, একটু সবুর কর্। তোকে সেই-যে খেলাঘর-তৈরির বাক্স দিয়েছিলুম কী করলি।

টুকরি। আমার ঘর তৈরি হয়ে গেছে।

যতীন। সে ঘরে কে আসবে ঠানদি বুড়ি ?

টুকরি। আমার রাজপুত্তুর আসবে।

যতীন। এখনো আসে নি ?

টুকরি। আমি কোলকাতা থেকে তাকে নিয়ে যেতে এসেছি। যতীনদা, তোমার ঘরে কে আসবে।

যতীন। আমার রাজকন্যা আসবে।

টুকরি। সে কোথায় আছে।

যতীন। অনেক, অনেক দূরে।

টুকরি। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে ?

যতীন। হাঁ, তাই বটে।

টুকরি। তাকে কেমন করে আনবে। পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে তোমার ?

যতীন। আছে, গানের সুর দিয়ে তার পাখা তৈরি। তোর হিমিদিদির আস্তাবলে সে থাকে।

টুকরি। (উচ্চস্বরে) হিমিদিদি, হিমিদিদি—

হিমির প্রবেশ

হিমি। একি টুকরি যে !

টুকরি। তোমার পক্ষীরাজ ঘোড়া আমি দেখব।

হিমি। পক্ষীরাজ ঘোড়া ?

যতীন। হিমি, তোর গলার ভিতর তার বাসা। গানের সুর দিয়ে তার পাখা তৈরি। দিক্-না সে তার পাখার ঝাপট।

টুকরি। হাঁ হিমিদিদি, দেখব।

যতীন। তাকে চোখ বুজে দেখতে হয়।

[টুকরি। হিমিদিদির গানের সঙ্গে, যতীনদা, তুমি বাঁশি বাজাও। সেই যে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে নাচাতে তোমার সে বাঁশি কই।

যতীন। বুকের গর্তটার ভিতর একটা দৈত্য ঢুকেছে, সে আমার ফুঁ কেড়ে নেয়, বাঁশি আর বাজে না। কিন্তু বুড়ি, আজ নাচের দিন। আমার রক্তে নাচের ঢেউ লেগেছে। আজ চারি দিকে খুশির হাওয়া। ঐ শোন্, পাশের বাড়িতে ক্লারিয়োনেট বাজাচ্ছে, তুই নাচ, আমার হয়ে নাচ্। রাজকন্যা ঘরে আসবে ব'লে যাত্রা করেছে, তারই নাচ। হিমি, হিমি, সেই গানটা ধর্-না ভাই— সে আসে ধীরে—

হিমির গান

সে আসে ধীরে
যায় লাজে ফিরে।
রিনিকি ঝিনিকি রিনিঝিনি
মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে।

বিকচনীপকুঞ্জে
নিবিড়তিমিরপুঞ্জে
কুন্তলফুলগন্ধ আসে অন্তরমন্দিরে
নিকুঞ্জকুটিরে।
শঙ্কিতচিত কম্পিত অতি
অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।
পুষ্পিত ঘনবীথি,
ঝংকৃত বনগীতি
কোমলপদপল্লবতলচুম্বিত ধরণী রে ॥][৫]

টুকরি। কই রাজকন্যা তো এল না?
যতীন। তাকেও চোখ বুজে দেখতে হয়।
টুকরি। তুমি [রাজকন্যাকে][৬] দেখেছ?
যতীন। দেখেছি বৈকি।
টুকরি। কেমন দেখলে? তার হাসিতে মানিক?
যতীন। হাঁ।
টুকরি। আর, তার চোখের জলে মুক্তো?
যতীন। চোখের জলটা এখনো দেখা যায় নি, হয়তো কোনো সময় দেখতে পাব!

মাসির প্রবেশ

মাসি। টুকরি, তোমার মা লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।
টুকরি। আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু যতীনদাদা, খেয়ে আবার আসব, তোমার রাজকন্যার কথা আমাকে বলতে হবে।
যতীন। বলব। [মাসি ও টুকরির প্রস্থান

পৃ ১২৬, 'মাসি। যতীন ওকে কি তুই' হইতে পৃ ১২৮, 'যতীন।... একটু কথা বলতে চাই।' পর্যন্ত বর্জিত। উহার পরিবর্তে বসিবে:

নেপথ্যে। যতীনদা—
যতীন। কিরে টুকরি, আয়, আয়, আয়।

টুকরির প্রবেশ

টুকরি। তোমার সেই রাজকন্যার কথা বলো।
যতীন। দেখতে পেয়েছি টুকরি, এবার তার চোখের জলের মুক্তো দেখেছি।

৫ রবীন্দ্রসদনের গ্রন্থে এই অংশের পরিবর্তে আছে:
যতীন। হিমি সেই গানটা— সে যে মনের মানুষ কেন তারে—
হিমির গীত
সে যে মনের মানুষ কেন তারে ইত্যাদি
হিমি। (গীতান্তে) আমি যাই দাদা।

৬ রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে নাই।

টুকরি। কোথায়, কোথায় সে মুক্তো !

যতীন। সে আমার মনের ভেতরে গেঁথে রেখেছি।

টুকরি। মনের ভেতরে ? সে কোন্‌খানে যতীনদা ?

যতীন। ঠানদি বুড়ি, বড়ো শক্ত প্রশ্ন করেছিস। মন কোথায় তারই খোঁজ করতে করতে এতকাল কেটে গেল।

টুকরি। হয়তো তোমার রাজকন্যা জানে, তাকে জিজ্ঞাসা করো-না।

যতীন। না টুকরি, সেও হয়তো জানে না।

টুকরি। আমার রাজপুত্তুর কিন্তু আমি পেয়েছি, তা জানো ? এখনই দেখাতে পারি।

যতীন। দেখিয়ে দে-না বুড়ি।

টুকরি। (পুতুল বাহির করিয়া) এই দেখো, এইবার তোমার রাজকন্যা দেখাও।

যতীন। তোর জিত রইল রে বুড়ি। দেখাতে পারলুম না। তাকে কেনা সহজ নয়।

টুকরি। মাকে বলে আমি তোমাকে কিনে দেব।

যতীন। না বুড়ি, আমি নিজে কিনব বলেই পণ করেছি।

টুকরি। পয়সা আছে তোমার ?

যতীন। কী জানি ঠানদি, হয়তো বা আছে— এইমাত্র খবর পেলুম যে—

মাসি। যতীন, ওর সঙ্গে আর কত ছেলেমানুষি করবি ? একটু চুপ কর্।

যতীন। খুব বেশি খুশি হয়ে উঠতে ডাক্তারের হয়তো বারণ আছে, তাই মাসি কথা চাপা দিতে চাচ্ছেন।— কিন্তু টুকরি, তোকে আমাদের গোপন কথা না জানালে খেলা জমবে কেন। রাজকন্যাকে বুঝি বা পেয়েছি, কেবল হাতে এসে পৌঁছতে একটু দেরি হচ্ছে।

টুকরি। পৌঁছলে আমাকে খবর দেবে ?

যতীন। সে যখন আসবে আমার খেলাঘরের দরজার কাছে তোকে দাঁড় করিয়ে রাখব।

মাসি। টুকরি, আর নয়। রাত হয়েছে, তোর মা ব্যস্ত হবে।

টুকরি। রাজকন্যে যেদিন আসবে সেদিন তুমি এমন বিচ্ছিরি সেজে থাকলে হবে না, সেদিন আমি তোমাকে সাজিয়ে দেব।

যতীন। আচ্ছা, মার কাছ থেকে একটা লাল চেলি নিয়ে আসিস, আর ফুলের মালা ফরমাশ দিয়ে রাখিস।

টুকরি। এই দেখো যতীনদা, আমার রাজপুত্তুরের জন্য সানাইয়ের বাঁশি কিনেছি। (টিনের বাঁশি বাজানো) [তুমি বাজাতে পার ?

যতীন। না ভাই, আমার হাতে সুর বাজল না।][৭] যেদিন আমার রাজকন্যে আসবে, তোকেই সেদিন সানাই বাজাতে ডাকব।

[টুকরির প্রস্থান

হিমি কোথায়, মাসি ? সে কি ঘুমোতে গেছে।

মাসি। না, এখনো বেশি রাত হয় নি। ও হিমি, শুনে যা।

যতীন। দেখ্ হিমি, যেদিন মণির ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুটবে ঠিক সেই দিনই গৃহপ্রবেশের আয়োজন করিস, ভুলিস নে— আর কতদিন আছে আন্দাজ করতে পারিস ?

হিমি। আর তিন-চার দিনের বেশি দেরি হবে না।

৭ রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে কবির হস্তাক্ষরে এই অংশের পরিবর্তে আছে :

টুকরি।… বাজাও-না।

যতীন। এখন আমি বাঁশি শুনি, বাঁশি বাজাই নে।

যতীন। আমি মনে মনে যেন সেই ফুল ফোটা দেখতে পাচ্ছি; একটি একটি করে পাপড়ি খুলছে। আমার যেন ছুঁতে ভয় করছে, পাছে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পাপড়ি আলগা হয়ে যায়।— আজ মণিকে একবার ডেকে দাও মাসি, কেবল পনেরো মিনিটের জন্যে। আজ তার সঙ্গে বিশেষ করে একটু কথা বলতে চাই।

পৃ ১৮৭, 'যতীন।...ঐ দরজাটি বন্ধ করে দে। এই উক্তির অনুবৃত্তিস্বরূপ বসিবে :

যতীন। দেখ্, মাসিকে কতদিন থেকে বলছি, একবার অখিলকে যেন আমার কাছে ডেকে দেন, তাকে নিয়ে উইলটা তৈরি করতে হবে। তিনি মিছিমিছি কেবলই দেরি করছেন। আজ নিশ্চয় যেন সে আসে।

হিমি। আমি জানি, মাসি তাঁকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। আজ হয়তো এখনই আসবেন।

নেপথ্যে। জয় হোক মা, ভিক্ষে চাই।

যতীন। ঐ তোদের বোষ্টমী এসেছে। ওকে সেই গানটা গাইতে বল্, আমি এখান থেকে শুনব।

হিমি। কোন্ গানটা?

যতীন। সেই-যে— মন রে আমার মন—

[হিমির প্রস্থান

বোষ্টমী ভিখারিনি ও হিমি

বোষ্টমী। জয় হোক মা, ভিক্ষে চাই।

হিমি। ভিক্ষে দিচ্ছি বোষ্টমী। একবার এইখানটাতে বসে সেই গানটা গেয়ে যাও— মন রে ওরে মন। দাদা শুনতে চাচ্ছে।

বোষ্টমীর গীত

মন রে ওরে মন,
তুমি কোন্ সাধনের ধন।
পাই নে তোমায় পাই নে, শুধু খুঁজি সারাক্ষণ।
রাতের তারা চোখ না বোজে
অন্ধকারে তোমায় খোঁজে,
দিকে দিকে বেড়ায় ডেকে দখিন-সমীরণ।
সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি
খোঁজে নিজের রতনমণি,
তেমনি করে আকাশ ছেয়ে
অরুণ-আলো যায় যে চেয়ে,
নাম ধরে তোর বাজায় বাঁশি কোন্ অজানা জন।

[হিমি। বোষ্টমী, তুমি এসব গান কার কাছে শিখলে। এ তো তোমাদের দলের গান নয়।

বোষ্টমী। আমাদের পাড়ায় এক রাতজাগা মানুষ আছে। সে গভীর রাতে গান গায়, দিনে তার দেখা পাই নে। গানের কথা বুঝি নে, কিন্তু মন টানে। যখন বলি 'বুঝিয়ে দাও', চুপ করে থাকে। যখন বলি 'শিখিয়ে দাও', শেখায়। আমার কণ্ঠটি তার ভালো লাগে বলে সে আমাকে গান জোগায়।][৮] [কাল রাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে এনে একটি গান দিয়েছে।—

৮ রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে এই অংশ বর্জনচিহ্নিত।

সে যে মনের মানুষ, কেন তারে
বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে।
ডাক্‌না রে তোর বুকের ভিতর
নয়ন ভাসুক নয়নধারে।
যখন নিববে আলো, আসবে রাতি,
হৃদয়ে দিস আসন পাতি—
আসবে সে যে সংগোপনে
বিচ্ছেদেরই অন্ধকারে।
তার আসাযাওয়ার গোপন পথে
সে আসবে যাবে আপনমতে।
তারে বাঁধবে ব'লে যেই কর পণ
সে থাকে না, থাকে বাঁধন—
সেই বাঁধনে মনে মনে
বাঁধিস কেবল আপনারে ॥][৯]

পৃ· ২০০, 'ডাক্তারের প্রবেশ'এর অব্যবহিত পূর্বে বসিবে :

টুকরির প্রবেশ

টুকরি। যতীনদা—

যতীন। ঠানদি বুড়ি, আয়, আয়, আমার বুকের ওপর আয়। [বুড়ি, তুই তো সত্যি, তুই তো মিথ্যে না ?][১০]

টুকরি। আজ তুমি সাজো নি কেন।

যতীন। কিসের সাজ।

টুকরি। রাজকন্যে আসছে, আমি দেখেছি।

যতীন। কোথায় দেখলি।

টুকরি। রাস্তায়। ময়ূরপঙ্খিতে চড়ে, বাঁশি বাজিয়ে, আলো জ্বেলে। আমি তাই তো ছুটে এলুম।

যতীন। এসে পৌঁছবে না। ধু ধু করছে রাস্তা, জনশূন্য রাস্তা, শেষ নেই তার শেষ নেই। লগ্ন ফুরিয়ে এল, বুড়ি, তোদের রাজকন্যা পৌঁছল না, পৌঁছল না।

টুকরি। অমন করে কী বকছ যতীনদাদা, শুনে কেমন ভয় করে। আমি দেখেছি আসছে। আমি তাকে নিয়ে আসছি। [প্রস্থান

শেষ বর্ষণ

শেষ বর্ষণ ১৩৩২ সালে রচিত হয়। ঐ সালের ভাদ্র মাসে ইহা মঞ্চস্থ হওয়া উপলক্ষে ঐ নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে শুধু নাট্যে ব্যবহৃত গানগুলিই মুদ্রিত হইয়াছিল, কথাবস্তু প্রকাশিত হয় নাই ; পরে ঋতু-উৎসব (১৩৩৩) গ্রন্থে কথা ও গান- সহ শেষ বর্ষণের সম্পূর্ণ নাট্যরূপটি প্রকাশিত হয়।

৯ রঙ্গমঞ্চে-ব্যবহৃত গ্রন্থটিতে এই অংশ বর্জনচিহ্নিত ; রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে অংশটি নাই। রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে গানটি প্রথম দৃশ্যে হিমির গান রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০ রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থে কবির হস্তাক্ষরে সংযোজন। প্রাথমিক অসম্পূর্ণ খসড়ার জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রভবন -প্রকাশিত রবীন্দ্রবীক্ষা ২১ : শ্রাবণ ১৩৯৬।

নটীর পূজা

নটীর পূজা ১৩৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

একই আখ্যানবস্তু অবলম্বনে কথা ও কাহিনীর পূজারিনী কবিতাও লিখিত হইয়াছিল।

১৩৩৩ সালে ২৫ বৈশাখ সায়ংকালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে নটীর পূজার প্রথম অভিনয়ের সময় এই নাটকে উপালি-চরিত্র ছিল না, উপালি-চরিত্র সংবলিত সূচনা অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে ছিল না। ১৩৩৩ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ঐ অংশ যোজিত হয়; উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুদ্রিত অভিনয়পত্রীতে সূচনা ও নিম্নোদ্‌ধৃত ভূমিকা প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রীতে নাট্যবিষয়সারও মুদ্রিত আছে। সূচনা-অংশ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

ভূমিকা

অজাতশত্রু পিতৃসিংহাসনে লোভ প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নগরী হইতে দূরে বাস করিতেছেন।

একদা রাজোদ্যানে ভগবান বুদ্ধ অশোকতরুচ্ছায়ায় আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইখানে বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার চৈত্য স্থাপন করিয়া রাজকন্যাদিগকে বেদীমূলে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অর্ঘ্য আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।

রাজমহিষী লোকেশ্বরী তাঁহার স্বামীর রাজ্যত্যাগে ও তাঁহার পুত্র চিত্রের সন্ন্যাসগ্রহণে ক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধ-অনুশাসিত ধর্মের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন।

নটরাজ

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা ১৩৩৩ সনের বসন্তে রচিত ও শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত এবং পরে ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা বিচিত্রায় শিল্পী নন্দলালের চিত্রভূষণে বিভূষিত হইয়া প্রকাশিত হয়।[১১] ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় ঋতুরঙ্গ নামে ইহা অভিনীত হয়; অভিনয়পত্রী হইতে দেখা যায়, ইহার কবিতাংশ সম্পূর্ণ নূতন। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে ঋতুরঙ্গ মুদ্রিত হয়।

১৩৩৮ সালে প্রকাশিত বনবাণী গ্রন্থে, বিচিত্রায় মুদ্রিত নটরাজ ও মাসিক বসুমতীতে মুদ্রিত ঋতুরঙ্গ একত্রীভূত ও পুনঃসজ্জিত হইয়া নটরাজ ও ঋতুরঙ্গশালা নামে সংকলিত হয়। বনবাণীর এই অংশটিই বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। বিচিত্রায় প্রকাশিত নটরাজের শেষ কবিতা 'শেষ মধু' এই নূতন পাঠের অন্তর্গত হয় নাই; উক্ত কবিতাটি তৎপূর্বেই মহুয়ার অন্তর্গত হয়।

'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' (পৃ ২৭২) গানটির নিম্নমুদ্রিত পাঠান্তর বিচিত্রায় পাওয়া যায়; গান হিসাবে এই পাঠান্তর সুপ্রচলিত নহে (গীতবিতান ২য় সং, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৩)।—

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।
শূন্য গগনে পাও কার বারতা?
নয়ন অতন্দ্র প্রতীক্ষারত
কেন উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত-মতো,

১১ সম্প্রতি (ফাল্গুন ১৩৮০) নটরাজ কাব্যের এই অলংকৃত মনোজ্ঞ রূপ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহা দেখিলে ইহার পরবর্তী সংস্করণ হইতে যে যে পার্থক্য তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

কুন্তলপুঞ্জ অযত্নে নত
ক্লান্ত তড়িৎ-বধূ তন্দ্রাগতা।
ধৈর্য ধরো, সখা, ধৈর্য ধরো,
দুঃখে মাধুরী হোক মধুরতর ;
হেরো গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর
মল্লিকা চরণতলে প্রণতা।

'চরণরেখা তব' (পৃ ২৭৭) গানটির বিচিত্রায় প্রকাশিত পূর্বপাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ?
অশোকরেণুগুলি
রাঙাল যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি ?
ফুরায় ফুল-ফোটা পাখিও গান ভোলে
দখিন বায়ু সেও উদাসী যায় চলে।
তবুও কি ভরি তারে
অমৃত ছিল না রে ?
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ?

মূলত গানটি বসন্ত-বিদায়ের 'বিলাপ'রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল— অভিনয়োপলক্ষে একবার গানটি শরৎ-বিদায়ের 'বিলাপ' রূপে পরিবর্তিত হয়। উপরে উদ্‌ধৃত পাঠটিই গান হিসাবে সুপ্রচলিত (গীতবিতান ২য় সং, ২য় খণ্ড, পৃ ২৪৭)।

শেষ বর্ষণের অন্তর্গত 'শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া' (পৃ ২১২) গানটিকে, নটরাজের 'শ্রাবণ-বিদায়' (পৃ ২৭১) গানটির পাঠান্তর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

'চঞ্চল' (পৃ ২৯৪) কবিতায় নানা সময়ে ভাব ভাষা ছন্দের পরিবর্তনে নানারূপের উদ্ভাবন করেন কবি, কদাচিৎ ব্যঞ্জনারও বদল হয় ; তন্মধ্যে দুইটি পরবর্তী রূপ প্রচল গীতবিতানে সংকলিত কিন্তু একটি কেবল গান-রূপে সুপ্রচলিত।

প্রচলিত

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে
কে যে পরশ করল তোরে
অস্তরবির তুলিখানি
চুরি ক'রে ॥
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের গোপন বাসা
বনে বনে বয়ে বেড়াস তারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোলের খেলার ফুলের রেণু
পাঠায় কে তোর পাখায় ভ'রে ॥
যে গুণী তার কীর্তি-নাশার বিপুল নেশায়
চিকন রেখার লিখন মেলে শূন্যে মেশায়,

সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় পলে পলে—
গান গেয়ে যে চলে তারা দলে দলে—
তার হারা সুর নাচের নেশায়
ডানাতে তোর পড়ল ঝরি ॥

অপ্রচলিত

গন্ধরেখার পন্থে তোমার শূন্যে গতি
লেখন রে মোর ছন্দ-ডানার প্রজাপতি—
স্বপ্নবনের ছায়ায় আলোয় বেড়াস দুলি
পরান-কণার বিন্দুসুরার নেশার ঘোরে ॥
চৈত্রহাওয়ায় যে চঞ্চলের ক্ষণিক বাসা
পাতায় পাতায় করিস প্রচার তাহার ভাষা—
অপ্সরীদের দোলের দিনের আবীর-ধূলি
কৌতুকে ভোর পাঠায় কে তোর পাখায় ভ'রে।
তোর মাঝে মন কীর্তি আপন নিষ্কাতরেই করে হেলা।
তার সে চিকন রঙের লিখন ক্ষণেক-তরেই খেয়াল-খেলা।
সুর বাঁধে আর সুর সে হারায় দণ্ডে পলে,
গান বহে যায় লুপ্ত সুরের ছায়ার তলে,
পশ্চাতে আর চায় না তাহার চপল তুলি—
রয় না বাঁধা আপন ছবির রাখীর ডোরে।

গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের (পৌষ ১৩৮১) গ্রন্থপরিচয়ে সম্পাদক বলেন, 'চঞ্চল' কবিতায় বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি-ধৃত ৮।৯টি রূপান্তরের ভিতর উল্লিখিত শেষ সংকলনটি বিশিষ্ট। পূর্বে যে প্রজাপতি ছিল উদ্দিষ্ট এ স্থলে সে উপমা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (দেশ : ২৮ মাঘ ১৩৬৭। পৃ ৯৯)— 'গানটি পুরাতনের নবীকরণ'। মূল রচনা ১৩৩৩ সনের ২৭ ফাল্গুনে আর এটির রচনা সম্ভবত ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ তারিখে। ঐ তারিখেই কবি এই গীতকবিতা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিয়া পাঠান। সে লেখাতেও পরে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়।

'দোল' (পৃ ২৯৬) কবিতার গীতরূপ 'ওগো কিশোর আজি' এই সূচনায় গীতবিতান গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

নটীর পূজা ও নটরাজের অঙ্গীভূত বহু গান কবিতা-রচনার সম্ভবপর সূচীপত্র এ স্থলে দেওয়া যায়।

নটীর পূজা -ধৃত

পূর্বগগন ভাগে।[১২] ৫ মাঘ ১৩৩৩
নিশীথে কী হয়ে গেল মনে। শান্তিনিকেতন[১৩], ৭ বৈশাখ ১৩৩৩
তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে। ১ বৈশাখ ১৩৩৩

১২ ১৩৩৮ পৌষ সংস্করণে যোগ করা হয়।
১৩ কবির জন্মদিনে (১৩৩৩) নটীর পূজা প্রথম অভিনয়, তৎপূর্বে অতি অল্পকালে ইহার রচনা শান্তিনিকেতনে। সুতরাং অধিকাংশ গানের (ঐ প্রথম অভিনয়ের) রচনার স্থাননির্দেশ বাহুল্যমাত্র।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে। প্রাক্ - ১ বৈশাখ ১৩৩৩
আর রেখো না আঁধারে। ৭~৮ বৈশাখ ১৩৩৩
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী।[১৪] ২১ ফাল্গুন ১৩৩৩
পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে। ৮ বৈশাশ ১৩৩৩
হে মহাজীবন হে মহামরণ। প্রাক্ - ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩[১৫]
হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান। ২৭ চৈত্র ১৩৩২ সকাল
সকলকলুষতামসহর।[১৪] বৈশাখ ১৩৩৮
আমায় ক্ষম হে ক্ষম। ৭ বা ৮ বৈশাখ ১৩৩২

নটরাজ

মুক্তিতত্ত্ব : মুক্তিতত্ত্ব শুনতে। খসড়া ১ চৈত্র ১৩৩৩
উদ্‌বোধন : মন্দিরায় মন্দ্র তব। খসড়া ২ বা ৩ চৈত্র ১৩৩৩
নৃত্য (মূল কবিতা) ; নৃত্যের তালে তালে। ২১~২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩
বৈশাখ : ধ্যাননিমগ্ন নীরব নগ্ন। খসড়া ১ চৈত্র ১৩৩৩
বৈশাখ-আবাহন : এস এস এস হে বৈশাখ। ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩
গান : হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর। শান্তিনিকেতন, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
কালবৈশাখী : ডাকো বৈশাখ। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
মাধুরীর ধ্যান : মধ্যদিনে যবে গান। ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩
পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
ব্যঞ্জনা : শুনিতে কি পাস। খসড়া ১ চৈত্র ১৩৩৩
আষাঢ় : কোন্ বারতার। ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
লীলা : গগনে গগনে আপনার মনে। ১৫ ফাল্গুন ১৩৩৩
বর্ষামঙ্গল : ওগো সন্ন্যাসী, কী গান। খসড়া ১ চৈত্র ১৩৩৩
যায় রে শ্রাবণকবি। ২ চৈত্র ১৩৩৩
শেষ মিনতি : কেন, পান্থ, এ চঞ্চলতা। মূলগান ১৪ ফাল্গুন ১৩৩৩
শ্রাবণ সে যায় চলে। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
শরৎ : ধ্বনিল গগনে। ১ চৈত্র ১৩৩৩
শান্তি : পাগল আজি আগল খোলে। ২ চৈত্র ১৩৩৩
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
শরতের ধ্যান : আলোর অমল কমলখানি। মূল ১৬ ফাল্গুন ১৩৩৩
শরতের বিদায় : কেন গো যাবার বেলা। খসড়া ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
গান : শিউলি ফুল, শিউলি ফুল। ২১~২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩
বিলাপ : চরণরেখা তব যে পথে। মূলপাঠ ১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩
নূতন পাঠ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
গান : শিউলি ফোটা ফুরাল যেই। শান্তিনিকেতন, ৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৮
হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার। ১৭ ফাল্গুন ১৩৩৩
হেমন্ত : হে হেমন্তলক্ষ্মী, তব। ২৯ ফাল্গুন~১ চৈত্র ১৩৩৩

১৪ ১৩৩৮ পৌষ সংস্করণে যোগ করা হয়।
১৫ 'উত্তর বৈকালী'তে (বেলগ্রেড। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) '১৩৩২' কবির লিপিপ্রমাদ মনে হয়।

দীপালি : হিমের রাতে ওই গগনের । ২৫～২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩
শীতের উদ্‌বোধন : ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
আসন্ন শীত : শীতের বনে কোন্‌ সে কঠিন । প্রাক্‌ - ৭ বৈশাখ ১৩৩৪
শীত : ওগো শীত, ওগো শুভ্র । খসড়া ২৯ ফাল্গুন～১ চৈত্র ১৩৩৩
গান : শীতের হাওয়ার লাগল নাচন । শান্তিনিকেতন, ৪ কার্তিক ১৩২৮
সর্বনাশার নিশ্বাসবায় । ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
স্তব : হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে । ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৩
শীতের বিদায় : তুঙ্গ তোমার ধবলশৃঙ্গ শিরে । খসড়া ৩～৯ চৈত্র ১৩৩৩
লুকানো রহে না বিপুল মহিমা । ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
আবাহন : তোমার আসন পাত্‌ব কোথায় । ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৩
বসন্ত : হে বসন্ত, হে সুন্দর । ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩
বসন্তের বিদায় : মুখখানি কর মলিন বিধুর । ২ চৈত্র ১৩৩৩
প্রার্থনা : জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার । ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩
অহেতুক : মনে রবে কি না রবে । ১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩
মনের মানুষ : কত-না দিনের দেখা । ৩ চৈত্র ১৩৩৩
চঞ্চল : ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে । খসড়া ২৭ ফাল্গুন ১৩৩৩
উৎসব : সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই । খসড়া ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
শেষের রঙ : রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার । ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩
দোল : আলোকরসে মাতাল রাতে । ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩

গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলি ১২৯৯ ও ১৩০০ সালে 'সাধনা'য় প্রকাশিত ; নিম্নে বিস্তারিত সূচী মুদ্রিত হইল :

ত্যাগ	বৈশাখ ১২৯৯	সুভা	মাঘ ১২৯৯
একরাত্রি	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯	মহামায়া	ফাল্গুন ১২৯৯
একটা আষাঢ়ে গল্প	আষাঢ় ১২৯৯	দানপ্রতিদান	চৈত্র ১২৯৯
জীবিত ও মৃত	শ্রাবণ ১২৯৯	সম্পাদক	বৈশাখ ১৩০০
স্বর্ণমৃগ	ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯	মধ্যবর্তিনী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
রীতিমত নভেল	ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯	অসম্ভব কথা	আষাঢ় ১৩০০
জয়পরাজয়	কার্তিক ১২৯৯	শাস্তি	শ্রাবণ ১৩০০
কাবুলিওয়ালা	অগ্রহায়ণ ১২৯৯	একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	ভাদ্র ১৩০০
ছুটি	পৌষ ১২৯৯	সমাপ্তি	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০

সমস্যাপূরণ অগ্রহায়ণ ১৩০০

একরাত্রি, রীতিমত নভেল, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, দানপ্রতিদান— 'ছোট গল্প' (ফাল্গুন ১৩০০) পুস্তকে ; ত্যাগ, স্বর্ণমৃগ, জয়পরাজয়— 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ভাগে (১৩০১), একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, সুভা, মহামায়া— 'বিচিত্র গল্প' দ্বিতীয় ভাগে (১৩০১) প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় ।

একটা আষাঢ়ে গল্প অবলম্বনে 'তাসের দেশ' (ভাদ্র ১৩৪০) প্রহসন রচিত হয়।

শ্রীমতী প্রীতি (রাণু) অধিকারীকে 'জয়পরাজয়' গল্পের উপসংহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৩২৪ সালে ৩ ভাদ্রের এক পত্রে কৌতুকচ্ছলে লিখিয়াছিলেন :

'কবিশেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হত, কিন্তু তার পূর্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে-খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টিসৎকার হয়েছিল।'

—ভানুসিংহের পত্রাবলী, প্রথম পত্র

সাজাদপুর হইতে লিখিত [জুন ১৮৯১] রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে (ছিন্নপত্র, ১৮৯১, ২৩ জুনের পরবর্তী পত্র দ্রষ্টব্য) নদীর ধারে 'গোটাকতক বিবস্ত্র খুদে ছেলে'র খেলাধুলার যে বর্ণনা আছে 'ছুটি' গল্পের সূচনাংশের সহিত তাহা তুলনীয়।

জীবিত ও মৃত গল্পের পরিকল্পনা কী ভাবে মনে আসে, সে সম্বন্ধে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

'অনেকদিন আগে কলকাতার বাড়িতে, ঠিক সময়টা মনে পড়ে না তবে ছোট বউ[১৬] তখন ছিলেন, একবার আত্মীয়স্বজন হঠাৎ এসে পড়ায় আমার বাইরের বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা হয়।··· শোবার জায়গায় যাব বলে চলেছি— ভিতর বাড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে চারি দিক, আলো অন্ধকারে বড়ো বড়ো ছায়ায় মিলে সে এক গভীর রাত্রি। সত্যিকারের রাত বলা যায় তাকে। বারান্দায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, মনে এল একটা কল্পনা যেন এ-আমি আমি নই। যে-আমি ছিলুম সে আমি নয়, যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে। সত্যি যদি তাই হয় তা হলে কেমন হয় ? মনে হল যদি পা টিপে টিপে ফিরে গিয়ে ছোটো বউকে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে বলি 'দেখো এ আমি কিন্তু আমি নয়, তোমার স্বামী নয়' তা হলে কী হয়।··· যা হোক, তা করি নি। চলে গেলুম শুতে, কিন্তু সেই রাত্রে এই গল্পটা আমার মাথায় এল, যেন একজন কেউ দিশাহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেও মনে করছে অন্য-সকলেও মনে করছে যে, সে সে নয়—'

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (পৃ ১৮২), মৈত্রেয়ী দেবী

খাতা গল্পটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না এখনো জানা যায় নাই। শনিবারের চিঠিতে (চৈত্র ১৩৪৬) প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী'তে লিখিত হইয়াছে, এ গল্পটি সম্ভবত হিতবাদীতে (১২৯৮) মুদ্রিত হইয়াছিল। হিতবাদী বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই গল্পটি সাময়িকে প্রকাশ-অনুসারে সাজানো যায় নাই, গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ অবলম্বনে ('ছোট গল্প', ফাল্গুন ১৩০০) বর্তমান খণ্ডে উহা মুদ্রিত হইল।

সম্পাদক ও সমস্যাপূরণ 'ছোট গল্প' (ফাল্গুন ১৩০০) পুস্তকে ; অসম্ভব কথা 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ভাগে (১৩০১) ; একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প 'বিচিত্র গল্প' দ্বিতীয় ভাগে (১৩০১) ; মধ্যবর্তিনী, শাস্তি ও সমাপ্তি 'কথা-চতুষ্টয়' (১৩০১) পুস্তকে প্রথম গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়।

১৬ মৃণালিনী দেবী, রবীন্দ্রনাথের পত্নী

জীবনস্মৃতি

জীবনস্মৃতি ১৩১৯ (জুলাই ১৯১২) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক অঙ্কিত চব্বিশটি চিত্রে শোভিত হইয়া এই প্রথম সংস্করণ বাহির হয়।

তৎপূর্বে জীবনস্মৃতি প্রবাসী মাসিকপত্রে (ভাদ্র ১৩১৮ - শ্রাবণ ১৩১৯) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। প্রবাসীতে রচনাটি সমর্পণ করিবার পূর্বে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে-পত্রালাপ হয় ১৩৪৮ কার্তিকের প্রবাসী হইতে তাহার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্‌ধৃত হইল। পত্রগুলি শিলাইদহ হইতে লিখিত।—

১

বাঃ তুমি তো বেশ লোক! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও! এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে— এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেড়ি করতে হবে? সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে অন্তর্হিত হয়, তুমি তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছ।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক্…।

২

আমার জীবনের প্রতি দাবি করে তুমি যে-যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ, "আপনার জীবনটা চাই।" এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা Halliday সাহেবের নামস্বাক্ষর থাকত তা হলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারও কোনো সন্দেহ থাকত না। তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধীনে থাকবে, এইটেই সংগত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেছ না সম্পাদকীয় দুর্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্ছ, তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারছি নে বলে কিছু স্থির করতে পারছি নে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন, অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কী তা না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের black and white-এ আমার জীবনটার এক গালে চুন ও এক গালে কালি লেপন করতে পারব না।

পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগল্‌ভ হবার অধিকার লাভ করে, কিন্তু তবুও সাদা চুল ও শ্বেত শ্মশ্রুতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুলতে পারে না। [৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮]

৩

তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেছি। কিন্তু অজিতের প্রবন্ধ[১৭] শেষ হয়ে গেলে এটা আরম্ভ হলেই ভালো হয়। লোকের তখন জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য একটু বাড়তে পারে। [১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮]

১৭ 'রবীন্দ্রনাথ', অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রবাসী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৮

৪

... জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধ হয় দেখেছ— জিনিসটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি— অর্থাৎ আমার জীবন ব'লে একটা বিশেষ গল্প যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টায় ত্রুটি হয় নি— আমার তো বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে, কিন্তু আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ইত্যাদি।

৫

...কবিকে[১৮] আমার কবিজীবনীটা পড়িতে দিও। সে তো সম্পাদক শ্রেণীর নহে, সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল, অতএব সে ওটা পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। [২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮]

জীবনস্মৃতির ভূমিকায় ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের পরে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় :

'এমনি করিয়া ছবি দেখিয়া প্রতিচ্ছবি আঁকার মতো কিছুদিন জীবনের স্মৃতি লিখিয়া চলিয়াছিলাম। কিছুদূর পর্যন্ত লিখিতেই কাজের ভিড় আসিয়া পড়িল— লেখা বন্ধ হইয়া গেল।'

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি সম্ভবত সেই অসম্পূর্ণ ('বালক'-প্রকাশের স্মৃতিকথা পর্যন্ত) প্রথম রচনা। ১৩১৮ সালের ২৫শে বৈশাখ উৎসবের সময় শান্তিনিকেতনে ঘরোয়া আসরে রবীন্দ্রনাথ এই পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত পরবর্তী পাঠেরও কিয়দংশ রবীন্দ্রসদনে একটি খাতায় আছে। উহার সংশোধিত সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সীতা দেবীর নিকটে ছিল (দ্রষ্টব্য 'পুণ্যস্মৃতি', পৃ ২০), তিনি সম্প্রতি রবীন্দ্রভবনে দিয়াছেন। ১৩১৯ সালে গ্রন্থপ্রকাশের সময় প্রবাসীর পাঠেও রবীন্দ্রনাথ বহু সংযোজন সংশোধন করিয়াছিলেন। সেই শেষ পাঠের কোনো পাণ্ডুলিপি (?) আমরা দেখি নাই। রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপি হইতে সূচনাংশ দুইটি এ স্থলে মুদ্রিত হইল :

১

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বসিলে যে-অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।

যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়— কেননা, তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্বপ্রধান রচনা। কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহা তো সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে— আবার জীবনের কথা কেন।

এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া আমি অনেকের অনুরোধসত্ত্বে নিজের জীবনী লিখিতে কোনোদিন উৎসাহ বোধ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে— দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি।

ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎরচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।

১৮ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কর্মবীরদের জীবন কর্মকে জন্ম দেয়, আবার সেই কর্ম তাঁহাদের জীবনকে গঠিত করে। আমি ইহা আজ বেশ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।

আমার হাতে আমারই রচিত অনেকগুলি পুরাতন চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে— বর্তমান প্রবন্ধে মাঝে মাঝে আমার এই চিঠিগুলি হইতে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিব। আজ এই চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে ১৮৯৪ সালে লিখিত এই ক'টি কথা হঠাৎ চোখে পড়িল।—

'আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারংবার স্থায়িভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তা হলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ়বিশ্বাসে এবং সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।'

এই রকমে পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মতো একত্রে রচিত আমার জীবন ও কাব্যগুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু তেমন করিয়া লেখা নিতান্ত সহজ নহে। তেমন সময় এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ নাই, ক্ষমতাও আছে কিনা সন্দেহ করি।

এখন উপস্থিতমত আমার জীবন ও কাব্যকে জড়াইয়া একটা রেখাটানা ছবির আভাসপাত করিয়া যাইব। যে-সকল পাঠক ভালোবাসিয়া আমার লেখা পড়িয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এটুকুও নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। আমার লেখা যাঁহারা অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন না তাঁহারাও সম্মুখে বর্তমান আছেন কল্পনা করিলে তাঁহাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সংকোচে কলম সরিতে চায় না— অতএব এই আত্মপ্রকাশের সময় তাঁহাদিগকে অন্তত মনে মনেও এই সভাক্ষেত্রের অন্তরালে রাখিলাম বলিয়া তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আরম্ভেই একটা কথা বলা আবশ্যক চিরকালই তারিখ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত কাঁচা। জীবনের বড়ো বড়ো ঘটনারও সন-তারিখ আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না ; আমার এই অসামান্য বিস্মরণশক্তি নিকটের ঘটনা এবং দূরের ঘটনা, ছোটো ঘটনা এবং বড়ো ঘটনা, সর্বত্রই সমান অপক্ষপাত প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব আমার এই বর্তমান রচনাটিতে সুরের ঠিকানা যদি-বা থাকে, তালের ঠিকানা না থাকিতেও পারে। প্রথমে আমার রাশিচক্র ও জন্মকালটি ঠিকুজি[১৯] হইতে নিম্নে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম।—

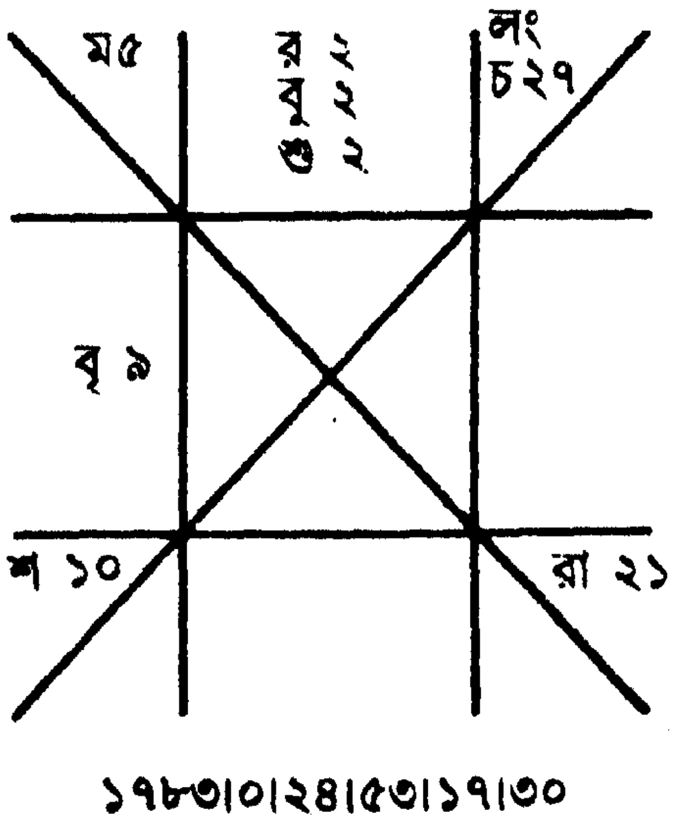

১৭৮৩।০।২৪।৫৩।১৭।৩০

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী সোমবার

১৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পারিবারিক পুরাতন খাতায় প্রাপ্ত রাশিচক্রটি পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

ইহা হইতে বুঝা যাইবে ১৭৮৩ সম্বতে অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৬১ খৃস্টাব্দে ২৫শে বৈশাখে কলিকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটিতে আমার জন্ম হয়। ইহার পর হইতে সন-তারিখ সম্বন্ধে আমার কাছে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিবেন না।

—প্রথম পাণ্ডুলিপি

২

এই লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র। এই স্মৃতিতে অনেক বড়ো ঘটনা ছোটো এবং ছোটো ঘটনা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। যেখানে ফাঁক ছিল না সেখানেও হয়তো ফাঁক পড়িয়াছে, যেখানে ফাঁক ছিল সেখানটাও হয়তো ভরা দেখাইতেছে। পৃথিবীর স্তর যেরূপ পর্যায়ে স্পষ্ট হইয়াছিল আজ সর্বত্র সেরূপ পর্যায়ে সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, অনেক স্থানে উলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমার স্মৃতিতে জীবনের স্তরপর্যায় আজ হয়তো সকল জায়গায় ঠিক পরে পরে প্রকাশ পাইতেছে না, কোথাও হয়তো আগেকার কথা পরে, পরের কথা আগে আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব ইহাকে জীবনের পুরাবৃত্ত বলা চলে না— ইহা স্মৃতির ছবি। ইহার মধ্যে অত্যন্ত যথাযথ সংবাদ কেহ প্রত্যাশা কবিবেন না— অতীত জীবন মনের মধ্যে যে-রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছে এই লেখায় সেই মূর্তিটি দেখা যাইবে।

নিজেকে নিজের বাহিরে দেখিবার একটা বয়স আছে। সেই বয়সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে নিজের জীবনক্ষেত্র নিজের কাছে অপরাহ্ণের আলোকে ছবির মতো দেখা দেয়। অন্যান্য নানা ছবির মতো সেই জীবনের ছবিও সাহিত্যের পটে আঁকা চলে। কয়েক বৎসর হইল তেমনি করিয়া অতীত জীবনের কথা কয়েক পাতা লিখিয়াছিলাম।

জীবনের সকল স্মৃতি স্তূপাকার করিয়া ধরিলে তাহার কোনো শ্রী থাকে না। সেইজন্য আমি একটি সূত্র বাহিয়া স্মৃতিগুলিকে সাজাইতেছিলাম। সেই সূত্রটিই আমার জীবনের প্রধান সূত্র, অর্থাৎ তাহা আমার লেখক-জীবনের ধারা।

এই ধারাটিকে আমার স্মৃতির দ্বারা অনুসরণ করিয়াছিলাম— সন্ধান-সংগ্রহ বিচারের দ্বারা নহে। এইজন্য, একটা গল্পমাত্রের যেটুকু গুরুত্ব ইহাতে তাহার বেশি গুরুত্ব নাই।

জন্ম-১৭৮৩ শক। ২৫শে বৈশাখ

১২৬৮ সাল। ঐ

১৮৬১ খৃস্টাব্দ। ৭ই মে

১৭৮৩।০।২৪।৫৩

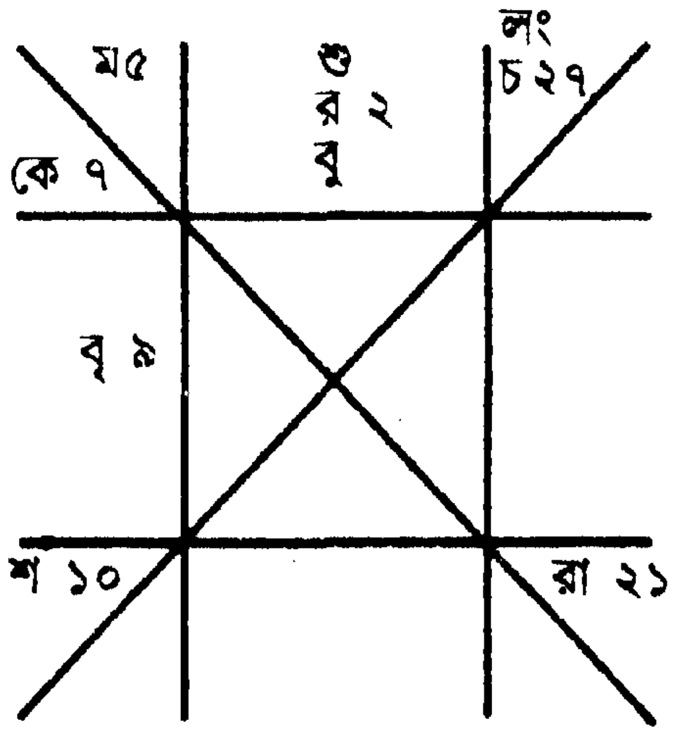

কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী সোমবার রেবতী মীন শুক্রের দশা ভোগা ১৪।৩।১১।৩৯

[প্রভাতে ২-৩৮-৩৭ সেকেন্ড গতে জন্ম]

এই কারণেই সম্পাদকমহাশয় যখন এই লেখাটিকে বাহির করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন তখন এই কথা মনে করিয়াই সংকোচ পরিহার করিলাম যে, আমারই জীবন বলিয়া ইহার গৌরব নহে, কোনো মানবজীবনের ছবি বলিয়া সাহিত্যে ইহা স্থান দাবি করিতে পারে— সে দাবি অসংগত হইলে ডিস্‌মিস্‌ হইতে বিলম্ব হইবে না।

ইহার মধ্যে একটা আশ্বাসের কথা এই যে, যেটুকু লিখিয়াছি তাহা বেশি নহে, তাহা জীবনের আরম্ভ-অংশটুকু মাত্র। —দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি জন্ম-তারিখ লইয়া মতবিরোধ হওয়ায় কিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরে কালিম্পং হইতে রবীন্দ্রনাথ যে-পত্র লেখেন তাহা নিম্নে সংকলিত হইল :

'রোসো, আগে তোমার সঙ্গে জন্ম-তারিখের হিসেব-নিকেশ করা যাক। তুমি হলে হিসেবী মানুষ। যে-বছরের ২৫শে বৈশাখে আমার জন্ম সে-বছরে ইংরেজি পাঁজি মেলাতে গেলে চোখে ঠেকবে ৬ই মে। কিন্তু ইংরেজের অদ্ভুত রীতি অনুসারে রাত দুপুরের পরে ওদের তারিখ বদল হয়, অতএব সেই গণনায় আমার জন্ম ৭ই।— তর্কের শেষ এখানেই নয়, গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্তে বাংলা পাঁজির দিন ইংরেজি পাঁজির সঙ্গে তাল রেখে চলবে না— ওরা প্রাগ্রসর জাত, পঁচিশে বৈশাখকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে— কয়েক বছর ধরে হল ৭ই, তার পরে দাঁড়িয়েছে ৮ই। তোমরা ওই তিন দিনই যদি আমাকে অর্ঘ্য নিবেদন কর, ফিরিয়ে দেব না, কোনোটাই বে-আইনী হবে না। এ কথাটা মনে রেখো। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫।'

—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ১৯৬

অতঃপর জীবনস্মৃতির বিভিন্ন অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ -সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নূতন তথ্য বা বর্ণনা গ্রন্থপরিচয়ে একে একে সন্নিবেশিত হইল।

'শিক্ষারম্ভের' পূর্ববর্তী একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধ হইতে নিম্নে সংকলিত হইল :

'রবির জন্মের পর হইতে আমাদের পরিবারে জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল ভট্টাচার্যেরা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত ছিল রবির জাতকর্ম উপলক্ষ্যে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল, সেই পিঁড়ির চারি ধারে পিতার আদেশে ছোটে ছোটো গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারি দিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল— রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।'

—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৪৭২
অপিচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩৭৫, পৃ ১৫২

'ঘর ও বাহির' পরিচ্ছেদের অনুবৃত্তিস্বরূপ একটি বাল্যস্মৃতি 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃত হইল :

'সেদিন হঠাৎ এক সময়ে জানি নে কেন ছেলেবেলাকার একটা ছবি খুব স্পষ্ট করে আমার মনে জেগে উঠল। শীতকালের সকাল বোধ হয় সাড়ে-পাঁচটা। অল্প অল্প অন্ধকার আছে। চির-অভ্যাস-মত ভোরে উঠে বাইরে এসেছি। গায়ে খুব অল্প কাপড়, কেবল একখানা সুতোর জামা এবং ইজের। এইরকম খুব গরিবের মতোই আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। ভিতরে

ভিতরে শীত করছিল— তাই একটা কোণের ঘর, যাকে আমরা তোষাখানা বলতুম, যেখানে চাকররা থাকত, সেইখানে গেলুম। আধা-অন্ধকারে জ্যোতিদার চাকর চিন্তে লোহার আঙটায় কাঠের কয়লা জ্বালিয়ে তার উপরে ঝাঁঝরি রেখে জ্যোদা'র জন্যে রুটি তোস্ করছে। সেই রুটির উপর মাখন গলার লোভনীয় গন্ধে ঘর ভরা। তার সঙ্গে ছিল চিন্তের গুন্‌গুন্ রবে মধুকানের গান, আর সেই কাঠের আগুন থেকে বড়ো আরামের অল্প-একটুখানি তাত। আমার বয়স বোধ হয় তখন নয় হবে : ছিলুম স্রোতের শ্যাওলার মতো— সংসারপ্রবাহের উপরতলে হালকাভাবে ভেসে বেড়াতুম— কোথাও শিকড় পৌঁছয় নি— যেন কারও ছিলুম না, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত চাকরদের হাতেই থাকতে হত ; কারও কাছে কিছুমাত্র আদর পাবার আশা ছিল না। জ্যোদা তখন বিবাহিত, তাঁর জন্যে ভাববার লোক ছিল, তাঁর জন্যে ভোরবেলা থেকেই রুটি-তোস্ আরম্ভ। আমি ছিলুম সংসারপদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে— সেখানে ফুল ছিল না, ফল ছিল না, ফসল ছিল না— কেবল একলা বসে ভাববার মতো আকাশ ছিল। আর, জ্যোদা পদ্মার যে কূলে ছিলেন সেই কূল ছিল শ্যামল— সেখানকার দূর থেকে কিছু গন্ধ আসত, কিছু গান আসত, সচল জীবনের ছবি একটু-আধটু চোখে পড়ত। বুঝতে পারতুম ওইখানেই জীবনযাত্রা সত্য। কিন্তু পার হয়ে যাবার খেয়া ছিল না— তাই শূন্যতার মাঝখানে বসে কেবলই চেয়ে থাকতুম আকাশের দিকে। ছেলেবেলায় বাস্তব জগৎ থেকে দূরে ছিলুম বলেই তখন থেকে চিরদিন 'আমি সুদূরের পিয়াসী'। অকারণে ওই ছবিটা অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে মনে জেগে উঠল।'

—পথে ও পথের প্রান্তে, পত্রসংখ্যা ৩২, ১৪ মার্চ ১৯২৯

বহুদিন পূর্বের একটি চিঠিতেও এই স্মৃতিচিত্রটিই পাওয়া যায় :

'দিনযাপনের আজ আর-এক রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট করে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সবশেষের ঘরে আমাদের ইস্কুলঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছেঁড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম, যখন তোষাখানার ঘরে শীতকালের সকালে চিন্তা বলে একটা চাকর গুন্ গুন্ স্বরে মধুকানের সুরে গান করতে করতে মাখন দিয়ে রুটি তোস্ করত— তখন আমাদের গায়ে গরম কাপড় ছিল না, একখানা কামিজ পরে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দবিগলিত নবনীসুগন্ধ রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধদুরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শুনতুম— সেই-সমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্তমানের করে দেখছিলুম এবং সেই-সমস্ত দিনগুলির সঙ্গে এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারি এক রকম সুন্দর ভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল— ঠিক যেন আমার সেই ছেলেবেলাকার খোলা জানলার ধারে বসে এই পদ্মার একটি দৃশ্যখণ্ড দেখছি বলে মনে হচ্ছিল।

—ছিন্নপত্র, ২৭ জুন ১৮৯৪

নর্মাল স্কুলের শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পরে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিতর্পণ' উপলক্ষে (২০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) এভাবে স্মৃতিচারণ করেন :

'সেই যুগে নর্মাল স্কুলে কোনোমতে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্যন্ত আমার উন্নতি হয়েছিল। বংশে ধনমর্যাদা না থাকলে তাও বোধ হয় ঘটত না। তখন যে ভাষাকে সাধুভাষা বলা হোত অর্থাৎ যে ভাষা ভুল করে আমাদের মাতৃভাষার পাড়ায় পা দিলে গঙ্গাস্নান না করে ঘরে ঢুকতেন না তাঁর সাধনার জন্যে লোহারাম শিরোরত্নের ব্যাকরণ এবং আদ্যানাথ পণ্ডিতমশায়ের সমাসদর্পণ আমাদের অবলম্বন ছিল। আজকের দিনে শুনে সকলের আশ্চর্য

লাগবে যে, দ্বিগু সমাস কাকে বলে সুকুমারমতি বালকের তাও জানা ছিল। তখনকার কালের পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা দেখলেই জানা যাবে সেকালে বালকমাত্রই সুকুমারমতি ছিল।'

—"হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিতর্পণের জন্য"। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ। শান্তিনিকেতন

'নর্মাল স্কুল' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হরনাথ পণ্ডিতের সহিত 'গিন্নি' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের সাদৃশ্য পাণ্ডুলিপির নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি-কয়টিতে পরিস্ফুট :

'এই পণ্ডিতটি ক্লাসের ছেলেদের অদ্ভুত নামকরণ করিয়া কিরূপ লজ্জিত করিতেন সাধনায়[২০] গিন্নি[২১]-নামক যে গল্প বাহির হইয়াছিল তাহাতে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর-একটি ছেলেকে তিনি ভেট্‌কি বলিয়া ডাকিতেন, সে বেচারার গ্রীবার অংশটা কিছু প্রশস্ত ছিল।

—দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি

'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায়ের বিজ্ঞানশিক্ষক 'সীতানাথ দত্ত' সম্ভবত সীতানাথ ঘোষ হইবেন। সীতানাথ নামে অন্য কোনো বৈজ্ঞানিকের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তখন যাতায়াত ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষ (১২৪৮-৯০) মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৩৮৮) এবং যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের 'বৈজ্ঞানিক সীতানাথ' নামক আলোচনায় (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, পৃ ২১৩-১৫) পাওয়া যাইবে। শেষোক্ত প্রবন্ধে ইহাও জানা যায় যে, "দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ১৮৭২ সনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকত্ব প্রদান করেন।"

'কাব্যরচনাচর্চা' পরিচ্ছেদে অনুল্লিখিত একটি নূতন কবিতার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে দেখা যায় ; এ স্থলে উদ্‌ধৃত হইল :

'মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়— তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন, আত্মীয়রা বললেন ছেলেটির লেখবার হাত আছে।'

—ছেলেবেলা, অধ্যায় ১১

'পিতৃদেব' পরিচ্ছেদে ৪৩৬ পৃষ্ঠায় যে মহানন্দ মুনশির উল্লেখ আছে রবীন্দ্রনাথ কোনো সময় এক মৌখিক ছড়ায় তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'ঘরোয়া' গ্রন্থের আরম্ভে অবনীন্দ্রনাথ সেই ছড়ার এই কয়টি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করিয়াছেন :

'মহানন্দ নামে এ কাছারিধামে
আছেন এক কর্মচারী,
ধরিয়া লেখনী লেখেন পত্রখানি
সদা ঘাড় হেঁট করি।...
হস্তেতে ব্যজনী ন্যস্ত,
মশা মাছি ব্যতিব্যস্ত—
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস...'

২০ বস্তুত 'হিতবাদী'তে।
২১ দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ ৪১৫-১৯। সুলভ অষ্টম খণ্ড পৃ ৫০২-৫০৪

এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত উপনয়ন অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ ও প্রধান আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ ১৭৯৪ শকের চৈত্রের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান। উপনয়ন। সমাবর্তন।' এই নামে (পৃ ২০৩-২০৬) মুদ্রিত হইয়াছিল। সেখানে 'তিন বটু'র মধ্যে কেবল অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

'হিমালয়যাত্রা' পরিচ্ছেদে বোলপুর-ভ্রমণের যে বৃত্তান্ত আছে জীবনস্মৃতি লিখিবার বহু পরে 'আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা'-নামক প্রবন্ধে (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০) প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ তাহার এক বিশদ ও গভীরতর বর্ণনা দিয়াছেন :

'আমার বয়স যখন অল্প পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে যাত্রা। ইটকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মুক্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্ব নিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা-খাঁচার পাখি— কেবল চলার স্বাধীনতা নয়, চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ— এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে— এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ সমল করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোকচলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণঠেসা করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ; কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা-আঁশ-ওয়ালা কাঠের টুকরোর মতো, কোনোটা স্ফটিকের-দানা-সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ।… আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানা রকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন-উপার্জনের লোভে নয়, পাথর-উপার্জন করতেই। মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোটো ঝর্না ঝরে পড়ত। সেখানে জমেছিল একটি ছোটো জলাশয়, তার সাদাটে ঘোলাজল, আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার মতো যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাখা-প্রশাখায়, ছোটো ছোটো মাছ সেই স্রোতে উজান মুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশুভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্র্যাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম। খোয়াইয়ের স্থানে স্থানে যেখানে মাটি জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনোজাম বুনোখেজুর— কোথাও বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূর মাঠে গোরু চরছে।

সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায়-রৌদ্রে-বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগৎ, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল, এখানে না আছে কোনো জীবজন্তুর বাসা ; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট্‌-বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার শখ ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর আর নীচে লাল কাঁকরের রঙ পড়েছে মোটা তুলিতে নানা রকমের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখায় ; সৃষ্টিকর্তার ছেলেমানুষি ছাড়া এর মধ্যে আর-কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল ; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর, সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন-মনে আমার বেলা কেটেছে অনেক দিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাবদিহি ছিল না।··· তখন শান্তিনিকেতনে আর-একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ছিল। যে সর্দার[২২] ছিল এই বাগানের প্রহরী এক কালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্য মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনের যে অতি প্রাচীন যুগল ছাতিমগাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এক কালে মস্ত মাঠের মধ্যে ওই দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়াপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিমতলায় হয় ধন, নয় প্রাণ, নয় দুইই হারিয়েছে সেই শিথিল রাষ্ট্রশাসনের কালে। এই সর্দার সেই ডাকাতিকাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ততিলকলাঞ্ছিত ভদ্রবংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রুতি কানে এসেছে।

'একদা এই দুটিমাত্র ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূরপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবনসিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানের এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রুক্ষ রিক্তভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জনবাস। যখন রেল লাইন স্থাপিত হল, তখন বোলপুর স্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রাভঙ্গ করতেন। আমি যে-বারে তাঁর সঙ্গে এলুম সে-বারেও ডালহৌসি পাহাড়ে যাবার পথে তিনি বোলপুরে অবতরণ করেন। আমার মনে পড়ে, সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্ত কালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিমগাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না— সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে একটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে, আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছবি আমার মনের মধ্যে

২২ 'আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার,··· মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে।'— আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

কোন্ রঙে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত, সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম— এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল -শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদ্‌রূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর-কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা।' —আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (১৩৫৮), পৃ ৪৮-৫৬

প্রথম হিমালয়দর্শনের নিম্নোদ্‌ধৃত স্মৃতিটুকু এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

'তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয় যাচ্ছ। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম। তার আগে ভূগোলে পড়েছিলুম, পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিস আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কী যে কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় করেছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেছ— পাঠানকোট সেইরকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো 'কর খল', 'জল পড়ে', 'পাতা নড়ে'— এর বেশি আর নয়। তার পরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠতে লাগলুম তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, হিমালয় যত বড়োই হোক-না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে ; মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়।' শান্তিনিকেতন, ১ ভাদ্র ১৩২৫

—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১২

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সংগীত কিরূপ ভালোবাসিতেন তাহা এই পরিচ্ছেদের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত। এ বিষয়ে সৌদামিনী দেবী 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধে বলেন :

'সংগীত বিশেষরূপ ভালো না হইলে তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] শুনিতে ভালোবাসিতেন না। প্রতিভার[২৩] পিয়ানো বাজানো এবং রবির গান শুনিতে তিনি ভালোবাসিতেন। বলিতেন রবি আমাদের বাংলা দেশের বুলবুল।'

—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৪৭৪ অপিচ, রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পৃ ১৫৬

'ঘরের পড়া' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত 'কুমারসম্ভব'এর অনুবাদপ্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত অনুবাদের পাঠবিশেষ 'মদন ভস্ম' নামে 'ভারতী'র প্রথম বর্ষে (১২৮৪) মাঘ সংখ্যায় 'সম্পাদকের বৈঠক' বিভাগে (পৃ ৩২৯-৩১) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ; অনুবাদকের নাম ছিল না।[২৪]

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িবার কালে নিম্নলিখিত ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল ; জীবনস্মৃতিতে ইহার উল্লেখ নাই।—

'রবীন্দ্রনাথ তখন [১৮৭৫] বাড়িতে রামসর্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] ও রামসর্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই 'সরোজিনী'র প্রুফ সংশোধন করিতাম। রামসর্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিতমহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া কোন্ স্থানে কী করিলে ভালো হয় সেই মতামত প্রকাশ

২৩ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' পরিচ্ছেদ (পৃ ৪৮৩) দ্রষ্টব্য।

২৪ পৃ ৪৫১, পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য। উত্তরসূরী পত্রের রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যায় (১৩৬৮) মুদ্রিত পূর্বতন পাঠ দ্রষ্টব্য, পৃ ১৬১-৬৫।

করিতেন। রাজপুত-মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্যরচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন, এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কই? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যে 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'[২৫] এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।' —জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৪৭

বিদ্যালয়ত্যাগের পূর্বের ও অব্যবহিত পরের জীবন পূর্বোক্ত 'আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন :

'জীবনস্মৃতিতে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকালসন্ধ্যার ছায়া এপার-ওপার করত— হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ে জলে-ভরা নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ওইখানেই নানা রঙে ঋতুর পর ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।...

'যখন আমার বয়স তেরো, তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। তখনকার অপ্রখর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত 'হরিবোল' শ্মশান যাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ুবৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে-সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি, অথচ ভার গেল কমে।'[২৬]
—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (১৩৫৮), পৃ ৩৪-৩৬

২৫ গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী নাটক'এর (১৮৭৫) অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য গীতবিতান, তৃতীয় খণ্ড

২৬ কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, একত্র-বাঁধানো বিবিধার্থসংগ্রহ, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বাংলা রবিন্সন ক্রুসো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত [? বঙ্গাধিপ পরাজয়], বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম। —'বঙ্কিমচন্দ্র', সাধনা, বৈশাখ ১৩০১

দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫৫০ (সুলভ পঞ্চম খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৮০৭) জীবনস্মৃতি প্রথম পাণ্ডুলিপিতে 'মৎস্যনারীর গল্প' উল্লিখিত হইয়াছে।

'ঘরের পড়া' পরিচ্ছেদের উপসংহারে প্রথম পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে :

'এ কথা বলা বাহুল্য, তখন বিদ্যাপতি অথবা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদ অবাধে পড়িবার উপযুক্ত বয়স আমার হয় নাই, কিন্তু আমি সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলাম। ইহাতে আমার বালককালের কল্পনাকে নিঃসন্দেহই কিছু আবিল করিয়াছিল কিন্তু সে আবিলতা এক সময়ে আপনিই কাটিয়া গেল, কিন্তু পদগুলির গভীর সৌন্দর্য আমার অন্তঃকরণের সহিত জড়িত হইয়া গেছে।

'কেবল বৈষ্ণবপদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে-কোনো বই বাহির হইত আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না। মনে আছে, দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' বইখানি আমার কোনো সতর্ক আত্মীয়ার হাত হইতে সংগ্রহ করিয়া পড়িতে আমাকে নানাপ্রকার কৌশল করিতে হইয়াছিল। এই-সকল বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকালপরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্যভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি— প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাল্যরচনা 'করুণা'-নামক গল্প তাহার নমুনা। কিন্তু এই অকালোচিত জ্ঞানগুলি মস্তিষ্কের উপরিভাগেই ছিল, তাহারা হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বরঞ্চ এখনকার কালের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাই, যথার্থভাবে পরিণত হইয়া উঠিতে আমার সুদীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। আমার বালকবুদ্ধি আমাকে অনেক দিন ত্যাগ করে নাই— আমি অধিক বয়সেও নানা বিষয়ে অদ্ভুত রকম কাঁচা ছিলাম। একটা-কিছু জ্ঞানে জানা এবং তাহাকে আত্মসাৎ করার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে— আমার বালককালের সংসারজ্ঞান তাহার একটা দৃষ্টান্ত। এবং সেই দৃষ্টান্ত হইতেই আজ আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি, ইংরাজি হইতে আমরা যে-সকল শিক্ষা খুব পাইয়াছি বলিয়া চারি দিকে ফলাইয়া বেড়াইতেছি, যদি কালক্রমে সেই শিক্ষা যথার্থভাবে আমাদের প্রকৃতিগত হয় তখন বুঝিতে পারিব— আমাদের পূর্বের অবস্থা কিরূপ অদ্ভুত অসত্য এবং হাস্যকর এবং তখন আমাদের আস্ফালনও যথেষ্ট শান্ত হইয়া আসিবে।

'এই উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা বলিয়া লইব। যখন আমার বয়স নিতান্তই অল্প ছিল এবং দূষিতবুদ্ধি আমার জ্ঞানকেও স্পর্শ করে নাই, এমন সময় একদিন বড়দাদা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও ব্রহ্মচর্যপালন সম্বন্ধে আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ আমার মনে এমনি গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, ব্রহ্মচর্য হইতে স্খলন আমার কাছে বিভীষিকাস্বরূপ হইয়াছিল। বোধ করি, এইজন্য বাল্যবয়সে অনেক সময়ে আমার জ্ঞান ও কল্পনা যখন বিপদের পথ দিয়া গেছে তখন আমার সংকোচপরায়ণ আচরণ নিজেকে ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।'

'বাড়ির আবহাওয়া' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত 'নবনাটক' অভিনয় সম্পর্কে পূর্ণতর পরিচয় এ স্থলে সংকলিত হইল :

'নাট্যশালা সমিতির'[২৭] অনুরোধে রামনারায়ণ তর্করত্ন অল্প সময়ের মধ্যেই 'নব নাটক'-নামক নূতন নাটক প্রণয়ন করিলেন। ১২৭৩ সনের ২৩শে বৈশাখ এক প্রকাশ্য সভা আহূত হইল এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নাটকখানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। সভাপতি প্যারীচাঁদ মিত্র রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রতিশ্রুত পুরস্কার বলিয়া প্রদান করিলেন। কেবল ইহাই নহে, গণেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির সহস্র খণ্ড মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় এবং গ্রন্থস্বত্বও নাট্যকারকে প্রদান করিলেন।'

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পৃ ১২

২৭ কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, এই পাঁচজনকে লইয়া গঠিত নাট্যসমিতি।— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ৯৬

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসাঁকো-বাসী বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০. টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

—রামনারায়ণের আত্মকথা, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৫, পৃ ৩৪

এই নির্দোষ আমোদপ্রমোদের আবহাওয়া-রচনায় দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহবাক্য তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন :

ওঁ

নাটোর
কালীগ্রাম ৪ঠা মাঘ ১৭৮৮
[১৬ জানুয়ারি ১৮৬৭]

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্য-দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে, কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার[২৮] উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্‌ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ

'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী' প্রসঙ্গে তাঁহার সরল ভাবুকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', হইতে উদ্‌ধৃত হইল :

'তাঁহাকে [অক্ষয়বাবুকে] অতি সহজেই April fool করা যাইত। একবার রবি গোঁপদাড়ি পরিয়া একজন পার্শী সাজিয়া, তাঁহাকে বড়ো ঠকাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম— বোম্বাই হইতে একজন পার্শী ভদ্রলোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে ইংরাজিসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান। অক্ষয় অমনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। রবি ছদ্মবেশী পার্শী হইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই রবিকে তিনি কতবার দেখিয়াছেন, কণ্ঠস্বর তাঁহার কত পরিচিত, কিন্তু ঐ যে পার্শী বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে সে তো শীঘ্র যাইবার নয়। অক্ষয় Byron, Shelly প্রভৃতি আওড়াইয়া খুব গম্ভীর ভাবে আলোচনা জুড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ চলিল, শেষে আমরা আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না, এমন সময় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তিনি "এ কে ?— রবি ?" বলিয়া রবির মাথায় যেমন এক থাপ্পড় মারিলেন, অমনি কৃত্রিম দাড়িগোঁপ সব খসিয়া পড়িল। অক্ষয় অবাক হইয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন ; তখনও কল্পনার নেশাটা তাঁহার মাথা হইতে যেন সম্পূর্ণ ছুটে নাই।'

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৫৩-৫৪

'গীতচর্চা' পরিচ্ছেদটির প্রথম পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত স্বতন্ত্ররূপ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'আমাদের পরিবারে গানচর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর

২৮ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০-৫৪)

সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে'[২৯] গান গাহিতেছি, বেশ মনে পড়ে।

'চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই-সমস্ত চোখে-দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কী নূতন অর্থ লাভ করে। হঠাৎ মনে হয়, আমরা যে জগতে আছি বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি— এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা, কিন্তু এইটেই সমস্তটা নয়। যখন এই বিপুল রহস্যময় প্রাসাদে সুর আর-একটা মহলের একটা জালনা ক্ষণিকের জন্য খুলিয়া দেয় তখন আমরা কী দেখিতে পাই! সেখানকার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নাই, সেইজন্য ভাষায় বলিতে পারি না কী পাইলাম— কিন্তু বুঝিতে পারি সেদিকেও অপরিসীম সত্য পদার্থ আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ প্রধানত বস্তু ও আলোক -রূপেই প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া আজ আমরা এই সূর্যের আলোকে বস্তুর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ পাঠ করিতেছি, আর কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারি না— কিন্তু এই অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর-কিছু না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতি বিচিত্র সংগীতরূপেই প্রকাশ পাইত তবে, অক্ষররূপে নহে, বাণীরূপেই আমরা সমস্ত পাইতাম। গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার-আয়তন-হীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে— তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যে-ভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কত রকম ভাবেই যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।

'সেই সময় জ্যোতিদাদার পিয়ানোযন্ত্রের উত্তেজনায়, কতক-বা তাঁহার রচিত সুরে কতক-বা হিন্দুস্থানি গানের সুরে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম। তখন বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শনে বাহির হইতেছিল এবং আমরা তাহাই লইয়া মাতিয়াছিলাম। এই সারদামঙ্গলের আরম্ভ-সর্গ হইতেই বাল্মীকিপ্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই-একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভায় গানরূপে স্থান পাইয়াছে।

'তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া স্টেজ বাঁধিয়া এই বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হইল। তাহাতে আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্চে আমার এই প্রথম অবতারণ। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন; তিনি এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তিপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

'ইহার পরে 'দশরথকর্তৃক মৃগভ্রমে মুনিবালকবধ' ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহাও অভিনীত হইয়াছিল। আমি তাহাতে অন্ধমুনি সাজিয়াছিলাম। এই গীতিনাট্যের অনেকগুলি গান পরে বাল্মীকিপ্রতিভার অন্তর্গত হইয়া তাহারই পুষ্টিসাধন করিয়াছে।'

—প্রথম পাণ্ডুলিপি

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি এবং 'প্রবাসী'তে 'গীতচর্চা' অধ্যায়ের শেষাংশ ছিল:

'জ্যোতিদাদার পিয়ানোযন্ত্র যখন খুব চলিতেছে সেই সময়ে সেই উৎসাহেই কতক তাঁহার সুরে কতক হিন্দি গানের সুরে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম।

২৯ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত ব্রহ্মসংগীত।

তখন এই নাটক লিখিবার একটি উপলক্ষ ঘটিয়াছিল।

'বৎসরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিকগণকে একত্র করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের বাড়িতে 'বিদ্বজ্জনসমাগম'-নামক এক সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সম্মিলন উপলক্ষে গান বাজনা আবৃত্তি ও আহারাদি হইত।

'দ্বিতীয় বৎসরে দাদারা এই সম্মিলনে একটি নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিলে এই সভার উপযুক্ত হইবে তাহারই আলোচনাকালে দস্যুরত্নাকরের কবি হইবার কাহিনীই সকলের চেয়ে সংগত বলিয়া বোধ হইল। ইহার কিছু পূর্বেই আর্যদর্শনে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের 'সারদামঙ্গল সংগীত' বাহির হইয়া আমাদের সকলকেই মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এই কাব্যে বাল্মীকির কাহিনী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহারই সঙ্গে দস্যু রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল। তাহার পর জ্যোতিদাদা বাজাইতে লাগিলেন, আমি গান তৈরি করিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়বাবুও মাঝে মাঝে যোগ দিলেন। অক্ষয়বাবুর রচিত দুই-তিনটি গান বাল্মীকিপ্রতিভার মধ্যে আছে।

'তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া স্টেজ বাঁধিয়া বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সাজিয়াছিলাম বাল্মীকি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল।[৩০] বাল্মীকিপ্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়াছে। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন [অভিনয়মঞ্চ হইতে আমি তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলাম না কিন্তু শুনিতে পাইলাম][৩১]— তিনি খুশি হইয়া গিয়াছিলেন।'

—দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি ও প্রবাসী (পৃ ৩১৯), মাঘ ১৩১৮

গ্রন্থে এই অংশ বর্জিত এবং স্বতন্ত্র 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অধ্যায় সংযোজিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদ্যরচিত সুরের সহিত রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের গান-রচনার পূর্ণতর একটি চিত্র এ স্থলে সংকলিত হইল:

'এই সময়ে আমি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র সেটি আরো কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেইসময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্মা সিগার টানিতে টানিতে মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত তখনি বুঝা যাইত যে, এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুকরাটি সম্মুখে যাহা পাইতেন, এমন-কি, পিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া 'হয়েছে হয়েছে' বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে শুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য ক্বচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না।'

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৫৫-৫৬

'সাহিত্যের সঙ্গী' পরিচ্ছেদে ৪৬০ পৃষ্ঠায় 'বউঠাকুরানী'র বিহারীলালকে একখানি আসন দিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে বিহারীলালের গ্রন্থাবলী হইতে 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা অংশ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল:

৩০ প্রথম অভিনয়ে শরৎকুমারীদেবীর কন্যা সুশীলাদেবী লক্ষ্মী সাজিয়াছিলেন।

৩১ এই অংশ প্রবাসীতে আছে, পাণ্ডুলিপিতে নাই।

'কোনো সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম— 'সাধের আসন'। সাধের আসনে অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া 'সারদামঙ্গল' হইতে এই শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও ?[৩২]

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্‌ধৃত শ্লোকার্ধের উত্তর চাহেন। আমিও উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি এবং বাটিতে আসিয়া তিনটি শ্লোক লিখি। কিছুদিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই! তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে !! এই ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল— 'সাধের আসন।'

'সাধের আসন' রচনার ইতিহাসটি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁহার স্মৃতিকথায় ('পুরাতন প্রসঙ্গ', প্রথম পর্যায়, পৃ ১৭২) এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ; দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে স্বহস্তরচিত একখানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সে-উপলক্ষে বিহারী 'সাধের আসন' লিখেন।'

—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৫, পৃ ১৯

'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ের সূচনাংশ প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এরূপ আছে :

'আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমাদের পরিবারে বিদেশী প্রথার কতকগুলি বাহ্য অনুকরণ অনেক দিন হইতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ সাগ্নিকের পবিত্র অগ্নির মতো বহুকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। আমার পিতামহ এবং ছোটোকাকা মহাশয় বিলাতের সমাজে বর্ষযাপন করিয়া ইংরাজের বেশ পরিয়া আসেন নাই, এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব হইয়া আছে। বড়দাদা বাল্যকাল হইতে আন্তরিক অনুরাগের সহিত মাতৃভাষাকে জ্ঞান ও ভাব -সম্পদে ঐশ্বর্যবান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। মেজদাদা বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভাবপ্রকাশের ভাষা বাংলাই রহিয়া গেছে। সেজদাদার অকালে মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু তিনিও নিজের চেষ্টায় ও মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞানের যে-পরিমাণ চর্চা করিয়াছিলেন তাহা বাংলাভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। জ্যোতিদাদাও তরুণবয়স হইতে অবিশ্রাম বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছেন। আমাদের পরিবারে পিতৃদেবকে ইংরাজি পত্র লেখা একেবারে নিষিদ্ধ। শুনিয়াছি নূতন আত্মীয়তাপাশেবদ্ধ কেহ তাঁহাকে একবার ইংরাজি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ফেরত আসিয়াছিল। আমরা আপনা-আপনির মধ্যে কেহ কাহাকে এবং পারৎপক্ষে কোনো বাঙালিকে ইংরাজিভাষায় পত্র লিখি না— আমাদের এই আচরণটিকে যে বিশেষভাবে

৩২ সারদামঙ্গল, প্রথম সর্গে ১৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম, আশা করি, একদা অদূর ভবিষ্যতে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ বলিয়াই গণ্য হইবে।

'আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন, এ কথা সকলেই জানেন— কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই ; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাব-লোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।'

হিন্দুমেলার উৎপত্তি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর একটি উক্তি উদ্ধারযোগ্য :

'আমি ইংরাজি ১৮৬৬ সালে 'Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' আখ্যা দিয়া ইংরাজিতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব' নামে এই গ্রন্থে (১২৮৯) সন্নিবিষ্ট হইল।... এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।'

—বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা

এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (পৃ ১২৭-২৮) পাওয়া যায় :

'এই সময়ে [১৮৬৭] শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্‌যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহে 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়েরা হইলেন মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ এবং মনোমোহন বসুও এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন এবং হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে নাও হয়, সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition এর) পত্তন করিল।'

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে (পৃ ৪৬৯) অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন :

'গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই হিন্দুমেলার সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক হন।... মেলার উৎসাহদাতাদের মধ্যে দুর্গাচরণ লাহা, কৃষ্ণদাস পাল, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।'

'হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া' যে কবিতা পাঠের উল্লেখ (পৃ ৪৬৩) এই পরিচ্ছেদে আছে উহা হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত (১৮৭৭) দ্বিতীয় কবিতা। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তিনি স্বরচিত কবিতা প্রথম পাঠ করেন। জীবনস্মৃতিতে এই কবিতাপাঠের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। সেই বৎসরের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সংযুক্ত হইয়া 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কবিতাটির সন্ধান সমসাময়িক কোনো পত্রিকায় পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় পুস্তিকার পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

এই পরিচ্ছেদে "জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে" স্থাপিত যে-স্বাদেশিকসভার (সঞ্জীবনী সভা) কথা বলা হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল :

'সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপালবাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সভার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল ভাঙা

ছোটো টেবিল একখানি, কয়েকখানি ভাঙা চেয়ার ও আধখানা ছোটো টানাপাখা— তারও আবার এক দিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

'জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষমহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি ; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

'আদি-ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল-রেশমে-জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত-ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত— সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য (অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত। কার্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্‌ভাবিত এক গুপ্তভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্তভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা'কে 'হামচুপামু হাফ্' বলা হইত।'

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৬৬-৬৭

'ভারতী' পরিচ্ছেদে 'কবিকাহিনী' কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রসঙ্গে প্রথম পাণ্ডুলিপিতে আছে :

'বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্য-সমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম। ইহার পর ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটে আমার প্রভাতসংগীতের সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই বোধ করি আমার শেষ লাভ। প্রথম হইতে সাধারণের নিকট হইতে বাহবা পাইয়া আমি যে রচনাকার্যে অগ্রসর হইয়াছি, এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে আমি উৎসাহদাতা বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম। ইঁহার সহিত নিরন্তর সাহিত্যালোচনায় আমি যথার্থ বললাভ করিয়াছিলাম— ইঁহারই কার্পণ্যহীন উৎসাহ আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু আমার রচনার আরম্ভকালে সমালোচক-সম্প্রদায় বা পাঠক-সাধারণের নিকট এ সম্বন্ধে আমি অধিক ঋণী নহি।'

—প্রথম পাণ্ডুলিপি

'আমেদাবাদ' পরিচ্ছেদে শাহিবাগ-লাইব্রেরিতে "পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ" পাঠের যে উল্লেখ রহিয়াছে (পৃ ৪৬৮) রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত সেই গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত। উহার নামপত্রের নকল নিম্নে দেওয়া হইল :

কাব্যসংগ্রহঃ। অর্থাৎ। কালিদাসাদি মহাকবিগণ। বিরচিত ত্রিপঞ্চাশৎ। উত্তম সম্পূর্ণ কাব্যানি॥ শ্রীডাক্তার যোহন হেবরলিন কর্তৃক। সমাহৃত-মুদ্রাঙ্কিতানি॥ শ্রীরামপুরীয় চন্দ্রোদয়যন্ত্রে। ১৮৪৭।

এই গ্রন্থের দুইটি পৃষ্ঠায়, সম্ভবত পরবর্তীকালে, রবীন্দ্রনাথ 'শৃঙ্গারশতক' ও 'নীতিশতক' হইতে দুইটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৮, পৃ ৪৯৯।

এই পরিচ্ছেদে ৪৬৮ "সমস্তদিন ডিক্‌শনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই" পড়িবার যে উল্লেখ

আছে তাহারই ফলস্বরূপ সেই বৎসরের (১২৮৫) ভারতীতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য :

স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য— শ্রাবণ ১২৮৫
বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য— ভাদ্র ১২৮৫
পিত্রার্কা ও লরা— আশ্বিন ১২৮৫
গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ— কার্তিক ১২৮৫
নর্মান জাতি ও অ্যাংলো-নর্মান্ সাহিত্য— ফাল্গুন ১২৮৫

'বাল্মীকিপ্রতিভা' পরিচ্ছেদে ৪৮৩ পৃষ্ঠায় 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সাহিত্যসম্মিলনের যে উল্লেখ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ স্থলে উদ্‌ধৃত হইল :

'এই সময়ে জোড়াসাঁকো বাড়িতে জ্যোতিবাবুরা প্রতিবৎসর একটি 'সম্মিলনী' আহ্বান করিতেন। উদ্দেশ্য— সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপপরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে সদ্‌ভাব বর্ধিত হয়।... শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই সম্মিলনের নামকরণ করিয়া দিয়াছিলেন— 'বিদ্বজ্জনসমাগম'। এই সমাগমে তখন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত। এই উপলক্ষ্যে অনেক রচনা এবং কবিতাদিও পঠিত হইত, গীতবাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইত এবং সর্বশেষে সকলের একত্র প্রীতিভোজনে এই সাহিত্য-মহোৎসবের পরিসমাপ্তি হইত।'

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৫৭-৫৮

'ভারত-সংস্কারক' সংবাদপত্রের ২৪ এপ্রিল ১৮৭৪ (১২ বৈশাখ ১২৮১ শুক্রবার) সংখ্যায় সেই সভার প্রথম অধিবেশনের নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায় :

'আমরা গত সপ্তাহে... যে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, গত শনিবার রাত্রে [৬ বৈশাখ] তাহা কার্যে পরিণত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বাংলা গ্রন্থকার ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের অনেকে তাঁহাদিগের জোড়াসাঁকোর ভবনে সমবেত হন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে আমরা এই কয় ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম— রেবরন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো। সর্বসুদ্ধ ন্যূনাধিক ১০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রয়িতা মহাত্মারা ভদ্রোচিত অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নাই। সভাস্থলে একটি যুবা প্রথমে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপনী কবিতামালা উচ্চ গম্ভীর স্বরে ও উপযুক্ত ভাবভঙ্গীর সহিত অনর্গল আবৃত্তি করিলেন, তাহাতে আসর বেশ গরম হইয়া উঠিল। আমরা বহুদিনবিস্মৃত একটি জাতীয় ভাব অনুভব করিলাম, এবং ইংরাজাধীনে বা স্বাধীনরাজ্যে বাস করিতেছি বোধগম্য করিতে পারিলাম না। পরে কবিরত্ন [প্যারীমোহন] মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের গুণ ব্যাখ্যাপূর্বক একটি সংগীত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিলেন। তিনি তৎপরে স্বকৃত আর-একটি শ্রুতিমধুর গান করিলেন, তাহাতে বিলাতি দ্রব্যের সহিত এ দেশীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের সর্বনাশ হইল বলিয়া ইংলন্ডেশ্বরীর নিকট ক্রন্দন করা হইতেছে। অতঃপর ঠাকুর পরিবারের ছোটো ছোটো কয়েকটি বালকবালিকা চৌতাল প্রভৃতি তালে তানলয়বিশুদ্ধ সংগীত করিয়া সভাস্থবর্গকে চমৎকৃত করিল।... পরে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এক অঙ্ক নাটক[৩৩] পাঠ করিলেন, তাহাতে পুরুরাজা যবনশত্রু নিপাত করিবার জন্য সৈন্যদলকে

৩৩ পুরু-বিক্রম নাটক, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উত্তেজিত করিতেছেন এবং সৈন্যদল তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বীরমদে মাতিতেছে। তদনন্তর দ্বিজেন্দ্রবাবু স্বরচিত 'স্বপ্ন' বিষয়ক একটি সুন্দর কবিতা[৩৪] পাঠ করিলে শিশুরা সংগীত করিতে লাগিল এবং পান, গোলাপের তোড়া, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা নিমন্ত্রিতগণের প্রতি সমাদর প্রদর্শনপূর্বক সভাকার্য শেষ হইল।'

—'সেকালের কথা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, পৃ ১৭০-৭১

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বাল্মীকিপ্রতিভা যেদিন সাধারণের সমক্ষে প্রথম অভিনীত হয় সেদিন দর্শকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজকৃষ্ণ রায় 'বালিকা-প্রতিভা' নামে যে কবিতাটি লেখেন ('অবসরসরোজিনী' গ্রন্থে সংকলিত) সেই কবিতার পাদটীকায় অভিনয়ের সঠিক তারিখ জানা যায়— ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার।[৩৫]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -প্রণীত 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিনয়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

'যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে[৩৬] রবীন্দ্রনাথবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।'

—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮৮

বাল্মীকিপ্রতিভার এই প্রথম অভিনয় -দর্শনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন :

উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ, ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভ'রে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর ॥

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উৎসবে টাউনহলে 'কবিসম্বর্দ্ধনা' সভায় (১৪ মাঘ ১৩১৮) কবিতাটি গুরুদাসবাবু নিজে পাঠ করিয়াছিলেন।

'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত দ্বিতীয় বার বিলাত-যাত্রার প্রস্তাব সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্‌ধৃত পত্রখানি প্রণিধানযোগ্য :

প্রাণাধিক রবি—

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলন্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে, আমি 'বারিস্টার হইব'। তোমার এই কথার উপরে এবং তোমার শুভবুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে

৩৪ স্বপ্নপ্রয়াণ, প্রথম সর্গ।
৩৫ এই তথ্য শ্রীসুকুমার সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৩৬ 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থে যে স্থলে বাল্মীকি কবি হইলেন।

ইংলন্ডে যাইতে অনুমতি দিলাম। তুমি সৎপথে থাকিয়া কৃতকার্য হইয়া দেশেতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিবে, এই আশা অবলম্বন করিয়া থাকিলাম। সত্যেন্দ্র পাঠাবস্থাতে যতদিন ইংলন্ডে ছিলেন ততদিন··· টাকা করিয়া প্রতি মাসে পাইতেন। তোমার জন্য মাসে··· টাকা নির্ধারিত করিয়া দিলাম। ইহাতে যত পাউন্ড হয় তাহাতেই তথাকার তোমার যাবদীয় খরচ নির্বাহ করিয়া লইবে। বারে প্রবেশের ফী এবং বার্ষিক চেম্বার ফী আবশ্যকমতে পাইবে। তুমি এবার ইংলন্ডে গেলে প্রতিমাসে ন্যূনকল্পে একখানা করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। তোমার থাকার জন্য ও পড়ার জন্য সেখানে যাইয়া যেমন যেমন ব্যবস্থা করিবে তাহার বিবরণ আমাকে লিখিবে। গতবারে সত্যেন্দ্র তোমার সঙ্গে ছিলেন, এবারে মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। ইতি ৮ ভাদ্র ৫১।[৩৭]

—পত্রসংখ্যা ১৩৬, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -প্রকাশিত

'গঙ্গাতীর' পরিচ্ছেদের সূচনাংশের পাঠ প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এরূপ দেখা যায়:

'আরও তো অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি— ভালো জিনিস, প্রশংসার জিনিস অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু সেখানে তো আমার এই মা'র মতো আমাকে কেহ অন্ন পরিবেশন করে নাই। আমার কড়ি যে হাটে চলে না সেখানে কেবল সকল জিনিসে চোখ বুলাইয়া ঘুরিয়া দিনযাপন করিয়া কী করিব! যে বিলাতে যাইতেছিলাম সেখানকার জীবনের উদ্দীপনাকে কোনোমতেই আমার হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমি আর-একবার বিলাতে যাইবার সময় পত্রে লিখিয়াছিলাম—

''নিচেকার ডেকে বিদ্যুতের প্রখর আলোক, আমোদপ্রমোদের উচ্ছ্বাস, মেলামেশার ধুম, গানবাজনা এবং কখনো কখনো ঘূর্ণীনৃত্যের উৎকট উন্মত্ততা। এদিকে আকাশের পূর্বপ্রান্তে ধীরে ধীরে চন্দ্র উঠছে, তারাগুলি ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে, সমুদ্র প্রশান্ত ও বাতাস মৃদু হয়ে এসেছে; অপার সমুদ্রতল থেকে অসীম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা, এক অনির্বচনীয় শান্তি নীরব উপাসনার মতো ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আমার মনে হতে লাগল, যথার্থ সুখ কাকে বলে এরা ঠিক জানে না। সুখকে চাবকে চাবকে যতক্ষণ মত্ততার সীমায় না নিয়ে যেতে পারে ততক্ষণ এদের যথেষ্ট হয় না। প্রচণ্ড জীবন ওদের যেন অভিশাপের মতো নিশিদিন তাড়া করেছে; ওরা একটা মস্ত লোহার রেলগাড়ির মতো চোখ রাঙিয়ে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, হাঁপিয়ে, ধুঁইয়ে, জ্ব'লে, ছুটে প্রকৃতির দুই ধারের সৌন্দর্যের মাঝখান দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে চলে যায়। কর্ম ব'লে একটা জিনিস আছে বটে কিন্তু তারই কাছে আমাদের মানবজীবনের সমস্ত স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার জন্যেই আমরা জন্মগ্রহণ করি নি— সৌন্দর্য আছে, আমাদের অন্তঃকরণ আছে, সে দুটো খুব উঁচু জিনিস।'

'আমি বৈলাতিক কর্মশীলতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছি না। আমি নিজের কথা বলিতেছি। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার অন্নের মতোই আবশ্যক ছিল। যদিও খুব বেশিদিনের কথা নহে তবু ইতিমধ্যে সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গেছে। আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা ঊর্ধ্বফণা সাপের মতো প্রকাশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খর মধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের স্নিগ্ধচ্ছায়া খর্বতম হইয়া আসিয়াছে— এখন দেশে কোথাও অবসর নাই। হয়তো সে ভালোই— কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিবার সময় হয় নাই।

'বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর-একখানি পুরাতন চিঠি হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া দিই—

৩৭ ৫১ ব্রাহ্ম সংবৎ, বাংলা ১২৩৬ সাল হইতে গণনারম্ভ।

''যৌবনের আরম্ভ-সময়ে বাংলাদেশে ফিরে এলেম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিনে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারি দিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব— এই-সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি। আজ আমার চার দিকে নবজীবনের প্রবলতা ও চঞ্চলতা দেখে মনে হচ্ছে, আমারও হয়তো এরকম হতে পারত। কিন্তু আমরা সেই বহুকাল পূর্বে জন্মেছিলেম— তিনজন বালক— তখন পৃথিবী আর-একরকম ছিল। এখনকার চেয়ে অনেক বেশি অশিক্ষিত, সরল, অনেক বেশি কাঁচা ছিল। পৃথিবী আজকালকার ছেলের কাছে Kindergarten-এর কর্ত্রীর মতো— কোনো ভুল খবর দেয় না, পদে পদে সত্যকার শিক্ষাই দেয়— কিন্তু আমাদের সময়ে সে ছেলে-ভোলাবার গল্প বলত, নানা অদ্ভুত সংস্কার জন্মিয়ে দিত, এবং চারি দিকের গাছপালা প্রকৃতির মুখশ্রী কোনো এক প্রাচীন বিধাতৃমাতার বৃহৎ রূপকথা-রচনারই মতো বোধ হত, নীতিকথা বা বিজ্ঞানপাঠ বলে ভ্রম হত না।'

'এই উপলক্ষে এখানে আর-একটি চিঠি উদ্‌ধৃত করিয়া দিব। এ চিঠি অনেকদিন পরে আমার ৩২ বছর বয়সে গোরাই নদী হইতে লেখা, কিন্তু দেখিতেছি সুর সেই একই রকমের আছে। এই চিঠিগুলিতে পত্রলেখকের অকৃত্রিম আত্মপরিচয়, অন্তত বিশেষ সময়ের বিশেষ মনের ভাব প্রকাশ পাইবে। ইহার মধ্যে যে-ভাবটুকু আছে তাহা পাঠকের পক্ষে যদি অহিতকর হয় তবে তাঁহারা সাবধান হইবেন— এখানে আমি শিক্ষকতা করিতেছি না।—

''আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব। যদি করি আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপরে বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে··· পড়ে থাকতে পারব। হয়তো আর-কোনা জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্যপরিবর্তন হবে, আর কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব। এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে-সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপর এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না।··· আশ্চর্য এই, আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা, সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্‌ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই, এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারি দোষের মনে করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্লামেন্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসাবাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁটে-বাঁধানো কঠিন; তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্‌ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো— তাতে একটি কোমল তৃণ, একটা অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারি ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় মনে হয় না।'

'এখনকার কোনো কোনো নূতন মনস্তত্ত্ব পড়িলে আভাস পাওয়া যায় যে একটা মানুষের মধ্যে যেন অনেকগুলা মানুষ জটলা করিয়া বাস করে, তাহাদের স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার মধ্যেকার যে অকেজো অদ্ভুত মানুষটা সুদীর্ঘকাল আমার উপরে কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে— যে-মানুষটা শিশুকালে বর্ষার মেঘ ঘনাইতে দেখিলে পশ্চিমের ও দক্ষিণের বারান্দাটায় অসংযত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইত, যে-মানুষটা বরাবর ইস্কুল পালাইয়াছে, রাত্রি জাগিয়া ছাদে ঘুরিয়াছে, আজও বসন্তের হাওয়া বা শরতের রৌদ্র দেখা দিলে যাহার মনটা সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া দিয়া পালাই-পালাই করিতে থাকে, তাহারই জবানি কথা এই ক্ষুদ্র জীবনচরিতের মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইবে কিন্তু এ-কথাও বলিয়া রাখিব, আমার মধ্যে অন্য ব্যক্তিও আছে— যথাসময়ে তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।'

—প্রথম পাণ্ডুলিপি

'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত "একটি পরিষৎ [সারস্বত সমাজ] স্থাপন" সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' প্রবন্ধটি (ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) এবং মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'সারস্বত সমাজ' অংশ (পৃ ১১০-২০) দ্রষ্টব্য। এই সমাজের প্রথম অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক-লিখিত প্রতিবেদন[৩৮] নিম্নে মুদ্রিত হইল :

সারস্বত সমাজ

১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহায্য করিতে হইলে কী কী কার্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, বানানের উন্নতি সাধন। বাংলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কিনা এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কিনা, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারও কাহারও মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্‌ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নামসকল বাংলায় কিরূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে 'ভিক্টো [রিয়া' বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি V অক্ষরের স্থলে অন্তঃস্থ 'ব' সহজেই হইতে পারে। ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাংলায় বিস্তর [গোল]যোগ ঘটিয়া থাকে— এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায়— ইংরাজি isthmus শব্দ কেহ বা 'ডমরু-মধ্য' কেহ বা 'যোজক' বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনোটাই হয়তো সার্থক হয় নাই।— অতএব এই-সকল শব্দ নির্বাচন বা উদ্ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন— এই-সকল এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে— যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায়সহকারে সমাজের কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতিমহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন—

স্থির হইল, বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।

তৎপরে তিন চারিটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল— সারস্বত সমাজ।

সমাজের দ্বিতীয় নিয়ম নিম্নলিখিত মতে পরিবর্তিত হইল—

যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

সমাজের তৃতীয় নিয়ম কাটা হইল।

[সমাজের] চতুর্থ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের মধ্যে অধিকাংশের ঐক্যমতে [নূ]তন সভ্য গৃহীত হইবে। সভ্যগ্রহণকার্যে গোপনে সভাপতিকে মত জ্ঞাত করা হইবেক।

সমাজের চতুর্বিংশ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

৩৮ রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে। পাণ্ডুলিপি স্থানে স্থানে ছিন্ন ; বন্ধনী-মধ্যে আনুমানিক পাঠ দেওয়া হইল। বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৫০) শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সভ্যদিগকে বার্ষিক ৬ টাকা আগামী চাঁদা দিতে হইবেক। যে-সভ্য এককালে ১০০ টাকা দিবেন তাঁহাকে ওই বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবেক না।

অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন—

সভাপতি— ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

—রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপি হইতে

'মৃত্যুশোক' পরিচ্ছেদে মাতার মৃত্যুর যে স্মৃতিচিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন তাহার পরিপূরকরূপে সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি' হইতে সংকলিত হইল :

'যে ব্রাহ্মমুহূর্তে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে মা ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন, 'বসতে চৌকি দাও।' পিতা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, 'আমি তবে চললেম।' আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল, স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য এ পর্যন্ত তিনি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।'

—পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৪৬৩
অপিচ, রবীন্দ্রনাথ, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', পৃ ১৫২-৫৩

উক্ত পরিচ্ছেদে ৫০৮ পৃষ্ঠায় 'চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয়' উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু (বৈশাখ ১২৯১)। এই প্রসঙ্গে ১৩২৪ সালের ৮ আষাঢ় তারিখে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত কবির একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইল :

'এক সময়ে যখন আমার বয়স তোমারই মতো ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মতো। আমার যে-পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের সাধ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে, এমন কথা আমি মনে করতে পারি নি। কিন্তু তার পরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম, জীবনকে মৃত্যুর জানলার ভিতর থেকে না দেখলে তাকে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড়ো দুঃসহ। কিন্তু তার পরে তার ঔদার্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হালকা হয়ে দেখা দেয়।'

—কবিতা, কার্তিক ১৩৪৮
অপিচ, চিঠিপত্র একাদশ খণ্ড, পৃ ৮

রবীন্দ্রনাথের 'পুষ্পাঞ্জলি'-নামক সমসাময়িক রচনাটিতে সেই বেদনার সদ্য প্রকাশ রহিয়াছে ; রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইয়া এ স্থলে তাহা সংকলিত হইল :

পুষ্পাঞ্জলি

প্রভাতে

সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে ? কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল ? এ দিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে কোন্‌খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে ? প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপরে পড়িয়াছে ! এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিয়াছ, সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে ? সেখানকার বালিকারা ঘরে দীপ জ্বালাইয়া ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া কি তাহাদের পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ? সেখানে তো মা আছে— তাহারা কি তাহাদের ছোটো ছোটো শিশুগুলিকে চাঁদের আলোতে শুয়াইয়া, মুখের পানে চাহিয়া চুমো খাইয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইতেছে ? কতশত সেখানে কুটির গাছপালার মধ্যে, নদীর ধারে, পর্বতের উপত্যকায়, মাঠের পাশে, অরণ্যের প্রান্তে আপনার আপনার স্নেহ প্রেম সুখ দুঃখ বুকের মধ্যে লইয়া সন্ধ্যাচ্ছায়ায় বিশ্রাম ভোগ করিতেছে ! সেখানে আমাদের কোন্ অজ্ঞাত একটি পাখি এই সময়ে গাছের ডালে বসিয়া ডাকে ; সেখানকার লোকের প্রাণের সুখদুঃখের সহিত প্রতি সন্ধ্যাবেলায় এই পাখির গান মিশিয়া যায় । তাহাদের দেশে যে-সকল কবিরা বহুকাল পূর্বে বাস করিত, যাহারা আর নাই, লোকে যাহাদের গান জানে কিন্তু নাম জানে না, তাহারাও কোন্ সন্ধ্যাবেলায় কোন্-এক নদীর ধারে ঘাসের 'পরে শুইয়া এই পাখির গান শুনিত ও গান গাহিত ! সে হয়তো আজ বহুদিনের কথা— কিন্তু তখনকার প্রেমিকেরাও তো সহসা এই পাখির স্বর শুনিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বিরহীরা এই পাখির গান শুনিয়া সন্ধ্যাবেলায় নিশ্বাস ফেলিয়াছিল ! কিন্তু তাহারা তাহাদের সে-সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছে । তাহারাও যখন জীবনের খেলা খেলিত, ঠিক আমাদের মতো করিয়াই খেলিত, এমনি করিয়াই কাঁদিত ; তাহারা ছায়া ছিল না, মায়া ছিল না, কাহিনী ছিল না । তাহাদের গায়েও বাতাস ঠিক এমনি জীবন্ত ভাবেই লাগিত— তাহারা তাহাদের বাগান হইতে ফুল তুলিত ; তাহারা এক কালে বালক বালিকা ছিল— যখন মা-বাপের কোলে বসিয়া হাসিত তখন মনে হইত না তাহারাও বড়ো হইবে । কিন্তু তবুও তাহারা আজিকার এই চারি দিকের জীবময় লোকারণ্যের মধ্যে কেমন করিয়া একেবারে 'নাই' হইয়া গেল ! বাগানে এই-যে বহুবৃদ্ধ বকুলগাছটি দেখিতেছি— একদিন কোন্ সকালবেলায় কী সাধ করিয়া কে একজন ইহা রোপণ করিতেছিল— সে জানিত সে ফুল তুলিবে, সে মালা গাঁথিবে ; সেই মানুষটি শুধু নাই, সেই সাধটি শুধু নাই, কেবল ফুল ফুটিতেছে আর ঝরিয়া পড়িতেছে । আমি যখন ফুল সংগ্রহ করিতেছি তখন কি জানি কাহার আশার ধন কুড়াইতেছি, কাহার যত্নের ধনে মালা গাঁথিতেছি ! হায় হায়, সে যদি আসিয়া দেখে, সে যাহাদিগকে যত্ন করিত, সে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা আর তাহার নাম করে না, তাহারা আর তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না— যেন তাহারা আপনিই হইয়াছে, আপনিই আছে, এমনি ভান করে— যেন তাহাদের সহিত কাহারও যোগ ছিল না ।

...

কিন্তু এই বুঝি এ জগতের নিয়ম । আর এ নিয়মের অর্থও বুঝি আছে ! যতদিন কাজ করিবে ততদিন প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে । ততদিন ফুল তোমার জন্যই ফুটে, আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক তোমার জন্যই আলো ধরিয়া থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে তোমারই বলিয়া মনে হয় । কিন্তু যেই তোমা দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না, যেই তুমি মৃত হইলে, অমনি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরাইয়া ফেলে— তোমাকে চোখের আড়াল করিয়া দেয়— তোমাকে এই জগৎ-দৃশ্যের নেপথ্যে দূর করিয়া দেয় । খরতর কালস্রোতের মধ্যে তোমাকে খড়কুটার মতো ঝাঁটাইয়া ফেলে, তুমি হুহু করিয়া ভাসিয়া যাও, দিনদুই বাদে তোমার আর একেবারে নাগাল

পাওয়া যায় না। এমন না হইলে মৃতেরাই এ জগৎ অধিকার করিয়া থাকিত, জীবিতদের এখানে স্থান থাকিত না। কারণ, মৃতই অসংখ্য, জীবিত নিতান্ত অল্প। এত মৃত অধিবাসীর জন্য আমাদের হৃদয়েও স্থান নাই। কাজেই অকর্মণ্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃতি জগৎ হইতে আমাদিগকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলে। আমাদের চিরজীবনের কাজের, চিরজীবনের ভালোবাসার এই পুরস্কার। কিন্তু পুরস্কার পাইবে কে বলিয়াছিল! এই তো চিরদিন হইয়া আসিতেছিল, এই তো চিরদিন হইবে— তাই যদি সত্য হয়, তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না। আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই— তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা হয়তো আমাকে ভুলে নাই, তাহারা হয়তো আমাকে চাহিতেছে। এক কালে এ জগৎ তাহাদেরই আপনার রাজ্য ছিল— কিন্তু তাহাদেরই আপনার দেশ হইতে তাহাদিগকে সকলে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে। কেহ তাহাদের চিহ্নও রাখিতে চাহিতেছে না! আমি তাহাদের জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমার কাছে থাকুক! বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই-না কেন। সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে— যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে— যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালোবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে, এই জগতের মধ্যাহ্নকিরণে কি তাহার সেই ভালোবাসার উপহার প্রতি মুহূর্তেই শুকাইয়া ফেলিব! আমার সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইবে তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালোবাসার পরিণামস্বরূপ আর কিছুই থাকিবে না, আর কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না— কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্ক মালা! সেগুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে না!

...

হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ-সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারও মনে থাকিবে না— কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে-সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর-এক দেশে আর-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?

...

আমরা যাহাদের ভালোবাসি তাহারা আছে বলিয়াই যেন এই জ্যোৎস্নারাত্রির একটা অর্থ আছে— বাগানের এই ফুলগাছগুলিকে এমনিতরো দেখিতে হইয়াছে, নহিলে তাহারা যেন আর-একরকম দেখিতে হইত! তাই যখন একজন প্রিয়ব্যক্তি চলিয়া যায় তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যেন একটা মরুর বাতাস বহিয়া যায়— মনে আশ্চর্য বোধ হয়, তবুও কেন পৃথিবীর উপরকার সমস্ত গাছপালা একেবারে শুকাইয়া গেল না! যদিও তাহারা থাকে তবু তাহাদের থাকিবার একটা যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না! জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের প্রিয়ব্যক্তিকে তাহাদের মাঝখানে বসাইয়া রাখিবার জন্য। তাহারা আমাদের ভালোবাসার সিংহাসন। আমাদের ভালোবাসার চারি দিকে তাহারা জড়াইয়া উঠে, লতাইয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। এক-একদিন কী মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম তরঙ্গিত হইয়া উঠে, প্রভাতে চারি দিকে চাহিয়া দেখি সৌন্দর্যসাগরেও তাহারই এক তালে আজ তরঙ্গ

উঠিয়াছে— কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র গান ! কাল যেন জগতে এত মহোৎসব ছিল না। অনেক দিনের পরে সহসা যেন সূর্যোদয় হইল। হৃদয়ও যখন আলো দিতে লাগিল সমস্ত জগৎও তাহার সৌন্দর্যচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সমস্ত জগতের সহিত হৃদয়ের এক অপূর্ব মিলন হইল। একজনের সহিত যখন আমাদের মিলন হয়, তখন সে মিলন আমরা কেবল তাহারই মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, অলক্ষ্যে অদৃশ্যে সে মিলন বিস্মৃত হইয়া জগতের মধ্যে গিয়া পৌঁছায়। সূচ্যগ্র ভূমির জন্যও যখন আলো জ্বালা হয়, তখন সে আলো সমস্ত ঘরকে আলো না করিয়া থাকিতে পারে না।

যে গেছে, সে সমস্ত জগৎ হইতে তাহার লাবণ্যচ্ছায়া তুলিয়া লইয়া গেছে।[৩৯]

...

যখন আমাদের প্রিয়বিয়োগ হয় তখন সমস্ত জগতের প্রতি আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়, অথচ সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাই না বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে কেমন আঘাত লাগে ; যেমন নিতান্ত কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা দেখিলে আমাদের সহসা সন্দেহ হয় আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি, আমাদের হাতের কাছে যে-জিনিস থাকে তাহা ভালো করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখি এ-সমস্ত সত্য কিনা ; তেমনি আমাদের প্রিয়জন যখন চলিয়া যায় তখন আমরা জগৎকে চারি দিকে স্পর্শ করিয়া দেখি— ইহারাও সব ছায়া কিনা, মায়া কিনা, ইহারাও এখনই চারি দিক হইতে মিলাইয়া যাইবে কিনা। কিন্তু যখন দেখি ইহারা অচল রহিয়াছে তখন জগৎকে যেন তুলনায় আরো দ্বিগুণ কঠিন বলিয়া মনে হয়। দেখিতে পাই যে, তখন যে-ফুলেরা বলিত 'সে না থাকিলে ফুটিব না', যে-জ্যোৎস্না বলিত 'সে না থাকিলে উঠিব না', তাহারাও আজ ঠিক তেমনি করিয়াই ফুটিতেছে, তেমনি করিয়াই উঠিতেছে। তাহারা তখন যতখানি সত্য ছিল, এখনো ঠিক ততখানি সত্যই আছে— এক চুলও ইতস্তত হয় নাই।— এইজন্য সে যে নাই, এই কথাটাই অত্যন্ত বেশি করিয়া মনে হয়, কারণ, সে ছাড়া আর-সমস্তই অতিশয় আছে।

...

আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না, এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না। এক-একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এইজন্য আমরা যাহাকে ভালোবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই ; কারণ, সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত— আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে ! কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম ! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে ! যে আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধুলা, সতেরো বৎসরের সুখ দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর-কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর-কাহারও ডাকে সাড়া দেয় না ! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাঁহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর-কিছুই চেনে না। বহির্জগতের সহিত এই ব্যক্তির আর-কোনো সম্বন্ধই রহিল না— সেখান হইতে এ একেবারেই পালাইয়া আসিল— এ-জন্মের মতো আমার হৃদয়-কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ইহার জীবিত সমাধি হইল।

৩৯ রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরো সতেরো বৎসর যাইতে পারে ! আবার তো কত নূতন ঘটনা ঘটিবে, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার তো কোনো সম্পর্কই থাকিবে না ! কত নূতন সুখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো হাসিবেন না— কত নূতন দুঃখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো কাঁদিবেন না ! কত শত দিনরাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে ! আমার সম্পর্কীয় যাহা-কিছু তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ আর-এক মুহূর্তের জন্যও পাইব না ! মনে হয়— তাঁহারও কত নূতন সুখ দুঃখ ঘটিবে, তাহার সহিত আমার কোনো যোগ নাই ! যদি অনেক দিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়েই নিতান্ত আপনার লোক।

...

কোথায় নহবৎ বসিয়াছে ! সকাল হইতে না হইতেই বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কী উৎসবময় বলিয়া মনে হইত। বাঁশিতে কেবল আনন্দের কণ্ঠস্বরটুকু মাত্র দূর হইতে শুনিতে পাইতাম, বাকিটুকু কী মোহময় আকারে কল্পনায় উদিত হইত ! কত সুখ, কত হাসি, কত হাস্যপরিহাস, কত মধুময় লজ্জা, আত্মীয়পরিজনের আনন্দ— আপনার লোকদের সঙ্গে কত সুখের সম্বন্ধে জড়িত হওয়া, ভালোবাসার লোকের মুখের দিকে চাওয়া, ছেলেদের কোলে করা, পরিহাসের লোকদের সহিত স্নেহময় মধুর পরিহাস করা, এমন কত কী দৃশ্য সূর্যালোকে চোখের সমুখে দেখিতাম ! এখন আর তাহা হয় না ! আজি ওই বাঁশি শুনিয়া প্রাণের এক জায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবলই মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে-সকল উৎসব আরম্ভ হয় সে-সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়। তখন আর বাঁশি বাজে না ! বাপমায়ের যে স্নেহের ধনটি কাঁদিয়া অবশেষে কঠিন পৃথিবী হইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়— একদিন সকালে মধুর সূর্যের আলোতে তাহার বিবাহেও বাঁশি বাজিয়াছিল। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, মনে কোনো দুঃখ ছিল না, কিছুই সে জানিত না ! বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারি দিকে ফুলের মালা ও দীপের আলোর মধ্যে, সেই ছোটো মেয়েটি গলায় হার পরিয়া, পায়ে দুগাছি মল পরিয়া বিরাজ করিতেছিল ! অল্প বয়সে খুব বৃহৎ খেলা খেলিতে যেরূপ আনন্দ হয় তাহার সেইরূপ আনন্দ হইতেছিল। কে জানিত সে কী খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল ! সেদিনও প্রভাত এমনি মধুর ছিল !

দেখিতে দেখিতে কত লোক তাহার নিতান্ত আত্মীয় হইল, তাহার প্রাণের খুব কাছাকাছি বাস করিতে লাগিল, পরের সুখ দুঃখ লইয়া সে নিজের সুখ দুঃখ রচনা করিতে লাগিল। সে তাহার কোমল হৃদয়খানি লইয়া দুঃখের সময় সান্ত্বনা করিত, কোমল হাত দুখানি লইয়া রোগের সময় সেবা করিত। সেদিন বাঁশি বাজাইয়া আসিল, সে আজ গেল কী করিয়া ! সে কেন চোখের জল ফেলিল ! সে তাহার গভীর হৃদয়ের অতৃপ্তি, তাহার আজন্মকালের দুরাশা, শ্মশানের চিতার মধ্যে বিসর্জন দিয়া গেল কোথায় ! সে কেন বালিকাই রহিল না, তাহার ভাইবোনদের সঙ্গে চিরদিন খেলা করিল না ! সে আপনার সাধের জিনিস সকল ফেলিয়া আপনার ঘর ছাড়িয়া, আপনার বড়ো ভালোবাসার লোকদের প্রতি একবার ফিরিয়া না চাহিয়া— যে-কোলে ছেলেরা খেলা করিত, যে-হাতে সে রোগীর সেবা করিত, সেই স্নেহমাখানো কোল, সেই কোমল হাত, সেই সুন্দর দেহ সত্য সত্যই একেবারে ছাই করিয়া চলিয়া গেল !

কিন্তু সেদিনকার সকালবেলার মধুর বাঁশি কি এত কথা বলিয়াছিল ! এমন রোজই কোনো-না কোনো জায়গায় বাঁশি তো বাজিতেছেই। কিন্তু এই বাঁশি বাজাইয়া কত হৃদয় দলন হইতেছে, কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, কত কোমল হৃদয় আমরণকাল অসহায়ভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে— অথচ একটি কথা বলিতেছে না,

কেবল চোখে তাহাদের কাতরতা, এবং হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তুষের আগুন। সবই যে দুঃখের তাহা নহে, কিন্তু সকলেরই তো পরিণাম আছে। পরিণামের অর্থ— উৎসবের প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া, বিসর্জনের পর মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ! পরিণামের অর্থ— সূর্যালোক এক মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ম্লান হইয়া যাওয়া— সহসা জগতের চারি দিক সুখহীন, শান্তিহীন, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন মরুভূমি হইয়া যাওয়া ! পরিণামের অর্থ— হৃদয়ের মধ্যে কিছুতেই বলিতেছে না যে, সমস্তই শেষ হইয়া গেছে, অথচ চারি দিকেই তাহার প্রমাণ পাওয়া ; প্রতি মুহূর্তে প্রতি নূতন ঘটনায় অতি প্রচণ্ড আঘাতে নূতন করিয়া অনুভব করা যে, আর হইবে না, আর ফিরিবে না, আর নয়, আর কিছুতেই নয় ! সেই অতি নিষ্ঠুর কঠিন বজ্রপাষাণময় 'নয়'-নামক প্রকাণ্ড লৌহদ্বারের সম্মুখে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে একতিল উদ্‌ঘাটিত হয় না !

...

মানুষে মানুষে চিরদিনের মিলন যে কী গুরুতর ব্যাপার তাহা সহসা সকলের মনে হয় না। তাহা চিরদিনের বিচ্ছেদের চেয়ে বেশি গুরুতর বলিয়া মনে হয়। আমরা অন্ধভাবে জগতের চারি দিক হইতে গড়াইয়া আসিতেছি, কে কোথায় আসিয়া পড়িতেছি তাহার ঠিকানা নাই। যে যেখানকার নয় সে হয়তো সেইখানেই রহিয়া গেল। এ জীবনে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। যাহা বাসস্থান হওয়া উচিত ছিল তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়াইল। আমরা সচেতন জড়পিণ্ডের মতো অহর্নিশি যে গড়াইয়া চলিতেছি— আমরা কি জানিতে পারিতেছি পদে পদে কত হৃদয়ের কত স্থান মাড়াইয়া চলিতেছি, আশে-পাশের কত আশা কত সুখ দলন করিয়া চলিতেছি ! সকল সময়ে তাহাদের বিলাপটুকুও শুনিতে পাই না, শুনিলেও সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। সারাদিন আঘাত তো করিতেছিই, আঘাত তো সহিতেছিই, কিছুতেই বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছি না। তাহার কারণ, আমরা পরস্পরকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারি না— দেখিতে পাই না— কোন্‌খানে যে কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িলাম জানিতেই পারি না। আমরা শৈলশিখরচ্যুত পাষাণখণ্ডের মতো। আমাদের পথে পড়িয়া দুর্ভাগা ফুল পিষ্ট হইতেছে, লতা ছিন্ন হইতেছে, তৃণ শুষ্ক হইতেছে— আবার, হয়তো আমরা কাহার সুখের কুটিরের উপর অভিশাপের মতো পড়িয়া তাহার সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিতেছি। ইহার কোনো উপায় দেখা যায় না। সকলেরই কিছু-না-কিছু ভার আছেই, সকলেই জগৎকে কিছু-না-কিছু পীড়া দেয়ই। যতক্ষণ তাহারা দৈবক্রমে তাহাদের ভারসহনক্ষম স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকে ততক্ষণ সমস্ত কুশল, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহারা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছায় যেখানে তাহাদের ভার আর সয় না ! যাহার উপর পা দেয় সেও ভাঙিয়া যায়, আর অনেক সময় যে পা দেয় সেও পড়িয়া যায়।[৪০]

...

হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়। এমন-কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। যে-সকল বিশ্বাস তাহার জীবনের একমাত্র নির্ভর তাহাদের সে জলাঞ্জলি দিতে চায় ! নিষ্ঠুর তর্কদিগের ভয়ে যে প্রিয় বিশ্বাসগুলিকে সযত্নে হৃদয়ের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিত আজ অনায়াসে তাহাদিগকে তর্কে বিতর্কে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে। প্রিয়বিয়োগে কেহ যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া বলে, "এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ওই খানিকটা ভস্ম ! কখনোই নহে !" তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে, "আশ্চর্য কি ! তেমন সুন্দর মুখখানি— কোমলতায় সৌন্দর্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহখানি— সেও যে আর কিছু নয়, দুইমুঠা ছাইয়ে পরিণত হইবে, এই বা কে হৃদয়ের ভিতর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত। বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস কী !" এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে। সে অন্ধকার

৪০ ইহার পর পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত খানিকটা পাঠ দেখা যায়

জগৎ-সমুদ্রের মাঝখানে নিজের নৌকাডুবি করিয়া আর কূলকিনারা দেখিতে চায় না। তাহার খানিকটা গিয়াছে বলিয়া সে আর বাকি কিছুই রাখিতে চায় না। সে বলে, তাহার সঙ্গে সমস্তটাই যাক্। কিন্তু সমস্তটা তো যায় না, আমরা নিজেই বাকি থাকি যে! তাই যদি হইল তবে কেন আমরা সহসা আপনাকে উন্মাদের মতো নিরাশ্রয় করিয়া ফেলি। হৃদয়ের এই অন্ধকারের সময় আশ্রয়কে আরো বেশি করিয়া ধরি না কেন। এ-সময়ে মনে করি না কেন, বিশ্বের নিয়ম কখনোই এত ভয়ানক ও এত নিষ্ঠুর হইতেই পারে না। সে আমাকে একেবারেই ডুবাইবে না, আমাকে আশ্রয় দিবেই! যেখানেই হউক এক জায়গায় কিনারা আছেই, তা সে সমুদ্রের তলেই হউক আর সমুদ্রের পারেই হউক— মরিয়াই হউক আর বাঁচিয়াই হউক। মিছামিছি আর তো ভাবা যায় না।

...

তুমি বলিতেছ, প্রকৃতি আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছে। আমাদিগকে কেবল ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। কাজ হইয়া গেলেই সে আমাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দেয়। কিন্তু এত বড়ো যাহার কারখানা, যাহার রাজ্যে এমন বিশাল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে, সে কি সত্য সত্যই এই কোটি কোটি অসহায় জীবকে একেবারেই ফাঁকি দিতে পারে! সে কি এই-সমস্ত সংসারের তাপে তাপিত, অহর্নিশি কার্যতৎপর, দুঃখে ভাবনায় ভারাক্রান্ত, দীনহীন গলদ্‌ঘর্ম প্রাণীদিগকে মেকি টাকায় মাহিয়ানা দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে! সে টাকা কি কোথাও ভাঙাইতে পারা যাইবে না! এখানে না-হয় আর-কোথাও? এমন ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও হীন প্রবঞ্চনা কি এত বড়ো মহত্ত্ব ও এত বড়ো স্থায়িত্বের সহিত মিশ খায়! কেবলমাত্র ফাঁকির জাল গাঁথিয়া গাঁথিয়া কি এমনতরো অসীম ব্যাপার নির্মিত হইতে পারিত। কেবলমাত্র আশ্বাসে আজন্মকাল কাজ করিয়া যদি অবশেষে হৃদয়ের শীতবস্ত্রটুকুও পৃথিবীতে ফেলিয়া পুরস্কারস্বরূপ কেবলমাত্র অতৃপ্তি ও অশ্রুজল লইয়া সকলকেই মরণের মহামেরুর মধ্যে নির্বাসিত হইতে হয়, তবে এই অভিশপ্ত রাক্ষস সংসার নিজের পাপসাগরে নিজে কোন্ কালে ডুবিয়া মরিত। কারণ, প্রকৃতির মধ্যেই ঋণ এবং পরিশোধের নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। কেহই এক কড়ার ঋণ রাখিয়া যাইতে পারে না, তাহার সুদসুদ্ধ শুধিয়া যাইতে হয়— এমন-কি, পিতার ঋণ পিতামহের ঋণ পর্যন্ত শুধিতে সমস্ত জীবন যাপন করিতে হয়। এমন স্থলে প্রকৃতি যে চিরকাল ধরিয়া অসংখ্য জীবের দেনদার হইয়া থাকিবে এমন সম্ভব বোধ হয় না, তাহা হইলে সে নিজের নিয়মেই নিজে মারা পড়িত।

...

তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে-রজনীগন্ধার গাছ রোপণ করিয়াছিলে তাহাকে কি আর তোমার মনে আছে! তুমি যখন ছিলে তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে, বুঝি তাহারই 'পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ! তাই সে আজ বেশি করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে, "তুমি এসো, তোমাকে রোজ ফুল দিব!" হায় হায়, যখন সে দেখিতে চায় তখন সে ভালো করিয়া দেখিতে পায় না— আর যখন সে শূন্যহৃদয়ে চলিয়া যায়, এ-জন্মের মতো দেখা ফুরাইয়া যায়, তখন আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলে কী হইবে! সমস্ত হৃদয় তাহার সমস্ত ভালোবাসার ডালাটি সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে। আমিও তোমার গৃহের শূন্য দ্বারে বসিয়া প্রতিদিন সকালে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধা ফুটাইতেছি— কে দেখিবে! ঝরিয়া পড়িবার সময় কাহার সদয় চরণের তলে ঝরিয়া পড়িবে! আর-সকলেই ইচ্ছা করিলে এই ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া মালা গাঁথিতে পারে, ফেলিয়া দিতে পারে— কেবল তোমারই স্নেহের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের উপরে আর পড়িবে না![৪১]

৪১ পাণ্ডুলিপিতে ইহার পর একটি গান আছে— 'কেহ কারো মন বুঝে না' ইত্যাদি। গীতবিতান দ্রষ্টব্য

তোমার ফুলবাগানে যখন চারি দিকেই ফুল ফুটিতেছে, তখন যে তোমাকে দেখিতে পাই না, তাহাতে তেমন আশ্চর্য নাই। কিন্তু যখন দেখি ঘরে ঘরে রোগের মূর্তি তখনো যে রোগীর শিয়রের কাছে তুমি বসিয়া নাই, এ যেন কেমন বিশ্বাস হয় না। উৎসবের সময় তুমি নাই, বিপদের সময় তুমি নাই, রোগের সময় তুমি নাই! তোমার ঘরে যে প্রতিদিন অতিথি আসিতেছে— হৃদয়ে সরল প্রীতির সহিত তাহাদিগকে কেহ যে আদর করিয়া বসিতে বলে না। তুমি যাহাকে বড়ো ভালোবাসিতে সেই ছোটো মেয়েটি যে আজ সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছে— তাহাকে আদর করিয়া খেতে দিবে কে। এখন আর কে কাহাকে দেখিবে! যে অযাচিত প্রীতি-স্নেহ-সান্ত্বনায় সমস্ত সংসার অভিষিক্ত ছিল সে নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গেল— এখন কেবল কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বার্থপর কঠিন পাষাণখণ্ড তাহারই পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল!

...

যাহারা ভালো, যাহারা ভালোবাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় আছে, সংসারে তাহাদের কিসের সুখ! কিছু না, কিছু না। তাহারা তারের যন্ত্রের মতো, বীণার মতো— তাহাদের প্রত্যেক কোমল স্নায়ু, প্রত্যেক শিরা সংসারের প্রতি আঘাতে বাজিয়া উঠিতেছে। সে গান সকলেই শুনে, শুনিয়াও সকলেই মুগ্ধ হয়— তাহাদের বিলাপধ্বনি রাগিণী হইয়া উঠে, শুনিয়া কেহ নিশ্বাস ফেলে না! তাই যেন হইল, কিন্তু যখন আঘাত আর সহিতে পারে না, যখন তার ছিঁড়িয়া যায়, যখন আর বাজে না, তখন কেন সকলে তাহাকে নিন্দা করে, তখন কেন কেহ বলে না 'আহা'!— তখন কেন তাহাকে সকলে তুচ্ছ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়। হে ঈশ্বর, এমন যন্ত্রটিকে তোমার কাছে লুকাইয়া রাখ না কেন— ইহাকে আজিও সংসারের হাটের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন— তোমার স্বর্গলোকের সংগীতের জন্য ইহাকে ডাকিয়া লও— পাষণ্ড নরাধম পাষাণহৃদয় যে ইচ্ছা সেই ঝন্ ঝন্ করিয়া চলিয়া যায়, অকাতরে তার ছিঁড়িয়া হাসিতে থাকে— খেলাচ্ছলে তাহার প্রাণের সংগীত শুনিয়া তার পরে যে যার ঘরে চলিয়া যায়, আর মনে রাখে না। এ বীণাটিকে তাহারা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে না— তাহারা আপনাকেই প্রভু বলিয়া জানে— এইজন্য কখনো বা উপহাস করিয়া, কখনো বা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া, এই সুমধুর সুকোমল পবিত্রতার উপরে তাহাদের কঠিন চরণের আঘাত করে— সংগীত চিরকালের জন্য নীরব হইয়া যায়। —ভারতী, বৈশাখ ১২৯২

এই শোকের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মৃত্যু উভয়েরই গভীরতর পরিচয় লাভ করিয়াছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, "মাতা সারদা দেবীর মৃত্যুর পর··· তিনিই [কাদম্বরীদেবী] মাতৃহীন শিশুদের মাতৃস্থান, বন্ধুস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৪২]

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে 'পুষ্পাঞ্জলি'তে যে-শোকবেদনার প্রকাশ দেখা যায়, তাহাই বহু বৎসর পরে লিপিকা গ্রন্থের কয়েকটি রচনায় পরিচ্ছন্ন কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কবি বলিয়াছেন, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"[৪৩]

'বর্ষা ও শরৎ' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বর্ষাস্মৃতি প্রসঙ্গে 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার চিঠি' রচনাটির কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, এই স্মৃতিচিত্রটি 'জীবনস্মৃতি'র বহু পূর্বের রচনা।

ছেলেবেলায় যেমন বর্ষা দেখতেম, তেমন ঘনিয়ে বর্ষাও এখন হয় না। বর্ষার তেমন সমারোহ নেই যেন, বর্ষা এখন যেন ইকনমিতে মন দিয়েছে— নমো নমো করে জল ছিটিয়ে চলে যায়— কেবল খানিকটা কাদা, খানিকটা ছাট, খানিকটা অসুবিধে মাত্র— একখানা ছেঁড়া ছাতা ও

৪২ রবীন্দ্র-জীবনী ১ (বৈশাখ ১৩৭৭), পৃ ১৯৪

৪৩ 'প্রথম শোক', লিপিকা ('কথিকা'— সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২৬)

চিনেবাজারের জুতোয় বর্ষা কাটানো যায়— কিন্তু আগেকার মতো সে বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাতাসের মাতামাতি দেখি নে। আগেকার বর্ষায় একটা নৃত্য ও গান ছিল, একটা ছন্দ ও তাল ছিল— এখন যেন প্রকৃতির বর্ষার মধ্যেও বয়স প্রবেশ করেছে, হিসাবকিতাব ও ভাবনা ঢুকেছে, শ্লেষ্মা শঙ্কা ও সাবধানের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। লোকে বলছে, সে আমারই বয়সের দোষ।

তা হবে! সকল বয়সেরই একটা কাল আছে, আমার সে বয়স গেছে হয়তো। যৌবনের যেমন বসন্ত, বার্ধক্যের যেমন শরৎ, বাল্যকালের তেমনি বর্ষা।... বর্ষাকাল ঘরে থাকবার কাল, কল্পনা করবার কাল, গল্প শোনবার কাল, ভাই বোনে মিলে খেলা করবার কাল।... বর্ষাকাল বালকের কাল— বর্ষাকালে তরুলতার শ্যামল কোমলতার মতো আমাদের স্বাভাবিক শৈশব স্ফূর্তি পেয়ে ওঠে— বর্ষার দিনে আমাদের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে।

তাই মনে পড়ে, বর্ষার দিন আমাদের দীর্ঘ বারান্দায় আমরা ছুটে বেড়াতাম— বাতাসে দুম্‌দাম্‌ করে দরজা পড়ত, প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ তার সমস্ত অন্ধকার নিয়ে নড়ত, উঠোনে একহাঁটু জল দাঁড়াত, ছাতের উপরকার চারটে টিনের নল থেকে স্থূল জলধারা উঠোনের জলের উপর প্রচণ্ড শব্দে পড়ত ও ফেনিয়ে উঠত, চারটে জলধারাকে দিক্‌হস্তীর শুঁড় বলে মনে হত। তখন আমাদের পুকুরের ধারের কেয়াগাছে ফুল ফুটত (এখন সে গাছ আর নেই)। বৃষ্টিতে ক্রমে পুকুরের ঘাটের এক-এক সিঁড়ি যখন অদৃশ্য হয়ে যেত ও অবশেষে পুকুর ভেসে গিয়ে বাগানে জল দাঁড়াত— বাগানের মাঝে মাঝে বেলফুলের গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের উপর জেগে থাকত এবং পুকুরের বড়ো বড়ো মাছ পালিয়ে এসে বাগানের জলমগ্ন গাছের মধ্যে খেলিয়ে বেড়াত, তখন হাঁটুর কাপড় তুলে কল্পনায় বাগানময় জলে দাপাদাপি করে বেড়াতেম। বর্ষার দিনে ইস্কুলের কথা মনে হলে প্রাণ কী অন্ধকার হয়েই যেত, এবং বর্ষাকালের সন্ধেবেলায় যখন বারান্দা থেকে সহসা গলির মোড়ে মাস্টারমহাশয়ের ছাতা দেখা দিত তখন যা মনে হত তা যদি মাস্টারমশায় টের পেতেন তা হলে—

—'বর্ষার চিঠি', বালক, শ্রাবণ ১২৯২, পৃ ১৯৬-৯৮

জীবনের টুকরা স্মৃতিকথা রবীন্দ্রসাহিত্যের নানাস্থানে ছড়ানো আছে। উহার মধ্যে চিঠিপত্রাদি বাদে শেষ দিকের রচনা— লিপিকা (প্রথমাংশ), সে, ছড়ার ছবি, আকাশপ্রদীপ, ছেলেবেলা, গল্পসল্প, এই কয়খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'জীবনস্মৃতি' সম্পাদনকার্যে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু পত্র এবং জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি আমরা ইন্দিরাদেবীর সৌজন্যে ব্যবহার করিতে পাইয়াছি। এই কার্যে ব্যবহৃত অন্যান্য নানা গ্রন্থের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য :

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী [তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২৭]
—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী —প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -প্রকাশিত

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৯১৬] —অজিতকুমার চক্রবর্তী

বঙ্গভাষার লেখক [১৩১১] —হরিমোহন মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি [ফাল্গুন ১৩২৬] —বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [১৩৩৪] —মন্মথনাথ ঘোষ

রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড [১৩৪০] —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকথা [১৩৪৮] —খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় -সংকলিত

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, খণ্ড ২২ [মাঘ ১৩৪৯] —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, খণ্ড ২, ৫, ১২, ১৮, ২১, ২৫ [১৩৪৬-৫০]
বাংলা সাময়িক পত্র [১৮১৮-৬৭]
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস [দ্বিতীয় সংস্করণ]
রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় [১৩৪৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫০]

—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনকার্যে ব্যবহৃত সাময়িক পত্রাদির উল্লেখ যথাস্থানে করা হইয়াছে।

বর্তমান 'জীবনস্মৃতি'র পাদটীকায় 'পাণ্ডুলিপি' বলিতে প্রথম পাণ্ডুলিপি বুঝাইতেছে।

সংযোজন

নর্মাল স্কুলে বালক রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজি গীতিকবিতা 'বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে'র সহিত সমস্বরে আবৃত্তি করিতেন, যাহার 'ধুয়া' অংশটি রবীন্দ্রনাথ অনুমানপূর্বক ঠিকই সংকলন করিয়াছেন (কেবল merrily শব্দটি আবৃত্তির ঝোঁকে তিনবার বলা হইত, দ্রষ্টব্য পৃ ৪২২) সেটির সম্পর্কে 'দেশ' পত্রে প্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (২৫ বৈশাখ ১৩৫৮, প্রবন্ধের '২' অংশ, পৃ ৯-১১)। আমেরিকান মহিলা কবি Eliza Lee Cabot Follen (১৭৮৭-১৮৬০) -লিখিত উক্ত কবিতার প্রথম স্তবক মাত্র এ স্থলে উদ্‌ধৃত হইল—

A SCHOOL SONG

Children go
To and Fro
In a merry, pretty row ;
Footsteps light,
Faces bright,
'Tis a happy sight,
Swiftly turning round and round,
Do not look upon the ground.
Follow me,
Full of glee,
Singing merrily.

'ঘরের পড়া'র প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবের অংশবিশেষের এবং ম্যাক্‌বেথ 'সমস্ত বইটার' বাংলা তর্জমার কথা জানা যায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কুমারসম্ভবের অনূদিত 'মদনভস্ম' অংশের তিনটি পাঠ আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; মিলাইয়া বিচার করিতে হইলে দ্রষ্টব্য—
(১) সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪, অথবা রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় (১৩৫০), পৃ ৮২-৮৫। (২) বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৫৮৫-৯১। (৩) রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থ (ভাদ্র ১৩৬৮) পৃ ২৪৯-৫৫, অথবা বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৬৯৬,২৪ পাদটীকায় উল্লিখিত উত্তরসূরী ত্রৈমাসিক পত্র।

ম্যাক্‌বেথ নাটকের ডাকিনীদের কথোপকথনটুকু যেমন রবীন্দ্র গ্রন্থ-পরিচয়ে তেমনি স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত বিস্তৃত-গ্রন্থপরিচয়-যুক্ত জীবনস্মৃতি গ্রন্থেও সংকলিত হইয়া আসিতেছে।

বংশলতিকা

প্রধানত, জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আত্মীয়দের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক দেখানো হইল
বিবাহ সম্পর্কে যাঁহারা এই বংশ-লতিকাভুক্ত তাঁহাদের নাম ছোটো হরপে

- **দ্বারকানাথ** ১৭৯৪-১৮৪৬ — দিগম্বরী দেবী ?-১৮৩৯
  - কন্যাসন্তান[1] — অল্পায়ু
  - **দেবেন্দ্রনাথ** ১৮১৭-১৯০৫ — সারদা দেবী
    - কন্যাসন্তান ১৮৩৮[1] — অল্পায়ু
    - **দ্বিজেন্দ্রনাথ** ১৮৪০-১৯২৬ — সর্বসুন্দরী দেবী
      - দ্বিপেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠ ১৮৬২-১৯২২ — সুশীলা দেবী, হেমলতা দেবী
        - দিনেন্দ্রনাথ ১৮৮২-১৯৩৫
      - সুধীন্দ্রনাথ। চতুর্থ পুত্র ১৮৬৯-১৯২৯ — চারুবালা দেবী
    - **সত্যেন্দ্রনাথ** ১৮৪২-১৯২৩ — জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
      - সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭২-১৯৪০ — সংজ্ঞা দেবী
      - ইন্দিরা দেবী ১৮৭৩-১৯৬০ — প্রমথ চৌধুরী
      - কবীন্দ্রনাথ ১৮৭৫-১৮৭৯
    - **হেমেন্দ্রনাথ** ১৮৪৪-১৮৮৪ — নীপময়ী দেবী
      - প্রতিভা। জ্যেষ্ঠা ১৮৬৫-১৯২২ — আশুতোষ চৌধুরী
    - **বীরেন্দ্রনাথ** ১৮৪৫-১৯১৫ — প্রফুল্লময়ী দেবী
      - বলেন্দ্রনাথ ১৮৭০-১৮৯৯ — সাহানা দেবী — নিঃসন্তান
    - **সৌদামিনী** ১৮৪৭-১৯২০ — সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
      - সত্যপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ ১৮৫৯-১৯৩৩
      - ইরাবতী। জ্যেষ্ঠা ১৮৬১-১৯১৮ — নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
    - **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ** ১৮৪৯-১৯২৫ — কাদম্বরী দেবী — নিঃসন্তান
    - **সুকুমারী** ?১৮৫০-১৮৬৪ — হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
    - **পুণ্যেন্দ্রনাথ** ?১৮৫১-১৮৫৭
    - **শরৎকুমারী** ১৮৫৪-১৯২০ — যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
      - সুশীলা। জ্যেষ্ঠা — শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
    - **স্বর্ণকুমারী** ?১৮৫৫-১৯৩২ — জানকীনাথ ঘোষাল
      - হিরণ্ময়ী ১৮৬৮-১৯২৫
      - জ্যোৎস্নানাথ ১৮৭১
      - সরলা ১৮৭২-১৯৪৫
      - ঊর্মিলা ১৮৭৩-?
    - **বর্ণকুমারী** ১৮৫৮-১৯৪৮ — সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
    - **সোমেন্দ্রনাথ** ১৮৫৯-১৯২২ — অবিবাহিত
    - **রবীন্দ্রনাথ** ১৮৬১-১৯৪১ — মৃণালিনী দেবী
    - **বুধেন্দ্রনাথ** ১৮৬৩-১৮৬৪
  - নরেন্দ্রনাথ[1] — আয়ু ৩ বৎসর
  - গিরীন্দ্রনাথ☆ ১৮২০-১৮৫৪ — যোগমায়া দেবী
  - ভূপেন্দ্রনাথ[1, 2] ১৮২৬-১৮৩৯
  - নগেন্দ্রনাথ ১৮২৯-১৮৫৮ — ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী — নিঃসন্তান

১ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রকথা পৃ ৪, ২২-২৩
২ দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪৫০

- **রবীন্দ্রনাথ** ১৮৬১-১৯৪১ — মৃণালিনী দেবী ১২৮০-১৩০৯ (১৯০২)
  - মাধুরীলতা ১৮৮৬-১৯১৮ — শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী — নিঃসন্তান
  - রথীন্দ্রনাথ ১৮৮৮-১৯৬১ — প্রতিমা দেবী
    - গৃহীতা কন্যা নন্দিনী ১৯২২-১৯৯৫
  - রেণুকা ১৮৯১-১৯০৩ — সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — নিঃসন্তান
  - মীরা [অতসী] ১৮৯৪-১৯৬৯ — নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
    - নীতীন্দ্রনাথ ১৯১২-১৯৩২
    - নন্দিতা ১৯১৬-১৯৬৭ — কৃষ্ণ কৃপালনি
  - শমীন্দ্র ১৮৯৬-১৯০৭

- ★গিরীন্দ্রনাথ ১৮২০-১৮৫৪ — যোগমায়া দেবী
  - গণেন্দ্রনাথ ১৮৪১-১৮৬৯ — নিঃসন্তান
  - কাদম্বিনী — যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
    - জ্যোতিঃপ্রকাশ ১৮৫৫-১৯১৯
      - যামিনীপ্রকাশ
  - কুমুদিনী — নীলকমল মুখোপাধ্যায়
  - গুণেন্দ্রনাথ ১৮৪৭-১৮৮১ — সৌদামিনী দেবী
    - গগনেন্দ্রনাথ ১৮৬৭-১৯৩৮
    - সমরেন্দ্রনাথ ১৮৭০-১৯৫১
    - অবনীন্দ্রনাথ ১৮৭১-১৯৫১
    - বিনয়িনী — শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়
      - প্রতিমা দেবী । মধ্যমা ১৮৯৩-১৯৬৯
    - সুনয়নী — রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

সংশোধন ।। নূতন তথ্য-অনুযায়ী বংশলতিকায় রবীন্দ্রনাথের কন্যা রেণুকার জন্মকাল ১৮৯২ ?

সঞ্চয়

সঞ্চয় ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল :

রোগীর নববর্ষ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯
রূপ ও অরূপ	প্রবাসী। পৌষ ১৩১৮
নামকরণ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। চৈত্র ১৩১৮
ধর্মের নবযুগ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; ভারতী। ফাল্গুন ১৩১৮
ধর্মের অর্থ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮
ধর্মশিক্ষা	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মাঘ ১৩১৮
ধর্মের অধিকার	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩১৮
আমার জগৎ	সবুজ পত্র। ১৩২১

ধর্মের নবযুগ মাঘোৎসব উপলক্ষে ১১ মাঘ ১৩১৮ মহর্ষি-ভবনে পঠিত হয়।

ধর্মের অর্থ ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৪ ভাদ্র ১৩১৮ সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হয়।

ধর্মশিক্ষা কলিকাতা সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলনে ২৭ ডিসেম্বর ১৯১১ সায়ংকালে পঠিত হয়।

ধর্মের অধিকার মাঘোৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১২ মাঘ ১৩১৮ সায়ংকালে পঠিত হয়।

নামকরণ রচনার উপলক্ষাদি প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

পরিচয়

পরিচয় ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল :

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩১৯
আত্মপরিচয়	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বৈশাখ ১৩১৯
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩১৮
ভগিনী নিবেদিতা	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩১৮
শিক্ষার বাহন	সবুজ পত্র। পৌষ ১৩২২
ছবির অঙ্গ	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২২
সোনার কাঠি	সবুজ পত্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
কৃপণতা	সবুজ পত্র। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২
আষাঢ়	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২১
শরৎ	সবুজ পত্র। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ৪ চৈত্র ১৩১৮ তারিখে ওভারটুন হলে পঠিত হয়। এই প্রবন্ধ পঠিত ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইলে সাময়িক পত্রে নানারূপ আলোচনা হয় ; রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা এই স্থলে মুদ্রিত হইল :

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'

বিগত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচিত 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্যপূর্ণ ইতিহাসের নানারঙের

বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি যাহা এতদিন সহস্র চেষ্টা করিয়াও আলোকাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না, এইবার তাহার সে চেষ্টা বাঞ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিবে তাহার অরুণোদয় দেখা দিয়াছে ; তবে যে, চতুর্দিকে কর্কশ কা কা ধ্বনি হইতেছে— রজনী-প্রভাতের সমসমকালে তাহা হইবারই কথা। এতদিনের ধস্তাধস্তির পরে ভারতে প্রকৃত ইতিহাসের এই যে একটা সম্ভবমতো পাকা রকমের গোড়াপত্তন হইল, ইহা বঙ্গ-সরস্বতীর ভক্ত সন্তানদিগের কত-না আনন্দের বিষয়। গোড়াপত্তন হইয়াছে যেরূপ সুন্দর, তাহার উপরে তদনুরূপ ভিত গাঁথিয়া তুলিতে হইলে আরো নানাপ্রকার ইষ্টক প্রস্তর এবং মালমশলার জোগাড় করা আবশ্যক, তা ছাড়া পুরাতন ইতিহাস-ভারতীর নূতন দেবালয়ের নির্মাণকার্যে বাছা-বাছা কারিকরদিগের সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রবন্ধটির সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন আপাতত যাহা আমার মনে উত্থিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে এই :

মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে কি উত্তর অঞ্চলে ?

রবীন্দ্রনাথের লেখার আভাসে আমার এইরূপ মনে হয় যে, তাঁহার মতে মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে। তিনি যাহা আঁচিয়াছেন তাহা একেবারেই অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, যেহেতু বাস্তবিকই রাক্ষসাদি ক্রূর জাতিদিগের মধ্যে বিষ্ণুর স্নিগ্ধমূর্তি উপাস্য দেবতার আদর্শ পদবীতে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। দুর্দান্ত রাক্ষস জাতিদিগের মনোরাজ্যের সিংহাসন শিবের রুদ্রমূর্তিরই উপযুক্ত অধিষ্ঠান-মঞ্চ। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও আমরা দেখিতে পাই যে, একদিক যেমন রক্ষঃ আর-একদিকে তেমনি যক্ষ। প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল যেমন রক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান (headquarters) ছিল— উত্তর অঞ্চল তেমনি যক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর্যদিগের চক্ষে দক্ষিণের দ্রাবিড়াদি জাতিরা যেমন রাক্ষস-বানরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল, উত্তরের মোগলাদি জাতিরা তেমনি যক্ষকিন্নরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল— ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিকটাকার বিষয়ের দক্ষিণের রক্ষ এবং উত্তরের যক্ষের মধ্যে যেমন মিল আছে, কিম্ভূতকিমাকার বিষয়ে তেমনি দক্ষিণের বানর এবং উত্তরের কিন্নরের সঙ্গে মিল আছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যক্ষদিগের রাজধানীতে কুবেরপুরীতে মহাদেবের অধিষ্ঠানের কথা কাব্যপুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া কৈলাসশিখর মহাদেবের প্রধান পীঠস্থান।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠে একটি বিষয়ে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে ; সে-বিষয়টি এই যে, জনক রাজা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাহা নহে, সেইসঙ্গে তিনি ভারতে কৃষিকার্য প্রবর্তনের প্রধান নেতা ছিলেন ; আর তাঁহার গুরু ছিলেন বিশ্বামিত্র। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, হিমালয় প্রদেশের কিরাত জাতিরা ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত— তাহারা কৃষিকার্যের ধারই ধারিত না। কিরাত জাতি মোগল এবং তাতারদিগের সহোদর জাতি ইহা বলা বাহুল্য। এটাও দেখিতেছি যে, হিমালয়ের উপত্যকায় মহাদেব অর্জুনকে কিরাতবেশে দেখা দিয়াছিলেন। মহাদেব কিরাতদিগের দলে মিশিয়া কিরাত হইয়াছিলেন। মহাদেব পশুহন্তাও বটেন, পশুপতিও বটেন। মহাদেব যে অংশে কিরাতদিগের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুহন্তা ; আর, যে অংশে তিনি খাস মোগলদিগের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুপতি। পুরাকালের মোগল এবং তাতার জাতিরা জীবিকালাভের একমাত্র উপায় জানিত পশুপালন, তা বৈ, কৃষিকার্যের ক অক্ষরও তাহারা জানিত না— ইহা সকলেরই জানা কথা। তবেই হইতেছে, মোগল এবং তাতার জাতিরা— সংক্ষেপে যক্ষেরা— একপ্রকার পশুপতির দল ছিল ; সুতরাং পশুপতি মহাদেব বিশিষ্টরূপে তাহাদেরই দেবতা হওয়া উচিত ; আর পুরাণাদিকে যদি শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হয়, তবে ছিলেনও তিনি তাই। যক্ষরাজ কুবেরের রূপ ছিল

অনার্যোচিত ; আর, তিনি ধনপতি নামে বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতে ধন-শব্দে বিশিষ্টরূপে গোমেষাদি পশুধনই বুঝাইত। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পশুজীবী মোগল তাতার প্রভৃতি জাতিরাই প্রাচীন ভারতের আর্যদিগের ইতিহাসে যক্ষনাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কী পশুহন্তা কিরাত জাতি, কী পশুপালক মোগল জাতি, উভয়েই কৃষিকার্য বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞ ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ধনুর্ভঙ্গের ব্যাপারটিকে কোন্ প্রকার বিঘ্নভঙ্গ বলিব ? কিরাতদিগের পশুঘাতী ধনুর্ভঙ্গ বলিব ? না রাক্ষসদিগের বিষদাঁত ভঙ্গ বলিব ? আমার বোধ হয়, প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক যোগ-সেতু বর্তমান ছিল ; কেননা লঙ্কাপুরী প্রথমে কুবেরের ছিল, পরে তাহা রাবণ বলপূর্বক হস্তগত করিয়াছিল। রাবণ এবং কুবের যে একই পিতার পুত্রদ্বয় ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

এ সম্বন্ধে আর-একটি কথা আমার বলিবার আছে— সেটাও বিবেচ্য। কথাটি এই :

নেপাল প্রদেশে বুদ্ধমন্দির এবং শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থিতি করে। গুর্খারাও শৈবধর্মাবলম্বী। খুব সম্ভব যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধসাধকেরা হিমালয় প্রদেশে নির্জনে যোগসাধন এবং তপস্যা করিতেন। উমা যেমন উপনিষদের সুনির্মলা ব্রহ্মবিদ্যা, পার্বতী তেমনি তন্ত্রশাস্ত্রের বিভীষিকাময়ী দশমহাবিদ্যা। ভক্তের দেবতা যেমন বিষ্ণু, যোগীতপস্বীদিগের দেবতা তেমনি মহাদেব। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধ সাধকেরা বিশিষ্টরূপে যোগীতপস্বী ছিলেন। মহাদেব সেই-সকল পর্বতবাসী বৌদ্ধ যোগীতপস্বীদিগের আদর্শ-প্রতিমা— এরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বৌদ্ধধর্ম এবং আর্যধর্মের ঘাতপ্রতিঘাত' নামক পুস্তিকায় এই বিষয়টির সম্বন্ধে আমি যাহা সবিস্তারে লিখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :

পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা আশ্চর্য নূতন প্রণালীতে বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রতিবিধানচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ যোগীতপস্বীদিগের আর্য যোগীতপস্বীদিগের দলে টানিয়া লইলেন, আর মহাদেবকে এই-সকল অবৈদিক যোগীতপস্বীদিগের ইষ্টদেবতার পদবীতে আসন গ্রহণ করাইলেন। পাছে লোকে মনে করে, যোগীশ্বর মহাদেব বুদ্ধেরই আর-এক অবতার— এই আশঙ্কায় পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা তাঁহার গলায় পৈতা দিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের মোট কথাটির সহিত আমার মতের একটুও অনৈক্য নাই। যে দু-একটি কথা আমি উপরে ইঙ্গিত করিলাম তাহার সহিত ভারতের ইতিহাস-ধারার কথাগুলির সমন্বয় মতে প্রবন্ধটির অঙ্গপূরণ করা হইলে ভালো হয়— ইহাই আমার মনোগত অভিপ্রায়। আমার বিশ্বাস এই যে, এই সমন্বয়কার্যটি রবীন্দ্রনাথ মনে করিলেই ঈশ্বরপ্রসাদে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সুনিষ্পন্ন করিতে পারেন।[৪৪]

আত্মপরিচয় প্রবন্ধ ছাত্রসমাজের অধিবেশনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা তত্ত্বকৌমুদী এই প্রবন্ধে বিবৃত মতের প্রতিবাদ করেন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ব্রাহ্ম প্রবন্ধে তাহার প্রত্যুত্তর দেন।

হিন্দু ব্রাহ্ম

'আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধে আমরা এই কথাটি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু, ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু। ইহাতে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন যে, যেহেতু আদি ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক বিষয়ে 'উন্নতিশীল' ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছেন 'তখন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু কি

৪৪ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯

না, এ কথা বিচার করিবার অধিকার আদি ব্রাহ্মসমাজের কাহারও নাই। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অনেককাল অতিক্রম করিয়াছেন।'[৪৫]

পরস্পরের উন্নতির তারতম্যসম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই কইব না, কারণ ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের পক্ষে যাহা অন্যায় তাহা যে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও অন্যায় অন্তত এ কথাটা আমাদিগকে কর্তব্যের অনুরোধে বলিতে হইবে।

নিশ্চয়ই আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে। যেমন যেমন তাহা বুঝিতে পারিব তেমনি তাহার বন্ধন কাটাইয়া উঠিব এইরূপ আশা করি— কিন্তু আমাদের এরূপ সংস্কার আদৌ নাই যে, বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার অধিকার কেবল কোনো বিশেষ উপাধি দ্বারা চিহ্নিত সমাজের লোকেরই আছে অন্য সমাজের লোকের নাই। যদিচ আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য তথাপি ঈশ্বর আমার চিন্তা করিবার শক্তি সম্পূর্ণ অপহরণ করেন নাই ; এবং কে হিন্দু ও কে হিন্দু নয় ইহা আমার পক্ষে বিচার করিবার অধিকার যদিচ 'উন্নতিশীল' সম্পাদক মহাশয় কাড়িয়া লইতে চান তথাপি মনুষ্যত্বের সকল মহৎ অধিকারই আমরা যাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছি তিনি এ সম্বন্ধে আমাদের কাহাকেও কোনো বাধা দিয়াছেন বলিয়া আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশ্বাস করি না।

উপবীতচিহ্নের দ্বারা সমাজে অধিকারভেদ নির্দিষ্ট হয় বলিয়া যাঁহারা উপবীতধারণকে নিন্দা করেন তাঁহারা কি এ কথা চিন্তা করিবেন না যে, অদৃশ্য উপবীত দৃশ্য উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ় ? 'উন্নতিশীল ব্রাহ্ম' নামের পৈতাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় যে জাত্যভিমান, যে কৌলীন্যগর্ব প্রকাশ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত ?

উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ কেবলমাত্র উন্নতিশীলতার বেগে হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অনেক কাল হইল কাটাইয়াছেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে গণ্ডী আমাদের স্বরচিত ও কৃত্রিম নহে তাহা আমরা কাটাইতে পারি না। যেমন আমার একটা দেহের গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীকে আশ্রয় করিয়া আমি একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি ; এই স্বাতন্ত্র্য যদি আমার উন্নতির প্রতিকূল ও আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তবে বিশ্বের সহিত একাকার হইবার চেষ্টায় পঞ্চত্বলাভ ছাড়া আমার অন্য কোনো গতি থাকে না।

গণ্ডীর পরে গণ্ডী, চক্রের পর চক্র কাটিয়া বিধাতা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর গণ্ডী পৃথিবীর, সূর্যের গণ্ডী সূর্যের, তৃণের গণ্ডী তৃণের, মানুষের গণ্ডী মানুষের। স্বাভাবিক গণ্ডীর বিরুদ্ধে লড়াই করাই যে উন্নতিশীলতার লক্ষণ এ কথা মনে করি না।

আবার আমাদের স্বরচিত গণ্ডীও আছে। কেননা, বিধাতার সৃষ্টিকার্যেও যেমন মানুষের সৃষ্টিকার্যেও তেমনি— গণ্ডী দিয়া দিয়াই গড়িয়া তুলিতে হয়। মানুষের ঘরবাড়ি একটা গণ্ডী, তাহার পরিবার একটা গণ্ডী, তাহার ব্যবসায় একটা গণ্ডী। প্রত্যেক গণ্ডীর মধ্যে বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতার দ্বারা মানুষ আপন ঘরে আপন পরিবারে আপন ব্যবসায়ে স্বতন্ত্র। এমন-কি, সামান্য ছাতাজুতা ঘটিবাটিও সরকারী নহে, এবং কেহ তাহাকে সরকারী করিবার চেষ্টা করিলেই থানায় খবর দিতে হয়।

তাই যদি হইল তবে সর্বজনীনতা বলিয়া একটা পদার্থ কি একেবারেই আকাশকুসুম ? যদি সকলপ্রকার গণ্ডীকে, সকলপ্রকার বিশিষ্টতাকে একেবারে অস্বীকার করাকেই সর্বজনীনতা বলে তবে সর্বজনীনতা বস্তুতই আকাশকুসুম সন্দেহ নাই। ভাইকে মানি না কিন্তু ভ্রাতৃভাবকে মানি, এ কথাটাও যেমন তেমনি সর্বজনকে বিশেষ বলিয়া মানি না একটা নির্বিশেষ সর্বজনীনতাকে মানি ইহাও সেইরূপ মাথা-নেই-তার-মাথা-ব্যথা। প্রত্যেকের বিশিষ্টতা আছে বলিয়াই সেই অগণ্য

৪৫ 'আদি সমাজ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ', তত্ত্বকৌমুদী, ১ বৈশাখ ১৩১৯

বিশিষ্টতার মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করার সাধনা সর্বজনীনতা— নতুবা তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। বিশিষ্টতাকে স্বীকার করা যে কুসংস্কার এইরূপ সৃষ্টিছাড়া কথাই অন্ধ সংস্কার। অতএব হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী কাটাইয়া যাওয়াকে উন্নতিশীলতা বা কোনো শীলতাই বলে না, তাহা একটা ব্যর্থবাক্য উচ্চারণ মাত্র।

ভূতের বিশ্বাস পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে— যখন বলা যায় আমি এই ভূতের বিশ্বাসের কুসংস্কার কাটাইয়াছি তখন এমন কথা বলা হয় না যে আমি মনুষ্যত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছি।

তেমনি হিন্দুসমাজে যে কুসংস্কার প্রচলিত আছে যদি কোনো হিন্দু সে সংস্কার কাটাইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কুসংস্কারহীন হিন্দু বলিব, অহিন্দু বলিব না। কুসংস্কারই হিন্দুর স্থায়ী পরিচয় এমন অদ্ভুত কথা কোনোমতেই বলা চলে না। এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, অন্ধসংস্কার মানুষের সকল জাতির মধ্যেই আছে কিন্তু বিধাতার রাজ্যে অন্ধসংস্কারের স্বভাবই এই যে তাহা নিত্য নহে ; বস্তুত এইজন্যই উন্নতিশীল হওয়া সম্ভব, এবং এইজন্যই আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা অন্য যে-কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ যতই মূঢ় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হই-না তৎসত্ত্বেও আমরা উন্নতিশীল, কারণ, আমরাও মানুষ। তাই যদি না হইবে তবে পৃথিবীতে ধর্মসংস্কারকের মতো উন্মত্ত পাগল আর তো কেহই নাই। সত্যমেব জয়তে এই বাণী বিশ্বচরাচরে কেবল হিন্দুসমাজেই অসত্য, বিশ্ববিধাতা কেবল এই হিন্দুসমাজেই পরাস্ত হইয়া হাল ছাড়িয়াছেন— অসাধারণ উন্নতিলাভ করিলেও এমন কথা বলিতে পারিব না। অতএব হিন্দুসমাজের প্রচলিত ভ্রম ও অন্ধসংস্কার বর্জন করার দ্বারাই যদি আমরা অহিন্দু হই তবে শিশু রাম কথা কহিতে শিখিলেই শ্যাম হইয়া যায় এ কথাটা বলা চলে। তাহাকে বালক রাম বা যুবক রাম বা সুবুদ্ধি রাম বল তাহাতে কোনো বাধা নাই কিন্তু তাহাকে রামই বলিব না এমন পণ করিলে মানুষের নিত্যই নূতন নামকরণ করিয়া চলিতে হয়।

যাঁহারা আমার প্রবন্ধ ভালো করিয়া না পড়িয়াই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের ভাবখানা এই যে, 'তুমি আমাকে হিন্দু বলিতেছ তবেই তো বলা হইতেছে আমি পৌত্তলিক, আমি জাতিভেদ মানি ইত্যাদি ইত্যাদি ; তুমি নিজের সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পারো, কেননা, তুমি কুসংস্কারাপন্ন, তুমি সাধারণ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নও, তোমার পিতা এমন কাজ করিয়াছেন, তিনি এমন কথা বলিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।'

বস্তুত আমার পিতা যদি অত্যন্ত সংকীর্ণ সংস্কারের অনুদার প্রকৃতির লোক ছিলেন ইহাই প্রকৃত সত্য হয় তবে আমার পিতাকে আমি তো পিতারূপে ত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও বা আমার কোনো-একটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহা আমার ইচ্ছার মধ্যেও উদয় হয় তথাপি তাহা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। আমারই পিতার সন্তান যে আমি, এ গণ্ডী বিধাতার গণ্ডী। সুখের বিষয় এই যে, এই গণ্ডী স্বীকার করিয়াও আমি সর্বজনীন হইতে পারি, এমন-কি, কোনো একদিন হঠাৎ কায়ক্লেশে উন্নতিশীল হইয়া উঠাও আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে। হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যেও বিধাতার সেই বিধান আছে বলিয়াই তাহা নানা পরিণতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনো হইবে— হিন্দুসমাজের মধ্যেও সেই সত্যস্বরূপ বিধাতার বিধান কাজ করে বলিয়াই এই সমাজেই আজ আমরা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় দেখিলাম। ইহাতেও কি বিধাতার উপরে বিশ্বাস জন্মে না, সত্য বিধানের প্রতি নির্ভর বাড়ে না ? হিন্দুসমাজে ভ্রম আছে, অন্ধসংস্কার আছে, সবই আছে মানি কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি করিয়া মানি হিন্দুসমাজেও সত্য আছেন, মঙ্গল আছেন, ব্রহ্ম আছেন। হিন্দুসমাজের মধ্যে আমি সেই সত্যের দিকে মঙ্গলের দিকে ব্রহ্মের দিকে দাঁড়াইব ইহাই যেন আমার সংকল্প হয়। সাধক যাঁহারা তাঁহারা সকল সমাজেই সত্যের দিকেই নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই অভিমুখে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। যেখানে অসত্যের অজ্ঞানের প্রভাব বেশি সেইখানেই সত্যকে তাঁহারা দেখেন ও

সত্যকে তাঁহারা দেখান, ইহাই তাঁহাদের ব্রত। দুর্গতির মধ্যে যে সমাজ উপনীত হইয়াছে তাহাকে তাঁহারা ত্যাগ করেন না, কারণ তাঁহাদের এই বিশ্বাস অটল যে দুর্গতি কখনোই নিত্য হইতে পারে না এবং যিনি পরমাগতি তিনি দুর্গতির মধ্যেই আপনাকে একদা পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করেন। বস্তুত যথার্থ প্রেমের সাধনা, শক্তির সাধনা, সেইখানেই সেই দুর্যোগে সেই দুর্দিনে। আমাদের আত্মাভিমান সেখান হইতে দূরে যাইতে চায়, আমাদের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঘৃণাই বিশ্বজনীনতার লক্ষণ নহে— কিন্তু যে দুর্গতিগ্রস্ত তাহাকেই আপন বলিয়া স্বীকার করার মধ্যেই যথার্থ সর্বজনীনতা আছে। কারণ, সর্বজনীনতা কেবল একটা বস্তুবিহীন বাক্য মাত্র নহে, তাহা অহংকৃত আত্মপরিচয়ের একটা স্বরচিত উপাধি মাত্র নহে, তাহা প্রেমের জিনিস, এইজন্যই তাহা সত্য। সেই প্রেম সকলের চেয়ে নীচের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়াও সকলের চেয়ে উচ্চে আপনার স্থান লাভ করিয়া থাকে ; সীমার মধ্যে বাস করিয়াও প্রতি মুহূর্তে সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে।

ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু-ইতিহাসের একটি বিকাশ, এই কথা আমরা বলিয়াছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম যতবড়োই সর্বজনীন ধর্ম হউক-না, বিধাতার সৃষ্টির নিয়ম তাহাকেও মানিতে হয়, নতুবা তাহা সত্যই হইতে পারে না। অতএব বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে তাহার উদয় হইয়াছে ব্রাহ্মধর্মের এই ঐতিহাসিক বন্ধনটুকু স্বীকার করিতে লজ্জা বা ক্ষোভের কোনো কারণ থাকিতে পারে না। যদি ইতিহাসকে মানি, যদি হিন্দু-ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশরূপ ঘটনাকেই একেবারে অস্বীকার করিয়া না বসি তবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটার সুস্পষ্ট অর্থই এই যে, হিন্দুর প্রকৃতির মধ্যে ও অবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি সমাবেশ আছে যাহাতে এই ধর্ম এইপ্রকার রূপ লইয়া এইখানেই ব্যক্ত হইতে পারিয়াছে।

হিন্দু-ইতিহাসের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশ, ইহার কারণরূপে নানা শক্তির খেলা থাকিতে পারে। হয়তো বিদেশের আঘাত তাহার মধ্যে একটা কারণ। অর্ধরাত্রে ভূমিকম্পে আমাকে জাগাইয়াছিল, তাই বলিয়া জাগরণটা ভূমিকম্পের নহে সেটা আমারই জাগরণ। যদি ইহাই প্রকৃত সত্য হয় যে, কোরান পুরাণ বাইবেল বৌদ্ধশাস্ত্র এবং দেশদেশান্তরের যত-কিছু ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মসমাজ আছে সকলে একত্রে মিলিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টির ন্যায় এই ব্রাহ্মধর্মকে সৃষ্টি করিয়া থাকে তথাপি এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টি যদি হিন্দুর ইতিহাসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে তবে তাহা হিন্দুরই। সূর্যের আলোক সূর্যেই সম্ভবপর হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন সূর্য অসংখ্য উল্কাপিণ্ডকে নিরন্তর আত্মসাৎ করিয়া সেই আলোকের সঞ্চয় রক্ষা করিতেছে। তাহা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে, তথাপি এই আলোক সূর্যেরই। আমি শাক খাইয়া ফল খাইয়া দুধ মাছ ভাত খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি বটে তাই বলিয়া আমার প্রাণকে আমারই প্রাণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া ঐ শাকভাতকেই স্বীকার করিলে কি অত্যন্ত ঔদার্য প্রকাশ করা হয় ? প্রত্যেক ধর্মেরই উৎপত্তি সম্বন্ধে তর্ক আছে। কেহ বলেন খ্রীস্টানধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে চুরি, কেহ বলেন বৈষ্ণবধর্ম খ্রীস্টানধর্ম হইতে চুরি, এমনতরো আরো অনেক বাদবিবাদ আছে— তেমনি হয়তো কালক্রমে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ করিয়া দেখাইবেন ব্রাহ্মধর্ম জগতের সকল ধর্মের চোরাইমালের ভাণ্ডার। কিন্তু উৎপত্তিঘটিত সমস্ত বাদবিবাদ সত্ত্বেও খ্রীস্টানধর্ম খ্রীস্টানধর্মই, বৈষ্ণবধর্ম বৈষ্ণবধর্মই। খ্রীস্টানধর্ম যদি বৌদ্ধধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, বৈষ্ণবধর্ম যদি খ্রীস্টানধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, তাহার গৌরব খর্ব হয় নাই। অনাত্মকে গ্রহণ করিয়া আত্মীয়ে পরিণত করিবার শক্তিই জীবনের শক্তি— অনাত্মের মধ্যে আত্মবিশেষত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়াই মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব যেমন করিয়াই বিচার করি, হিন্দুর ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ স্বদেশীয় বিদেশীয় যত-কিছু কারণপরম্পরা অবলম্বন করিয়াই দেখা দিক-না তথাপি তাহা হিন্দুরই সামগ্রী। এই ইতিহাস আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না— ইহা আমার প্রিয় হইলেও সত্য, অপ্রিয় হইলেও সত্য। কিন্তু সকলের চেয়ে

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় আমার উক্তি স্বীকার করিয়াও আমার প্রবন্ধের প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছেন। তিনি একজায়গায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'ব্রাহ্মধর্ম কেবল যে হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, ব্রাহ্মগণ কেবল যে হিন্দুবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যেই অবস্থিত থাকিবেন তাহা নহে, সর্বদেশের লোক এই উদার ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।'[৪৬] আমি তো সর্বদেশের লোককে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের দরজায় কুলুপ লাগাইতে চেষ্টা করি নাই। হিন্দুও যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন এই কথাই আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম কেবল হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে' এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনোদিন বলি নাই।

তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে যে-সকল য়িহুদি মুসলমান য়ুরোপীয় আশ্রয় লইতেছেন তাঁহারা কি নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন ?[৪৭] পরিচয় নানা প্রকারের আছে— কোনোটা সংকীর্ণ কোনোটা ব্যাপক। আমি ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেই যে আমাকে হিন্দু পরিচয়ও গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। একজন ইংরেজ যে-অংশে ব্রাহ্ম কেবল সেই অংশেই হিন্দুর সহিত তাঁহার দেনাপাওনার একটা যোগ থাকিয়া গেল ; তাহাতে তাঁহার লজ্জার কারণ কিছুই নাই। আমরা হিন্দু হইয়াও ইংরেজি সাহিত্যে আনন্দ পাই, য়ুরোপীয় চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচাই, রেলগাড়িতে অসংকোচে চড়ি, টেলিগ্রাফে খবর পাঠাইয়া দিই— চিন্তামাত্র করি না তাহা আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্ভাবিত সামগ্রী কি না। এইরূপে প্রতিদিনই দেখিতেছি বিশেষ মানবজাতির কীর্তিই সর্বসাধারণ মানবজাতির সম্পদ।

বেদান্তদর্শনকে ভারতবর্ষীয় দর্শন বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাতে জর্মন পণ্ডিত ডয়সনের যদি জর্মনত্বে কোনো বাধা না ঘটাইয়া থাকে তবে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু-ইতিহাসের সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মুসলমানের বা ইংরেজের বা য়িহুদির লেশমাত্র বাধা কেন থাকিবে ? সত্যকে কি মানুষ এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতেছে না ? প্লেটোর রচনা কি গ্রীসের সীমার বাহিরে অস্পৃশ্য ? আরিস্টটলের দর্শন কি মুসলমান জ্ঞানী কোনোদিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং সেই গ্রহণ করিবার শক্তি দ্বারাই কি তাঁহার গৌরবহানি হইয়াছিল ? বস্তুত ব্রাহ্মধর্ম বিশেষভাবে হিন্দুর চিত্তের সমস্ত রস লইয়া বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই অহিন্দুর পক্ষে তাহার উপাদেয়তা বাড়িয়াছে নতুবা জগৎসংসারে তাহা নিতান্তই বাহুল্য হইয়া থাকিত, তাহা একটা পুনরাবৃত্তিমাত্র হইত, তাহার মধ্যে বিধাতার কোনো বিশেষ বিধান প্রকাশ হইতে পারিত না।

তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বারংবার বলিয়াছেন, খ্রীস্ট, মহম্মদ, থিওডোর পার্কার, মার্টিন লুথর, মার্টিনো সকলেই আমাদের গুরু[৪৮]। তিনি তালিকা আরো অনেক বাড়াইয়া দিতে পারেন। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য এই যে, মানবসমাজের মধ্যে যে দেশে যে জাতির মধ্যে যে-কেহ যে-কোনো সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন তিনি সেই বিষয়েই নিখিলমানবের গুরু। ইহাই সম্ভবপর বলিয়া আমরা সত্যকে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু এই কথা কেবল পরের বেলাই খাটিবে নিজের বেলা খাটিবে না ? খ্রীস্টানের সত্য মুসলমানের সত্য আমি গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু আমার সত্য আমার বলিয়াই পাছে খ্রীস্টান ও মুসলমান গ্রহণ না করে এই কারণেই তাহা আমার সত্য নয় এমন কথা বলিতে হইবে ? বাম হাতের দিকে সত্যকে মানিব আর ডান হাতের দিকে তাহাকে মানিব না ? লইবার বেলা এক কথা আর দিবার বেলা তাহার বিপরীত ?

৪৬ 'ব্রাহ্মধর্মের মূল-মত ও অবান্তর বিষয়', তত্ত্বকৌমুদী, ১ বৈশাখ ১৩১৯

৪৭ 'হিন্দু কি ?' তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ চৈত্র ১৩১৮

৪৮ 'ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম', তত্ত্বকৌমুদী, ১ বৈশাখ ১৩১৯

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, সব ধর্মই যদি হিন্দুধর্ম হইতে পারে, যদি হিন্দুর বিশেষ ধর্ম কী তাহা আমরা না জানি তবে তো নিজেকে হিন্দু বলাও যা আর সাদা চেকে স্বাক্ষর করাও তা।[৪৯] সকল জাতির মধ্যেই তো সাদা চেকের ফাঁকা জায়গা আছে। কোনো ইংরেজ যদি এরূপ মত প্রকাশ করে যে, জাতিভেদ ভালো অথবা জেনেনা প্রথা স্ত্রীপ্রকৃতির পক্ষে যথার্থ অনুকূল তথাপি যে ইংরেজ ইংরেজ তাহার সকল বিষয়ে সকল মতই একেবারে অবিচলিতরূপে পাকা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক ইংরেজ আপনাকে ইংরেজ বলিবার অধিকার পাইয়াছে ইহাই কি সত্য ? প্রত্যেক ইংরেজের হাতেই সাদা চেকের খাতা আছে তাহাতে তাহার আপনাকে ইংরেজ বলিবার কোনো বাধা ঘটে নাই। সেইরূপ আমরা দেখাইয়াছি হিন্দু কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট ধর্মের বা মতের পরিচায়ক নহে কিন্তু সেইজন্যই যদি হিন্দু বলিয়া কিছুই না থাকে তবে মানুষ বলিয়াও কিছু থাকে না, তবে কেহ বলিয়াও কেহ নাই। আমি যে একজন বিশেষনামধারী ব্যক্তি, আমার ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া অসংখ্য পরিবর্তন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, ছেলেবেলা হইতে আজ পর্যন্ত আমি কত ভুল বুঝিয়াছি ও সে ভুল ছাড়িয়াছি, কত মত লইয়াছি ও বিসর্জন দিয়াছি, শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারা কাটাকুটি-করা আমার রাশি রাশি এক্সের্সাইজ বহির সঙ্গে আর আমার অদ্যকার শিক্ষার একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আশৈশবকাল হইতে আজ পর্যন্ত নিজের সমস্ত খুঁটিনাটি যদি বিচার করিয়া দেখি তো দেখিব, মতে ভাবে কর্মে আত্মবিরোধের আর অন্ত নাই কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই-সমস্ত বিরোধ ও অনৈক্যগুলিও একটি গভীরতম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে ; সেই সূত্রটি আচ্ছন্ন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নির্দেশ করা কঠিন ; অনৈক্যের পরম্পরাটাই বাহিরে প্রকাশমান— তবু যে লোক দেখিতেছে সে এই অনৈক্যের মালাকেও মালা বলিয়া দেখিতেছে— সে প্রতিদিনের ভূরি ভূরি বিচ্ছেদের মধ্যেও আমাকে বিচ্ছিন্ন পদার্থ বলিয়া ভ্রম করিতেছে না। অতএব, যেমন সকল জাতিরই, যেমন সকল মানুষেরই, তেমনি হিন্দুরও ইতিহাসে মতের ধর্মের আচারের পরিবর্তনহীন অবিচলিত ঐক্য নাই, সেরূপ ঐক্য থাকিতে পারে না, এবং না থাকাই মঙ্গল। সেইরূপ নিশ্চল ঐক্য আছে বলিয়া যাঁহারা গৌরব বোধ করেন তাঁহাদের সেই গৌরববোধ কাল্পনিক— সেরূপ ঐক্য নাই বলিয়া যদি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তবে তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাও একেবারে অযৌক্তিক।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির সহস্র বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে যে এক প্রবল শক্তি গভীর ভাবে কাজ করিতেছে সেই শক্তি আর্যের সঙ্গে অনার্যকে রক্তে রক্তে মিলাইয়া দিয়াছে, সেই শক্তি শক হূন এবং গ্রীক উপনিবেশগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, সেই শক্তি শত শত ধর্মমত ও আচারকে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছে এবং সেই শক্তিই সকল ধর্মের অনৈক্যের ভিতর দিয়া অনন্ত সত্যের একটি সুমহৎ ঐক্যকে উপলব্ধি করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার কার্যক্ষেত্র অতি বৃহৎ, তাহার উপকরণ অতি বিপুল বলিয়াই তাহার বাধাও পর্বতপ্রমাণ— কিন্তু এই বাধাই তাহার নিত্য নহে ; সে মহত্তম সত্যকে চায় বলিয়াই গুরুতর ভ্রান্তির সহিত পদে পদে তাহাকে লড়াই করিতে হইতেছে ; সে যে সামঞ্জস্যকে ঘটাইয়া তুলিবার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়াছে তাহা সংকীর্ণ নহে বলিয়াই তাহার অনৈক্যভারে সুদীর্ঘ পথ সে এমন পীড়িত হইয়া চলিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অনৈক্যরাশিই তাহার চরম সঞ্চয় নহে। আজ যদি এই হিন্দুর ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া আমরা কোনো একটি ঐক্যের উপলব্ধিকে পাইয়া থাকি তবে অকৃতজ্ঞের মতো কি আমরা এমন কথা বলিতে পারি যে, সাধনা যাহার সিদ্ধি তাহার নহে ? এতদিনের দায়-বহনটা রহিল হিন্দুর, আর সই দায়-শোধের অঙ্কটা কেবলমাত্র আমাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র খাতায় জমা করিয়া লইব এবং তাহাকেই নাম দিব অসাম্প্রদায়িকতা ? যেখানেই হিন্দু-ইতিহাসের সফলতা সেইখানেই আমি তাড়াতাড়ি সকলকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সকল

৪৯ 'সাদা কাগজে স্বাক্ষর', তত্ত্বকৌমুদী, ১ বৈশাখ ১৩১৯

হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হইয়া নিজের আসনটা চৌকা করিয়া পাতিয়া লইয়া চারি দিকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া তুলিয়া দিব এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিব, এসো খ্রীস্টান, এসো মুসলমান, এসো য়িহুদি, আমরা ব্রহ্মনামের সদাব্রত খুলিয়াছি, কিন্তু এই সদাব্রতের আয়োজনটি হিন্দুর নহে, ইহা কেবল আমাদেরই এই কয়জনের ; ইহার মধ্যে অতীতের কোনো সাধনা নাই, চিরন্তনকালের ঐতিহাসিক পরীক্ষাশালার কোনো ছাপ নাই, মানবসমাজে সত্যমাত্রই বিধাতার স্বহস্তস্বাক্ষরিত যে একটি বিশেষ দেশকালের পরিচয় লইয়া আসে ইহার মধ্যে সেই স্বাক্ষর নাই, সেই পরিচয় নাই— এই যে আমাদের ভাবাবেগ, এই যে আমাদের আইডিয়াল— কবন্ধের মতো ইহার মুণ্ড নাই কেবল দেহ আছে, ইহার বিশেষত্ব নাই কেবল বিশ্বত্ব আছে ; ইহা নিজের পায়ের তলার আশ্রয়কে মাটি বলিয়া অবজ্ঞা করে এবং শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তাহাও নিজের হাত দিয়া নহে পাছে সেই নিজত্বের দ্বারা বিশ্বজনীনতার খর্বতা ঘটে।[৫০]

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষে রিপন কলেজে ২৯ অক্টোবর ১৯১১ তারিখে পঠিত হয়।

শিক্ষার বাহন ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২২ তারিখে রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত হয়।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের এই নূতন নহে, ১২৯৯ সালে 'শিক্ষার হেরফের' রচনার সময় হইতে তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ; এবং ১৩৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ'[৫১] ও 'শিক্ষার বিকিরণ'[৫১] প্রবন্ধে ও ১৩৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পদবী-সম্মান বিতরণ-সভায় পঠিত 'ছাত্র-সম্ভাষণ'[৫২] প্রবন্ধেও, প্রসঙ্গক্রমে এ-বিষয়ে মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন ; ১৩৪৩ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সপ্তাহে পঠিত 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'[৫২] প্রবন্ধেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কর্তৃপক্ষের নিকট একই আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে··· বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী ?··· প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না ?' শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রবন্ধেও তদনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব আজিজুল হক মহাশয়কে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন নীচে তাহা অংশত মুদ্রিত হইল।

আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষা-বিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানাকারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে

৫০ আলোচ্য বিষয়টি লইয়া ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালের তত্ত্বকৌমুদীতে আরো কয়েকটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু' প্রবন্ধে, ব্রাহ্মগণ হিন্দু, এই মত সমর্থন করেন। ১৩২১ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি পুনরুত্থাপিত করেন, তাঁহার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মত সমর্থিত হয় ; তাহার অনুবৃত্তিরূপ ঐ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্বকৌমুদীতে এ-বিষয়ে অনেক বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় ; গুরুচরণ মহলানবিশ, সুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি অজিতকুমারের প্রতিবাদ করেন।

৫১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড (সুলভ ৬) ; ঐ খণ্ডে 'শিক্ষা'র গ্রন্থপরিচয়ও দ্রষ্টব্য।

৫২ 'শিক্ষা', ১৩৫১ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তা ছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রায় কর্ণধার।

'বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেও' ইতিপূর্বে শিক্ষার বিকিরণ প্রবন্ধে তিনি অনুরূপ 'আবেদন উপস্থিত' করিয়াছিলেন :

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সে-রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় বা গবর্নমেন্ট হইতে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় বিশ্বভারতী লোকশিক্ষাসংসদ যথাশক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতে থাকেন, এই কাজ এখনো চলিতেছে।

পরিচয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পূর্বতন প্রবন্ধ বর্জিত ও নূতন প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণের প্রবন্ধসূচী অনুসৃত হইল।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরেই (২২ আগস্ট ১৯১৭) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে উহা কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরিতে (৪ আগস্ট ১৯১৭) ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে আলফ্রেড থিয়েটার গৃহে পঠিত হয়।

এই বৎসর আষাঢ় মাসে, ভারতবর্ষে আত্মশাসন-প্রবর্তনচেষ্টার ফলে, 'নির্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায় শ্রীমতী অ্যানী বেসান্ট ও তাঁহার দুই জন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত'[৫৩] হয়। 'কথা হয় যে, টাউন-হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে, এবং তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্নমেন্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এ সভার কয়েকজন উদ্যোক্তাকে ডাকিয়া এই জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা গবর্নমেন্ট

৫৩ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, 'প্রতিবাদের অধিকার'।

টাউন-হলে এই সভা হইতে দিবেন না ; কেবল মান্দ্রাজ গবর্নমেন্ট একটি কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্নমেন্ট সভা হইতে দিতে পারেন না ; অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলা গবর্নমেন্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না,[৫৪] কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদাদি করিলে গবর্নমেন্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন।'[৫৫] এইরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন ; জনশ্রুতি, এইজন্য তাঁহার গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছিল।

'যখন বঙ্গের গবর্নর টাউনহলে শ্রীমতী বেসান্টের স্বাধীনতালোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারি করেন, তখন বাক্যস্ফূর্তি 'রাজনীতি-ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ' ('novice in politics') রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরিতে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।'[৫৬]

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটি এই সময় রচিত ও রামমোহন লাইব্রেরির সভায় সর্বপ্রথম সাধারণ্যে গীত হয়; গানটি প্রবাসীতে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সম্ভবত এই প্রবন্ধে বিবৃত সমাজ-সংক্রান্ত মতামত প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রব্যবহার করেন ; তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন তাহা মুদ্রিত হইল :

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। কিছুদিন হইতে বাংলাদেশের যুবকদের ভাবগতিক দেখিয়া বড়োই হতাশ হইতেছিলাম। স্বদেশভক্তির নাম লইয়া বিচারবুদ্ধির অন্ধতা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন-কি আমার এই বিদ্যালয়ে অল্পবয়সে যে-সব ছাত্র আসে তারাও এমন একটা বিরুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া আসে যে হার মানিতে হয়। যে মূঢ়তা স্বাভাবিক তার প্রতিকার আছে। কিন্তু যে মূঢ়তা কৃত্রিম— যাহা জোর করিয়া কোমর বাঁধিয়া সর্বত্র তাল ঠুকিয়া বেড়ায়, তার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। আমি একরকম হাল ছাড়িবার চেষ্টাতেই ছিলাম, এমন সময় এই বক্তৃতার তাগিদ আসিল। আর যাই হোক একটা দেখিলাম, রাক্ষসটাকে যত প্রকাণ্ড প্রবল বলিয়া মনে হইত উহার জোর ততটা নয়। উহার আয়তন বড়ো, কিন্তু ভিতরটা ভূয়ো একটু ধাক্কা মারিলেই দেখি টলমল করিয়া উঠে। সুতরাং যে পর্যন্ত না কাত হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা মারিবার সংকল্প রহিল। দূর হইতে আপনাদের উৎসাহবাণী কাজে লাগিবে। ইতি ৬ ভাদ্র ১৩২৪

৫৪ দ্রষ্টব্য পৃ ৬৫৯

'দেড়শো বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেন্টি ভালোমন্দ যাই করুক বাংলাদেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এতদিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিমপারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্বপারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখদুঃখে বাঙালীর কোনো মাথাব্যথা নাই ? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব ?'

৫৫ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, 'প্রতিবাদের অধিকার'।

৫৬ প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, 'রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব'।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী	...	৪৫৭
অগ্নিশিখা, এসো এসো	...	১৯৪
অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া	...	৯১
অচেনা	...	৯
অনাগতা	...	৩১
অনেক কালের একটিমাত্র দিন	...	৮০
অনেক হাজার বছরের	...	৪৬
অন্য কথা পরে হবে	...	৫৯
অবরুদ্ধ ছিল বায়ু	...	৬৬৯
অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে	...	২০৮
অসংগতি [বেসুর]	...	৬৬৫
অসম্ভব কথা	...	৩৭২
অসীম আকাশে কালের তরী	...	৬০
অহৈতুক	...	২৯২
আকাশে চেয়ে দেখি	...	৭৫
আজ তুমি ছোটো বটে	...	২০
আজ শরতের আলোয়	...	৭১
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে	...	২০৭
আত্মপরিচয়	...	৫৯২
আবাহন	...	২৮৯
আমরা কি সত্যই চাই	...	৬৩
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো	...	২৪৯
আমার এই ছোটো কলস পেতে রাখি	...	৬৭১
আমার এই ছোটো কলসিটা	...	৭৭
আমার এই ছোটো কলসখানি	...	১২৪
আমার কাছে শুনতে চেয়েছ	...	৬২
আমার জগৎ	...	৫৬৭
আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে	...	৭২
আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে	...	১৮৫
আমার রাত পোহাল	...	২১৬
আমার শেষবেলাকার ঘরখানি	...	১০৮
আমি	...	১২৬
আমি থাকি একা	...	২৬

আমি বদল করেছি	...	৫৭
আমেদাবাদ	...	৪৬৮
আরশি	...	১৩
আর রেখো না আঁধারে	...	২৩৮
আলোকরসে মাতাল রাতে	...	২৯৬
আলোর অমল কমলখানি	...	২৭৫
আশীর্বাদ	...	৫
আষাঢ়	...	১২৮, ২৬৮, ৬৪০
আসন্ন শীত	...	২৮২
উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল	...	১৫৬
উৎসব	...	২৯৪
উদ্‌বোধন	...	২৫৮
ঋষি কবি বলেছেন	...	৯৬
এই যে রাঙা চেলি দিয়ে তোমায় সাজানো	...	১৯
এই যে সবার সামান্য পথ	...	১২৬
একটা আষাঢ়ে গল্প	...	৩১১
একটা কোথাও ভুল হয়েছে	...	৬৬৫
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	...	৩৮৪
একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের	...	১১৭
একদিন তুচ্ছ আলাপের	...	৪০
একদিন শান্ত হলে	...	১১৮
একরাত্রি	...	৩০৭
একলা বসে বাদলশেষে	...	২২১
একাকিনী	...	১৮
একাকিনী বসে থাকে	...	১৮
একা আছ নির্জন প্রভাতে	...	৬৬৬
একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে	...	৩৪
এ-পারে চলে বর, বধূ সে পরপারে	...	২০
এবার অবগুণ্ঠন খোলো	...	২১৪
এসেছিল বহু আগে যারা মোর দ্বারে	...	৩১
এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ	...	২৬২
এসো নীপবনে	...	২০৬
এসো শরতের অমল মহিমা	...	২১৩
ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে	...	২১০
ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে	...	১৯০

ওই-যে তোমার মানস প্রজাপতি	...	১৬
ওগো শীত, ওগো শুভ্র	...	২৮৩
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা	...	২১৪
ওগো সন্ন্যাসী, কী গান	...	২৭০
ওরা এসে আমাকে বলে	...	৯৪
ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে	...	২৯৪, ৬৮২
ওরে মন যখন জাগলি না রে	...	১৮৬
ওলো শেফালি	...	২১৩
কড়ি ও কোমল	...	৫১৩
কত-না দিনের দেখা	...	২৯৩
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	...	৬৪৭
কন্যাবিদায়	...	৩৫
কবিতা-রচনারম্ভ	...	৪২৩
কাবুলিওয়ালা	...	৩৩৯
কাব্যরচনার্চর্চা	...	৪২৮
কার বাঁশি নিশিভোরে	...	২১৫
কার লাগি এই গয়না গড়াও	...	২৮
কারোয়ার	...	৪৯৮
কালবৈশাখী	...	২৬৪
কালো অন্ধকারের তলায়	...	৫৬
কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি	...	৩০
কালো ঘোড়া	...	৩০
কুমার	...	১১
কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী	...	১১
কৃপণতা	...	৬৩৫
কেউ চেনা নয়	...	৫৪
কেন এ কম্পিত প্রেম, অয়ি ভীরু	...	২৫
কেন গো যাবার বেলা	...	২৭৬
কেন পান্থ এ চঞ্চলতা	...	২৭২, ৬৮১
কোথা যে উধাও হল	...	২০৭
কোন্ ছায়াখানি	...	২১
কোন্ বারতার করিল প্রচার	...	২৬৮
খাতা	...	৪০২
খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি	...	১৭৭
গগনে গগনে আপনার মনে	...	২৬৯

গঙ্গাতীর	...	৪৮৮
গন্ধরেখার পঙ্কে তোমার	...	৬৮৩
গান আমার যায়	...	২১৬
গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ	...	৪৮৬
গীতচর্চা	...	৪৫৭
গোয়ালিনী	...	১১
ঘট ভরা	...	১২৪
ঘর ও বাহির	...	৪১৩
ঘরের পড়া	...	৪৫১
চঞ্চল	...	২৯৪'
চরণরেখা তব	...	২৭৭, ৬৮২
ছবি ও গান	...	৫০১
ছবির অঙ্গ	...	৬২৮
ছায়াসঙ্গিনী	...	২১
ছুটি	...	৩৩৫
জননী, কন্যারে আজ বিদায়ের ক্ষণে	...	৩৫
জয়পরাজয়	...	৩৩৪
জানি তুমি ফিরে আসিবে	...	২৯২
জাহাজের খোল	...	৫০৬
জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে	...	২০০
জীবিত ও মৃত	...	৩১৭
ঝরে ঝরো ঝরো	...	২০৭
ঝাঁকড়াচুল	...	৩২
ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা	...	৩২
ডাকো বৈশাখ, কালবৈশাখী	...	২৬৪
ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি	...	২৮১
তখন আমার আয়ুর তরণী	...	১১০
তখন আমার বয়স ছিল	...	১১১
তখন বয়স ছিল কাঁচা	...	৬৪
তপের তাপের বাঁধন	...	২৬৭
তুঙ্গ তোমার ধবলশৃঙ্গশিরে	...	২৮৬
তুমি কি এসেছ মোর	...	২৩০
তুমি গল্প জমাতে পার	...	৯৯
তুমি প্রভাতের শুকতারা	...	৭৮
তোমাতে আমাতে আছে তো প্রভেদ	...	২৩

তোমার আমার মাঝে হাজার বৎসর	...	৩৬
তোমার আসন পাতব কোথায়	...	২৮৯
তোমার নাম জানি নে	...	২১৫
তোমার যে-ছায়া তুমি দিলে আরশিরে	...	১৩
তোমারে আমি কখনো চিনি নাকো	...	৯
ত্যাগ	...	৩০৩
দান	...	১৪
দানপ্রতিদান	...	৩৫৮
দিনের প্রান্তে এসেছি	...	৪৪
দীপালি	...	২৮০
দুঃখ যেন জাল পেতেছে	...	১২০
দেখো দেখো শুকতারা	...	২১২
দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের	...	১২৫
দোল	...	২৯৬
দ্বারে	...	৩৪, ৬৬৬
দ্বিধা	...	৩২
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে	...	২০৯
ধর্মশিক্ষা	...	৫৪৪
ধর্মের অধিকার	...	৫৫৬
ধর্মের অর্থ	...	৫৩৪
ধর্মের নবযুগ	...	৫২৮
ধূসরবসন, হে বৈশাখ	...	২৬৩
ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন	...	২৬১
ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর	...	২৭৩
নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা	...	৫
নব বরষার দিন	...	১২৮
নমো, নমো করুণাঘন	...	২৬৭
নমো, নমো, নমো তুমি ক্ষুধার্ত	...	২৭৭
নমো, নমো, নমো, নমো, তুমি সুন্দরতম	...	২৮৭
নমো, নমো, নমো, নমো নির্দয় অতি	...	২৮৪
নমো, নমো, হে বৈরাগী	...	২৬২
নর্মাল স্কুল	...	৪২১
নানা বিদ্যার আয়োজন	...	৪২৪
নামকরণ	...	৫২৬
নির্মল কান্ত, নমো হে নমঃ	...	২৭৪

নিশীথে কী কয়ে গেল	...	২২৫
নীহারিকা	...	২৮
নূতন কল্পে সৃষ্টির আরম্ভে	...	৬৭
নৃত্য	...	২৬০, ২৮৪
নৃত্যের তালে তালে	...	২৬০
পঁচিশে বৈশাখ চলেছে	...	১০৩
পড়েছি আজ রেখার মায়ায়	...	৬০
পথিক আমি	...	৯০
পথিক মেঘের দল জোটে	...	২০৯
পথে যেতে ডেকেছিলে	...	২৪২
পরানে কার ধেয়ান আছে	...	২৬৫
পসারিনী	...	৯
পসারিনী, ওগো পসারিনী	...	৯
পাগল আজি আগল খোলে	...	২৭৪
পাঁচিলের এ ধারে	...	৭৪
পাড়ায় আছে ক্লাব	...	৮৩
পিতৃদেব	...	৪৩৫
পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ	...	৮৬
পুব হাওয়াতে দেয় দোলা	...	২০৮
পুরবাসী বলে উমার মা	...	৪৫৪
পুষ্প	...	৭
পুষ্পচয়িনী	...	২৩
পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে	...	৭
পুষ্পাঞ্জলি	...	৭১:
পূর্বগগনভাগে	...	২২১
প্রকাশিতা	...	২০
প্রকৃতির প্রতিশোধ	...	৫০০
প্রত্যাবর্তন	...	৪৪৭
প্রত্যাশা	...	২৬৭
প্রভাতসংগীত	...	৪৯১
প্রভেদ	...	২৩
প্রশ্ন	...	১২৫
প্রার্থনা	...	২৯২
প্রিয়বাবু	...	৪৯০
ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন	...	৪০

বঙ্কিমচন্দ্র	...	৫০৪
বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা	...	২০৮
বধূ	...	৮
বন্ধু, রহো রহো সাথে	...	২১০
বরবধূ	...	২০
বর্ষা ও শরৎ	...	৫১০
বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে	...	৪৩
বর্ষামঙ্গল	...	২৭০
বল্ গোলাপ মোরে বল্	...	৬৭৪
বসন্ত	...	২৮৯
বসন্তের বিদায়	...	২৯১
বাংলাশিক্ষার অবসান	...	৪৩১
বাজো রে বাঁশরি বাজো	...	১৭৮
বাড়ির আবহাওয়া	...	৪৫৩
বাতাবির চারা	...	১১৮
বাদল-শেষের আবেশ আছে ছুঁয়ে	...	২৮
বাদশাহের হুকুম	...	৮৮
বাঁধন কেন ভূষণবেশে	...	২২৬
বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে	...	২৩৬
বালক	...	৫০২
বাল্মীকিপ্রতিভা	...	৪৮২
বাহিরে যাত্রা	...	৪২৬
বাহিরে যার বেশভূষার ছিল না প্রয়োজন	...	৩২
বিদায়	...	৩৬
বিলাত	...	৪৬৯
বিলাতি সংগীত	...	৪৮১
বিলাপ	...	২৭৭
বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি একদিন	...	৯৩
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা	...	১৪০
বেসুর	...	২৭, ৬৬৫
বৈশাখ	...	২৬১
বৈশাখ-আবাহন	...	২৬২
ব্যঞ্জনা	...	২৬৬
ভগিনী নিবেদিতা	...	৬১৩
ভগ্নহৃদয়	...	৪৭৭

ভাগ্য তাহার ভুল করেছে	...	২৭
ভানুসিংহের কবিতা	...	৪৬১
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	...	৫৭৫
ভারতী	...	৪৬৬
ভালোবেসে মন বললে	...	৪৯
ভীরু	...	২৫
ভৃত্যরাজক তন্ত্র	...	৪১৯
ভোরের আলো-আঁধারে	...	৫২
মধ্যদিনে যবে গান	...	২৬৪
মধ্যবর্তিনী	...	৩৬৪
মনটা আছে আরামে	...	৬১
মন রে ওরে মন	...	৬৭৯
মনে মনে দেখলুম	...	৪৭
মনে রবে কি না রবে	...	২৯২
মনে হয়েছিল আজ	...	৫১
মনের মানুষ	...	২৯৩
মন্দিরার মন্দ্র তব	...	২৫৮
মরীচিকা	...	১৬
মর্মবাণী	...	১২২
মহামায়া	...	৩৫৩
মাধুরীর ধ্যান	...	২৬৪
মুক্তিতত্ত্ব	...	২৫৭
মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস	...	২৫৭
মুখখানি কর মলিন বিধুর	...	২৯১
মৃত্যুশোক	...	৫০৮
যক্ষ	...	১২৯
যখন দেখা হল	...	৮১
যদি হল যাবার ক্ষণ	...	১৯২
যাত্রা	...	৩৩
যায় রে শ্রাবণকবি	...	২৭১
যুগল	...	২৬
যে-চিরবধূর বাস তরুণীর প্রাণে	...	৮
যে ছায়ারে ধরব বলে	...	২১৩
যে-ধরণী ভালোবাসিয়াছি	...	১৭
যেথা দূর যৌবনের	...	১১৯

যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল	...	১৮১
যৌবনের প্রান্তসীমায়	...	৪১
রঙ লাগালে বনে বনে	...	২৯১
রচনাপ্রকাশ	...	৪৬০
রাগরঙ্গ	...	২৯১
রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো	...	২৯৫
রাজা করে রণযাত্রা	...	৩৩
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	...	৪৯৬
রাস্তায় চলতে চলতে	...	৫৫
রীতিমত নভেল	...	৩৩১
রূপ ও অরূপ	...	৫২২
রোগীর নববর্ষ	...	৫১৯
লীলা	...	২৬৯
লুকানো রহে না বিপুল মহিমা	...	২৮৮
লোকেন পালিত	...	৪৭৬
শরৎ	...	২৭৩, ৬৪৪
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা	...	২৭৫
শরতের ধ্যান	...	২৭৫
শরতের বিদায়	...	২৭৬
শান্তি	...	২৭৪
শান্তি	...	৩৭৭
শিউলি-ফোটা ফুরালো যেই	...	২৭৯
শিক্ষারম্ভ	...	৪১২
শিক্ষার বাহন	...	৬১৯
শিল্পীর ছবিতে যাহা	...	১২২
শীত	...	২৮৩
শীতের উদ্‌বোধন	...	২৮১
শীতের বনে কোন্ সে কঠিন	...	২৮২
শীতের বিদায়	...	২৮৬
শীতের রোদ্দুর	...	৯১
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন	...	২৮৪
শুক্লা একাদশী	...	১৫
শুনিতে কি পাস	...	২৬৬
শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে	...	৭০
শেষ পর্ব	...	১১৯

শেষ মিনতি	...	২৭২
শেষের রঙ	...	২৯৫
শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া	...	২১২
শ্যামলা	...	১৭
শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার	...	২৭১
শ্রাবণ-বিদায়	...	২৭১
শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ	...	২৭৩
শ্রীকণ্ঠবাবু	...	৪২৯
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী	...	৫১২
সকলকলুষতামসহর	...	২৪৬
সন্ধ্যাসংগীত	...	৪৮৫
সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই	...	২৯৪
সমস্যাপূরণ	...	৩৯৭
সমাপ্তি	...	৩৮৫
সম্পাদক	...	৩৬২
সম্বোধন	...	২৬৩
সাজ	...	১৯
সাহিত্যের সঙ্গী	...	৪৫৮
সুভা	...	৩৪৯
সে আমার গোপন কথা	...	১৩৫-১৩৭
সে আসে ধীরে	...	৬৭৬
সে যে মনের মানুষ কেন তারে	...	৬৮০
সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা	...	৬৬
সোনার কাঠি	...	৬৩৩
স্তব	...	২৮৬
স্থির জেনেছিলেম	...	৩৯
স্বর্ণমৃগ	...	৩২৪
স্বাদেশিকতা	...	৪৬২
স্মৃতিপাথেয়	...	১১৭
স্যাকরা	...	২৮
হাটেতে চল পথের বাঁকে বাঁকে	...	১১
হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার	...	২৭৯
হার	...	১৫
হার মানালে	...	২৪৫
হালকা আমার স্বভাব	...	৯৮

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী ... ২৪১
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ... ৬০৩
হিন্দু-ব্রাহ্ম ... ৭২৪
হিমালয়যাত্রা ... ৪৩৯
হিমের রাতে ওই গগনের ... ২৮০
হৃদয় আমার, ওই বুঝি ... ২৬৩
হে উষা তরুণী ... ১৪
হে ক্ষণিকের অতিথি ... ২১৫
হে পুষ্পচয়িনী ... ২৩
হে বসন্ত, হে সুন্দর ... ২৮৯
হেমন্ত ... ২৭৯
হে মহাজীবন ... ২৪৫
হে যক্ষ, তোমার প্রেম ... ১২৯
হে যক্ষ, সেদিন ... ৯৩
হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে ... ২৮৬
হে হেমন্তলক্ষ্মী, তব ... ২৭৯

সুলভ সংস্করণ

ISBN-81-7522-364-2 (V.9)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)